



রচনা বালী

সৈয়দ মুজতবা আলী



ହିନ୍ଦୀ ସ୍ଫୁଟନ ଓ ଚଳିତ ବିଚାରବଳୀ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ



ସିତ ଓ ଘୋଷ ପାବ୍ଲିଶାର୍ସ
ପ୍ରା ଇ ଡେ ଟି ଲି ମି ଡେ ଡ

୧୦ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, କଲିକାତା ୧୨

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
স্বমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিদ্ধ-স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
এস. এম. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	সৈয়দ আলী আহসান	/০
অবিখ্যাস্ত	...	১
শব্দনম	...	১০২
প্রেম	...	২৭১
ছ-হারা		
ছ-হারা	...	৩৪৫
প্রেমের প্রথম ভাগ	...	৩৮১
মত্বপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা	...	৩২০
শ্রীচরণেষু	...	৪০০
পুচ্ছ (প্র)দর্শন	...	৪০৭
নটরাজনের একলব্যজ্ঞ	...	৪১২
বুড়ো-বুড়ী	...	৪৩৬
কোষ্ঠী-বিচার	...	৪৪৪
একটি অনমিত নাম :		
বনবিহারী মুখোপাধ্যায়	...	৪৪৭
অদৃষ্টের রঙ্গরস	...	৪৬৪
দ্বিজ	...	৪৮০
গ্রন্থ-পরিচয়	...	৪৮৭

ভূমিকা

একজন লেখক তাঁর উপলব্ধির প্রতিকল্প আবিষ্কার করেন শব্দে। অথবা আবিষ্কার না বলে বলা যায়, তিনি স্বতঃসিদ্ধান্তে একটি বক্তব্যে উপনীত হন। আমরা অনেক সময় সকালবেলায় জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকাই, তখন হয়তো কুয়াশার অস্পষ্টতায় পাখী দেখি, মেঘ দেখি, এলোমেলো গাছের পাতা অথবা কাগজের টুকরো উড়ে যেতে দেখি, হয়তো গানের শব্দ কানে আসে, হয়তো অনেক পুরোনো ঘটনা সহসা মনে সাড়া তোলে। আমি যদি বুদ্ধিমান হই, তাহলে আমি তখন সমস্ত ঘটনার বিমিশ্রণে একটি কুশলী ভাষণ উপস্থিত করবো যার মধ্যে আমার চিন্তা ও অহমিকার পরিচয় থাকবে এবং অধীত বিচার তাৎপর্য আবিষ্কৃত হবে। একটি উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় এভাবেই লেখকের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। এ পরিপূর্ণতার পথে অন্তরঙ্গ ধ্যান এবং চিন্তায় শব্দগুলো আবেগ ও বিশ্বাসের উষ্ণতায় হৃদয়কে উন্মোচিত করে। সমস্ত ঘটনা এবং চিন্তা তখন শব্দ হিসেবে উদয় হয়।

শব্দ হচ্ছে দাবাখেলার গুটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতির সাহিত্যে ঘটগুলো শব্দ আছে তা নিয়েই তার বহু বিচিত্র কথার খেলা। আবার কখনও কখনও শব্দ যোগ করি, কখনও পুরাতন শব্দকে অস্বীকার করি এবং এভাবে আয়ত্তাগত শব্দের সামগ্রীকে অনবরত নব নব বিজ্ঞাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তুলি।

সমাজ হচ্ছে শব্দবৈচিত্র্যের লীলাভূমি। মানুষের অনবরত সংলাপ, জিজ্ঞাসা, ইচ্ছা, অহমিকা, বেদনা, প্রতিদিন উচ্চারিত ধ্বনিকে ইঙ্গিতবহু করছে। আমরা যদি কখনও আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সমাজ-বিমুখ হই, তাহলেও সমাজ আমাদের অনুসরণ করবে ভাষা হয়ে, কখনও জাগরণে, কখনও স্বপ্নে। শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতার স্মৃতিকে ধারণ করে আছে, শব্দ হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস ও বিবেকের সাড়া। যিনি চিরকাল আকাশে স্বপ্ন ছড়াতে চান, তিনিও তাঁর শব্দকে মানবসমাজের চেতনার আড়ালে নিতে পারেন না। প্রতিদিনের গতি-বিধিতে যতটা অঞ্চল আমরা পরিক্রম করি, শব্দরূপে আমাদের ইচ্ছাগুলো তার চেয়েও অধিক অঞ্চল পরিক্রম করে, কিন্তু যেহেতু তা শব্দরূপে এবং যেহেতু শব্দসকল মুহূর্তেই সমাজের অনুভূতির উত্তাপ তাই আমাদের সকল ইচ্ছা, কল্পনা ও স্বপ্ন আমাদের সমাজ এবং সভ্যতার উৎপ্রেক্ষা যাত্র।

লেখার প্রাথমিক পর্যায়ে যে সরলতা থাকে তা জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার

অভাবের জন্ম, কিন্তু সর্বশেষের সরলতা অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তার জন্ম। আমরা প্রথমে ভাষাকে পাই, কিন্তু অবশেষে তাকে আবিষ্কার করি শাসনের মধ্যে এবং অস্তিত্বের বিচিত্র খেলায়। রুদ্ধবাক থেকে মুক্তবাক এবং অবশেষে সর্বসঙ্কয়ের অভিজ্ঞতায় স্বল্পবাক—যে কোনও প্রধান লেখকের লেখক-জীবনের ক্ষেত্রে এ উক্তি চরমভাবে সত্য। যাকে ইংরেজীতে বলে crystallization অর্থাৎ স্ফটিক-বন্ধন, আমাদের অভিজ্ঞতা যখন স্ফটিকের নিশ্চিত স্বচ্ছতায় পরিণত হবে, তখন অনেক কথা বলবার প্রয়োজন করবে না। অতি অল্প কথায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাস্তব করবো। আমরা প্রতিদিন জীবনের অলিন্দে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার নিঃশ্বাস গ্রহণ করছি। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জীবনের যে সঙ্কয়, অভিজ্ঞতার আহরণ নিয়ে একজন লেখকের জীবনে তা যেমন সত্য, অল্প কারোও জীবনে তেমন নয়।

পাঠকের বুদ্ধিকে দীপিত করা এবং আবেগকে পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব লেখকের। শব্দের বিস্তারের মধ্যে নতুন ধ্বনি-ব্যঞ্জনা দান করে, বক্তব্যকে একই সঙ্গে চিন্তা ও আবেগের মধ্যে শিহরিত করে পাঠকের আপন বোধের রাজ্যে লেখক তার সন্তাকে কল্পিত দেখবেন। প্রতিদিনের কথা একটি তীব্র স্বাভাবিকতায় অথচ এ-মূহূর্তের সীমাকে অতিক্রম করে একটি জীবনের স্মরণচিহ্ন হবে। জ্ঞানের পরিধি বর্তমানে অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যা জানি তা আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের অনেক বেশী অর্থাৎ যতটা আমাদের ব্যবহারে লাগবে তার চেয়ে অনেক বেশী। একজন লেখককে এ জানার অসম্ভব প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করতে হয়। পাঠক যেখানে বাস করেন ব্যবহারের এবং প্রয়োজনের পৃথিবীতে লেখক সেখানে বাস করেন জ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধিমান ভবিষ্যতের অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই পাঠককে লেখকের কাছে পৌঁছতে হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে এ-কথা খুবই প্রযোজ্য।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে হলে আমাদের ভাষায় জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত শব্দের প্রত্যাপের কথা বলতে হয়। যেভাবে তিনি শব্দকে ব্যবহার করেছেন, শব্দকে তার বহুবিধ লৌকিক অঞ্চল থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে প্রবাহিত করেছেন, মানুষের উচ্চারণগত বাণীভঙ্গীকে নির্মিত বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি নিজেই নিজের তুলনা।

প্রতিদিনের জীবনে লঘুসম্পর্কের যে শিহরণ আছে, ক্ষণকালীন যে কোঁতুক আছে, সময় অপহরণের জন্ম কয়েকজন মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরের যে কল্লোল

আছে—মুজ্তবা আলীর বলার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কোনও রচনাতেই তিনি নিঃসঙ্গ নন। তিনি আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন, তাঁর লেখাতেও সেই আসরের আমেজ এসেছে। তাঁর শব্দের প্রবাহের মধ্যে তিনি শুধু একাকী উপস্থিত নন, আমরা অমুগ্ধব করি যে আসরের অন্ত্যস্ত লোকেরাও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের বিস্তার এমন স্বভাবের যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মানুষের কলরব সেখানে শোনা যায়। এই অসাধারণ দক্ষতার ফলেই মুজ্তবা আলী তাঁর রচনার মধ্যে একটি চতুর নাগরিক জীবনকে বাস্তব করতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ অমুযোগ করেন যে, মুজ্তবা আলী ইচ্ছা করলে তাঁর বিচিত্র জ্ঞানের নির্ধাস নিয়ে জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিগত কোন কিছু আমাদেরকে দিয়ে যেতে পারতেন। হয়তো বা পারতেন কিন্তু তা হলে আমরা সদাহাস্তময় মুজ্তবা আলীকে প্রাত্যহিক জীবনের লঘু স্পর্শের আনন্দ-কল্লোলের মধ্যে পেতাম না।

মুজ্তবা আলী অনেকদিন বিদেশে ছিলেন, বিশেষ করে জার্মানিতে। সেখানকার জীবনকে তিনি জেনেছিলেন, বিশেষ করে সেখানকার মানুষের সময়-ক্ষেপণের যে সমস্ত উপকরণ ছিল সেগুলো তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আমরা সাধারণত যে জার্মানীকে জানি, শিলার গায়টে অথবা হাইনের রচনায়, মুজ্তবা আলীর জার্মেনী সে জার্মেনী নয়, তাঁর জার্মেনী হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত নগর-জীবনের বিচিত্র মানুষের অবসর-মুহূর্তের জার্মেনী। এ জার্মেনীকে দেখা যায় বিভিন্ন শহরের বিয়ারের আড্ডায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অহুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভায়, যন্ত্রণার মধ্যেও রহস্যপ্রিয়তায়। বিদেশীরা সাধারণত এ জার্মেনীকে দেখে নি। মুজ্তবা আলীর সৌভাগ্য যে তিনি সে জার্মেনীকে দেখেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তাঁর নিজস্ব স্বভাবের শব্দের ব্যবহারের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিপাতই আমরা আবিষ্কার করি। এত অন্তরঙ্গভাবে একটি জাতির পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। মুজ্তবা আলীর রচনায় আমরা হিটলারের সমসাময়িক জার্মেনীকে পাচ্ছি, আবার হিটলারের পরবর্তী জার্মেনীকে দেখছি এবং একেবারে শেষে নতুন শোভায় সমৃদ্ধ নতুন জার্মেনীকে পাচ্ছি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি জার্মেনীর আত্মনাকে দেখেছেন, তার বেঁচে থাকার প্রয়াসকে দেখেছেন এবং তাকে একটি উজ্জ্বল সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ পরিচয়গুলো তথ্যভারাক্রান্ত গভীর অমূল্যবোধের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। জার্মেনীর বিচিত্র স্বভাবের মানুষের কল্লোলের মধ্যে তিনি জার্মেনীকে আবিষ্কার করেছেন।

ঠিক একইভাবে তিনি কলকাতাকে চিনেছিলেন এবং তার পরিচয় উদ্ঘাটন করেছিলেন। কলকাতার যে পরিচয় সাহিত্যে অথবা কাব্যে অথবা বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মানুষের জীবনযাত্রায়, সে কলকাতাকে মূজতবা আলী তাঁর প্রয়োজনের সামগ্রী করেন নি। বর্তমানকালের অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় যে মানুষ প্রতিদিন জীর্ণ হচ্ছে সে মানুষের পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দের যে উপকরণ আছে সে আনন্দের উপকরণকে তিনি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন। মূজতবা আলীর রচনায় সকল মানুষকে একই আসরে উপস্থিত হতে দেখি। পর্যাপ্ত রসিকতার মধ্যে, বিনয়ের লঘুস্পর্শে, চতুর সংলাপের মধ্যে যে সব মানুষকে আমরা দেখেছি তারা সর্বতোভাবে বর্তমান মুহূর্তের মানুষ। যদি সময়কে স্পষ্টভাবে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে বলা যায় যে মূজতবা আলীর রচনায় আমরা ঠিক এই মুহূর্তের চলমান বর্তমানকে পাই। কতদিন এই বর্তমান থাকবে জানি না, কিন্তু যতদিন থাকবে ততদিন মূজতবা আলীর রচনাকে আমরা বর্তমান সময়ের অন্তঃসার হিসেবে গণ্য করব।

প্রত্যেক লেখকের রচনার প্রতিকৃতি তাঁর প্রতিফলিত মানসিকতার বাণীরূপ। কখনও শ্রদ্ধা, কখনও অবজ্ঞা, কখনও নিরাসক্তিতে আমরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম ও সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করি তখন আমাদের বর্ণনার শব্দসজ্জায় কখনও শ্রদ্ধা, কখনও অবজ্ঞা, কখনও নিরাসক্তি ধরা পড়ে। তথ্যের ব্যতিক্রমের সঙ্গে অহুভূতির ব্যতিক্রম যে সর্বত্র হবে তা বলা চলে না। তথ্যের সমৃদ্ধি তার স্থিরতা, এবং অহুভূতির সমৃদ্ধি তার প্রবাহে। ‘তিনি কবি’, ‘তিনি কবিতা লিখবার চেষ্টা করেন’, ‘তিনি কবিতা লেখেন’—এ তিনটি উক্তিই একটি তথ্যই আছে যে, যে ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তিনি কবি কিন্তু তিনটি উক্তি তিনটি বিভিন্ন মনোভাব ধারণ করছে। প্রথম উক্তিই শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় উক্তিই অবজ্ঞা এবং তৃতীয় উক্তিই নিরাসক্তি স্পষ্ট। স্টাইল বা বাগ্-ধারা এভাবেই লেখকের প্রতিফলিত মানসিকতা। লেখকের মানসিকতার পশ্চাতে সক্রিয়রূপে অথচ প্রায়শঃই অজ্ঞাতে বিদ্যমান তাঁর সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষা। যে সমাজ ও পরিবেশ লেখককে লালন করেছে এবং যার প্রাণে তিনি সমৃদ্ধ অথবা লাহিত তাঁর মানসরূপ নির্মাণকার্যে সে সমাজ সর্বদাই প্রতিশ্রুত। যে পাঠক্রম এবং শিক্ষার দ্বারা তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন সে শিক্ষা তাঁর বক্তব্যকে বুদ্ধিদীপ্ত অথবা নির্বিকার, চাতুর্ময় অথবা নিরাভরণ, দ্বিধাহীন অথবা শঙ্কিত, প্রশান্ত অথবা অশোভন করে।

গত লেখার প্রকৃতি নির্ধারণ এ জন্তই দুর্লভ কর্ম। আমরা সকলেই কথা বলি।

গল্পে, আমাদের প্রতি মুহূর্তের পরিচয়ের ভাষা গল্প, তাই বিভিন্ন প্রকারের গল্প রচনার মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে তা আমাদের নির্ণয়ে আসে না। কবিতা সম্পর্কে গভীর অসুধাবন সহজে সম্ভবপর না হলেও যে কোনও লোক একথা বলতে পারেন যে কবিতার একটি বিশেষ গঠন-সৌষ্ঠব আছে, ছন্দ আছে, শব্দের পুনরাগম আছে। কবিতা সম্পর্কে এ কথাই সব কথা নয় এবং হয়তো বিশিষ্টার্থক কোনও কথাই নয়। কিন্তু বিশ্লেষণবিহীন হঠাৎ মন্তব্যের জগত এ কথাই আপাততঃ চূড়ান্ত! গল্প সম্পর্কে এভাবে হঠাৎ কোনও মন্তব্য করা চলে না। মুজতবা আলী প্রসঙ্গে এ কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর স্বভাব, মানসিকতা, চিন্তাগত প্রবণতা তাঁর শব্দের সজ্জার মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে।

বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র ছোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে এক অনন্ত সমৃদ্ধমান ব্যক্তি।

বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

}

সৈয়দ আলী আহসান



সৈ—মে

অবিশ্বাস

বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক
স্থায়িক শ্রী প্রমথনাথ বিনোয়—

মধুগঞ্জ মহকুমা শহর বলে তাকে অবহেলা করা যায় না।

মধুগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য নগণ্য; মধুগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে; মধুগঞ্জে জলের কল, ইলেকট্রিক নেই, তবু মানুষ মধুগঞ্জে বদলি হবার জন্য সরকারের কাছে ধন্যে দিত। কারণ এসব অসুবিধাগুলো যে রকম এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শাপ, অন্যদিক দিয়ে আবার ঠিক সেইগুলোই বর। মাছের সের ছ আনা, ছুধের সের ছ পয়সা, ঘি়ের সের বারো আনা এবং সেই অল্পপাতে আঙা মুরগী সবই সম্ভব। আর সবচেয়ে বড় কথা, কাক্সাবাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য মধুগঞ্জ পূর্ববাঙলা-আসামের অক্সফোর্ড বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না; ওয়েলশ মিশনারীদের রূপায় মধুগঞ্জে একটা হাইস্কুল আর ছোটো প্রাইমারী স্কুল যে পদ্ধতিতে চলত তা দেখে বাইরের লোক মধুগঞ্জে এসে অবাক মানত। স্কুল-হস্টেলে সীটের জন্য পূর্ববাঙলা-আসামে একমাত্র মধুগঞ্জেই আড়াই-গজ ওয়েটিং লিস্ট অফিসের দেওয়ালে টাঙানো থাকত। হস্টেলের খাই-থরচা মাসে সাড়ে চার টাকা, আর সীট-রেন্ট চার আনা!

মধুগঞ্জের আরেকটি সদৃশ্যের উল্লেখ করতে লেখকমাত্রই ঈর্ষা কুণ্ঠিত হবেন। লেখকমাত্রই সাহিত্যিক, কাজেই মধুগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁদের হৃদয় আকৃষ্ট করবে এ তো জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যিকেরা এ তত্ত্বও বিলক্ষণ জানেন যে, এ সংসারে আর পাঁচজন শহরের দোষগুণ নির্ণয় করার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জিনিসটাকে জমা-থরচের কোনো খাতেই ফেলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ এ তত্ত্ব তো অভিশয় সত্য যে, নিছক প্রকৃতির মাধ্যমে মুগ্ধ হয়ে কেউ চাকরিতে বদলি খোঁজে না, কিংবা ব্যবসা ফাঁদে না।

এ সত্য জানা সত্ত্বেও যে দু-একজন সাহিত্যিক বরষাজীকূপে কিংবা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছেন তাঁরাই মধুগঞ্জের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাই দেখে খাস মধুগঞ্জীয় কাঁচা সাহিত্যিকেরাও মধুগঞ্জের আর পাঁচটা সুখ-সুবিধের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও প্রশংসা গেয়েছেন।

পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উচু-নিচু খোয়াইভাঙা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উচু-নিচুর ঢেউ-খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়ার রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বলে

মনে হয়, এই আধমাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশ নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার খোয়াইভাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে, সে মায়াদিগন্ত মালুঘের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি মন স্বাধীন; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপারপানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নপ্রয়াণে তো আমার রক্ত-মাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সবকিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার ছুটি মাত্র চোখই আমাকে এক নিমেষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে, যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে'; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মালুঘ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।'

এ মুক্তি-ধারণা নিছক কবি-কল্পনা নয়। বহুবার দেখা গিয়েছে সম্ভার সময় পশ্চিমপানে তাকাতে তাকাতে সাঁওতাল ছেলে হঠাৎ দাওয়া ছেড়ে স্বর্ধাস্তের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর সে আর ফিরল না। মড়া পাওয়া গেল পরের দিন খোয়াইয়ের মাঝখানে—বাড়ি হতে অনেক দূরে; বুড়ো মাঝিরা বলে, ভূত তাকে ডেকেছিল, তারপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে কী দেখেছে, কী ভয় পেয়ে মরেছে, কে জানে?

পূর্ববাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পূর্ববাঙলার 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে/সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ভোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, হলদে-সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম, জাম, কাঁঠালের ঘন সবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্রাণ্ডলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস থেয়ে থেয়ে পূর্ববাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ—কৃষ্ণশ্রাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্রামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?

কিন্তু মধুগঞ্জের সৌন্দর্য এও নয় ও-ও নয়। মধুগঞ্জ পূর্ববাঙলার মত ফ্ল্যাট নয়, আবার পশ্চিমবাঙলার মত ডেউ-খেলানোও নয়। ভগবান যেন মধুগঞ্জে

এক তিসরা থেলা থেলার জন্তু নয়। এক ক্যানভাস নিয়ে বসে গেছেন। ক্যানভাসখানা বিরাট আর তাতে আছে মোটামুটি তিনটি বড় রঙের পৌচ—সামনের ‘কাজলধারা’ নদীর কাকচক্ষু কালো জল, নদী পেরিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত, সর্বশেষে এক আকাশাছোয়া বিরাট নিরেট নীল পাথরের খাড়া পাহাড়। এখানে পশ্চিম বাঙলার মত মাঠ ঢেউ খেলতে খেলতে পাহাড়ে বিলীন হয় নি—পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে আছে পালিশ সবুজ মাঠের শেষে সোজা খাড়া পাঁচালের মত। তার গায়ে কিছু কিছু খাঁজ আছে কিন্তু এ খাঁজ আকড়ে ধরে ধরে উপরে চড়া অসম্ভব।

মধুগঞ্জের যেখানেই যাও না কেন উত্তরদিকে তাকালে দেখতে পাবে, কালো নদী, সবুজ মাঠ আর তার পর নীল পাহাড়। আর সেই পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে কত শত রূপালী ঝরনা। দূর থেকে মনে হয়, নীল ধাতুর উপর রূপোর বিদ্যুী মিনার কাজ।

এ পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকে না—এ পাহাড় বলে, যেখানে আছ সেইখানেই থাকো।

এরকম পাহাড় বিলেতে প্রচুর আছে, শুধু গায়ে নেই মিনার কাজ আর সামনে নেই সবুজ মাঠ, কাজলধারার কালো জল।

তাই আইবিশম্যান ডেভিড ও-রেলি মধুগঞ্জে অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ হয়ে আসামাত্রই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল।

॥ ২ ॥

প্রেমটা কিন্তু দু’তরফাই হল। ছোট্ট মহকুমার শহরটি ও-রেলিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেললে।

তার প্রধান কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। ও-রেলি সত্যিই সুপুরুষ। ইংরেজ বাঙালীর তুলনায় অনেক বেশী ঢাঙা, তার উপর এদেশে বেশীদিন বাস করলে কেউ হয়ে যায় দারুণ মোটা, কেউ বড্ড লিকলিকে, কারো বা নাক হয়ে যায় টকটকে লাল, কারো দেখা দেয় সাদা চামড়ার তলায় বেগনি রঙের মোটা মোটা শিরা-উপশিরা। তার-ই মাঝখানে হঠাৎ যখন স্বাস্থ্যবল আরেক ইংরেজ এসে দেখা দেয়—ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রেশ ক্রম ক্রিসটিয়ান হোম্—তখন সে সুন্দর না হলেও তাকে প্রিয়দর্শন বলে মনে হয় ; রাজপুত্র না হলেও অন্তত কোটালপুত্রের খাতির পায়।

বয়স তার একুশ, জোর বাইশ। সায়েবদের ফরসা রঙ তো আছেই কিন্তু তার চুল খাটি বাঙালীর মতো মিশকালো আর তার সঙ্গে ঘননীল চোখ। এ জিনিসটি অসাধারণ; কারণ সায়েব-মেমদের চুল কালো হলে চোখও কালো, নিদেনপক্ষে বাদামী—আর চুল রঙ হলে চোখ হয় নীল। আমাদের দেশেও যাদের রঙ ধবধবে ফরসা হয় তাদের চোখও সাধারণত একটুখানি কটা; তাই যখন তাদের চোখ মিশমিশে কালো হয় তখন যেন তাদের চেহারাতে একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়। কালো চুল আর নীল চোখও সেই আকর্ষণী শক্তি ধরে।

মধুগঞ্জ যদিও ছোট শহর তবু তার বিলিতি ক্লাব এ অঞ্চলে বিখ্যাত। শহর থেকে বিশ মাইল দূরে যে স্টেশন সে পথের দুদিকে পড়ে বিস্তর চাবাগান আর রোজ সন্ধ্যায় সে সব বাগান থেকে হেটিয়ে আসত ক্লাবের দিকে সায়েব-মেম আর তাদের আগুবাচ্চারা।

ফুটফুটে ক্লাব-বাড়িটি। একদিকে লন টেনিসের কোর্ট আর ভিতরে বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা—বিলিয়ার্ডের বল দেখে খানসামারা ক্লাবের নাম দিয়েছিল ‘আগুঘর’, আর সেই থেকে এ অঞ্চলে ঐ নামই চালু হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে মুন্স্কী রায়বাহাদুর কাশীখর চক্রবর্তীরও একটা ‘অনবজ্ঞ অবদান’ আছে। ক্লাব তখন সবোন্নত খুলেছে। সায়েব-মেমরা ধোপদুর্ন্ত জামাকাপড় পরে টুকটাক করে টেনিস খেলছেন—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রায়বাহাদুর ভীত নয়নে একটিবার সেদিকে তাকালেন। সে সন্ধ্যায় পাশার আড্ডায় রায়বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে বললেন, ‘দেখলে হে কাণ্ডখানা, সায়েবরা নিজেদের জ্ঞা রেখেছে একখানা মোলায়েম খেলা; ধাক্কাধাক্কি মারামারি নেই—যে যার আপন কোটে দাঁড়িয়ে দিব্যি খেলে যাচ্ছে। আর তোমাদের মত কালো-আদমিদের জ্ঞা ছেড়ে দিয়েছে একটা কালো ফুটবল। তার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে বাইশটা নেটিভকে—মরো গুঁতোগুঁতি করে, আপোসে মাথা ফাটাফাটি করে। আর দেখেছ, সাহেবদের যদি বা কেউ তোমাদের খেলায় আসে তবে সে মাঠের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে বাজায় গোরা রায়ের বাঁশি—তার গায়ে আঁচড়টি লাগবার জো নেই।’

পাশা খেলোয়াড়রা একবাক্যে স্বীকার করলেন, এত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার একমাত্র রায়বাহাদুরেই সম্ভবে, তত্পরি তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তানও তো বটেই!

সেই রায়বাহাদুরের সপ্তম দর্শনের বেলুনটি ফুটো করে চুপসে দিয়ে দেশে নাম

করে ফেললে বিদেশী ও-রেলি। চার্জ নেবার তিনদিন পরেই দেখা গেল, সে ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফুটবলে দমান্দম কিক লাগাচ্ছে; আর এদেশের ভিজে মাঠে খেলার অভ্যাস নেই বলে হাসিমুখে আছাড় খেল বার তিরিশেক।

রায়বাহাদুর বললেন, 'ব্যাটা বন্ধ-পাগল নয়,—মুক্ত পাগল।'

পাশা খেলোয়াড়রা কান দিলেন না। পুলিশের বড় সাহেব ছোঁড়াদের নিয়ে ধেই ধেই করলে অভিভাবকদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু এসব পরের কেক্কা।

ক্লাব জয় করেছিল ও-রেলি—প্রথম দিনই টেনিস খেলায় জিতে নয়—হেরে গিয়ে। মাদামপুর চা-বাগিচার বড় সায়েব এ অঞ্চলের টেনিস চ্যাম্পিয়ান। পয়লা সেট ও-রেলি জিতল; কারণ সে বিলত থেকে সঙ্গে এনেছে টেনিস খেলার এক নতুন ঢঙ—মিডকোর্ট গেম আর বড় সাহেব খেলেন সেই বেজ লাইনে দাঁড়িয়ে আঙিকালের কুটুস-কাটুস। অথচ পরের দু সেটে ও-রেলি হেরে গেল—দাবার ভাষায় বলতে গেলে অবিশ্বি গজ্জচক্র কিংবা অশ্বচক্র খেল না বটে, আনাড়ি দর্শকেরা ভাবলে বড় সায়েব প্রথম সেটে স্ততো ছাড়ছিলেন; জউরীরা বিলক্ষণ টের পেয়ে গেল, ও-রেলি প্রথম দিনেই 'ওভার চালাক', 'বাউস্মার' হিসাবে বদনাম কিনতে চায়নি। মেমেরা তো অজ্ঞান—যদিও হারলে তবু কী খেলাটাই না দেখালে, 'মাস্ট বি দি হীট, ইউ নো ফ্রেশ ফ্রম হোম' ইত্যাদি। বড় সায়েবও খুশি। সবাইকে বলে বেড়ালেন, 'ছোকরা আমার চেয়ে ঢের ভালো খেলে, তবে কি না, বুঝলে তো, আমার বুড়ো হাড়, হেঁ হেঁ, অফ কোর্স!'

পরদিনই দেখা গেল, ও-রেলি বুড়ো পাত্রী সায়েব রেভারেন্ড চার্লস ফ্রেডারিক জোনসকে পর্যন্ত বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে 'আণ্ডা-ঘরের' দিকে। বুড়ো পাত্রী অতিশয় নীতিবাগীশ লোক, অবরে-সবরে ক্লাবে এলে নির্দোষ বিলিয়ার্ডকে পর্যন্ত ব্যাসনে শামিল করে দিয়ে এক কোণে বসে সেই অজ্ঞ ওয়েলসের দেড় মাসের পুরনো খবরের কাগজ পড়তেন কিংবা বাচ্চাদের সঙ্গে কানামাছি খেলতেন। ও-রেলির পাল্লায় পড়ে ধর্মপ্রাণ পাত্রীর পর্যন্ত 'চরিত্রদোষ' ঘটল। দেখা গেল, পাত্রী এখন প্রায়ই ক্লাবে এসে ও-রেলির সঙ্গে এক প্রান্ত বিলিয়ার্ড খেলে সম্ভার পর তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শহরের বাইরে ও-রেলির বাঙলোর দিকে চলেছেন।

পাত্রী যে ও-রেলির সঙ্গে জমে গেলেন তার অন্ত কারণও আছে।

ও-রেলির খানার কাছেই পাত্রীদের ইস্কুল। চাকরিতে ঢোকার দিন দশেক পরে ও-রেলি লক্ষ্য করল ইস্কুলে কতগুলো সায়েব-মেমের বাচ্চাও ঘোরাঘুরি

করছে, কিন্তু দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আসলে এরা ঠিক কী ?

ইনস্পেক্টর সোমকে ভেকে পাঠিয়ে বললে, 'সোম ?'

'ইয়েস স্যর !'

'নো, আমাকে "স্যর" "স্যর" করো না !'

'নো, স্যর !'

'ফের "স্যর" ?'

'ইয়েস স্য—!'

বাচ্চাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সায়েব শুধাল, 'এরা কারা ?'

সোম চুপ করে রইল ।

ও-রেলি বলল, 'দেখো সোম, তুমি আমার সহকর্মী । তুমি যা জান আমাকে খোলাখুলি না বললে আমি এখানে কাজ করব কী করে, আর তুমিই বা আমার সাহায্য পাবে কী করে ?'

'আজ্ঞে, এরা ইয়োরেশিয়ন ।'

'ভালো করে খুলে বলো ।'

'এরা দোআশলা ; এদের অধিকাংশই চা-বাগান থেকে এসেছে । এদের বাপ—'

'খামলে কেন ?'

'চা-বাগানের সায়েব আর মা—এই, এই, যাদের বলে কুলী রমণী ।'

ও-রেলি ষ মেয়ে সব কিছু শুনল । তারপর অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধাল, 'তা এদের সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু বলেনি কেন, এমন কি পাত্রী সায়েব পর্যন্ত না ?'

সোম বললে, 'এদের নিয়ে খাস ইংরেজদের লজ্জার অন্ত নেই, তাই, এরা তাদের ঘেন্না করে । পাত্রী সায়েব ভালো মানুষ, তাই এ নিয়ে ঠঁর দুঃখ হওয়ারই কথা । বোধহয়, আপনাকে ভালো করে না চিনে কোনো কিছু বলতে চাননি ।'

সেদিনই থানা থেকে ফেরার সময় ও-রেলি সোজা পাত্রীর টিলায় গেল । পাত্রীকে সে কী বলেছিল জানা নেই । তবে পাত্রী-টিলার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের প্রথম খাস ইংরেজ সদস্য ও-রেলি—অবশ্য পাত্রী সায়েবদের বাদ দিয়ে—সে কথাটা ক্লাবের মিনিট বুক সগর্বে সানন্দে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।

খবর শুনে এস-ডি-ও প্রামার ও-রেলিকে বললেন, 'গো স্নো !'

ও-রেলি তর্ক জোড়েনি, তবে এ বিষয়ে তার মনের গতি কোন্ দিকে সেটাও জানিয়ে দিতে কস্বর করেনি ।

রায়বাহাদুর খবরটা শুনে বললেন, 'নাঃ, ছোঁড়াটাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তবে না আত্মে ডোবে। পাদ্রী-টিলার কোনো একটা ডপকা ছুঁড়িকে বিয়ে করলেই চিস্তির !'

আর ইস্কুলের ছোঁড়ারা তো ওয় নাম দিয়ে ছড়া বানিয়েছিল,

'ও—রেলি, কোথায় গেলি ?'

সাহেব মানে শুধিয়ে উত্তর শুনে ডাম্‌ গ্লাড্‌ ।

তারপর হাত-পা ছুঁড়ে আবৃত্তি করলে,

'O, Mary, go and call the cattle

Home,

Call the cattle home,

Across the sands of Dee.'

'আমাকে ঐ ক্যাটল্‌দের একটা মনে করেছ বুঝি ? তাই নই, আমি না হয় তোমাদের দেবতা "হোলি কাও"ই হলুম ।'

॥ ৩ ॥

এক বৎসর হয়ে গিয়েছে। ও-রেলিকে মধুগঞ্জ যে ক্রিকেট ম্যাচের মত লুফে নিয়েছিল সেই থেকে সে শহরের ছেলে-বুড়োর বৃকে গোঁজা—ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যবাহী তাকে 'ড্রপ' করা হয়নি।

ইতিমধ্যে ভর বর্ষায় মধুগঞ্জের জলে সাড়ষরে নৌকো-বাচ হয়ে গেল। বিলেত তার নৌকো-বাচ নিয়ে যতই বড়ফাটাই করুক না কেন, পূববাঙলার নৌকো-বাচের তুলনায় সে লাফালাফি বাচ্চাদের কাগজের নৌকো ভাসানোর মত। ও-রেলি উল্লাসে বে-এজ্ঞেয়ার। নৌকো-বাচের আইনকানুন সোমের কাছ থেকে তিন মিনিটে রপ্ত করে বন্দুক কাঁধে করে উঠল মোটর বোটে। সোমকে বললে, 'তুমি এগিয়ে যাও আমার লঞ্চ নিয়ে শুদ্ধিকের শেষ সীমানায়, সেখানে যেন কোনো বদমাইশি না হয়। আমি এদিক সামলাব—এখানেই তো জেতার গোল !'

সোম বললে, 'সায়েব, নৌকো-বাচের "ফাউল" আর তারপর বৈঠে দিয়ে মাথা ফাটাফাটির ঠালায় ফি বছর এ-দিনটায় ভাবি চাকরি রিজাইন দেব। আজ তুমি আমায় বাঁচালে।'

সায়েব বললে, 'তুমি কুছ্‌ পরোয়া করো না সোম, ফাউল বাঁচাতে গিয়ে

খুন-জখম আমিই করব। ইউ গো রাইট্‌ অ্যাহেড্‌।’

তারপর ও-রেলি বন্দুক দেগে রেসের স্টার্ট দিলে, পিছনে পিছনে মোটর বোট, হেঁকে ফাউল সামলালে, উল্লাসে চিৎকার করে ঘন ঘন ‘গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড, ও হাউ গ্র্যাণ্ড’ হুকার ছাড়লে, কমজোর নৌকোগুলোকে ‘চীয়ার আপ্‌’ করলে আর সর্বশেষে প্রাইজের পাঁঠা, কলসী সকলের সঙ্গে হাওশেক করে করে স্বহস্তে বিতরণ করলে। মাথা-কাটাফাটি যে হল না তার জন্ত সোম আর বাইচগুলাদের অভিনন্দন জানালে।

সর্বশেষে সোম খুশিতে ডগমগ হয়ে বিজয়ী নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে, ‘আসছে বছর যে নৌকো জিতবে সে পাবে হুজুর ও-রেলির পিতার নামে দেওয়া “মাইকেল শীল্ড”। পূববাঙলায় নৌকো-বাচে এই প্রথম শীল্ড—কম কথা নয়, আপনারা ভেবে দেখুন। আর সে শীল্ড লম্বায় তিন হাত হবে, হুজুরের কাছ থেকে সেটা আমি জেনে নিয়েছি। তার মানে পূর্ব বাঙলার যে-কোন ফুটবল শীল্ড তার তুলনায় “ছোড্ড আড্ডা পোলাডা।” হুজুর শীল্ড কী ধরনের হবে সেটা আমায় বলতে বারণ করেছিলেন; আমি সে আদেশ অমান্য করেছি। কাল আমার চাকরি যাবে। তা যাক। এখন আপনারা বলুন :

থ্রী চিয়ারস্‌ ফর ও-রেলি,

হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে।’

সে কী হুকারে হিপ্‌, হিপ্‌। গাঁয়ের লোক এ ধরনের স্কুল রসিকতা বোঝে। তার উপর তাদের আনন্দ, দু’দিনের চ্যাংড়া ফুটবল খেলার পাতলা দাপাদাপিকে তারা আজ হারিয়েছে। তাদের শীল্ড আসছে বছর থেকে সব ফুটবল শীল্ডের কান মলে দেবে।

ক্লাবের যে দু-একটি পাড় ইংরেজ কালো আদমিদের রেস দেখতে আসেননি তাঁরা পর্যন্ত হুকার শুনে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করে বলেছিলেন, ‘ও-রেলি ইজ গন্‌ কমপ্লীটলি নেটিভ!’

অসম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন শীল্ড-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যদি ও-রেলি গা-ঢাকা না দিত তবে পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক তাকে লিন্‌চ্‌ করত।

পাদ্রী-বাঙলার নয়মি, কথ, ইভা, মেরি সব ক’টা সোমথ মেয়ে জাত-বেজাত ভুলে পাইকেরী দরে পড়ল ও-রেলির প্রেমে। সে হাণা সামলাতে না পেয়ে ও-রেলিকে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হল, তার বিয়ে দেশে ঠিক হয়ে আছে, ছুটি পেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবে।

ও-রেলি বুদ্ধিমান ছেলে। বিয়ের খবরটা সে ভেঙেছিল সোমের কাছে।

সোম খবরটাকে বিয়ে-বাড়িতে ফাটাবার বোমার মতই হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ আদর করার পর সেটি ফাটিয়ে দিলে হাটের মধ্যখানে, কিন্তু তার থেকে বেরল টিয়ার গ্যাস। সে গ্যাস পৌঁছে গেল পাদ্রী-বাঙলোর পোপের মৃত্যুসংবাদ ছড়াবার চেয়েও তেজে—এবং চোখের জলের জোয়ার জাগাল নয়মি, রুথ, ইভার হৃদয় ছাপিয়ে।

হায়, এরা তো জানে না ও-রেলিকে আশা করা এদের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা করার মত। কিংবা তাতেই বা কি? এবং এ উপমাটাও হয়ত তারা জানে যে সামান্য একটা খরগোশ যখন চাঁদের কোলে প্রতি সন্ধ্যার অশ্বিনী-ভরণীকে টিচ দিয়ে বসতে পারে তখন এরাই বা এমন কি ফেলনা? বিশেষ করে নয়মি। ভারতীয় সৌন্দর্যের হুন-নেমক আর ইংরেজের নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে গড়া এই তরুণী; এর সঙ্গে ফ্লার্ট করার জন্ত পঁচিশটে বাগানের ইংরেজ ছোঁড়ারা ছোঁকছোঁক ঘুরঘুর করে তার চতুর্দিকে, যদিও সকলেরই জানা—শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করে নিয়ে আসবে বিলেত থেকে কতকগুলো খাটাসমুখো ওরু মেড।

এ তরুণীও ও-রেলির জানা ছিল বলে সে একদিন সোমকে দুঃখ করে বলেছিল, ‘দেখো সোম, আর যে যা-খুশি ভাবুক তুমি কিন্তু ভেবো না যে, আমি পাদ্রী-টিলার মেয়েদের নিচু বলে ধরে নিয়েছি। আমার বিয়ে ঠিক না থাকলে আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করতুম। মেয়েগুলির বড় মিষ্টি স্বভাব।’

সোম কানে আঙুল দিয়ে বললে, ‘ও কথা বোল না সায়েব। জাত মানতে হয়।’

ও-রেলি আশ্চর্য হয়ে বললে, ‘ক্রিস্টানের আবার জাত কি?’

সোম বললে, ‘জাতের আবার ক্রিস্টান কি?’

করে করে এক বছর কেটে গেল।

ও-রেলি ছুটি নিয়ে বিলেত থেকে বউ আনতে গেল।

খাসপেয়ারা লোক যখন বিয়ে করে তখন তার একদল বন্ধু বউকে ভালোমন্দ বিচার না করে কাঁধে তুলে ধেই ধেই করে নাচে আবার আরেক দল তার দিকে তাকায় বড্ড বেশি আড়নয়নে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। সোম-কোম্পানি দিনের পর দিন মেমসায়েবকে ফুল পাঠাল, মিষ্টি পাঠাল, মেমের জলে

শখ জেনে ছোঁড়ারা তাকে নিত্যা নিত্যা ডিঙি চড়াল, পাত্রীর টিলায় ঘন ঘন চড়ুইভাতে নেমতগ্ন করল, ক্লাবে আর বাগিচা-বাগিচায় বেনকুয়েট ডিনার হল ; এ দলের খুশির অন্ত নেই।

অত্ৰ দল বিস্তর যাচাই করার পর শুধু একটি কথা বললে, 'মেয়েটি ভালো, কিন্তু কেমন যেন মিস্তক নয়।'

কিন্তু তাদের সর্দার রায়বাহাদুর চক্রবর্তীই তাদের কানা করে দিলেন আর-একটি মহামূল্যবান তত্ত্বকথা বলে—বললেন, 'নেটিভদের সঙ্গে ধেই ধেই করা উভয় পক্ষের পক্ষেই অমঙ্গল। ওরা রাজার জাত, রাজত্ব করবে : আমরা প্রজার জাত, হুজুরদের মেনে চলব। এর ভিতর আবার দোস্তি-ইয়ার্কি কী যে বাবা ? তোমরা ভেবেছ লিবার্টি পেলে তোমাদের নূতন কর্তারা তোমাদের কোলে বসিয়ে মণ্ডামেঠাই খাওয়াবেন ? দেখে নিয়ো, আজ আমি যা বললুম।'

তখনো স্বরাজের ছবি দিগদিগন্তেরও বহু পিছনে আগার ভিতরে বাচ্চার মত নিশ্চিন্দি মনে ঘুমুচ্ছেন। কাজেই রায়বাহাদুরের সঙ্গে এ বাবদে তর্ক করার উপায় ছিল না ; এবং এ ধরনের মুক্ককীও তখন সর্বত্রই বিস্তর, মজলিস গুলজার করে এই রায়ই ঝাড়তেন। রায়বাহাদুর আবার বললেন, 'নেটিভ সাহেব যেন তেলে-জলে। সাবধান !' কিন্তু মধুগঞ্জ এ সাবধানবাণীতে কোন প্রয়োজনই অমুভব করল না।

রায়বাহাদুর অবশ্য মেমসাহেবকে সেলাম দিতে প্রথম দিনই কুঠিতে গিয়েছিলেন। মেমসাহেব তাঁর গালকণ্ঠল মান-মনোহর দাড়ি দেখে একেবারে স্ট্রাক্, থ! রায়বাহাদুর ভাল করেই জানতেন আজকের দিনের দাড়ি-গোঁফ-কামানো ছোঁড়ারা তাঁর দাড়িতে উকুন অথবা ছারপোকা আছে কি না তাই নিয়ে ফিসফাস গুজগাজ করে, কিন্তু অন্তরে তাঁর দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর দাড়ি-গোঁফের কদর প্রকৃত রসিক-রসিকাদের কাছে কিছুমাত্র নগণ্য নয়।

আদালতে বিস্তর সায়েবকে তিনি বহুবার যে কাবু করেছেন তার দুটি কারণ :

প্রথম, তাঁর আইনজ্ঞান এবং দ্বিতীয় তাঁর মনস্তত্ত্ববোধ। সায়েবের সাদা মুখ লাল, নীল, বেগুনি রঙের ভোল বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটপট সমঝে যেতেন সাহেব চটেছেন, খুশি হয়েছেন, হকচকিয়ে গিয়েছেন কিংবা আইনের অথই দরিয়ায় হাবুভাবু খাচ্ছেন।

প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেমসাহেব তাঁকে নেকনজরে দেখেছেন। তারই পুরা ফায়দা উঠিয়ে তিনি তাঁকে মেলা অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানালেন,

উনি যে তাঁর সেবার জন্ত সব সময়ই তৈরী সে কথা বললেন, তাঁর স্বামী যে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি সে কথাও উল্লেখ করলেন এবং বলতে বলতে উৎসাহের তোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আদালত যে এ দেশে শুভাগমন করেছে—’ বলেই তাঁর মনে পড়ল, এ আদালত নয়। খুপ করে বসে পড়ে বললেন, ‘সরি, ম্যাডাম, আই ফরগট!’

মেম তো হেসেই লাল। রায়বাহাদুর যেমে কালো। শেষটায় মেম বললেন, ‘ইটস ও’ রাইট, রে ব্যাড়র; থ্যাঙ্ক্স ভেরী মাচ, ইনজীড্।’

রায়বাহাদুরের এ ভুল জীবনে এই প্রথম নয়। বৃড়ো বয়সে দিনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম পুত্রসন্তান হওয়াতে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে টিকিনের পূর্বে ‘বারের’ পক্ষ থেকে বলেছিলেন, ‘আদালতের পুত্রসন্তান হওয়াতে আমরা সকলে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।’

এ ভুলটাও তিনি গোপন রাখেননি। সেদিক দিয়ে তিনি সত্যই সরল প্রকৃতির লোক। মেমসায়েবের সঙ্গে তাঁর ভেট তিনি সবিস্তর বাখানিয়া বললেন, চাপরাসী ইস্তাজ আলীকে যে তিনি দু’আনা বখশিশ দিয়েছেন সেটাও বলতে ভুললেন না।

সর্বশেষে থানিকক্ষণ কিছু কিছু করে বললেন, ‘সায়েবের সঙ্গে তো আমার বিশেষ পরিচয় নেই, তবু কেমন যেন মনে হল একটু বদলে গিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।’

আড্ডা বললেন, ‘আপনিও তাজ্জব বাত বললেন, রায়বাহাদুর। বিয়ে করে কোন্‌ মানুষ বদলায় না, বলুন দিকিনি? অন্তত কিছু দিনের জন্ত?’

সোম উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ লক্ষ্য করল সেও কোনো আপত্তি জানাল না।

রায়বাহাদুর বললেন, ‘কী জানি ভাই, আমার অতশত স্বরণ নেই। বিয়ে করেছিলুম কবে, সেই ঠাকুন্‌দার আমলে।’

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, ‘সে কি, স্তার! বিয়ের পূর্বের কেস-গুলোও তো আপনার খুঁটিনাটি হুঙ্ক মনে আছে!’

উকিল মেস্বাররা মায় দিলেন।

রায়বাহাদুর গুণী লোক। মুনিখাশিরা যে রকম এককালে একস্মে দৃষ্টি দিয়ে হাঁড়ির খবর জানতে পারতেন তিনিও হয়তো থানিকটা আসল খবর ধরতে পেয়েছিলেন, তবে কি না খাশিদের তিন হাজার বছরের পুরনো লেন্স, অনাদর-অবহেলায় কয়ে ঘষে গিয়েছে বলে ছবিটা আবছা-আবছা হয়ে ফুটল।

ও-রেলি তাগড়া জোয়ান, তার উপর পাটি-পরবে ভোর অবধি বেধম নাচতে পারে—একটা ভালও মিল না করে। তাই বিয়ের পর আড্ডা-ঘরের 'গ্যালা'-নাচে সবাই আশা করেছিল ও-রেলি হয় বউকে কোমরে ধরে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর তুলে দিয়ে নাচতে শুরু করবে কিংবা হলের মধ্যখানে বউকে দুই ঠেঙে তুলে ধরে পাই পাই করে তার চতুর্দিকে সার্কেনি ঢঙে চক্কর খাওয়াবে। অন্তত-পক্ষে টাঙ্কে নাচের সময় সে যে বউকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে নিয়ে গভীর দোহুলদোলা জাগাবে সে আশা—এবং বুড়ী মেমেরা সে আশঙ্কা—নিশ্চয়ই মনে মনে করেছিলেন; কারণ বউকে, তাও আবার আনকোরা বউকে নিয়ে নাচের সময় যে চলাচল করা যায় সেটা ইংরেজ সমাজে পরকীয়্যতে চলে না। ফ্রান্সে চলে, তবে নাচের মজলিসে নয়।

ও-রেলি নেচেছিল এবং তার নাচে প্রাণও ছিল, কিন্তু আয়ারল্যান্ডে নব বর এ রকম নাচের সময় যে কুরুক্ষেত্র জাগিয়ে তোলে এখানে সেটা হল না। কেউ কেউ কিঞ্চিৎ নিরাশ হল বটে তবে ঝামুয়া জানেন নব বর (অর্থাৎ নওশাহ্—নূতন রাজা) পয়লা রাতে কী রকম আচরণ করবে তার ভবিষ্যৎবাণী কেউ কখনো করতে পারে না। মদ খেলে বাচাল হয়ে যায় চূপ আর বোবা হয় মুখর—আর বিয়ে করা তো সব নেশার চেয়ে মোক্ষম নেশা, খোঁয়ারি ভাঙাতে গিয়েই বাদ-বার্কি জীবনটা কেটে যায়। কিন্তু তাই বলে যে সব সময় ঠিক উলটোটাই ফলবে তারও তো কোনো স্থিরতা নেই। আবহাওয়ার জ্যোতিষীরা বললেন, বৃষ্টি হবে অতএব আপনি ছাতা না নিয়ে বেরলেন; ফলং ? ভিজ়ে কাঁই হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্যত্যয়ও তো হয়।

কাজেই পালোয়ান এবং নাচিয়ে ও-রেলি আড্ডা-ঘরকে তার হস্তের পাকী সের থেকে এক ছটাক বঞ্চিত করাতে অল্প লোকই তাই নিয়ে মাথা চুলকোল।

গ্যালা নাচের পর পাত্রী-বাঙলো দিলে পিকনিক। বাইরের বেশী লোককে নেমস্তন্ন করা হয়নি কিন্তু সোমের ডাক পড়েছিল কারণ পাত্রীরা এ বাবদে বাঙালী সায়েব কারোরই মত এত মারাত্মক নাকতোলা নয়। পাত্রী-টিলার পিছনে যে ছোট ছোট টিলা আর বনবাদাড়ের আরম্ভ তার শেষ হয় কুড়ি মাইল দূরে রেলস্টেশন পৌঁছে। এ বনে বুনো আম, কাঁঠাল, বঁইচি, কালোজাম, মিষ্টি মধুর সন্ধানে সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়ে দেওয়া যায়। মোহূমের সময় মাটিতে ফোটে অন্তনতি লুট্‌কি ফুল আর গাছের গা-ঝুলে ফুলে ওঠে রঙ-বেরঙের অকিঞ্চিৎ ('বান্দের জাজ')। এ জায়গাটায় পিকনিক করতে গেলে তাস-পাশা নিয়ে যেতে হয় না, গাছতলায় বলে দুটি খেয়ে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে

হয় না,—এখানে একা একা কিংবা ছোট ছোট দল পাকিয়ে অনেক কিছুই অহুসঙ্কানে বেরনো যায় আর লুকোচুরি খেলার অনিশ্চয় বর্ধি কোনোদিন তার সদর অপিস খুলতে চায় তবে গতিমিসি না করে এখানেই সোজা চলে আসবে।

পাত্রী-টিলিতে আপোসে বিয়ে হলেই এখানে তার পরের দিন পিকনিক। পিকনিকওয়ালারা আবার বর-বধূকে নানা ছুতোয় একা একা এদিক-ওদিক গুম হয়ে যেতে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে চোখ-ঠাঠারি করে।

বর-বধূ বিয়ের পর প্রথম কয়েক দিন একে অঙ্কে চিনে নেয় ঘরের ভিতরে বাইরে, বারান্দায়, নদীর পারে চাঁদের আলোতে কিংবা সমাজে আর পাঁচজনের ভিতর। এখানে নিভুতে বনের ভিতর একে অঙ্কে চিনে নেওয়ার ভিতর আরেক অভিনব মাধুর্য আছে—ওদিকে বন্ধুবান্ধব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও তারা নয়। ডাক দিলেই সাড়া মিলবে—ওরা তো এসেছে নব বরের নূতন শাহের খেদমত করার জন্তে।

খোয়াইভান্কার দিগ্দিগন্ত-মুগ্ধ কবি, পদ্মার অবিচ্ছিন্ন অবিরল শ্রোতের সঙ্গে যে কবি তাঁর জীবনধারার মিল দেখতে পেয়ে বিশ্বত্রাসে, গ্রহসূর্যে-তারায় বিশ্ব-শ্রোত বিশ্ব-গতি হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করলেন, সে কবি পর্যন্ত আপন ঐশ্বর্যের যে ছবিটিকে বুকের ভিতর একে নিতে চেয়েছিলেন সেটি পত্রপল্লবের অর্ধ-আচ্ছাদনে, বনানীর মাঝখানে;—

‘পাতার আড়াল হতে বিকালের
আলোটুকু এসে
আরো কিছুক্ষণ ধরে বলুক তোমার
কালো কেশে ॥
হাসিয়ে মধু উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে—
বনসরসীর তীরে ভীষ্ম কাঠ-বিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো জ্বাসে।’

ও-রেলি বসে রইল বুড়ো পাত্রী সায়েবের সঙ্গে বটগাছতলায়—পিকনিকের হেড অফিসে। অবশ্য বউ মেবলুও তার গা ঘেঁষে।

বুড়ো পাত্রী গল্প বলে যেতে লাগলেন,—চল্লিশ বছরের আগেকার কথা। এ-সব গল্প মধুগঞ্জ বহুবাব শুনেছে, কিন্তু ও-রেলির কাছে নূতন।

‘বুঝলে ভেঁটিভি, তখন আমি ছোকরা পাত্রী হয়ে এদেশে এসেছি। সোম

এ-সব জানে, তার বাপ তখন এখানে সাবরেজিস্ট্রার। আমাকে অনেক করে বোঝালে টিলাতে বাঙলো না বানিয়ে যেন নদীপাড়ে আসন পাতি। তখনকার দিনে ছুপুরবেলায় এখানে বাঘ চরাচরি করত, আমার একটা বাছুর চিতে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে, ব্রেকফাস্টের সময়।’

ও-রেলি শুধালে, ‘টিলার মোহটা কী? আপনি তো হরিণ কিংবা পাখী শিকারও করেন না।’

পাদ্রী বললেন, ‘বাঘ আর ম্যালেরিয়ার ভিতর আমি বাঘই পছন্দ করি বেশী। টিলার উপর ম্যালেরিয়া হয় কম। বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করা যায়, কিন্তু মশা মারা কঠিন। কী বলো সোম, তুমি তো রববার হলেই বন্দুক নিয়ে মত্ত। কতবার বলেছি সোম, রববার স্রাবাথ—শাস্তির দিন। এ-দিনটায় রক্তারক্তি নাই করলে।’

সোম বললে, ‘স্মার, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছেড়ে একজন দেবতা পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি?’ তারপর ও-রেলির দিকে তাকিয়ে শুধাল, ‘আপনি-ই বলুন চীফ, তেত্রিশ কোটি টাকার মাইনে ছেড়ে দিয়ে এক টাকার চাকরি নেয় কোন্ লোক?’

পাদ্রী বললেন, ‘ওর যে-সব কটা মেকি।’

সোম বললেন, ‘আমি পুলিশের লোক, স্মার, মেকি টাকা চিনতে না পারলে আমার সায়েবই কাল আমাকে ডিসমিস করবেন। মেকি খাটিতে তফাত আমি বেশ জানি। কিন্তু এদিককার তেত্রিশ কোটি আর ওদিককার একজন কেউ তো কখনো আমার থানায় এসে এজহার দেননি। বাজিয়ে দেখব কী করে? মাঝে মাঝে সন্দ হয়, সব কজনাই মেকি।’

পাদ্রী বললেন, ‘মাই বয়! কী বলছ?’

পাদ্রীর বুড়ী বউ স্বামীকে বললেন, ‘তোমাকে কতবার বলেছি, সোমের সঙ্গে ককখনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা করো না। ও যে শুধু হিন্দু তাই নয়—হিন্দুদের ভিতর অনেক সং লোক আছেন—ও একটা আস্ত ভণ্ড।’

তারপর ও-রেলিকে শুধালেন, ‘সোম আমাদের টিলায় এত ঘন ঘন আসে কেন?’

ও-রেলি হেসে পালটে শুধালেন, ‘কেন, আপনাদের ঝগড়া মেটাতে?’

বুড়ী বেগে বললেন, ‘বিয়ে করেছ তো মাত্র সেদিন! ঝগড়ার তুমি কী জান হে, ছোকরা? সে কথা থাক, সোম আসে শুধুমাত্র মূর্গা খেতে, বাড়িতে পায় না বলে।’

সোম বললে, ‘মাম্মি, আপনি যে ধরতে পেরেছেন, সে কথাটা এতদিন

বলেন নি কেন ?

বুড়ী থ হয়ে বললেন, 'সে কী রে ! তোকে একশবার বলেছি, তোর বাপকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখি নি ।'

সোম বললে, 'কই, আমার তো মনে পড়ছে না ? তা কাল থানাতে গিয়ে দেখব, কোনো পুরোনো নথিতে রিপোর্ট লেখা আছে কি না ।'

বুড়ো পাত্রী ও-রেলি আর মেবলের চোখের উপর কয়েকবার স্নেহের চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এই যে ডেভিড বললেন, সোম আসে আমাদের ঝগড়া মেটাতে, তা সে কিছু ভুল বলে নি । আজ যে রকম ডেভিড মেবলকে নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি আমিও একদিন নিয়ে এসেছিলুম গ্রেসিকে । পনেরো বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন আমাদের ভিতর সামান্য কথা-কাটাকাটি হওয়াতে হঠাৎ গ্রেসি বললে, "তবে কি আমাদের 'হনিমুন' আজ শেষ হল !" সেই সেদিনই আমি সামলে নিলুম । তারপর দেখো, কেটে গেছে আমাদের 'হনিমুনের' আরো পঁইত্রিশ বছর ।'

সোম বললে, 'সে কথা মধুগঞ্জের কে না জানে বলুন । কিন্তু আমার বেলায় উল্টো । যাবজ্জীবন স্বীপাস্তুর মানে চৌদ্দ বছরের জেল । আমার বেলা তারও বেশী । বিয়ে করেছি চৌদ্দ বছর বয়সে, তারপর কেটে গেছে প্রায় আঠারো বৎসর । এখনো কেউ খালাস করবার কথাটি তোলে না ।'

পাত্রী সোমের পাগলামিতে কান না দিয়ে বললেন, 'ঠিক এই গাছতলাতেই বসেছিলুম গ্রেসিকে নিয়ে, বাঘ-ভালুকের ভয় না করে । পাশের ঝোপে কোকিল কুহ কুহ করছিল । আমাদের মনে কী আনন্দ, এমন সময় একটা হুহুমান "হুম" "হুম" করে আমাদের সামনে এসে দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগল । গ্রেসি কখনো বাঁদর দেখে নি, প্রায় ভিরমি থেয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজল ।'

বুড়ি মেম লজ্জায় রাঙা হয়ে বললেন, 'ব্যস, ব্যস হয়েছে ।' এর পরও ডেভিড মেবল উঠল না ।

॥ ৫ ॥

দেখা যেত দুজনকে, রাস্তা থেকে, তাদের বাড়লোর বারান্দায় ছাতা-ল্যাম্পের নিচে আরাম-চেয়ারে বসে আছে । কখনো সায়েব মেমসায়েবের হাত-পাখাখানা এগিয়ে দিচ্ছে, কখনো মেমসায়েব ঘরের ভিতর গিয়ে দু'হাতে দুটো লাইমজুস নিয়ে আসছে । আর কখনো বা সিংহলী বাটলার জয়সূর্য বারান্দার এক-

গ্রামে গ্রামোফোনে রেকর্ডের পর রেকর্ড বিলিতি বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নির্জন বারান্দায় কিংবা টিলার বাগানের লিচুগাছতলায় দুজন পাশাপাশি বসে, সামনের কালাই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

জ্যোৎস্না রাতে দুজনা ডিনারের পর বারান্দা থেকে নেমে লিচুবাগানের ভিতর দিয়ে নেমে আসত সদর রাস্তায়। সেখান থেকে চলে যেত নদীপারে। নদী-পার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছোত গিয়ে রামশ্রী গ্রামে, যেখানে ছোট্ট কিসাই নদী বড় নদী কাজলধারার সঙ্গে মিশেছে।

কিংবা তাদের মাথায় চাপত অদ্ভুত খেয়াল। কিসাই-কাজলের মোহনায় খেয়াঘাট; তারা সেই রাত দশটায় হাট-ফের্তাদের সঙ্গে বসত খেয়া-নৌকায়—বাতার উপর। তারপর হুপুররাত অবধি খেয়া-নৌকায় বসে এপার-ওপার করে বাড়ির পথ ধরত চাঁদ যখন ডুবুডুবু।

মেম আসার পর সায়েব ট্রে গেছে মাত্র একবার। মেমকে সঙ্গে নিয়েই গেল। ভাওয়ালি-নৌকায় করে দু'দিনের রাস্তা। রোজ সন্ধ্যায় সায়েব-মেম ভাওয়ালির ছাদের উপর বসে বসে মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালি গান শোনে, আর কখনো বা জয়সূর্য ভগলা-মাঝির গান গ্রামোফোনে বাজায়। মাঝি-মাল্লারা সে গীত শুনে তাজ্জব মানে, আর মাঝে মাঝে তার নকল করতে গিয়ে মেম-সায়েবের কাছে ধমক খায়। মেম বলে ভাটিয়ালিই ভালো—মাঝিরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে;—তাদের গান সায়েবদের কলে বাজানো গাওনার চেয়ে ভালো, এও কি কখনো সম্ভবে! তবে কি না সায়েব-সুবোদের খেয়াল, আল্লায় মালুম, ওদের দিল, ওদের দরদ কখন কোন্ দিকে ধাওয়া করে। একদিন তো মেমসায়েব নায়ের মশলা-পেঁষা ছোঁকরাটার ঝাঁশের ঝাঁশি চেয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে-পুঁছে ভাটিয়ালির স্র অনেকক্ষণ ধরে বাজালে।

এবারে নৌকোর বারোয়ারী ডাবাছকোতে এনরা গুড়ুক খেলেই হয়েছে আর কি!

মাঝি-মাল্লারা কিন্তু একটা বিষয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর আলোচনা করল। সায়েব-মেম এক অন্তরঙ্গ সঙ্গে অত কম কথা কয় কেন? ভাগ্যিস ওরা জানত না যে, বিষের আগে ও-রেলি সাহেবের বাচাল বলে একটুখানি বদনাম ছিল বটে।

ভাওয়ালির হালদার বুড়ো মাঝি তালেবুদ্দি বললে, 'খুদাতালা কত কেরামতিই দেখালে; গোরা হল রাজার জাত—আমাদের ডাঙর জমিদারের

গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারলে উনি সেটা আল্লার মেহেরবানি সমঝে দিল-খুশ হয়ে হাবেলী চলে যান। আর সেই গোরা দেখো, মেমের ক্রমালখানা হাত থেকে পড়ে গেলে তখ্খুনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মেমকে এগিয়ে দেয়। আমি তো এ মামলা বিলকুল বুঝতে পারলাম না।’

গুরুক্ল্লা বললে, ‘কইছো ঠিকই কিন্তু আমাগো সায়েব তো কখনো কাউরে চড় মারে নি। বন্ধে, আমার মনে লয়, সায়েবরা হামেশাই কথা কয় কম, কাম করে বিস্তর। দেখছো না, যারা হাঙ্গাই-তাঙ্গাই করে বেশী, তারাই বাম করে কম।’

মশলা-পেয়া বললে, ‘বউয়ের লগে যদি দুই-চারটা মিডা মিডা কথা না কইলা তয় বিয়া করলা ক্যান্।’

একই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশে মাঝি-মাল্লা চাষা-ভূষো অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে না—অবশ্য পুর্ববাঙলার পটভূমি নিয়ে লেখা নভেলে তারা ‘গোরা’ এবং ‘বিনয়ের’ মত ঘটনার পর ঘটনা নব্যজ্ঞানের তৈলাধার জালিয়ে রাখতে পারে। তারা আপন আপন রায় জাহির করেই চুপ করে যায়। তর্ক করে যুক্তি দেখিয়ে একে অন্নের অভিমত বদলাবার চেষ্টা করে না। তাই বোধ করি ভদ্রসমাজে নিছক অবাস্তব তর্কাতর্কির ফলে যে রকম মনকষাকষি এবং মুখ-দেখাদেখি-বন্ধ হয়, চাষা-ভূষোদের ভিতর সেরকম হয় না।

তাই আলোচনার মোড় বদলে গিয়ে সভাস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হল, ‘সায়েব-মেমরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসে, কিন্তু নদীর জল ঘোলা হলে গোসল করে না কেন?’

পুর্ববাঙলার লোক জানে না, সায়েবদের কাছে সাঁতার কাটা হচ্ছে স্পোর্টস-বিশেষ—স্নানের খাতিরে তারা সাঁতার কাটতে নাপে না। আমাদের কাছে স্নান যা, সাঁতার কাটাও তা।

ট্র থেকে ফিরে এসে ও-রেলি পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে একা কলকাতায় চলে গেল। সোম কিন্তু সবাইকে বললে, ‘হুজুর সরকারী কাজে কলকাতা গেছেন ; জানেন তো, আজকাল যা স্বদেশী-কদেশী আরম্ভ হয়েছে।’

রায়বাহাদুর বললেন, ‘হুদিকেই বিপদ দেখতে পাচ্ছি। সায়েব যদি “স্বদেশীর” পিছনে লাগে, তবে তাদের দফা-রফা! নেটিভদের সঙ্গে দোস্তি জমিয়ে ও তাদের সব হাড়হুদ শিখে নিয়েছে, কড়ি চালালে আর কারো রক্ষে নাই। ওদিকে ছোকরা আবার আইরিশম্যান ; ওর আপন দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে

চলেছে জোর “স্বদেশী”। ও যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে তার প্রমোশনেরও তেরোটা বেজে যাবে। চাই কি কমপলসরি রেটারারমেন্টও হতে পারে। থাক, ও-সব কথা কইতে নেই।’

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, ‘নৌকো দিয়েছেন ভাসিয়ে মাঝগাঙে—আর তারপর করছেন নোঙরের খোঁজ। সোমের সামনে খুলে দিয়ে দিয়েছেন গুটিকির হাঁড়ি, আর এখন বলছেন নাক বন্ধ করো!’

রায়বাহাদুর বললেন, ‘বাবা, স্মৃধাংগু—’

সোম জিভ কেটে হুকানে হাত দিয়ে বললে, ‘রাম, রাম!’

এবারে ও-রেলি যখন কলকাতা থেকে ফিরল, ওখন সকলেরই চোখে পড়ল তার মুখের উপর গান্ধীর ছাপ।

সায়েরা কলকাতা থেকে ফিরলে, তা সে রাত বারোটাই হোক, তখুনি যায় ক্লাবে, সবাইকে কলকাতার তাজা খবর বিলিয়ে দেবার জন্ত—খবরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলে মেয়ে যে রকম ধুলো-পায় সইয়ের বাড়িতে ছুট লাগায়। ক্লাবের সবচেয়ে নীরস বেরসিকও তখন কয়েক দিন ধরে আরব্যা উপত্যাসের শেহেরজাদীর কদর পায়।

ও-রেলি ক্লাবে গেল ফিরে আসার তিনদিন পরে।

বুড়ো পাদ্রীর চোখের জ্যোতি কম। তার উপর এতখানি সাংসারিক বুদ্ধি নেই যে, কারো চেহারা খারাপ দেখালে তদুৎপন্ন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধাতে নেই। ও-রেলিকে দেখামাত্রই শুধালেন, ‘সে কি হে ডেভিড, তোমার চেহারা ও-রকম শুকিয়ে গেছে কেন?’

মাদামপুরের বুড়া-সায়ের বাহু লোক। ও-রেলি আমতা আমতা করছে দেখে বললেন, ‘অস্থ-বিস্থ করেছিল হয়তো। কলকাতা বড় নাস্টি প্লেস—ডিসেপ্টি আর ডিসেপ্টি! কেন যে মানুষ কলকাতা যায় বুঝতে পারি নে। আমি যখন প্রথম মাদামপুর আসি—’

বিষ্ণুছড়া বাগিচার মেম বললেন, ‘তা মিষ্টার ও-রেলি, কলকাতার নতুন খবর কী?’

মাদামপুরের বড় সায়ের তখনো আশা ছাড়েন নি; বললেন, ‘কলকাতায় যেতে আঠারো দিন লাগত, আর—’

বিষ্ণুছড়া বাগিচার বড় মেমে আর মীরপুর বাগিচার ছোট মেমে যেন সাপে-নেউলে। একে অন্যের দেখা হলেই টুকাটুকি ঠোকোটুকি। বললেন, ‘মিষ্টার ও-রেলি, কলকাতার সব খবরই নতুন। ফার্পোতে নেটিভরা ঢুকতে পারছে,

সে-ও নূতন খবর। ময়দানে ঘাস গজাচ্ছে, সে-ও নূতন খবর।’

বিষ্ফুছড়ার মেম ছোবল মারতেন, কিন্তু তাঁর সায়েব শাস্তভাবে মেমের হাতের উপর হাত রেখে তাঁকে চেপে দিয়ে বললেন, ‘তাজা-বাসি আমরাই ষাচাই করে নেব ও-রেলি। ও-সব ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।’

আগে হলে ও-রেলি এক্ষণে হুবোহ ছেলের মত ‘টু বী সীন, নট টু বী হার্ড’ হয়ে বসে থাকতো না। ততক্ষণ হয়তো সপ্রমাণ করে দিত গড়ের মাঠে সতাই কত রকম নূতন ঘাস গজাচ্ছে, তার রঙ গোলাপী, ফুল সবুজ আর সে ঘাস নেটিভ মাঠে পা ফেললেই গোখরোর মত ছোবল মারে—ডেঞ্জারেস পয়জন—কিংবা হয়তো গম্ভীরস্বরে বয়ান করত, নেটিভরা এখনো ফার্পোতে ঢুকতে পায় নি; তবে কি না এ খবর কিছুটা সত্য, এখন ফার্পোর টেবিল-চেয়ার সরিয়ে সেখানে কার্পেটের উপর গোবর নিকনো লেপানো হয়েছে, আর তারই উপর সায়েবরা থালা পেতে হাপুর-হপুর শব্দ করে খিচুড়ির সঙ্গে মালগাটানি হুপ মাথিয়ে থাকছেন।

অবশ্য ও-রেলি একেবারে চুপ করে বসে রইল না। কিন্তু খবর বিলোতে গিয়ে দেখল এবারে কলকাতায় সে তেমন কিছুই দেখে নি। গ্র্যাণ্ডে বসে লাঞ্চ খেয়েছে অথচ চারদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নি। ক্যালকাটা ক্লাবের বাবে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা-ওটা চুকচুক করেছে, কিন্তু এখন আর স্মরণ করতে পারল না পরিচিত কার কার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছে।

বিষ্ফুছড়া বললেন, ‘ও-রেলি গোপন সরকারী কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়, আর তার ফাঁকে করেছেন পার্টি-পরব। ছুটোয় জট পাকিয়ে গিয়েছে বলে কী বলবেন, কী বলবেন না, ঠিক করতে পারছেন না।’

ও-রেলি বুঝলে, এটা সোমের কীর্তি।

প্রকাণ্ডে বললে, ‘ঠিক তা নয়, তবে এখন কলকাতার মোহুমটা মন্দা যাচ্ছে। বেশীর ভাগই দার্জিলিং কিংবা শিলঙে। আমার পরিচিত অল্প লোকের সঙ্গেই সেখানে দেখা হল।’

মীরপুর বললেন, ‘সে কি মিস্টার ও-রেলি? আপনি তো এক সেকেন্ডে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারেন বন্ধু কালা-বোবার সঙ্গে, আর আপনি করছেন পরিচয় অভাবের শোক!’

মনের ভিতর চমক খেয়ে ও-রেলি দেখলে, কথাটা একেবারে খাঁটি। এই তার জীবনে প্রথম যে সে কলকাতায় কোনো নূতন পরিচয় জানতে পারে নি। তবে কি সে জানাতে চায় নি? কেন, কী হয়েছে তার?

কিছু একটা বলতে হয়—যে লোক গল্পবাজ, সে কোনো কারণে চুপ মেয়ে গেলে সমাজে তার বড় দুঃখবস্থা—তাই আমতা আমতা করে বললে, ‘না না, সে দিক দিয়ে আটকায় নি।’ বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, ক্রিকেটার হেণ্ডারসনের সঙ্গে ছয়াইটওয়ার দোকানে তার দেখা হয়েছিল। ও-রেলি বেঁচে গেল। শুধালে—

‘ক্রিকেটার হেণ্ডারসনকে চেনেন?’

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, ‘আমার দূর সম্পর্কের বোন-পো হয়।’

মীরপুর মেম কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই ও-রেলি ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিল। মীরপুর-বিষ্ণুছড়ার কথা-কাটাকাটিকে সে, ‘স্বদেশী’ বোমার চেয়েও বেশী ভরাত—বললে, ‘একটা ভালো ইংলিশ ক্রিকেট টীম নিয়ে আসছে-নীতে ইণ্ডিয়া আসতে চায়। ছেলেটার তাই নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের সব কটা “পিচ” সে তার আপন হাতের তেলোর চেয়েও ভালো করে চেনে। আমার তো মনে হল “পিচ”গুলোর ঘাস বকরির মত চিবিয়ে খেয়ে যাচাই করে নিয়েছে, কোনটা বোলারের স্বর্গ আর কোনটা ব্যাটসম্যানের—দরকার হলে ‘কোয়ের ম্যাটিঙ’ও চিবুতে তৈরী।

“আমি বললুম, অতশত মাথা ঘামাচ্ছ কেন হেণ্ডারসন, এদেশের ক্রিকেট বড্ড কাঁচা, তোমরা অনায়াসেই জিতে যাবে।”

“হেণ্ডারসন বললে, তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। বোম্বাইয়ের জ্যাম সায়েব—তোমরা নাকি নামটা অল্প ধরনে উচ্চারণ করো, তিনি ‘জ্যাম’ হোন আর জেলিই হোন, বিলেতে তিনি তাড় হাঁকড়ে সবাইকে ক-শো বার জেলি বানিয়ে দিয়েছেন, তার খবরও তো তোমার অজানা নেই। কে বলতে পারে বলো, কালই এদেশে আরো পাঁচটা জ্যাম বেরিয়ে যাবে না এবং হয়তো জ্যাম নয়, তার চেয়েও শক্ত মাল—‘হার্ড নাট’।”

‘আমি উত্তরে বললুম, অসম্ভব তো কিছুই নয়, তবে কি না কাল আমার জ্বাজ গজাতে পারে বলে আজ তো আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাই নে কিংবা জ্বাজ সাক্ষাতরো রাখার জন্ত বরুণও কিনি নে!’

মাদামপুরের বুড়ো সায়েব লক্ষ্য করলেন, ক্রিকেটের গল্পে উত্তেজিত হয়ে ও-রেলি তার মন-মরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলেছে। খুশি হয়ে উৎসাহ দিয়ে বললে, ‘তা তুমি এখানে একটা ক্রিকেট টীম বানাও না কেন?’

ও-রেলি বললে, ‘ভাবছি, শমশেরগঞ্জের জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাব। সম্প্রতি লোকটা গুম-খুনে জড়িয়ে পড়েছিল—অথচ সোম পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করতে পারলে না। আমি কিন্তু জমিদারকে ভাঁওতা

মারলুম, সব প্রমাণ তৈরী, এবারে বাছাধনকে ঝুলতে হবে। পায়ে জড়িয়ে ধরে আর কি, তখন ভবিষ্যতের জন্তে তার বুকে ষমদূতের ভয় জাগিয়ে দিয়ে যেন নিছক মেহেরবানি করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। টাকা চাইলে এখন তার ঘাড় দেবে।’

সবাই কলরব তুলে নৃতন করে আবার সেই গুম-খুনের পোস্টমর্টেমে লেগে গেলেন। ইংলণ্ডে হিজ ম্যাজেস্টির পরেই ক্রিকেট-আলোচনা আড্ডার রাজা কিন্তু পূর্ববাঙলার গুম-খুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী—অবশ্য দাবা খেলার—রাজার চেয়ে ঢের বেশি তাগদ ধরেন। কত রকম কথা-কাটাকাটিই না হল, বিষ্ণুছড়ার মেম বলছেন, জমিদারের হুকুমে বড় ভাইয়ের চোখের সামনে ছোট ভাইকে জ্যাস্ত পৌতা হয়েছিল, মীরপুরের মেম বললেন, গুলতান, লোকটার বড় ভাই-ই নেই আর সে খুন হয় নি আদপেই; মীরপুরের জমিদারের টাকা খেয়ে গুম হয়ে গিয়েছে শমশেরগঞ্জকে জড়াবার জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলেছিল। ইতিমধ্যে ও-রেলি কেটে পড়েছে।

মাদামপুরকে বাগানে ফেরার সময় বিড়বিড় করে বলতে শোনা গেল, ‘ও-রেলিকে বোঝা ভার’।

॥ ৬ ॥

বরঞ্চ ইংরেজ সকালবেলার বেকন আঙা বর্জন করে দেবে, বরঞ্চ ইংরেজ বড়দিনে গির্জা কট করতে পারে, এমন কি শান্তুড়ীর জন্মদিনও ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে হোস-অব-কমনস্ পুড়িয়ে দেবার সামিল—মুসলমানের কলমা ভুলে যাওয়া, হিন্দুর গো-মাংস ভক্ষণের তুলনায় চুলে চিমটি কাটার মত।

ডেভিড, মেব্‌ল্‌ তিন মাস ধরে ক্লাবে যায় নি।

যে মীরপুরের ছোট মেম ডুমরের ফুল সাপের ঠ্যাঙ দেখেছেন বলে ক্লাবে দাবি করে থাকেন, তাঁকে পর্বস্ত স্বীকার করতে হল, মধুগঞ্জের তাবৎ খানসামা-বাটলার, মেথর-ঝাড়ুদারকে ফালতো চা বকশিশ দিয়েও তিনি কারণটা বের করতে পারেন নি।

এ-সব বাবদে সোজাহুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ইংরেজের সর্বশাস্ত্রে বারণ। এক-মাত্র পাত্রীদের কিছু হক আছে। বূড়ো পাত্রী সন্তর্পণে প্রশ্ন শুধিয়ে নিরাশ হলেন। বূড়ী মেম একবার ডেভিডের মফস্বল-বাসের সময় মেব্‌লের সঙ্গে তেরান্তির কাটান। চতুর্দিকে কড়া নজর ফেলে, এমন কি শেখটায় জিজ্ঞেসবাদ

করেও কোনো খবর যোগাড় করতে পারলেন না।

বুড়ী বেদনা পেয়েছিলেন। তৃতীয় রাজিতে ছিল পূর্ণিমা। জানালা দিয়ে চোখে চাঁদের আলো পড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেবল্ নেই। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দেখেন মেবল্ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে হুঁহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে—তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাত-মুখ ছাপিয়ে ফেলেছে। বুড়ী মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকল।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী-টিলার বহু তরুণী, বিস্তর যুবতীর অনেক বুকফাটা কান্না দেখেছেন, কোনো কোনো স্থলে সলা-পরামর্শ দিয়ে নানা দিকে নানা রকম কলকাঠি চালিয়ে এদের মুখে হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ নারীর বেদনা কী হতে পারে, সে সমস্তার সন্ধানে কোন্ দিকে হাতড়াতে হবে তার সামান্যতম অহুমানও তিনি করতে পারলেন না।

বুড়ো পাদ্রী সব শুনে বললেন, 'এসো, দুজনাতে মিলে প্রার্থনা করি।'

সোম একদিন ও-রেলিকে প্রশ্ন শুধাল মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে, 'এনি ট্রাবল?'

উত্তরের জ্ঞান মাত্র এক নেকেও অপেক্ষা করে সোম 'গুড বাই' বলে বারান্দা থেকে নেমে লিচুতলা দিয়ে গেট খুলে বড় রাস্তায় নেমে গেল।

ও-রেলি ভাবলে মাত্র দুটি কথা, 'এনি ট্রাবল!'

শ্রবণই করতে পারল না, তার জীবনে কখনো কোনো শব্দ ট্রাবল এসেছিল, কি না যেটাকে সে কাত করতে পারে নি। সে তাগড়া জোয়ান, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট না হলেও ভালো, গায়ের জোরে কমতি নেই, আর পাঁচটা ইংরেজের মত তিনটে কথা বলতে গেলে সাতবার হৌচট খায় না—তার আবার ট্রাবল! হ্যাঁ, একটা সামান্য ট্রাবলের কথা মনে পড়ছে বটে। এমনিতে তার মুখে শুধু খই ফোটে না, টোস্ট পর্বস্ত সৈঁকা যায় তবে প্রেমের ব্যাপারে একটু মুখচোরা বলে মেবল্কে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে তার তিনটে রবির সন্ধ্যা লেগেছিল বটে, কিন্তু তারপরের অবস্থা দেখে সে থ—মেবল্ বাহান্ন রববারের আগের থেকেই নাকি তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ট্রিসোর ডিজাইন বানাতে লেগে গিয়েছিল।

ইস্কুলের ব্ল, চাকরির জ্ঞান পরীক্ষা, রাগবিতে একথানা পাজির গুঁড়িয়ে যাওয়া—এ-সব ও-রেলির কাছে কখনো ট্রাবল বলে মনে হয় নি। তার একমাত্র ভয় ছিল মেবল্ যদি তাকে গ্রহণ না করে। সেই মেবল্কে পেতে তার তিনটে রববার—অর্থাৎ একুশ দিনের দিবারাত্র হুশিস্তা—লেগেছিল বটে কিন্তু

আজকের তুলনায় সে কত সহজ। সেদিন পথহারা ও-রেলির সামনে থেকে হঠাৎ যেন কুয়াশা কেটে যায় আর স্মৃতিতে দেখে বসন্তের মধুরোদ্রে, নীল আকাশের পটে আঁকা মেবল। ‘উতলা পবন বেগে মেঘে মেঘে’ যেন তার খোলা চুল উড়ে উড়ে চলেছে। হাতে তার একটি ছোট ফুল। তারই এক-একটা পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে ‘হি লাভস্ মী’, পরেরটায় বলছে ‘হি লাভস্ মী নট’—এই করে করে ভাগ্য-গণনা করছে। সর্বশেষের পাপড়িতে ‘হি লাভস্ মী’ না ‘হি লাভস্ মী নট’—এ এই জীবন-মরণ সমস্কার সমাধান মিলবে।

ও-রেলির মনে পড়ল, মেবল সেদিন তার কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলেছিল, ‘আমি সব সময়ই জানতুম, শেষ পাপড়ি ‘হি লাভস্ মী’-তেই শেষ হবে। একদিন যখন হল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে গেলুম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল—টুকরোখানা তখনো ঝোঁটায় লেগে আছে।’

সে সব দিন চলে যাওয়ার পর আজ সোম জিজ্ঞেস করলে, ‘এনি ট্রাবল্ !’

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। এ তিন মাসের ভিতর আরো পরিবর্তন ঘটেছে। ও-রেলিরা ক্লাব দূরে থাক কারো বাড়িতে পর্যন্ত যায় নি। তার থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল তারাও চায় না কেউ তাদের বাড়িতে আসুক। শেষ পর্যন্ত এক পাত্রী মেম ছাড়া আর কেউ ও-রেলি টিলায় আসত না এবং তিনিও আসতেন যেন অতিশয় দায়ে পড়ে, অঙ্কভাবে অঙ্ককারে কোন এক ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আবহা বৃষ্টিতে পেরে মাছুষ যেরকম আত্মজনের কাছে এসে দাঁড়ায়।

তারপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের খরদাহের পর নামল বর্ষা। কলকাতার বদখদ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বড়বাজারের বেরদিক মারোয়াড়ী পর্যন্ত আকাশের দিকে দু-একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না, আর কলেজের মেয়েরা নাকি ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার অছিলা করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের জল মেলায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী আছে! ছেলেরা তো কলেজ পাসের পর অঙ্ককার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম-বিয়ে-শাদি মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দেয়; মেয়েরাই শুধু অজানা ভবিষ্যৎকে অতখানি ডরায় না বলে বে-এক্কেয়ার প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর কবিতা ঝাঁচিয়ে রাখে। তবে কি রবিঠাকুর এ তব্বটা জানতেন, তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গান শিখিয়েছেন অনেক বেশী সযত্নে ?

মধুগঞ্জে এ-সব বালাই নেই—মারোয়াড়ী নেই বললেও চলে, কলেজ নেই তাই কলেজের মেয়েও নেই। মধুগঞ্জী বালিকাদের বিয়ে হয়ে যায় চোদ্দ পেরতে না পেরতেই। এ বিষয়ে ওয়েলস পাত্রী সাহেবও নেটিভ বনে গিয়েছেন, রুথ-মেরীদের বোলো পেরতে না পেরতেই বরের সন্ধান লেগে যান। তাঁর যুক্তি—প্রাচ্যে মেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়ে যায় অল্প বয়সেই, এদেশে বিলিতি কায়দা। মেনে নিলে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি হয়।

বিবাহ মাত্রই প্রেমের গোরস্তান, কিন্তু শান্তির আস্তানা।

তাই এখানে কোনো তরুণী অকাণ্ণ বেদনায় কাতর হয়ে রবিঠাকুরের কবিতা-গান নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। রবিঠাকুর তাই সেযুগে মধুগঞ্জে অচল।

ঠিক সেই কারণেই প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ মধুগঞ্জে মদনভাস্কর মত শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখানকার লোক নবাবরঞ্জে ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে না, আবার উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে দলে দলে নবীন মেঘ এসে যখন শহরের বনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে তখনও মানুষ সেখানে বর্ষার মধুর দিকটা সম্বন্ধে অচেতন হতে পারে না। আর হবেই বা কী করে? প্রথম যেদিন মধুগঞ্জে কদম ফুল ফোটে সেদিন তার গন্ধে সমস্ত শহর ম-ম করতে থাকে। সে গন্ধে নেশা আছে—রায়বাহাদুর চক্রবর্তীর মত রসকব্বাহীন মানুষকেও দেখা যায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় একডাল কদম হাতে নিয়ে ফিরছেন।

কিন্তু পুর্ববাঙলা আসামের সায়েবরা বর্ষাকালে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা বাগানের ছোট ছোট টিলাতে নিজ নবাসে থাকতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাইলের ভিতরে একটা ইংরেজ নেই যার সঙ্গে দুটি কথা বলতে পারে, দিনের পর দিন অনবরত বৃষ্টি, রাস্তাঘাট জলে-জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, ক্লাবে যাবার কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগ সায়েবরাই এই সময় দিশী রমণী গ্রহণ করে। কেউ কেউ ম্যালেরিয়ায় তাদের শুশ্রূষা লাভ করে সেরে ওঠার পর, আর কেউ কেউ একটানা নিজ নবাসের ফলে হত্ম হয়ে গিয়ে।

ও-রেলির মাথার ইঞ্জুপগুলো জোর টাইট করে বসানো। বর্ষা তাকে কাবু করতে পারে না। তার ওপর মেবল্ পাশের চেয়ারে বসে।

তবু বোঝা গেল, এ বর্ষা ও-রেলিকে পর্যন্ত অনেকখানি ঘায়েল করে দিয়েছে। ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে।

॥ ৭ ॥

মাদামপুরের বড় সায়েব বললেন, 'এ কথাটা আমি কী করে বিশ্বাস করি বলো তো, পার্সি? মেব্ল মিস্তকে হোক আর না-ই হোক, ওর মত ডিসেন্ট গার্ল আমি জীবনে অল্পই দেখেছি। কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, উত্তম রুচি। সে কী করে অতখানি ঈশুপ করবে? তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ কথাটা বললে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।'।

বিষ্ফুছড়ার সায়েবের বয়স যদিও কম তবু এ অঞ্চলে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিচক্ষণ লোক হিসাবে। আর পরচর্চা, গুজোব রটানো থেকে তিনি থাকেন সব সময়েই দূরে এবং আশ্চর্য, যারা এ-সব জিনিসে কান দেয় না, পাকা খবর তারাই পায় বেশী এবং আর সকলের আগে। বললেন, 'আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে তো বললুম, কিছুটা বিশ্বাস না করলে তোমার কাছে আমি কথাটা পাড়তুম না। অবশ্য একথাও আমি বলব, এ-সব জিনিস আমি শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করারই চেষ্টা করি।'।

'তোমার মেম, মীরপুরের মেম, এরা সব জানতে পেরেছে?'

'নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত না। শার্লট জানতে পারলে আমাকে রাত তিনটেয় খবরটা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ছুটত এমিলিকে টেকা মারবার জন্ত—আ্যাও ভাইস ভার্সি। তবে খুব বেশী দিন গোপন থাকবে না। সত্যি হোক আর মিথ্যেই হোক, যে-সব মেয়েরা মেব্লের রুচিশীল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের ছোট মনে করত তাদের জিভের লকলকানি খুব শিগগিরই আরম্ভ হয়ে যাবে।'।

সন্ধ্যার পর টেনিস লেনের এক কোণে বসে দুই সায়েব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবলেন। মধুগঞ্জ অঞ্চলের ইংরেজ কলোনির আসল সদার এঁরাই। বিষয়টি তাঁরা আলোচনা করছিলেন সেই কর্তব্যবোধ থেকে—এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু করতে পারেন কি না।

শেষটায় মাদামপুর জুজার দিলেন, 'বয়, দো ব্রা পেগ্‌।'

খবর কিংবা গুজোব যা-ই হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক—গড্‌ ড্যাম্‌ সিরিয়স—মেব্ল না'ক নেটিভ বাটলারটার প্রতি অহুরক্ত!

ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা ভৌতকা লোকটার প্রতি মেব্ল অহুরক্ত, একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'জীচরিত্র দেবতার'ও জানে না' তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জী-নিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যায়, দেবতার' না হয় দেবীদের চরিত্র চিনতে পারেন নি, তাই বলে পুরুষকেও তার জী-জাত সম্বন্ধে

এই অজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে জী-জাতকে অপমান এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে লাঞ্ছনা করতে হবে ?

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা । প্রথমেই যেটা মনে আসে সেইটেই মাদাম-পুরের বড় সায়েব বিষ্ণুছড়াকে বললেন, ‘হাতা-হাতি হয়ে যেত ।’ তারপর ছড়ছড় করে মনে আসে একসঙ্গে দশটা প্রতিবাদ ; ও-রেলির মত সুপুরুষকে ছেড়ে ? এক বৎসর যেতে না যেতে ? ও-রেলির এতখানি আদর-যত্ন পেয়েও ? ও-রেলি কি তবে জানে না ?

ঠাণ্ডা-মাথা মাদামপুর বললেন, ‘পারি, তবে কি তাই তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে ?’

বিষ্ণুছড়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, ‘কিন্তু মেলামেশাটা বজায় রাখলেই তো মানুষের সন্দেহ হত কম ।’

মাদামপুর ছুই ঢোকে ডবল ছইস্কি খতম করে বললেন, ‘মাই গড, নেটিভরা জানতে পারলে লজ্জার সীমা থাকবে না । ওঃ !’

‘তা ঠিক, তবে কি না জিনিসটা যখন চা-বাগিচার ভিতরে আগেও হয়েছে তখন—’

মাদামপুর বাধা দিয়ে বললেন, ‘সে হয় শহর থেকে দূরে, বনের তিতর, টিলার উপরে ।’

‘সে কথা ঠিক কিন্তু পাদ্রী-টিলার বাচ্চারা কোথা থেকে আসে সে তত্ত্বও তো নেটিভদের অজানা নয় ।’

মাদামপুর একটুখানি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, ‘সে তো সাধারণভাবে, যে রকম ধরো অনাথাশ্রম হয় । কিন্তু এখানে যে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ যাকে চেনে । তা আবার এ. এস. পির মেম ! মাই গড ! আমি ভাবতুম, পুরুষরা এ-সব ঢলা-ঢলিতে যতখানি নিচু হতে পারে, জীলোকেরা ততখানি পারে না ।’

দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন । দেখা গেল বিষ্ণুছড়া আর মীরপুরের মেম আসছেন । সাপে-নেউলে গল্প করতে করতে আসছেন এ জিনিস প্রাণীজগতে কখনোই দেখা যায় না । দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক লেক্সোটোর ইয়ার—উহু, এক ক্রকের সই । অথচ এঁরা আসছেন ইনি ওঁকে ছোবল মারতে মারতে, উনি এঁকে কামড় দিতে দিতে । চোখ লাল না করে, দাঁত না খিঁচিয়ে, ফণা না বাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে একমাত্র মানুষই—অবশ্য জীলোকেরাই পায় মাইকেল ও-রেলি শীল্ড—পুরুষের কপালে কনসোলেশন প্রাইজ ।

গুজোবটা ছড়াতে কত দিন লেগেছিল বলা শক্ত । গুজোবের স্বভাব হচ্ছে যে,

প্রথম ধাক্কাতেই সে যদি কিছুটা সাহায্য না পায় তবে কেমন যেন দড়কচা মেরে যায়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়া যদি সেটার টুটি চেপে না ধরতেন, তবে কী হত বলা যায় না; এস্থলে গুজোবটাকে ফের চাক্ষা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশ একটুখানি সময় লেগেছিল।

মধুগঞ্জের ‘আঙা-ঘরে’ গুজোব মাত্রেরই জন্ম-মৃত্যু জরা-যৌবনের বেশ একটা স্মৃতিষ্টি ঠিকুজি আছে। গুজোবের জননী যদি মীরপুরের ছোট মেম হন, তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য জানা কথা, বিষ্ণুছড়ার বড় মেম তখন ঙাঁতুড়ঘরেই বাচ্চাটাকে হুন খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন এবং আরো জানা কথা, বেশীর ভাগ স্থলেই বাচ্চা ঘোঁত-ঘোঁত করে হুনটা খেয়ে ফেলে দিব্য ট্যাঁ-ট্যাঁ করে দুধের জন্তু আপন ক্ষুধা জানিয়ে দেয়। তার কারণ বিষ্ণুছড়ার বড় মেম পাঁঠা কাটতে চান তাঁর পদমর্যাদার ভার দিয়ে—তিনি বড় মেম, মীরপুর ছোট মেম—আর মীরপুর কাটে ধার দিয়ে। তার উপর ক্লাবে ছোট মেমদের সংখ্যা বেশী, কাজেই তারা সদলবল সায় দেয় মীরপুরের কথায় কথায়—হায়, কার্লমার্কস্ যদি আঙা-ঘরে একটা চুঁ মেরে যেতেন, তবে তিনি ‘পতি বুজুয়াজী’ আর ‘অং বুজুয়াজী’র আড়াআড়ি সম্বন্ধে কত তত্ত্বকথা না রপ্ত করে যেতে পারতেন!

আবার বিষ্ণুছড়া যদি কোনো গুজোবের ‘গড্‌মাদার’ হন তবে সে বেচারীকে যজ্ঞী-পূজোর দিন পর্যন্ত বাঁচতে হয় না।

মেব্‌লের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তার সম্বন্ধে গুজোবটা বিষ্ণুছড়া ক্লাবে বাপ্তিস্ম করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মীরপুর বললেন, এ গুজোব তাঁর কানে এসেছে বহুদিন হল। তিনি এটা একদম বিশ্বাস করেন নি। ও-রেলি বিপ্লবীদের পিছনে লেগেছে বলে নেটিভরা হিংসেয় এইসব আজগুবী যাচ্ছেতাই কেচ্ছা রটাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। সে ময়না তদন্তে মেব্‌লের গোপনতম অন্তবস্তুর সাইজ, রঙ কিছুই বাদ পড়ল না। সেদিন কিন্তু আরেকটু হলে মীরপুরই লড়াইয়ে হেরে যেতেন, কারণ দেখা গেল মেব্‌লের সৌন্দর্যে হিংস্রটে খাটাসমুখোগুলো পাইকারী হিসেবে জুটেছে বিষ্ণুছড়ার পিছনে। আরেকটু হলে মীরপুরকে রণে ভঙ্গ দিতে হত, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার ফিফ্‌থ কলাম জুটে গেল, বিষ্ণুছড়ার বড়সায়ের সাহায্যে।

এ-সব কেলেক্সারি-কৌদল মেমেরা করে শায়েবদের বাদ দিয়ে। আজকের আলোচনা কিন্তু এতই তপ্ত-গরম হয়ে উঠেছিল যে, বিষ্ণুছড়ার বড় সাহেব যে কখন এসে একপাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি।

হঠাৎ একসময় তাঁর স্ত্রীর কথা কেটে দিয়ে বললেন, ‘শার্লট, তুমি যে

কথা বলছ সেটা কি খুব রুচিসঙ্গত ?’

তারপর আর পাঁচজনের দিকে একটুখানি বাও করে, ‘আপনারা আমাকে মাফ করবেন’, বলে আন্তে আন্তে বাইরে চলে গেলেন।

সবাই থা। একে অস্ত্রের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। বরঞ্চ যদি বিষ্ফুছড়া তাঁর খাণ্ডার মেমের কথার প্রতিবাদ না করে কোট-পাতলুন ফেলে দিয়ে আঙাখেলার টেবিলের উপর ধেই-ধেই করে নেচে নেচে ধর্মসঙ্কীত গাইতে আরম্ভ করতেন তবু আঙা-ঘর এতখানি আশ্চর্য হত না, কারণ এ অঞ্চলে সবাই জানে, বিষ্ফুছড়া তাঁর মেমকে ডরান কুলীদের স্ট্রাইকের চেয়েও বেশী। তাঁর যে এতখানি দুঃসাহস হতে পারে সেকথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। সবাই থা। না, থ নয়—একেবারে দ, ধ, দন্ত্য ন—বর্ণমালার শেষ হরফ পর্যন্ত।

সম্মিলিত ফেরার পর মীরপুরের ছোট মেম ফিসফিস করে এস. ডি. ও’র মেমকে বললেন, ‘নিশ্চয়ই এক জালা হইস্কি খেয়েছে, বাঘের চর্বির সঙ্গে ককুটেল বানিয়ে।’

এস. ডি. ও’র মেমের স্বরসিকারূপে খ্যাতি ছিল। ক্লাব থেকে বেরতে বেরতে বললেন, ‘হ্যাঁ, একটা ছবিতে দেখেছিলুম, হইস্কির পিঁপে থেকে ছাঁদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হইস্কি চুইয়ে বেরচ্ছে। এক ইঁদুরছানা সেইটে চুকচুক করে চুষে হয়ে গিয়েছে বেহেড মাতাল। লাফ দিয়ে পিঁপের উপর উঠে আস্তিন গুটিয়ে চিংকার করে বলছে, ‘ঐ ড্যাম্ ক্যাটুটা গেল কোথায় ? নিয়ে এসো এইথেনে—আমি ব্যাটার সঙ্গে লড়ব।’

মীরপুর বললেন, ‘ভালো গল্প ; টম্কে বললে হবে। আপিসের কাউকে ডিসমিস করতে হলে সে সেই সাতসকাল ছটার সময় হইস্কি খেয়ে আপিস যায়।’

এস. ডি. ও-মেম বললেন, ‘আজ রাতে বেচারী পার্সির ডিনার জুটবে না। ওকে “পট-লাকে” নেমস্তন্ন করলে হয় না?’ হঠাৎ কথা বন্ধ করে বললেন, ‘ঐ দেখো, পার্সিকে ফেলে বেটি মোটর হাঁকিয়ে বাড়ি রওয়ানা হয়েছে। এই বয়সে পার্সি বেচারার কী করে টাক হল বুঝতে কষ্ট হয় না। তালুতে যে কুলে আড়াইখানা চুল আছে সেগুলোও আজ রাতে ছেঁড়া যাবে।’

মীরপুর ততক্ষণে আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। গুজোবটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু এই যে বিষ্ফুপুরের বড় সায়েব জিনিসটাকে এত সিরিয়সলি নিলে যে মেমকে পর্যন্ত ধমক দিলে—তবে কি ?—কে জানে ?

‘গুড্ নাইট !’

‘গুড্ নাইট !’

॥ ৮ ॥

কিঞ্চুড়। আঙা-ঘরে গুজোবটার উপর যে বম্-শেল কাটিয়েছিলেন তার ধুঁয়ো কাটতে কাটতে কেটে গেল পুরো তিনটি মাস। তাঁর সাহসকে পুরস্কার দেবার জন্তই বোধ করি গুজোবটাকে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হল—সায়েবের উপর চটে গিয়ে কিঞ্চুড়ার মেমও হস্তা-তিনেক ক্লাবে হাজিরা দেন নি—ও নিয়ে বহুদিন ক্লাবে আর কোনো আলোচনা হল না। আর যত বড় রগরগে থবর কিংবা পরনিন্দা, পরচর্চাই হোক—মানুষ এক জিনিস নিয়ে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না। পারলে কোনো ছেলেই পরীক্ষায় ফেল হত না, কোনো আবিষ্কারই অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকত না। ইংরেজিতে এই মনোবৃত্তিরই নাম, ‘গ্রাসহপার মাইণ্ড’, প্রতি মুহূর্তে হেথায় লক্ষ, হোথায় কাম্প। ইতিমধ্যে আবার লাফাউড়া বাগিচায় একটা খুন হয়ে গেল। কুলি-সর্দারের উপকা বউ—‘মিস্ লাফাউড়া’—ডিম্পেনসারির কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামো করছিল বলে সে তার গলাটি কেটে, গামছায় বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে পেশ করেছে। পথে পড়ে চ্যাঙের খাল, তার সাঁকোতে এক-এক পয়সা করে ‘পোল’ ট্যাক্স দিতে হয়। সর্দারকে বাধা দিতে সে বললে, সরকারী কাজে থানায় যাচ্ছে, তার ট্যাক্সো লাগবে না!

‘কি সরকারী কাজ?’

সর্দার গামছা খুলে মুণ্ডটা দেখালে। সবাই নাকি দেখামাত্র পরিত্রাহি চিৎকার করে চুপীঘরের দরজায় ছড়কো মেঝে জানালা দিয়ে ঢেঁচিয়ে বলে, ‘তুই শিগগির যা, তোর ট্যাক্সো লাগবে না, এ সতাই বড্ড জরুরী সরকারী কাজ!’

সর্দার নাকি এদের ভয় দেখে একটুখানি তাজ্জব বেনে গিয়েছিল। ধীরে স্বস্থে মুণ্ডটা ফের গামছায় বেঁধে হেলেচলে থানার দিকে রওনা দিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মরতুজা সায়েবের এজলাসে যখন সর্দার দাঁড়ালে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুই মেয়েটাকে খুন করতে গেলি কেন?’

সর্দার বললে, ‘করব না? বেটি আমাকে বললে, “দেখ সর্দার, আমার উপর তুই যদি চটে গিয়ে থাকিস তবে আর কোনো মেয়েছেলেকে নে না, এই হুনিয়াতে আমিই তো একহ-ই-ঠো লড়কী নই! আর তোকে যদি আমার ভালো না লাগে তবে তুইও তো একহ-ই-ঠো মর্দ নস; তুই বেছে নে তোর-ঠো, আমি বেছে নিই হমার-ঠো।” ঐসী বেতমীজ? হারামজাদী আমার মূখের উপর এইরকম বেশরম বাত বললে। তাকে খুন করে আমি সরকারী কাম করেছি হজুর। আমাকে এরা বেহক্ হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হজুর।’

ম্যাজিস্ট্রেট সর্দারকে দায়রায় সোপর্দ করার সময় সরকারী উকিলের দিকে

তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'দেয়ার ইজ এ লট অব টুথ ইন ওয়াট দি গার্ল সেড ! ঐ খাঁটি কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে খুনের সংখ্যা অনেক কমে যেত !'

এই নিয়ে ক্লাব মেতে রইল খুনের খবর পৌঁছানোর থেকে সর্দারকে চোন্ধ বছর জেল পর্যন্ত। তারপর এই লাকাউড়া বাগিচার ছোট সায়েব করলে আত্মহত্যা। কেন করল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বললে, দেশে যে মেমসায়েবের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকাপাকি ছিল সে নাকি আর কারো সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে, কেউ বলে, সায়েব যে এদিকে এক কুলী-রমণীর কুম্ভালিঙ্গনে চব্বিশ ঘণ্টা চুর হয়ে থাকত সেই খবর শুনে সে রমণী অল্প পুরুষ খুঁজে নিয়েছে, কেউ বললে, তিনমাসব্যাপী ঝাড়া বাদলের ঠেলায় টিলার নির্জন বাসে থেপে থিয়ে মদ ধরে—তাও আবার কুলীদের ধাচ্ছেরী—তারপর দিবা-রাস্তিরে সে মদের নেশায় ছ'ঠ্যাঙওলা বাঘের দিকে সে অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে, শেষটায় বাঘ নাকি তার মাথার ভিতর ঢুকে যায়, চিৎকার করে সেই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একদিন সেই বাঘকে আপন কানের ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালিয়ে খুন করে।

ততদিন ও-রেলিদের কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। ক্লাব যখন গুজোবের তাড়িতে মত্ত তখন ও-রেলিদের বংশধর জন্মের খবর পৌঁছল পানসে শরবতের মতো। কেউ সামান্য চাখলে, অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলে, তাই নাকি, কবে হল ? কেউ সামান্য ভুরু কৌচকালে। মুকুব্বীরা বললেন, 'ভালোই হয়েছে, বাচ্চাই অনেক সময় বাপ-মায়ের মাঝে সেতু হয়ে দুজনাকে এক করে দেয়।'

শুধু বিস্মুহভার মেম বাঁকা হাসি হেসেছিলেন।

'সে হাসির অর্থ বলা শক্ত কারণ এটা ব্যক্ত'—হু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে ও-জাহাজে জোড়া লাগানো যায়, ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু-নৌকোর মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

পয়লা বাচ্চার বাপ্তিস্ম করার সময় ক্যাথলিকরা ধুমধাড়া করা করে বাঙালী ঠাকুরদার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশনের চেয়েও বেশী। মেবল্ কিন্তু সব-কিছু সারতে চেয়েছিল সাদামাটাভাবে। ও-রেলি দেখা গেল ঠাকুরদা-গোত্রের। সে চায় পালা-পরব করতে। ওদিকে পাত্রী জোনস্ সাহেব প্রটেষ্টানট—তিনি ক্যাথলিকের বাচ্চাকে বাপ্তিস্ম করবেন কী করে ? এ ঘেন পাঁড় বোষ্টমের ছেলেকে শান্ত দিচ্ছে মস্তদীক্ষা—আশানে মড়ার উপর মুখোমুখি বসে মড়ার খুলিতে কারণ-ভতি-হাতে ! ও-রেলি কিন্তু জোনস্কেই অহরোধ করলে বাপ্তিস্মের তাবৎ ব্যবস্থা করতে।

গড়-ফাদার অর্থাৎ ধর্মপিতার অভাব মধুগঞ্জে হত না। মাদামপুরের বড় সায়েব, ডি. এম, যে-কেউ আনন্দের সঙ্গে রাজী হতেন, ‘পুয়ের ডেভিল—বেচারী! একলা-একলি মনমরা হয়ে থাকে, ঐটুকুতে যদি সে খুশি হয় তবে হোয়াই নট—নিশ্চয়ই—অফ কোর্স—অবশি, অতি অবশি।’ কিন্তু ওদিকে দেখা গেল, ও-রেলি পাড় ক্যাথলিক। ক্যাথলিক বাচ্চার গড়-ফাদার হবে প্রটেস্টানট! মন্ত্র যে খুশি পড়াক, বাপ্তিস্ম যে খুশি করুক, সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু ধর্মবাপ তামাম জীবনের। সেখানে প্রটেস্টানট হলে চলবে কেন? কলমা যে খুশি পড়াক, কিন্তু মুরশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়।

ও-রেলি পরিবার বাদ দিলে মধুগঞ্জে আছে মাত্র একজন ক্যাথলিক—বাটলার জয়স্বর্ঘ। ও-রেলিদের মতই একেবারে খাঁটি। ও-রেলি বললে, সেই হবে ধর্মবাপ। শুনে পাত্রী সায়েব পর্যন্ত অনেক ‘যদি’ অনেক ‘কিন্তু’ অনেক ‘ইউ নো হোয়াট আই মিন’ অনেক ‘বাট অফ কোর্স’ বলে ইতি-উতি করে মুহূ আপত্তি জানিয়েছিলেন, এমন কি, কলকাতা থেকে তাঁর পরিচিত ভদ্র ক্যাথলিক আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু ও-রেলি একদম নেই-আঁকড়া,—বলে ধর্মের চোখে সব ক্যাথলিকই বরাবর—পোপ যা, জয়স্বর্ঘও তা।

ও-রেলির কথার কোনো জমা-থরচ পাওয়া গেল না। বাপ্তিস্মের বেলায় সে দিলদরিয়া—হেরেটিক প্রটেস্টানটই সই, অথচ ধর্মবাপের বেলা সে কটুর—ক্যাথলিক না হলে জর্ডনের জল অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন ‘বিদেশী ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর’। ওদের ভাষায় বলতে হলে ‘মাই রিলিজিয়ন রাইট অর রঙ, মাই মাদার—ড্রাক অর সোবার।’

হ্যাঁ, ‘ড্রাক অর সোবার’ কথাটা ওঠাতে ভালই হল। জয়স্বর্ঘ পৃথিবীর আর পাঁচ লক্ষ বাটলারের মতো অধিকাংশ সময়ই থাকে ড্রাক আর সোবারের মাঝখানে। আর মোকা পেলেই গুস্তা খেয়ে ড্রাকের দিকেই কাত। অবশ্য তাকে গড়-ফাদার হতে হবে শুনে তন্মুহূর্তেই বেচারার নেশা কেটে গিয়েছিল। গবেটের মত বিড়বিড় করে কী একটা বলতে গিয়ে খেল ও-রেলির ধমক আর কড়া তর্ক,—অন্তত পরবের দিনটায় যেন সে সাদা চোখে গির্জায় যায়।

সে এক বিচিত্র বাপ্তিস্ম। মেবল্ স্বন্দের ঘাত-প্রতিঘাতে অল্প অল্প কাঁপছে, ও-রেলি পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, পাত্রী সায়েব নার্ভাস আর জয়স্বর্ঘ তার বরাবরের গির্জের পোশাক পরে বিশ্ব্বলের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সবাই ভাবলে, ব্যাটা আজ টেনে এসেছে।

একমাত্র সোমই ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছুর তদারক করলে। পাত্রী-টিলার

মেয়েদের বেশীর ভাগই জয়সুখ জাতের—পরবের উৎকট দিকটা শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ল না।

বাগ্মিশ্বের পরই কিন্তু গির্জা থেকে বেরিয়ে জয়সুখ না-পান্তা। সন্ধ্যার সময় সোম তাকে খুঁজে বের করল উজ্জান গাঙের ঘাটে বাঁধা এক নৌকোর ভিতর। দু'বোতল ধাত্তেশ্বরী শেষ করে বৃন্দ হয়ে বসে আছে।

সব খবরই আগু-ঘরে পৌঁছল।

বিস্মৃচ্ছড়ার মেম বললেন, 'ডিসগ্রেসফুল!'

মাদামপুর তাঁর অন্তরঙ্গজনকে বললেন, 'ধাক! এবার থেকে ওদের আর একদম ঘেঁটিও না। কাট দেয় একদম ডেড। কী যে হল, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

দিলী কথায় বলে, ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

॥ ৯ ॥

মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, লাশ গোর দিয়ে লোকজন চলে আসার পর গোরের ভিতর কী কাণ্ড-কারখানা হয়।

কুরানে স্পষ্ট বলা আছে, ইয়োম্-উল্-কিয়ামত—অর্থাৎ প্রলয়ের দিন সবাইকে আল্লাতালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি তখন সকলের বিচার করে ধার্মিককে পাঠাবেন স্বর্গে আর পাপীকে নরকে। এখন প্রশ্ন, কিয়ামত কবে হবে তার তো কোনো হাদিস পাওয়া যায় না, এই মুহূর্তেই হতে পারে আবার এক কোটি বৎসর পরেও হতে পারে—ততদিন অবধি গোরের ভিতর মরাদের কী গতি হয়?

কুরান নয়—অন্য শাস্ত্রে বলেন,—গোর দিয়ে আত্মীয়স্বজন চল্লিশ পা চলে আসার পর দুই ফিরিস্তা—দেবদূত গোরের ভিতর ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তার ইমান (ধর্মত) কী? সে যদি খাঁটি মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'আল্লা এক, আর মুহম্মদ সাহেব তাঁর প্রেরিত পুরুষ।' ফিরিস্তারা উত্তর শুনে খুশি হয়ে বলেন, 'তোমার ইমান ঠিক, কিন্তু এখনো তো কিয়ামতের কিছু দেরি আছে। ততক্ষণ অবধি এই নাও এক গাছা তসবী, আল্লার নাম স্মরণ করো।' তারপর শাস্ত্র বলেন, লোকটি খুশি হয়ে তসবী হাতে নিতেই তার স্বতোটি ছিঁড়ে গিয়ে তসবীর দানাগুলো কবরময় ছড়িয়ে পড়বে। সে তখন ব্যস্ত হয়ে দানাগুলো কুড়োতে না কুড়োতে দেখবে, কিয়ামতের শিঙে ফুঁকে

উঠেছে—ছুটে গিয়ে আল্লার সামনে দাঁড়াবে আর-সকলের সঙ্গে সারি বেঁধে ।

আর যদি সে পাপাত্মা হয় তবে সে ইমান বলতে পারবে না । ফিরিস্তারা তখন তাকে ধনুর্ঘরীরা যেমন তুলোর ভিতর যন্ত্র চালিয়ে দেয় ঠিক তেমনি তার সর্বসত্তা ছিন্নভিন্ন করে দেবেন—তুলোর মতো সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়বে । আবার সব কটা টুকরো জুড়ে দিয়ে ফিরিস্তারা আবার ঐ প্রক্রিয়া চালাবেন । পাপীর মনে হবে, এ যন্ত্রণা যেন যুগ যুগ ধরে চলছে ।

অথচ পুণ্যাত্মা হয়তো মরেছিল কিয়ামতের এক লক্ষ বৎসর পূর্বে ; পাপাত্মা মরেছিল কিয়ামতের এক সেকেন্ড আগে ।

অর্থাৎ পুণ্যাত্মার বেলা আল্লা এক লক্ষ বৎসরকে তার চৈতন্তের ভিতর এক সেকেন্ডে পরিণত করে দেবেন আর পাপাত্মার বেলা এক সেকেন্ডকে লক্ষাধিক বৎসরে ।

আজকের দিনের ভাষায় তুলনা দিতে বলা যেতে পারে পুণ্যাত্মার বেলা যেন তিন মিনিটের রেকর্ডের গতিবেগ বাড়িয়ে এক সেকেন্ডে বাজিয়ে দেওয়া হল, পাপাত্মার বেলায় সেই রেকর্ডই বাজানো হল এক ঘণ্টা ধরে ।

তাই বোধহয়, হিন্দু পুরাণেও আছে, নরের এক লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত ।

কিন্তু এ কি শুধু মৃত্যুর পরই ? জীবিত অবস্থায়ও তো ঐ-ই । মিলনের শত বৎসর মনে হয় এক মুহূর্ত, আর ‘ক্ষণেক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে’ মনে হয় ‘লাখ লাখ যুগ’ ধরে সে যেন কোন্‌ স্বদূরে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে ।

‘মোতির মালা’ গল্পে তাই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের দুঃখ-দুর্দৈবের বর্ণনা মোপাসাঁ দিয়েছেন দশ ছত্রে আর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনের তিনদিন মেয়াদের বর্ণনা দিয়েছেন ষাণ্ঠো পুরো একখানা কেতাব লিখে ।

বাস্তিস্ম-পরবের পর চার বৎসর কেটে গিয়েছে । এ চার বৎসর মেব্ল ডেভিডের কেটেছে তসবীর দানা কুড়োতে কুড়োতে না তুলো-ধুনো হয়ে হয়ে—তার খবর দেবে কে ? কাজল-ধারা নদীর মত নিরবধি তাদের জীবনগতি সমুখ পানে ধেয়ে চলেছিল, না সামনের নীলপাথরী পাহাড়ের মত স্থাগু হয়ে পড়েছিল তাই বা বলবে কে ? মধুগঞ্জ শুধু দেখল, যে বারান্দায় সায়েব আর মেম বসে থাকত, বাটলার রেকর্ডের পর রেকর্ড বদলে যেত সেখানে একটি চতুর্থ প্রাণী প্রথম দোলনায় শুয়ে তারপর পেরেঝুলেটায়ে বসে এবং সর্বশেষে টলমল হয়ে হেঁটে হেঁটে বারান্দাটাকে চঞ্চল করে তুলল । যেখানে আর দুটি প্রাণী—জয়স্বর্ধকে ধরলে কখনো বা তিনটি—আপন আপন আলনে ধ্যানমগ্ন,

সেখানে এই নূতন প্রাণীটির আনাগোনার অন্ত নেই। কখনো সে মেবলের কোলে মাথা গুঁজে ছুটি খুঁদে হাত দিয়ে উরু জড়িয়ে ধরে, মেবল্ তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়, কখনো সে ডেভিডের আঙ্গিনা ধরে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন সে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো বা জয়স্বর্ঘের গলা জড়িয়ে ধরে তার-ই কাছ থেকে শেখা গান ধরত—

‘ক্-ক্-ক্-কেটি, হুয়েন দি ম্-ম্-মুন শাইনস্—’

একমাত্র ওরই জীবনে এখনো তসবী, ধূমুরী কেউই আসে নি। ‘সময়’ কী বস্তু সে এখনো বোঝে নি—টেকোর ভয় নেই উকুনের।

বাচ্চা প্যাট্রিকের চতুর্থ জন্মদিনে ও-রেলিরা স্থির করলে, মেবল্ বাচ্চাকে নিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। মধুগঞ্জের ইস্কুল দিশীর কাছে অক্সফোর্ড-সম হতে পারে, কিন্তু সায়েবের বাচ্চা যদি সেখানে ট্যাশ উচ্চারণ শেখে তবেই চিন্তির! বড় হয়ে সে বাপ মাকে প্রতি সন্ধ্যায় অভিসম্পাত না দিয়ে ছইস্কি-সোডা স্পর্শ করবে না, সে যে ইয়োরেশিয়ান নয়, সেকথা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে, বোঝাবার মোকা না পেলে সেই ঘর্মে ডুবে মরতে হবে।

টমাস কুক, অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস, আর দুনিয়ার যত জাহাজ কোম্পানির ছবির বিজ্ঞাপন, চটি বই, জাহাজের টাইম-টেবলে ও-রেলির বারান্দা ভরতি হয়ে গেল। হিন্দীতে বলে :

‘বাঘ কা ভাই বাঘেরা

কুদে পাঁচ তো কুদে তেরা’

‘বাঘ যদি দেয় পাঁচ লক্ষ, তবে তার ভাই বাঘেরা মারে তেরোটা।’ বাঙলায় প্রবাদ ‘ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।’ অর্থাৎ যাত্রী যদি কোম্পানিকে লেখে আমি লগুন যাব, তবে তারা যে শুধু ঐ জাহাজেরই খবরওয়ালা চটি বইই পাঠায় তাই নয়, সঙ্গে পাঠায় আরেক হন্দর ‘পথিক-দিক্-দর্শন’—তাতে আছে নরওয়ার ফিয়ার্ডে যেতে হলে কোন্ জামা-কাপড় অপরিহার্য, মধ্য আফ্রিকায় উট চড়তে হলে আগে-ভাগে ইনকোলেশন নিতে হয় কি না। ফলে সেই পর্বত-প্রমাণ কাগজপত্রের মাঝখানে বিলাতগামী জাহাজের বিশল্যকরণী খুঁজে বের করা হুম্মানের—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। ও-রেলি সেই অষ্টাদশ পর্বে উদয়াস্ত ডুব মেরে পড়ে রইল।

সোম এসেছিল একদিন সন্ধ্যারী কাজে। কাগজপত্রের ডাঁই দেখে

তথ্যে, ‘আর, গুপ্তিহৃদ নর্থপোলে চললেন নাকি ? এর চেয়ে অল্প দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে তো মঙ্গল কিংবা শনিতে ভ্রমণ করে আসা যায় ।’

ও-রেলি এক তাড়া কাগজ সোমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, ‘মঙ্গল-শনির কথা বলতে পারি নে, কিন্তু নর্থপোলে যেতে হলে এ-সবের দরকার হয় না । সেখানে যাবার জন্তে কোনো স্টীমার-সার্ভিস নেই—অন্ত জাহাজ চাটার করতে হয় । এখানে ঠিক তার উল্টো । কত সব অল্টারনেটিভ দেখো । বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবে, না কলকাতা থেকে কিংবা মাদ্রাজ থেকে ? পি. এণ্ড. ও. নেবে, না মার্কিন জাহাজ, না জার্মান ? ফরাসীও নিতে পারো—জাহাজগুলো বড় ডোমো, কিন্তু রান্না ভারী চমৎকার । তুমি কি একটা প্রবাদ বলো না, দি ডোম ইজ্, রাইও ইন দি ব্যাথু-জাঙ্গল ? আমার হয়েছে তাই ।’

বহুকাল পরে সায়েবের তাজা-দিল দেখে সোম খুশি হল । বললে, ‘তাহলে সায়েব, অত ভক্ষ্য ধনুগুণ—ইট্ দি বো থ্রিং টুডে—অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা জাহাজ নিলেই হয় ।’

ও-রেলি বললে, ‘দেখো সোম, আমাকে আর ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করো না । গোড়ার দিকে কিছু জানতুম না বলে তুমি তোমার আপন মাল গুড্ ওন্ড ইণ্ডিয়ান উইজডম্ বলে পাচার করেছ বিস্তর । এখন আর সেটি চলছে না । আমার পনচা-চান্ট্রী, হিটোপ্ ডেস পড়া হয়ে গিয়েছে । ধনুর ছিলে খেতে গিয়ে তোমার ঐ শেয়ার্লের কী হয়েছিল মনে আছে ?’

সোম ইঙ্কলের ছেলেদের ভঙ্গীতে তড়াক করে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে, ‘খুব মনে আছে, সুর ! ছিলে ছিঁড়ে গিয়েছিল । তা যাবে না ? আপনারাই তো বলেন, “ডিম না ভেঙে মমলেট বানানো যায় না” ।’

ও-রেলি বললে, ‘ডিম দিয়ে মামলেড্ কী করে হয় হে ? মামলেড্ তো হয় কমলালেবুর খোসা দিয়ে ।’

‘আজ্ঞে মামলেড্ নয়, মমলেট ?’

‘ও ! অমলেট !’

‘আজ্ঞে না । অমলেট হয় বিলেতে, বিলিতি ডিম দিয়ে । দিল্লী ডিমে হয় মমলেট । তা যখন মামলেড্ মমলেটের কথাই উঠল, ওসব তৈরি করেন মেয়েরা । জাহাজ বাছাইয়ের ভার মেমসাহেবের হাতে ছেড়ে দিলে হয় না ?’

ও-রেলির মুখ কঠিন হল । সোমের দৃষ্টি এড়াল না ।

স্বরসিক যদি বদমেজাজী আর খামখেয়ালী হয়, তবে তাকে নিয়ে বড় বিপদ । যত্ন চট করে বেহুরো হয়ে যায় আর তার বিকৃত স্বর সব-কিছু বরবাদ করে দেয় ।

ও-রেলির 'ছঃ' বীণাবাণ্ডের মাঝখানে প্যাচার কণ্ঠের মত শোনাল।

সোম বুঝলে, কঁচো খুঁড়তে গিয়ে ঢোঁড়া বেরিয়েছে। এইখানেই থামা উচিত, না হলে হয়তো কেউটে বেরুবে। কিন্তু হঠাৎ ধেমের গিয়ে বিদায় নিলে সেটা হবে আরো বেতাল। একটুখানি ইতি-উতি করে শুধালে, 'আপনি পোর্টে ওদের সী অফ্ করতে যাচ্ছেন তো?'

ও-রেলি বললে, 'না।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে, জিজ্ঞেস না করা সম্বন্ধেও বললে, 'বাটলার পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে সে দেশে যাবে। অনেককাল ছুটি নেয় নি বলছিল।' কণ্ঠে কিন্তু বিরক্তির স্বর।

সোম না হয়ে আর কোনো নেটিভ হলে ভাবত, এই সাদামুখগুলোর মতিগতি বোঝা ভার, কিন্তু সোম মেলা ইংরেজ চরিয়েছে। সে অত সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট নয়। বড় ভারী মন নিয়ে সোম বাড়ি ফিরল। ও-রেলিকে সে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিল।

'সোনামুগ সরু চাল স্পারি ও পান
ও হাড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু বুনা নারিকেল
দুই ভাও ভালো রাই-সরিষার তেল—'

এই সব পর্বতপ্রমাণ মালপত্র নিয়ে আমরা সফরে বেরই, আর সায়েবরা কিরকম মাত্র একটা স্টকেস হাতে নিয়েই গটমট করে গাড়িতে ওঠে, তাই দেখে বাঙালীর ভারি ঈর্ষা হয়। কিন্তু ঐ স্টকেসটির ভিতরকার মালপত্র তৈরি করতে গিয়ে সায়েবদেরও হিমসিম খেতে হয়। মোকামে পৌঁছানোর পর বাঙালী যদি দেখে ধুতির অনটন তাহলে সে কারো কাছ থেকে ও জিনিসটি ধার নিয়ে পরতে পায়—এমনকি কুর্ভাতেও খুব বেশী আটকায় না—কিন্তু সায়েবরা কোট-পাতলুন ধার নিয়ে পরতে পারে না, ফিট হল কি না সেটা মারাত্মক প্রশ্ন।

মেব্লকে তাই বাচ্চার কাপড়-জামা তৈরি করতে বেশ বেগ পেতে হল। ভূমধ্যসাগর অবধি আবহাওয়া গরম, মধুগঞ্জের জামাকাপড়ই চলবে। কিন্তু তার পরের জন্ম যে গরম জিনিসের প্রয়োজন, সে তো মধুগঞ্জে পাওয়া যায় না। তাই ফ্রান্সেল, সার্জ, টুইড আনাতে হল শিলঙ থেকে, আর আনাতে হল শহরের বুড়ো খলিফাকে। তাই নিয়ে পড়ে রইল মেব্ল দিনের পর দিন, আর ও-রেলি বাস-স্টকেস-হ্যাটকেসে সাঁটতে লাগল জাহাজের

লেবেল। যে বাস্তব যাবে কেবিনে তার এক রঙ, যেটা যাবে স্টোররুমে তার অন্য রঙ এবং যেটা হাতে থাকবে তার জন্ত কোনো লেবেলের প্রয়োজন নেই। এই রামধনুর রঙের প্যাঁচে ও-রেলি তো একবার মতিচ্ছন্ন হয়ে বাচ্চার পিঠে লেবেল লাগিয়েছিল আর কি!

বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় জিনিসপত্র সব ফিটফাট ছিমছাম হল। পরদিন ভোর ছ'টায় ও-রেলি মোটর হাঁকিয়ে সবাইকে কুড়ি মাইল দূরে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। চাকর-বাকরদের বললে তারা যেন বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, কারণ পরদিন ভোরেবেলা এসে মালপত্র ঠাঠাতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কম্পাউণ্ডে রইল শুধু বাটলার—অন্ত চাকর-বাকরদের সেখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পরদিন ভোরের দিকে বুষ্টি হল। চাকর-বাকরেরা কোনোগতিকে ছ'টায় বাঙলো পৌঁছে দেখে সবাই চলে গিয়েছে—গারাজ খালি, বাড়ি তালাবন্ধ। ও-রেলি সায়েবের সব-কুছ তড়িঘড়ি, ঝটপট, কাঁটায় কাঁটায়। চাকরেরা আন্দাজ করলে সামান্য পাঁচ মিনিট দেরিতে আসার জন্ত তাদের একটুখানি বকুনি খেতে হবে।

সায়েব ফিরল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। আরদালি আসমৎউল্লা সায়েবের জন্ত দুখানা কাটলিস আর আলুসেদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু সে কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সব-কিছু শুনে রায়বাহাদুর কালীশ্বর চক্রবর্তী বললেন, ‘আহা, বেচারী, এবারে একদম একা পড়ে গেল।’

তঁার জুনিয়র তালেবুর রহমান বললেন, ‘আমি ভাবছি অল্প কথা। বাচ্চাটা বিলেত গেল বাঘ হয়ে ফিরে আসবার জন্ত। তখন লাগাবে নেটিভদের উপর জোর ডাঙা। এ-মুহুর্তে থাকলে তাদের তরে দরদী হয়ে যেত, ছাতির খুন ঠাঙা আর দিলেও মোলায়েম মেয়ে যেত।’

রায়বাহাদুর বললেন, ‘সে কী কথা! ও-রেলির মত ভদ্রলোকের ছেলে কি কখনো বৈরীভাব নিতে পারে? কী বলে সোম?’

সোম বললে, ‘আপনার ছেলের বিলেত যাওয়ার কী হল?’

রায়বাহাদুর বললেন, ‘জানেন ব্রাহ্মণী?’

তালেবুর রহমান বললেন, ‘সোম ভাবে সে একটা মস্ত ঘড়েল।’

ক্লাবে হল অল্প প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই বললে, ‘গেছে গেছে, আপদ গেছে। কেলেঙ্কারিটা তো চাপা পড়ল। এখন ক্লাবের ছেলে ও-রেলি ক্লাবে

ফিরে এলেই হয়।’

কিন্তু আরেকটি বৎসর কেটে গেল। ও-রেলি ক্লাবে এল না।

॥ ১০ ॥

বাড়ির সামনে জ্যোতিষ্মান এবং অঙ্ককারে মানুষের তৃতীয় চক্ষুরূপ ল্যাম্প-পোস্টটা সম্বন্ধেই যখন সে ছুদিন বাদেই অচেতন হয়ে যায়, তখন অদৃষ্ট ও-রেলিকে ক্লাব যে ভুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে! কিন্তু যেদিন থবর এল ও-রেলি মধুগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে, সেদিন ক্লাবে তার সম্বন্ধে আর-এক প্রস্তুত আলোচনা করে নিলে।

মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়াই প্রথম থবর পেলেন ডি. এম-এর কাছ থেকে।

মাদামপুর বললেন, ‘ভালোই হল। যাচ্ছে কক্সবাজার না কোথায়, সেখানে কলেঙ্কারিটা হয়তো পৌঁছয় নি এবং পৌঁছলেও সেটা বাসি হয়ে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো পুয়ের ডেভিল আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবে। আমি সত্যি তাকে বড্ড মিস করতুম।’

বিষ্ণুছড়া চুপ করে রইলেন, ভালো মন্দ কিছু বললেন না।

মাদামপুর শুধালেন, ‘কী হে, চুপ করে রইলে যে? ছইন্সি চড়েছে নাকি?’

বিষ্ণুছড়া বললেন, ‘সাতটা ছোটায়? আই লাইক টাট—আপনিও যেমন!’ তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে বসে বললেন, ‘আমি সে কথা ভাবছি নে। আমার কানে এসে সেদিন পৌঁছল, মেব্লুয়া নাকি আদপেই ইংলণ্ড পৌঁছয় নি।’

মাদামপুর বললেন, ‘আমিও শুনেছি, কিন্তু তারা পৌঁছল কি না তার থবর দেবে কে? মেব্লের সঙ্গে ক্লাবের কারো তো এমন দহরম-মহরম ছিল না যে, বন্দর বন্দর থেকে পিকচার-পোস্ট-কার্ড পাঠাবে আর লগুন পৌঁছে কেবল। মোকামে পৌঁছে প্রাতি মেলে স্কাফ, স্নয়েটার আর গরম মোজা, প্যার স্কটিশ উলে তৈরী! হোম মেড!’

বিষ্ণুছড়া বললেন, সায়েবের একটু চড়েছে—বয়স রয়েছে কি না, অল্পেই একটু কেমন যেন হয়ে যান—না হলে স্কাফ, স্নয়েটারের কথা বলবেন কেন? ও বস্তু মধুগঞ্জে পরবে কে? সাদা চোখে এ ভুলটা করতেন না, হয়তো বলতেন টিনের বেকন, সার্ডিন। চেপে গিয়ে বললেন, ‘কলকাতার ও. শী-র সঙ্গে নর্থ ক্লাবে দেখা হয়েছিল, সে বললে, মেব্লু আর তার বাচ্চাকে সে মাস তিনেক আগে দেখেছে মসুরিতে, সঙ্গে ছিল ও-রেলি। তোমার মনে আছে কি না জানি নে,

ও-রেলি তখন ছুটি নিয়ে মসুরি গিয়েছিল।

এবারে মাদামপুর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'কে বলেছে ? ও. শী. ? কটা মেব্লু আর কটা ডেভিড্ দেখেছিল জিজ্ঞেস করো নি ? ও তো সকালে খায় কড়া হস-নেক, দুপুরে জিন, সন্ধ্যায় রম্ আর রাত্রে হুইস্কি। সন্ধ্যায় দেখে থাকলে নিশ্চয়ই ছুটো, আর রাত্রে দেখে থাকলে চারটে ও-রেলি দেখেছে। কটা মসুরি দেখেছে সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলে কি ?'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, এখন আর কথা-কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। তাই বললেন, 'সোমও বলছিল মেব্লু লগুনে আছে।'

মাদামপুর আশ্চর্য হয়ে শুধালেন, 'সোম বললে ? আশ্চর্য ! ও তো কখনো কোনো খবর কাউকে দেয় না। মধুগঞ্জের বানান জিজ্ঞেস করলে ভাবখানা করে ঘেন সরকারী টপ সিক্রেট। আমি তাকে একদিন বলেছিলুম, "ফাইন ওয়েদার, সোম।" মুখখানা করলে ঘেন আলিপুরের আবহাওয়া দফতর থেকে রিপোর্ট না এলে সে ঐ একস্ট্রিমলি কনফিডিয়েনশেল খবর কনফার্ম করতে প্রস্তুত নয়। তাই বলছি সোম যখন বলেছে তখন ওটা বাইবেল-বাক্য।'

কিন্তু বিষ্ণুছড়ারই ভুল। হঠাৎ চেয়ারখানা তার কাছে টেনে এনে মাদামপুর একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে অত্যন্ত সাদা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোথায় আছে, কোথায় নেই, ওসব খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আবার সেই ধামাচাপা ডার্ট লিনেন বেরিয়ে পড়বে। তাতে ইয়োরোপীয়ন কমিউনিটির কী লাভ ? বরঞ্চ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নো নিউজই যদি হয়, তবে জান তো প্রবাদ, "নো নিউজ ইজ গুড নিউজ"।'

বিষ্ণুছড়া অভয় পেয়ে বললেন, 'বিশেষ করে সোমের কথাই পাকি খবর। কিন্তু ও-রেলিকে একটা বিদায়ভোজ দিতে হবে না ! ক্লাবে আসুক আর না-ই আসুক, চাঁদা তো ঠিক ঠিক দিয়ে গিয়েছে, এমন কি টেনিসের একস্ট্রা ও চ্যারিটি-ক্যারিটির পয়সাও কামাই দেয়নি।'

মাদামপুর বললেন, 'সাদুও করে দেখতে পার। কিন্তু আসবে কি।'

এ সম্বন্ধে মাদামপুর এবং বিষ্ণুছড়ার মনে সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ও-রেলি আসতে রাজী হল। তবে ইঙ্গিত করলে যে, ডিনারের বদলে মামুলী টি-পার্টি হলেই ভালো হয়। ক্লাব রাজী হল।

ক্লাবের প্রায় সবাই সেদিন হাজিরা দিলেন। ও-রেলি সঙ্গে নিয়ে এল তার বদলী সমারসেট ভীনকে। চটপটে ছোকরা, সমস্তক্ষণ কথা কয় আর এক সিগরেট থেকে আরেক সিগরেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের খর্চা বাঁচায়। ও-রেলি

ডীনকে ক্লাবের সঙ্গে সাড়বর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ইনি স্কটলাও ইয়ার্ড থেকে খাশ-তালিম নিয়ে তৈরি হয়ে এদেশে এসেছেন, মধুগঞ্জ এঁর সেবায় উপকৃত হবে।'

গুজোব রটাতে ফিসফাস-গুজগাজ করতে ইংরেজ এবং বাঙালীতে কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু যাকে নিয়ে এ-সব করা হয়, তাকে সোজাছজি প্রশ্ন করাটা ইংরেজের অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। তাই মেবল্ সন্ধ্যাে ও-রেলিকে মুখের উপর কেউ কোনো প্রশ্ন শুধালে না। একেবারে কোনো প্রকারের অহুসজ্ঞান না করাটা আবার মুকস্বীদের পক্ষে ভালো দেখায় না। তাই বুড়ো মাদামপুর ও ডি. এম. শ্রেণীর দু-একজন ও-রেলির পরিবারের খবর নিলেন কোনো প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, অর্থাৎ শুদ্ধ আশা প্রকাশ করলেন, মেবল্ বিলেতে ভালো আছে নিশ্চয়ই। ও-রেলি ঘাড় নেড়ে সায়া দিলে।

মোটের উপর পার্টিতে কোনরকমের অস্বস্তি কিংবা আড়ষ্টতার ভাব দেখা গেল না। ও-রেলি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা কইলে। বাঙলাদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রায় সব শহরেই ছোট-বড় দ'য়ের সৃষ্টি করেছে—কথাবাতা হল সেই সন্ধ্যােই বেশী। ও-রেলি আইরিশম্যান, তাই সে বুঝিয়ে বললে, এ-সব আন্দোলন নির্মূল করা পুলিশের কর্ম নয়, বিলেতের পার্লামেন্ট যদি সময়াপ-যোগী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সক্তাসবাদ বাড়বে বৈ কমবে না। অবশু তার অর্থ এই নয়, পুলিশ হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে—সে তার কর্তব্য করে যাবে, তবে তারও একটা সীমা আছে।

মাদামপুর এ বাবদে কট্টর। কিন্তু ও-রেলি তার বক্তব্য এমনভাবে গুছিয়ে বললে যে, তিনি পর্যন্ত বাগান ফেরার সময় বিস্কুছড়াকে বললেন, 'পিটি, ছোঁড়াটার পারিবারিক জীবন সূত্থের হল না। ওকে কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই। ছোঁড়ার মাথাটা ঘাড়ের সঙ্গে ঠিকমত জুঁ করাই আছে। আমি সত্যই প্রার্থনা করি, ও যেন জীবনে সূত্থী হয়।'

বিস্কুছড়াও সায়া দিয়ে বললেন, 'হোয়াই নট। ইট ইজ নেভার টু লেট টু বিগিন্ এগেন্।'

মারপুরের মেম দরদী রমণী। তিনি ও-রেলিকে একবার এক লহমার তরে একলা পেয়ে তার ডান হাত চেপে বলেছিলেন, 'ও-রেলি, তুমি আমার ছেলের বয়সী তাই তোমাকে বলি, জীবনটা একেবারে ছবছ জিগশো ধাঁধার মতো—প্রথমবারেই সব কটা মেলাতে না পারলে নিরাশ হবার মতো কিছু নেই। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

ও-রেলি শটাই বিচলিত হয়েছিল। আধো-আধো ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়েছিল।

পার্টি শেষ হতেই ও-রেলি নিয়ে গেল ডীনকে তার বাড়লোয়। ডিনার খেয়ে ও-রেলি তার ডেরা তুলে মোটরে যাবে স্টেশন, আর ডীন খাটাবে তার বাড়লোতে আপন ডেরা। চাকরি-জগতে সরকারী বাসা সম্বন্ধে এ-ই হচ্ছে এদেশে আইন—অবশ্য সাদা কালিতে লেখা।

ডীন সবমাত্র বিলেত থেকে এসেছে, তার উপর সে বকর-বকর করতে ভালোবাসে—এককালে ও-রেলিও গালগল্প জমাতে কিছুমাত্র কম ওস্তাদ ছিল না—কাজেই সে একটানা গল্প বলে যেতে লাগল। ও-রেলিরও ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল, তাই যদি বা ডীন দু-একবার ভদ্রতার খাতিরে তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করলে সে তাতে সাড়া না দিয়ে উলটে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ওকে আবার বকর-বকর করাতে তাতিয়ে দিলে।

ও-রেলির মালপত্র মোটরে তোলা হয়ে গিয়েছে—এখন তার ওঠবার সময় হল দেখে ডীন শুধালে, ‘এখানে ভালো করে কাজ চালাবার জন্য আপনি কোন টিপ্‌স্ দেবেন কি? আমার তাতে উপকার হবে।’

ও-রেলি বললে, ‘সে কথা যে আমি ভাবি নি তা নয় এবং দেবার মতো টিপ্‌স্ থাকলে আমি অনেক আগেই এ প্রস্তাব পাড়তুম—’

ডীন বললে, ‘সরি, আমি বড্ড বেশি কথা বলি,—না?’

ও-রেলি বললে, ‘নটেটোল। চুপ করে অগ্নের কথা শুনেই অপর পক্ষকে বেশি চেনা যায় তা নয়। অনেক সময় নিজে কথা বলে অগ্নের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয়—তার মাথা নাড়াতে, হাঁ না বলাতে, কোন প্রসঙ্গে সে ইন্টারেস্ট নিচ্ছে, কোনটাতে নিচ্ছে না—তাই দিয়ে মাহুষ চেনা যায় অনেক বেশি। তার উপর সমস্তকণ কথা বললে অল্প পক্ষ কোনো প্রশ্ন শুধাবার সুযোগ পায় না—যে প্রস্তাব তোলার ইচ্ছে নেই, সেটা বেশ এড়িয়ে যাওয়া যায়। মধুগঞ্জ লোক্যাল-বোর্ড চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। অপ্রিয় কথা ওঠবার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি পাখি শিকার, ২০ সালের ভূমিকম্প, আর গিরের কিত্তে না ইঞ্চির কিত্তে ভালো, এ-সব নিয়ে এমন গল্প জোতেন যে, তাঁর ঘর থেকে বেরনোই মুশকিল হয়ে ওঠে।

‘সে কথা ঠিক, আমি মাত্র একটা টিপ্‌ দেব। আপনার আপিসের সোম—তার সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে—বড় খাটি আর বুদ্ধিমান লোক। আপনি তো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে অনেক নতুন পদ্ধতি শিখে এসেছেন, সেগুলোর

কটা এখানে কাজে খাটবে জানি নে, তবে একথা আপনাকে বলতে পারি সোম যেখানে ফেল মারে, সেখানে করার মতো বড় কিছু একটা থাকে না। অন্তত আমি কিছু পারি নি।’

ডীন একটুখানি অবিশ্বাসের স্বরে বললে, ‘দেখে তো কিন্তু বুদ্ধ বলে মনে হয়।’

ও-রেলি হেসে বললে, ‘প্রিন্সাইসলি! ঐ তার একটা মন্ত রেস্ত। কিন্তু এদেশে অল্‌ ছাট্‌ স্টিন্‌ক্‌স ইজ্‌নট্‌ রট্‌ন্‌ ফিশ্—“ঝলঝল করলেই সোনা নয়” হচ্ছে তার উন্টো প্রবাদ। বর্ষাতে একরকম ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মতো, কিন্তু একবার সে ফল ঘে খেয়েছে, তার ঐ ফলের জ্ঞান নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশী। সোম ঐ বর্মী-ফল।’

‘তাহলে গুড-নাইট।’

‘গুড-নাইট।’

॥ ১১ ॥

‘খ্রীষ্টালয় থেকে সন্ধ্যাগত’—‘ফ্রেশ ফ্রম ক্রিস্টিয়ান হোম’-ওলাদের এদেশে এসে বায়নাকার অন্ত থাকে না। এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায়—সুবো-শাম লেগেই আছে। তবু যত বড় উল্লাসিকই হোক না কেন, পুলিশ সায়েবের বাঙলোটো কিছুমাত্র ফেলনা নয়।

ডিনার খেয়ে দুজনাই এসে বসেছিল চণ্ডা বারান্দায়। বস্তুত ঐ বারান্দা-টাই বাড়ির সবচেয়ে আরামের জায়গা। ও-রেলি চলে যাওয়ার পর ডীন বেয়ারাকে দিয়ে সিগারেটের তাজা টিন খুলিয়ে আরাম করে গা এলিয়ে বসল। লগুন ছেড়েছে অবধি জাহাজে ট্রেনে সর্বত্র হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে তার সময় কেটেছে, দু-দণ্ড নিজের মনে নতন নতন অভিজ্ঞতার জমা-খরচ মিলিয়ে নিতে পারে নি—অথচ গুণীরাই জানেন, যারা কথা কয় বিস্তর তারাই নির্জনতা খোঁজে শাস্ত্রজনের চেয়ে বেশী।

পেট্টোমাক্স জ্বলছে। তার আলো বারান্দার বাইরের অন্ধকার কিন্তু ফুটো করতে পারছে না। ওদিকে আবার বর্ষার গুমোট। আকাশ থমথম করছে। গাছগুলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ভাইনে-বায়ে, উপর-নিচে কোনো দিকে যেতে চায় না। এ অবস্থায় মুখের ধোঁয়া দিয়ে থাশা রিং বানানো যায়। মুখ থেকে বেরিয়েই রিংগুলো একটার

পিছনে আরেকটা সারি বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সিগারেট-থেকোরা আর সিগারেটের নেশা করে না—রিঙের নেশায় পিলপিল করে চক্করের পর চক্কর বের করতে থাকে।

ব্যাচেলাররা দেরিতে শুতে যায়, একথা সবাই জানে, আর তামাকখোররা যায় আরো দেরিতে। ‘আরেকটা খেয়েই উঠছি’, ‘আরেকটা খেয়েই উঠব’ করে করে ঘুমে আর সিগারেটে যখন লড়াই বেশ জমে ওঠে তখন অনেক সময় রেফরি লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমের শরণ নেয়, সিগারেটও চটে গিয়ে কার্পেট পোড়ায়।

ভীনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, ভান হাত চেয়ারের হাত থেকে খসে বুলে পড়ছে, ঢিলে আঙুল থেকে সিগারেটটা খসিখসি করছে, এমন সময়—

এমন সময় ভীন দেখে তিনটি প্রাণী—মূর্তি—কী বলি?—বেড-রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল। সে বসে ছিল বারান্দার এক প্রান্তে, বেড-রুম অগ্র প্রান্তে—সিঁড়ি তার-ই গা ঘেঁষে।

ভীনের চোখে কাঁচা ঘুমের ছানি। তার ভিতর দিয়ে সবকিছু যেন আবছা আবছা, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা দিল, কিংবা যেন সিনেমার পর্দাতে ঢিলে ফোকাসের ছবি।

তিনটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার পূর্বেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। ভীন শুধু দেখলে প্রথমটি দৈর্ঘ্যে মাঝারি, দ্বিতীয়টি ছোট এবং তৃতীয়টি বেশ লম্বা—বাস আর কিছু না।

সম্মিলিত ফিরে ভীন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামল। চতুর্দিকে ঘোরঘুটি অন্ধকার, নিচের তলায় ছাতা-ল্যাম্প বেয়ারা অনেকক্ষণ হল নিবিয়ে দিয়েছে, উপরের তলার আলো সেখানে পৌঁছয় না। ভীন সত্ত্ব বিলেত থেকে এসেছে—মফঃস্বলে টর্চের কী প্রয়োজন এখনো জানতে পারে নি। তার টর্চ নেই। ছুটে গেল গেটের কাছে; সেখানে রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখলে, চতুর্দিকে জনমানবশূন্য।

সাপ, চোর, শেয়াল দেখলে আমরা চিংকার করে চাকর-বাকরদের ডাকি, কারণ আপন দেহ রক্ষার জন্য এদের উপর আমরা নির্ভর করেছি যুগ-যুগ ধরে। বিলেতের লোক কাজকর্ম চালাচ্ছেন বিন্ চাকরে বহুকাল ধরে। তাই সম্মিলিত ফিরেও ভীন চোঁচামেচি আরম্ভ করলে না। ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে আবার চেয়ারে বসল।

আকাশ-কুসুম কেউ কখনো দেখে নি—সে স্বপ্ন কল্পনামাত্র; স্বপ্ন আমরা

দেখি, কিন্তু তার পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই; রজ্জু দেখে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন সে সর্প বাস্তব নয় বটে, কিন্তু ভ্রম কেটে যাবার পরও রজ্জুটিকে ধরতে-ছুঁতে পাই। ভীন যা দেখল সেটা এর কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তাহলে কি সে বাস্তব জিনিস প্রত্যক্ষ করল? তাই বা কী করে? বেড-রুম খাকার কথা নয়—ডিনার শেষ হওয়ার পর চাকররা চলে গিয়েছিল, ও-রেলি যাওয়ার পর উপরের তলায় তো সে একেবারে একা বসে ছিল। তবে কি ওরা মেথরের দরজা দিয়ে বাধ-রুম বেড-রুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল? ভীন চেক-আপ করে দেখলে মেথরের দরজা ডবল লক্টে বন্ধ।

তবে কি মত্তপান? অসম্ভব। খেয়েছে মাত্র ছোট্ট দু পেগ—তাও ডিনারের আগে। দু পেগে বঙ্গ-সন্তানেরই চিন্তা-চাঞ্চল্য হয় না—ও দিয়ে তো ইংরেজ কপালে তিলক কাটে।

ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় ভীনের ঘুম ততক্ষণে ক্ষীণ নয়—লীন হয়ে গিয়েছে। বিছানায় ছটফট করার চেয়ে বরঞ্চ চেয়ারে বসে প্রতীক্ষা করাই ভালো, যারা গেছে তারা ফিরে আসে কি না। পুলিশের লোক—প্রথম সম্মিতে ফেরা মাত্রই সে ঘাড়ি দেখে নিয়েছিল। এরা বেরিয়েছিল ১২টা ৩০ এবং ৩৫-এর মাঝামাঝি। যদি তারা নিতাস্তই ফেরে তবে তো ফিরবে ভোরের আলো ফোটবার আগেই। ভীন পিস্তলটা স্লটকেস থেকে বের করে পেগ-টেবিলের উপর রেখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘণ্টা চারেক সিগারেট পোড়ানোর পর লুপ্ত ঘুম ফিরে এল কিন্তু যাদের জ্ঞান এত অপেক্ষা তারা আর এল না।

সকালবেলা বেয়ারা বেড-টী এনে দেখে সায়েব চেয়ারের উপরে বেঘোরে ঘুমে কাতর। শেষ সিগারেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেগ-টেবিলের বানিশ পুড়িয়ে দিয়েছে।

আরো একটু ক্ষতি হল ভীনের। সেদিনই আঙাঘরের বেয়ারামহলে রটে গেল, নূতন সায়েব বোতল-বাসী-পিয়সী। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করল না, যে-বেয়ারা চা এনেছিল সে বোতল খালি পেয়েছিল না ভর্তি।

সকাল হতে না হতেই ভিজিটারদের ঠালা। তাদের সঙ্গে লৌকিকতা করতে করতে ভীন ভাবছে আগের রাত্তির কথা। দিনের আলো প্রথমে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীনের কাছে রাত্তির প্রাহেলিকা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের ঘোরে কিংবা ঘুমের জড়তায় কী দেখতে কী দেখেছে তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি

করলে—ইন্তেক পিস্তল বের করলে! কী আশ্চর্য! এদেশে একটানা বিশ বছর কাটানোর পর অসহ্য গরম আর সুদীর্ঘ বর্ষার ঠাণ্ডায় ইংরেজদের মাথায় ছিট জন্মায়—দেশে ফিরে গিয়ে তার ধকল কাটায় পুড়িয়ে থানা আরম্ভ করে আর সুপ দিয়ে শেষ করে। তাদেরই একজন, ভীনের এক মামাকে নিয়ে সে কতই না ঠাট্টা-মশকরা করেছে, আর বেচারী মামা কিছু না বলতে পেয়ে শুধু হম-হম করেছে। আর তার নিজের সেই অবস্থা এই প্রথম রাত্রেই। পিস্তল ওঁচায় স্বপ্নের পেট ফুটো করতে? তার হল কী?

এমন সময় সোম এসে খবর দিলে, কাল রাত্রে তের-সতীতে জলে ডাকাতির খবর এসেছে। বোধ হয় গোটা তিনেক খুনও হয়েছে। সে অকুস্থানে যাচ্ছে।

ইংরেজের বাচ্চা নিজেকে এতক্ষণে সংযত করতে শিখেছে। কোনো চাকল্য না দেখিয়ে শুধালে রাত কটায় কাণ্ডটা ঘটেছে?

‘কী জানি, ঠিক বলা যাচ্ছে না, ছপুর কিংবা শেষ রাতে।’

সোম চলে গেল।

‘টু হেল’—অর্থাৎ চুলোয় যাগগে বলে ভীন মধুগঞ্জের ম্যাপ মেলে গেজেটিরর খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু ‘চুলোয় যাগগে’ বললেই যদি সব আপদ চুলোয় যেত তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই হামেহাল নরককুণ্ডের মতো জালিয়ে রাখতে হত। সন্ধ্যা হতে না হতেই দিনের-বেলায়-হেসে-উড়িয়ে-দেওয়া আপদ ভীনের মনের ভিতর ‘কিন্তু কিন্তু’ করে ইতি-উতি করতে লাগল। ভিনারে বসে মনে হল কাল রাত্রে ঘটনা স্বপ্ন নয়, মায়ী নয়, মতিভ্রমও নয়—ইংরিজিতে ভাবতে গেলে ইলুশন, ডিলুশন, হালুসিনেশন কিছুই নয়। প্রেসটিভিজিটেশনও নয়—কারণ ঐ রাত সাড়ে চব্বিশটার সময় তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাতে যাবে কোন্‌ ভাঁড়?

বাগানের আম-জাম-লিচুর অঙ্ককার ক্রমেই যেন বারান্দার দিকে গুড়িগুড়ি এগিয়ে আসছে। প্রতিপদ আকাশের মেঘময় অঙ্ককারও নেবে আসছে নিচের দিকে, দুই অঙ্ককারের ভিতর কী যেন গোপন যোগ-সাজস রয়েছে। সেই নিরেট জমে-ওঠা অঙ্ককারের ভিতর দিয়ে গাছপালার মধ্যে হৃদয়—অতি হৃদয়—হিঙ্গ করে কাজলধারার উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকার ক্ষীণ প্রদীপের আলোক মাঝে মাঝে এসে পৌঁছেছে বাঙলোর দিকে। কিন্তু সে আলোক চোখে পড়ে ঐ দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে। সে আলো তখন যেন চোথকে আরো কানা করে দেয়—চতুর্দিকের অঙ্ককার যে কতখানি পুঞ্জীভূত নীরঞ্জ তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

অঙ্ককারে মাহুশ যেমন নিজেকে সাহস দেবার জ্ঞান শিস দেয়, পেট্রোমাক্সটাও ঠিক তেমনি যুহু একটানা শাঁ—শব্দ করে যাচ্ছে আর ভয়ে মরছে হঠাৎ কখন অজ্ঞানতে অঙ্ককার তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাতির চাবিতে দম দিয়ে তার দম বন্ধ করে দেবে।

ডীন চাকর-বাকরকে বিদায় দিয়ে পিস্তল কোলে নিয়ে বসেছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। টিপয়ের উপর রিস্টওয়াচ।

রাত ঘনিয়ে এল। আগের রাতে ভোরের দিকে চোখের দু পাতা জুড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জ্ঞান, দিন কেটেছে নানা কাজের ঠেলায়, এখন বারে বারে ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু আজ তো সর্বশ্রুত কলম্যান মার্টার্ডের মতো তীক্ষ্ণ সজাগ রাখতে হবে। সে আজ আর্দো মদ খায় নি, জাস্ট টু বি অন ১০০% সেক সাইড।

ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। ডীন ভাবলে, এবারে আরো সজাগ হতে হবে। রুমালটা ভিজিয়ে এনে চোখে বোলাবার জ্ঞান এদিক ওদিক জল খুঁজছে এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই ত্রিমূর্তি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডীন মন স্থির করে রেখেছিল দেখামাত্র পিস্তল হাতে ছুটে গিয়ে ওদের ঠাঁকাবে কিন্তু কাজের বেলায় এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল—ছুটে গিয়ে যখন নিচের বারান্দায় নামল তখন ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে দেখে তখনো বারোটা—অর্থাৎ সকালে দম দেওয়া হয় নি।

এবারে ডীন ছুটোছুটি করলে না। ‘মাই গড’ বলে চাপরাসীর টুলে বসে পড়ল—ভীষণ বিপাকে না পড়লে ইংরেজ ‘মাই গড’ বলে না। অনেকক্ষণ পর সে বেড-রুমে ঢুকল। ক্লান্তিতে নিজ-জাগরণে মেশা আহুতির ভিতর দিয়ে কাটল।

সকালবেলা সোম এল। তিনটে নয়, দুটো খুন।

সেদিকে খেয়াল না করে ডীন শুধালেন, ‘সোম, এ বাড়ি ভুতুড়ে?’

সোম বললে, ‘জানি নে স্যর।’

‘তুমি ভুত মান?’

‘নো, স্যর।’

‘তাহলে এ বাড়ি কিংবা যে কোনো বাড়ি ভুতুড়ে হয় কী করে?’

‘জানি নে স্যর।’

ডীন বলতে যাচ্ছিল, ‘তুমি একটা গবেট, আর তোমার প্যারা বস একটা আস্ত গাড়ল—না হলে তোমাকে শার্লক হোমসের মতো ঠাণ্ডালাে কেন?’ ঠিকই

তো, বোকাকে বুদ্ধিমান মনে করা, এ যেন গাধা দেখে বলা এটা ঘোড়া। যে এ কথা বলে সে শুধু গাধা চেনে তা নয়, ঘোড়াও চেনে না।

তারপর ডীন আরও পাকাপাকি ভাবে আটঘাট বেঁধে ত্রিমূর্তির জন্ত ত্রিরাত্রি অপেক্ষা করল, কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হল।

সপ্তাহের শেষে আই. জি-কে রিপোর্ট লেখার সময় ডীন এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে লিখব-কি-লিখব-না করে করে কী করে যে লিখে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না। ভাবলে ওটা কেটে ফেলি—সে বিলক্ষণ জানত, ইংরেজ এ সব কেছা নিয়ে নির্মম হাসাহাসি করে—কিন্তু তাহলে আবার নতুন করে রিপোর্ট লিখতে হয়, আর লেখালেখির ব্যাপারে পলিস বাবাজীরা হামেশাই একটুখানি কাহিল।

যাগ কে বলে শেষটায় পয়লা পাঠাই পাঠিয়ে দিলে।

তিন দিন বাদে উত্তর এল। তার শেষ ছত্র, ‘ড্রিক্‌ লেস স্পিরিট’।

ডীন খাল্লা হয়ে বললে, ‘ড্যাম দি স্পিরিট!’

। ১২ ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয় করে ইংরেজ সর্গর্বে তার ইতিহাস রচনা করেছে। যুদ্ধে হেরে জার্মান তার সলজ্জ ইতিহাস লিখেছে। দুটোর কোনোটা থেকেই প্রকৃত সত্য জানবার উপায় নেই। তাই মনে হয়, ইংরেজের ইতিহাসটা যদি জার্মান লিখত এবং জার্মানেরটা ইংরেজ, তাহলেও হয়তো খানিকটে সত্যের কাছে যাবার উপায় থাকত। কিংবা যদি ভারতবাসী লিখত—কারণ সে যে এ বাবদে অনেকখানি নিরপেক্ষ সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাই চা-বাগানের আশেপাশের, বিশেষ করে মধুগঞ্জের লোক বিলক্ষণ জানে ইংরেজ তার শৌর্যবীর্য নিয়ে যতই লক্ষবাক্ষ করুক না কেন, চা-বাগিচার সায়েবদের ভিতর লেগে গিয়েছিল ধুকুমার। তার ইতিহাস লেখা হয় নি, কোনো কালে হবেও না।

হাতিম-তাই না সিন্দবাদ কোন্‌ এক দেশে গিয়েছিলেন যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বড়ো হয়ে কিংবা অস্থ-বিস্থ করে মরে না। প্রতি সন্ধ্যায় সবাই এক জায়গায় ব্লান মুখে বসে কিসের যেন অপেক্ষা করে, আর হঠাৎ এক গম্ভীর ডাক শুনে ওদের একজন লাফ দিয়ে উঠে দূর দিগন্তে পালিয়ে যায়, কেউ তার পিছু নেয় না, সে-ও আর কোনো দিন ফিরে আসে না।

চা-বাগিচার বড় মেজো ছোট বেবাক সায়েব রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে বসে প্রতীক্ষা করেন, লড়াইয়ে যাবার জ্ঞা বিলেত থেকে কোন দিন কার ডাক পড়ে। এবং কাজের বেলা দেখা গেল হাতিম-তাই-এর গল্পের লোকগুলোর মত এঁরা পত্রপাঠ বিলেতের দিকে ছুট দেন না—এঁদের অনেকেই আছেন ডাক এড়াবার তালে। সিভিল সার্জেন ইংরেজ, তার উপর কট্টর সাম্রাজ্যবাদী, সার্টিফিকেট পাওয়া অসম্ভব, কাজেই এদের উর্বর মস্তিষ্ক তখন লেগে যায় নূতন নূতন ফন্দিফিকিরের অগ্ন্যবসানে। এক ভীতু তো সাহস করে বাঁ হাতের কজ্জীতে গুলি মেরে সেটাকে জখম করে লড়াই এড়ালে। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া নিজেদের ভিতর লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

তঁারই মাঝখানে কে যেন খবর এনে দিল ও-রেলি লড়াইয়ে যাবার জ্ঞা নিজের থেকে প্রস্তাব পেড়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার রংরুটের অগ্রবিধা হবে বলে তাকে যেতে দিল না, কারণ সে ইতিমধ্যেই জনপকাশেক বাঙালী ছোকরাকে ফিকুট করেছে এবং তার ভিতর গোটাপাঁচেক টেরোরিস্টও আছে।

ও-রেলি সম্বন্ধে আর সব কথা ক্লাব এক মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে এক বাক্যে বলে, শাবাশ।

পুলিসের ক্লাবে আই. জি. এসেছিলেন মধুগঞ্জে টুরে। ক্লাবে বসে ও-রেলির উচ্ছ্বাসিত প্রশস্তি শুনে নিজের ডিপার্টমেন্টের প্রতি গর্ব অম্লভব করলেন। তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে না বলতেই ক্লাবের নয়া-বুনা সব মদস্ত দফে দফে তার গুণকীর্তন করলেন, এবং বিষ্ণুছড়ার ছোট মেমই বিগলিতাশ্র হলেন সব চেয়ে বেশী।

ক্লাব ভাঙল অনেক রাতে, পরদিন কাইজারের খড়ের মূর্তি পোড়াবার স্বেচ্ছা করল। বেয়ারারা তাই নিয়ে নিজেদের ভিতর হাসাহাসি করলে। সায়েবদের বড়কাটাই যে কী বেহদ বেশরম ফঙ্গাবেনে সে-কথা তারা লড়াই লাগাবার কয়েক মাস পরেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার তাদের যে সব ভাই-বোনেরা সাত জন্মে কখনো লড়াই দেখে নি তারা যেতে আরম্ভ করল ইরাকে। তাই নিয়ে পূর্ব বাঙলায় গান পর্যন্ত রচনা হয়ে গেল। সেপাই ফিরে এসেছে মেসপট থেকে দেশে; বউ জিজ্ঞেস করছে,

মিয়া, গেছলায় যে বসরায়,

দেখছনি দালান ?

ছোট ছোট সেপাইগুলি লাল কুঁড়ি গায়

হাটু পানি ল্যামা তারা

পিস্তল মারাং যায়—

মিয়া গেছলার যে বসরায়, মিয়া গে— (সম)!

এ গীতে তবু বরঞ্চ গ্রাম্য মেয়ের সরলতা আর কল্পনাশক্তির খানিকটা বিকাশ পেয়েছে, কিন্তু সায়েবদের ছেলেমানুষি কত চরমে পৌঁছে গিয়েছে তার প্রমাণ বেয়ারাগুলো পেল যেদিন মধুগঞ্জের পাগলা টেঁচিয়ে গান ধরলে,

মরি, রাই, রাই, রাই,

জর্মনিরে ধরে এনে,

হার্মনি বাজাই!

এ গানের না আছে মাথা না আছে কাঁথা—পাগলা জগাইয়ের ‘গানে’ কখনো থাকতও না—অথচ সায়েবরা গান শুনে ভাবলেন জগাই জর্মনির কান খুব করে মলে দিচ্ছে। পাগলকে ডেকে এনে ক্লাবে তার ‘নৃত্যসম্মিলিত’ গান শোনা হল, প্রচুর বকশিশ দেওয়া হল, এবং তাকে একটা মেডেল দেওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা হল।

‘বাঙাল’ গাছে ফলে না, ‘বাঙালে’র চাষ পূব-বাঙলার একচেটে নয়, তাই সায়েবদের ‘বাঙালপনা’ দেখে বাঙাল বেয়ারাগুলো হাসলে জোর একপেট আর পাগলা জগাইকে খেতাব দিলে ‘জঙ্গীলাট’।

রাত্রে আই. জি’র নিয়ন্ত্রণ ছিল ডীনের বাংলায়।

সূপ শেষ হতে না হতেই ডি. এম-এর বাংলা থেকে জরুরী খবর এল ‘স্বদেশী’দের আড্ডায় বোমা ফেটে দুজন মারা গিয়েছে—ডীন যেন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ডীন তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে থানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে।

আই. জি. বাঙাল ভাষা বেশ শিখে গিয়েছিলেন। একা একা থানা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাটলারদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এককালে বড়লোকদের যদি শখ হত ছোটলোকদের সঙ্গে গল্প করার তবে তাঁরা ডেকে পাঠাতেন চন্দ্রবৈষ্ণবকে—মুখ-চন্দ্রটিকে বিচক্ষণ বৈষ্ণব মতো খাফস্বরত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত হুজুরকে দুনিয়ার নানা খবর নানা গুজব শুনিয়ে গুণিবাহাল করে তুলত। বিলেতে এখনো ও কর্মটি করে বাটলার এবং খানদানী সায়েবদের ঝাঁরাই দেশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই এ-দেশে সেই রেওয়াজটি চালু রেখেছেন।

সায়ের মতের গতি ধরতে পেরে খয়রুল্লা আলোচনা আরম্ভ করলে জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে—সায়ের সায় দিলেন; তারপর ভরসা দিলে

লড়াই শিগগিরই থতম হয়ে যাবে—সায়ের শুধু ‘হু’ বললেন—থয়রুলা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, দিশী লোক বসরা থেকে বেশ ছু পয়সা বাড়িতে পাঠাচ্ছে—সায়ের আনন্দ-প্রকাশ করলেন।

খানার শেষ পদ ছিল পনিরে রান্না আস্ত আগা। বহুকাল ধরে বিলেত থেকে পনির আসছে না বলে বড় সায়ের তাই নিয়ে প্রশংসা ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। থয়রুলা দেমাক করে জানালে এ পনির বিলেতি নয়, এ জিনিস তৈরি হয় মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামে। বিদেশী পনির যখন এ-দেশে পাওয়া যেত সেই আমলেই ও-রেলি সায়েরের মেম দিশী পনিরের সন্ধান পেয়ে তাই দিয়ে এই নতুন সেভারি আবিষ্কার করেন। থয়রুলার মতে তাঁর মতো পাকা রাধুনি এ দেশে কখনো আসে নি। সে তখন জয়স্বর্ঘের মেট—তার কাছ থেকে সে এ জিনিসটে বানাতে শিখেছে।

বড় সায়ের জানতেন মিসেস ও-রেলি বিলেতে। তবু কথার পিঠে কথা বলার জন্তু আপন মনেই যেন শুধালেন, ‘তা মেম সায়ের তো এখন বিলেতে?’

থয়রুলা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, ‘বোধ হয় তাই। তবে সঠিক কেউ বলতে পারে না। মীরপুর বাগিচার বেয়ারা বলছিল তিনি মসুরি না সিমলে কোথায় যেন।’

এবারে সায়ের একটুখানি আশ্চর্য হলেন। বললেন, ‘সে কী হে? এই সামান্য খবরটাও সঠিক জান না?’

থয়রুলার দিলে চোট লাগল। পুলিশ সায়েরের বেয়ারা হিসেবে জাত-ভাইদের ভিতর তার খুশ-নাম ছিল যে, সে ছুনিয়ার সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তাকে কি না সায়ের পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন সে একটা আস্ত উজ্জবুক, ছুনিয়ার কোনো খবর রাখে না। তার চেয়ে যদি তিনি তাকে খবর দিতেন যে সে এদিকে, জানে না, ওদিকে কিন্তু তার বিবি বিধবা হয়ে গিয়েছেন, তা হলেও তার কলিজা এতখানি ঘায়েল হত না। তাই ইজ্জত বাঁচাবার জন্তু বললে, ‘সঠিক খবর তো দিতে পারেন শুধু ও-রেলি সায়েরই। তা তিনি তো কারো সঙ্গে কখনো কথা বলেন না, তাঁকে শুধাতে যাবে কে?’

বড় সায়ের খানদানী ঘরের ছেলে। সায়ের-মেমদের নিয়ে চাকর-নফরের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে চান না; আলোচনাটা ওদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বললেন, ‘ঠিক বলেছ।’

থয়রুলাও পেটে আঙ্কেল ধরে। সায়ের যদি বা কথার মোড় ফেরালেন সে তাঁর সামনে খাড়া করে দিলে একখানা নিরেট পাঁচিল।

বললে, সে বহু মেহমত করে ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ উত্তম কফি যোগাড় করে এনেছে, পারকুলেটরে সেটা চড়িয়ে রেখেছে, সায়েব যদি একটু মজি করেন ?

ডিনার শেষ হলে পর খয়রুল্লা বললে, সে সায়েবকে সার্কিট হাউসে পৌঁছিয়ে দেবার জন্তু নিচের তলায় অপেক্ষা করবে। কফি-লিকার-সিগার তিনটিই উত্তম শ্রেণীর ছিল বলে সায়েব তদুত্তেই ডেরা ভাঙবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। জানালেন, তিনি একাই সার্কিট হাউস যেতে পারবেন।

রাত একটার সময় ডীন ফিরে এল। বড় সায়েবকে নিতান্ত একা-একা ডিনার খেতে হল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলে।

বড় সায়েব মোজাহুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস ও-রেলি এখন কোথায় তুমি জান ?'

ডীন হেসে বললে, 'কেন ? আপনিও কিছু শুনেছেন নাকি ?'

'না, তো। আমি শুনেছি, তিনি বিলেত না মসুরিতে সে-কথা কেউ জানে না। আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকল।'

ডীন বললে, 'ঠেকারই কথা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। এর পিছনে আবার একটুখানি কেলঙ্কারি কেছা রয়েছে। মেবল্ এখান থেকে সরে পড়াতে কেছাটা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।'

তারপর ডীন ক্লাবে যা-কিছু শুনেছিল সে কথা তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে বললে, 'পাছে আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাই মাদামপুরের সায়েব—এ অঞ্চলে তিনিই মুক্কাবী—আমাকে এখানে আসার দিনই সমস্ত কথা খুলে বলে ইঙ্গিত করেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমিও তাঁকে বলেছি, ব্রাদার অফিসারের ক্যামিলি অ্যাফেয়ারে আমি কনসার্নড্ নই।'

বড় সায়েব বললেন, 'ঠিক বলেছ !'

আরো পাঁচ রকমের কথা হল—বিশেষ করে লড়াই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। দুজনেই ইয়র্কশায়ের লোক, কাজেই দুজনারই পরিচিত অনেক লোকের প্রমোশন, জখম, বাহাহুরি, মৃত্যু নিয়ে অনেক সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা হল।

রাত প্রায় একটার সময় বড় সায়েব শেষ ফ্রেম দ্ব মাং খেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বললেন, 'কই হে, তোমার ত্রিমূর্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না ?'

ডীন যেন শুনতে পায় নি এমনভাবে বললে, 'আপনি বাগদাদের কাজীর

গল্প জানেন ?

বেম্বা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হল তার হৃদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, ‘না তো।’

ডীন বললে, ‘মুর্গী খেতে খেতে কাজী বাবুর্চীকে শুধালেন, মুর্গীর আরেকটা ঠ্যাং কোথায় ? বাবুর্চী বললে, মুর্গীটার ছিল মাত্র একটা ঠ্যাং। কাজী বললেন, একঠ্যাঙী মুর্গী কেউ কখনো দেখে নি। বাবুর্চী বললে, বিস্তর হয়, সে দেখিয়ে দেবে। তারপর শীতকালে একদিন আড়িনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতর গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল—বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিলে একঠ্যাঙী মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাততালি। মুর্গী দূসরা ঠ্যাং বের করে ছুটে পালাল। কাজী বললেন, ঐ তো দূসরা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে, সেদিনও খাওয়ার সময় তিনি হাততালি দিলে দূসরা ঠ্যাং বেরোত।’

বড় সায়েব বললেন, ‘উত্তম গল্প কিন্তু—’

ডীন বললে, ‘এতে আবার কিন্তু কী ? আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কম হইকি খেতে—ত্রিমূর্তি হইকির চোখে দেখেছিলুম কি না ! আপনি যদি আচ্ছা করে আজ হইকি খেতেন, তবে তার-ই ‘হাততালিতে’ ত্রিমূর্তি বেরিয়ে আসতো।’

অথচ সায়েব খেয়েছিল পাঁচটা ‘ত্রা’—বড়া।

মনে মনে ভাবলেন, ‘ছোকরা তুখোড়।’ বাইরে হেসে বললেন, ‘আচ্ছা, আসছে বারে না হয়, ম্যাকবেথের তিন ডাইনীর স্মরণে তিন বোতল খেয়ে ত্রিমূর্তিকে ইনভোক করা যাবে।’

ডীন বললে—‘খাইস ওথ—তিন সত্যি।’

॥ ১৩ ॥

লড়াইয়ের জন্ত টাকা তোলার মতলবে ইংরেজ নানা ফন্দি-ফিকির চালালে—তারই একটা ‘আওয়ার ডে’, পূর্ব বাঙলার এই প্রথম ক্ল্যাগ ডে। নেটিভরা বিক্রপ করে ‘আওয়ার ডে’-কে নাম দিলে ‘আওর দে’ অর্থাৎ ‘আরো দে’। ওদিকে ভারতবাসীদের কাছ থেকে এ দুঃসংবাদ আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না যে, ইংরেজ ক্রমাগতই লড়াই হারছে। চতুর্দিকের অভাব অনটনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের গৌরবও কমে যাওয়াতে পূর্ব বাঙলায় আরম্ভ হল বাজার লুট। ইংরেজ ভয় পেয়ে গেল যে, একবার যদি এ অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেটা ঠেকানো

সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেখা গেল, ও-রেলির এলাকায় কোনো বাজার লুট হয় নি। আই. জি. গেলেন ঐ এলাকা পরিদর্শন করতে আর ও-রেলির কাছ থেকে সলা-পরামর্শ নিতে।

ও-রেলির বাড়লোয় বসে আলাপচারি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে সে সায়েবকে ‘পটলোক’ খেয়ে যেতে বললে।

খেতে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ আরম্ভ হল। বড় সায়েবের পরিবারও বিলেতে, তাই নিয়ে তাঁর হুশিস্তার অবধি নেই, তবে সাস্ত্যনা এই যে, তাঁর স্ত্রী লড়াইয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন আর বড় মেয়ে তো নার্স হয়ে ফ্রান্সে গিয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায়েব বললেন, ‘লড়াইয়ে যে শুধু মানুষ জখম হয় আর মরে সেইটেই তো শেষ কথা নয়, কত পরিবার যে লগুভগু হয়ে যায় তার কি কোনো স্টাটিস্টিকস্ কেউ নেয়? তোমার বউ-বাচ্চা কী রকম আছে?’

‘ভালোই।’

‘চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছ তো?’

‘হঁ।’ তারপর বলল, ‘ও-সব কথা বাদ দিন। আমি আমার মনকে আদপেই বিলেতমুখে হতে দিই নে। যতটা পারি কাজকর্মে ডুব মেরে থাকি।’

বড় সায়েব বললেন, ‘সরি! কিছু মনে কোরো না, ও-রেলি। আমি পরের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা সচরাচর জিজ্ঞেস করি নে; নিজের হুশিস্তারই আমার অবসান নেই।’

ও-রেলি চুপ করে রইলো।

মাস দুই পর সায়েব ভীনকে চিঠি লিখলেন,

‘প্রিয় ভীন,

আমি বড় সমস্যায় পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। প্রায় দু’মাস হল আমি রাধাপুর মফঃস্বল যাই। সেখানকার অবস্থা খুব সন্তোষজনক সে খবর তুমি জান—তার জন্ত ও-রেলিকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়, সে কথাও তোমার অজানা নয়। দেশে যে সে শান্তিরক্ষা করতে পেরেছে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আমি মুগ্ধ হয়েছি অগ্নি কারণে।

ভারতবর্ষে একদিন আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না, এ জিনিসটা আমার কল্পনার বাইরে নয়, কিন্তু আমরা জার্মানির কাছে পরাজিত হব এবং ফলে আমরা জার্মান জনদের তাঁবুতে আসতে পারি, এ জিনিসটার কল্পনাও

আমি করতে পারি নে। এ-লড়াই জেতার জন্য ভারতে শান্তি গোঁথ—মুখ্য, ভারতকে এই যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ানো। ও-রেলি এ-কাজটি তার এলাকায় অবিশ্বাস্তরূপে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। তার কার্যপন্থা ও সরলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তাই আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন পরিবারের কথা উঠেছিল। আমার প্রশ্নের সামান্যতম উত্তর না দিয়ে সে আমার দিকে যে ভাবে তাকালে তাতে আমার মনে হল, এই বিষয় নিয়ে তার মনের কোণে এক গভীর বেদনা লুকনো আছে। আমার মনে হল, তার সম্বন্ধে আমরা যে-সব গুজব শুনেছি, সেগুলোর কিছুটা তার কানে পৌঁছেছে এবং গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব জেনে চুপ করে সব অপবাদ সয়ে নিয়েছে।

হয়তো এটা বিচক্ষণের কর্ম। কিন্তু আমার মনে হল, এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ থাকা দরকার। যে মাহুয তার সম্বন্ধে জঘন্য অপবাদ সহ করেও আপন দেশের জন্য অগ্নানমুখে অবিশ্রাম খেটে যাচ্ছে—এবং খাটছে কাদের জন্য? যারা তার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছে তাদেরই জন্য—তার মনের জালা লাঘব করার জন্য যদি আমরা আমাদের কড়ে আঙুলটিও না তুলি, তবে আমরা যে হুন খেয়েছি তার উপযুক্ত নই। আর যদি আমাদের প্রেক্ষণের কথা তুলি তবে বলব, ‘তুমি আমি পুলিশ; অসংকে সাজা’ দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সজ্জনকে অন্তায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা আমাদের ততোধিক কর্তব্য,—ভারতীয় পুলিশ এ কথা ভুলে গিয়েছে।

আমি তাই স্থির করলুম, ও-রেলিকে না জানিয়ে তার জীব অহুসন্ধান করে সত্য খবর মধুগঞ্জের ইয়োরোপীয় সমাজকে গোচর করাব। এবং তারপরও কারো বিষ-জিত যদি লকলকানি আরম্ভ করে, তবে রাঙ্কেলটাকে মধুগঞ্জের ক্লাবহাউসের সিঁড়িতে চাবকে দেব।

মেবল্ এবং তার বাচ্চা কোন মাসে বিলেত গিয়েছিল সে খবর বের করে আমি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, কলম্বো এমন কি চাটগাঁর বন্দরের সব প্যাসেঞ্জার লিস্ট তন্ন তন্ন অহুসন্ধান করেও তাদের নাম পেলুম না।

ও-রেলিকে মন্সুরিতে নাকি মেবল্দের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল—সব কটা ইউরোপীয় হোটেলের অহুসন্ধান করেও ওদের নাম পাওয়া গেল না, অথচ ও-রেলির নাম সাতয় হোটেলের রেজিস্ট্রিতে রয়েছে।

ভারতবর্ষের হিল-স্টেশনে কোনো ইউরোপীয় রমণীর পক্ষে নাম ভাঁড়িয়ে

বেশী দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব, ছদ্মনামে ছদ্ম পাসপোর্ট নিয়ে বিলেতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সব দিক যখন ব্ল্যাক্ বেরল তখন আমি মেবল্দের বাটলারটার অনুসন্ধান করলুম সিংহলে তার গ্রামে। খবর এল সাত বৎসর ধরে সে গ্রামে ফেরে নি।

তাই আমি বড় সমস্যায় পড়েছি।

তুমি কি মধুগঞ্জে অত্যন্ত সাবধানে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কোন পথে এগোতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু হদিস দিতে পার ?

মনে রেখো, আমি এ যাবৎ সব অনুসন্ধান করেছি অতিশয় গোপনে, এবং বেশির ভাগ নিজে নিজেই—পাছে ও-রেলি খবর পেয়ে মর্মান্বিত হয় যে, আমিও মধুগঞ্জের বক্সওয়ালাদের* মতো কুচুটে। তুমিও সাবধানে কাজ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ও-রেলিকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করা। সে-কর্মে সফলতা নাও পেতে পারি, কিন্তু তাকে আরো দুঃখ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত হবে।

শুভেচ্ছাসহ

ডাড্‌নি।'

ঠিক সাতদিন পর বড় সায়েব ভীনের কাছ থেকে একখানি ছোট চিঠি পেলেন।

'যতদূর সম্ভব শীঘ্র এখানে আহন; সব আলোচনা ম্থোমুখি হওয়ার প্রয়োজন।'

বড় সায়েব খবর দিয়ে মধুগঞ্জে পৌঁছলেন। মোটরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী?' ভীন উত্তর না দিয়ে শুধু ডাইভারের দিকে আঙুল দেখালে।

রাত্রে ভিনারের পর চাকরদের বিদায় দিয়ে ভীন বড় সায়েবকে তার স্টোর-রুমের তালা খুলে ভেতরে নিয়ে গেল।

সায়ের দেখলেন, টুকরো টুকরো হাড়ে জোড়া তিনটি কঙ্কাল। একটা বড়ো, একটা মাঝারি, আরেকটা ছোট্ট শিশুর।

তালা বন্ধ করে দুজনে ফিরে এলেন। বড় সায়েব একটা নির্জলা বড় হইক্সি খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেলো?'

* টী-চেস্ট বা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে বলে চা-বাগিচার সায়েরদের অবজ্ঞার্থে অল্প ইংরেজ নাম দিয়েছে 'বক্সওয়াল'। হিন্দী 'ওয়াল' প্রত্যয় ব্যবহার করার অর্থ যে তারা 'হাফ-নেটিভ'।

‘বাগানে লিচুগাছের তলা খুঁড়ে।’

‘কী করে সন্দেহ হল?’

ডীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, ‘আপনার চিঠি থেকে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, মেবল্‌দের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি অবিশ্বাস্ত জিনিসে বিশ্বাস করে আপন অহুসন্ধান আরম্ভ করলুম—বরঞ্চ বলতে পারেন শেফ করলুম।’

‘এ বাঙালোয় প্রথম দু রাত্রে আমি যে ত্রিমূর্তি দেখেছিলুম, সেগুলো আমার মন থেকে কখনো মুছে যায় নি। যে গাছতলায় ছায়ামূর্তিগুলো হঠাৎ মিলিয়ে যায়, সে গাছটাকেও আমি স্পষ্ট মনে রেখেছিলুম। আপনার সব তল্লাসীই স্বখন নিষ্ফল হল, তখন আমি যে কাজ করলুম সেটা শুনলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমার গুরুরা হাসবেন। কিন্তু যে জিনিস আমি স্পষ্ট দেখেছি, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে জিনিস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছে—আপনার কাছে—যতই অবিশ্বাস্ত হোক না কেন, আমার কাছে তা-ই বিশ্বাস্ত, সে-ই আমার থেই।’

‘জায়গাটা খোঁড়ার আরেকটা কারণ : যদি কিছু না পাই, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারব।’

বড় সায়েব দু হাতে মাথা চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ডীন সায়েবকে আরেকটা পেগ দিলেন।

সায়েব শুধালেন, ‘তোমার কী মনে হয়?’

ডীন কোনো উত্তর দিলে না, প্রশ্নটা যেন সে শুনতেই পায় নি।

এবারে সায়েব মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘এ কাজ যদি ও-রেলির হয়, তবে বলব, যথেষ্ট ত্রায়সঙ্গত কারণ না থাকলে তার দ্বারা এটা কখনো সম্ভবপর হত না।’

ডীনও উঠে দাঁড়াল। বললে, ‘খোঁড়াখুঁড়ি করার আমার তৃতীয় কারণ সেইখানেই। আপনার শেষ সিদ্ধান্ত যদি ও-রেলির সপক্ষে যায়, তবে এই কঙ্কালগুলো নিয়ে আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করতে পারবেন। এটা তো আপনার কেস।’

বড় সায়েব বললেন, ‘মাই কেস! ও গড।’

বড় সায়েব পরদিন রাধাপুর গিয়ে সোজা উঠলেন ও-রেলির বাঙালোয়। কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, ‘ও-রেলি, মধুগঞ্জে তোমার বাঙালোর বাগান খুঁড়ে তিনটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে

কি ? কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—তুমিও জান—’
সায়ের বাক্য শেষ করলেন ।

ও-রেলি তখন একটু শুকনো হেসে বললে, ‘আমাকে কিছু সাবধান করতে হবে না । এই নিন ।’ বলে সে কোটের ভিতর বুকের পকেট থেকে একতড়া কাগজ বের করে সায়েরের হাতে দিলে ।

॥ ১৪ ॥

প্রিয় সোম,

এ চিঠিটা তোমাকে লিখছি ; এ চিঠিটা বিশ্বসংসারের যে কোনো লোককে লেখা যেত । তবু তোমাকেই কেন লিখছি তার কারণ তুমি আমাকে হৃদয় আর মন দিয়ে যে রকম বুঝতে চেষ্টা করেছ এ রকমটা আর কেউ কখনো করে নি—না এদেশে না আমার আপন দেশে—এক মেবল্ ছাড়া । ‘হৃদয় আর মন’ দিয়ে বলবার সময় আমি ইচ্ছে করেই ‘হৃদয়’ আগে ব্যবহার করেছি ; তার কারণ আমি আইরিশম্যান, আমি ইংরেজ নই । আমি আমার পাঁচটা জাতভাইয়ের মতো হৃদয় দিয়ে ভাবি, আর মন দিয়ে অনুভব করি । ইংরেজ তার মনকে হৃদয়ের আগে স্থান দেয়—এবং বহু ইংরেজের আদর্শেই হৃদয় আছে কি না তাই নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে । কিন্তু থাক, এ-সব সস্তা পাইকারি হিসেবে কোনো জাত কিংবা দেশ সম্বন্ধে রায় প্রকাশ । শুধু শেষ একটা কথা বলি, বাঙালীর সঙ্গে এ বাবদে আইরিশম্যানের অনেকখানি মিল আছে । জানি নে, তোমার কাছে খবর পৌঁছেছে কি না, আলিপুরের মামলায় যারা হাজতে ছিল তাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে এক আইরিশ ডাক্তারকে এদেশের ইংরেজ কর্তাদের কাছে হুমকি খেতে হয়েছে । এই আইরিশ ডাক্তারের সঙ্গে আমার এবং তোমার হৃদয়ের মিল রয়েছে । দেশে আমার জাতভাইরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই স্বাধীনতার জন্য । তাদের জন্য আমার হৃদয়ে যথেষ্ট দরদ । ওদিকে ইংরেজ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সেটাকেও অস্বীকার করতে পারি নে । তোমার বেলাও তাই, অরবিন্দ-কোম্পানির প্রতি তোমার সহানুভূতি ; ওদিকে যে ইংরেজ রাজতন্ত্র এ দেশে প্রচলিত তার সদৃশগুণলো তোমার চোখ এড়ায় না । আইরিশ ডাক্তার, তোমার এবং আমার, আমাদের সকলের ভিতর একই স্বপ্ন ।

সাধারণ লোক এ ক্ষেত্রে বলে, ‘তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলেই পার !’

এর সত্ত্বর যখন আমি আপন মনে খুঁজছি তখন তোমার মুকুতা—যাকে

প্রথম দর্শনে মনে হয়, আস্ত একটা গড-ড্যাম ফুল—কালীশ্বর চক্রবর্তীকে এক পুরস্কার-সভার বক্তৃতাতে অল্প কথাশ্রসঙ্গে বলতে শুনলুম, ‘সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব সংসারে তো চিরকালই লেগে থাকবে ; তাই কি আমরা সবাই সংসার ত্যাগ করে বনবাসে চলে যাই ? আর যদি যাই-ও, তাতেই বা কী ? সেখানে কি দ্বন্দ্ব নেই ?’

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়লুম ! কিন্তু তোমার স্মরণ আছে, সোম, আমি যখন প্রথম এদেশে আসি তখন কী রকম মারাত্মক বাচাল ছিলাম । তুমিই নাকি মীরপুরকে একদিন বলেছিলে, ‘সায়েব কথা কয় যেন ম্যাক্সিম্ গানের মতো—কট্ কট্ কট্ কট্ ট্-ট্-ট্!’ ঠিকই বলেছিলে । এবং আমিও মস্তবাটা শুনে সেটাকে সবিশেষ প্রতিপন্ন করার জন্ত আরো শ তিনেক রৌণ্ড তন্দগুই ছেড়েছিলাম ।

সে বাচালতা একদিন আমার লোপ পায় । আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে । দীর্ঘ সাত বছরের জমানো কথা আজ তোমাকে বলতে যাচ্ছি । যে কলম-ধরাকে আমি ভূতের মতো ডরাভূম, আজ আমাকে সেই কলম ধরেছে । আমার একমাত্র দুঃখ এ-চিঠি হয়তো কোনোদিন তোমার হাতে পৌঁছবে না । এটা হয়তো জবানবন্দী রূপে আদালতে পেশ করা হবে । যে অল্প তোমাকে সাদরে আপন হাতে খাওয়াতে চেয়েছিলাম, সেটা পৌঁছবে তোমার কাছে, পাঁচশো জনের এঁটো হয়ে ।

হ্যাঁ, আমার-ই কর্ম, আমিই করেছি । এর জন্ত আর কেউ দায়ী নয় । আমি একাই দায়ী আমি জানি, একমাত্র তুমিই জানতে পেরেছিলে যে, আমি দায়ী । তুমি আমাকে ধরিয়ে দাও নি কেন তারও আন্দাজ আমি খানিকটা করতে পেরেছি । বিশ্বের আদালতে আমাকে খাড়া না করে তুমি আমাকে তোমার নিজের আদালতে খাড়া করে হয়তো যথেষ্ট প্রমাণ পাও নি, হয়তো তোমার প্রত্যয় হয়েছিল যে, এ অবস্থায় পড়লে তুমিও ঠিক এই রকম ধরাই করতে, হয়তো ভেবেছিলে আমি তোমার ওপরওলা,—ওপরওলার অপরাধের বিচার করবেন তাঁর ওপরওলা, গুরুর বিচার করবেন ভগবান, চেলার তাতে কিসের জিষেদারি ! এ নিয়ে আমার কোনো কোঁতুহল নেই । জঙ্গ যখন আসামীকে খালাস দেয় তখন জঙ্গ কেন তাকে ছেড়ে দিলে তাই নিয়ে মাথা ঘামায় কোন্ আসামী ?

তুমি যে আমাকে হৃদয় দিয়ে খানিকটে বুঝতে পেরেছিলে সে বিষয়ে আমার স্নানে কোনো সন্দেহ নেই, তুমি যেন অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধনের কাছে

পৌছে গিয়েছিলে, এইবারে আমি তোমাকে হাত ধরে বাকি পথটুকু নিয়ে যাব। কিন্তু যদি গুপ্তধনের কলসী তখন ফাঁকা বেরোয়, কিংবা যদি তার থেকে বেরোয় কেউটে...? তখন তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না। আর তুমি যদি তখন তোমার রায় বদলাও তবে আমিও তোমাকে দোষ দেব না।

তাহলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি।

একদিন কথায় কথায় আমি তোমাকে আমার বাপ-মা সম্বন্ধে কী যেন সামান্য কিছু একটা বলি। তুমি স্বেচ্ছা পেয়ে এমন একটা প্রশ্ন শুধালে যার থেকে আমি আবছা-আবছা বুঝতে পারলুম, তুমি জানতে চাও আমি আমার রক্তে এমন কোনো দ্রব্য নিয়ে জন্মেছি কি না যার তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি অপরাধের পন্থা বরণ করলুম, এখানে এলে রাখি, সে স্থলে তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলে আমিও ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতুম। কারণ অপরাধী নিয়ে আমাদের কারবার। হয় তাদের গায়ে বদ-খুন,—না হয় তারা বড় হয়েছে বদ আবহাওয়ার ভিতরে। আজ আমার আর স্পষ্ট মনে নেই তবে এটুকু এখনো স্মরণে আছে যে, তুমি কিন্তু প্রশ্নটি করেছিলে এমনি স্বেচ্ছুরতাবে যে, আমি কোনো অফেন্স নিই নি।

তাই বলে রাখি, আমি আমার বাবার যেটুকু দেখেছি তার থেকে এমন কিছুই মনে পড়ছে না যা দিয়ে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি ছিলেন খাঁটি আইরিশম্যান, অর্থাৎ দু মূঠো অল্প আর তিন পান্তর মদের পয়সা হয়ে গেলেই কাজে ক্ষান্ত দিয়ে সোজা চলে যেতেন পাড়ার মদের দোকানে—তারপর তাঁকে আর এক মিনিটের তরে কাজ করানো যেত না। তুমি আয়ারল্যান্ডের মদের দোকান কখনো দেখ নি, তাই তুলনা দিয়ে বলছি সে হল কাশীখর চক্রবর্তীর বৈঠকখানার মতো। সেখানে কুঁড়েমি আর গালগল্প ছাড়া অণু কোনো জিনিস হয় না—মদ সেখানে আত্মবিস্মৃত মাত্র। মেয়েদের সামনে এ সব জিনিস ভালো করে জমে না বলে মেয়েরা ‘পাবে’ যায় না, চক্রবর্তীর বৈঠক-খানায়ও তাদের প্রবেশ নিষেধ।

আমার বাবা ছিলেন গল্প বলায় ওস্তাদ, তাই তিনি ছিলেন ‘পাবের’ প্রাণ—চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় শুনেছি সেই ব্যবস্থা।

তার কোনো প্রকারের চরিত্র-দোষ ছিল না, তাঁকে কোনো প্রকারের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে আমি কখনো দেখি নি। অথচ তিনি আমাকে জীবনে একটিমাত্র উপদেশ লক্ষ্যধিকবার দিয়েছেন, সেটি—‘ডেভিড, যা খুশি তাই করবি, কারো পরোয়া করিস নি।’ কেন তিনি এ উপদেশ দিতেন জানি নে, এর ভিতর

কোনো দ্বন্দ্ব আছে কি না সে তুমি ভেবে দেখো। মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, তিনি যুঁহু আপত্তি জানাতেন। বাবা তখন অন্য কথা পাড়তেন, কিন্তু যেদিনই ঝড় দুর্ধোগে 'পাবে' যেতে পারতেন না, সেদিনই আমাকে মজাদার কেচ্ছা-কাহিনী শোনাতেন এবং তার সবগুলোতেই ইঙ্গিত থাকত,—'যা খুশি তাই করো', এমন কি 'যাচ্ছেতাই করো'।

এ উপদেশ কিন্তু আমার মনের উপর কোনো দাগ কাটতে পারে নি—অন্তত তাই আমার বিশ্বাস।

এ ধরনের পরিবার আয়ারল্যান্ডে বিস্তর—এর মধ্যে কোনো বিদগ্ধুটে নূতনত্ব নেই। এর থেকে আমি কোনো হৃদিস পাই নি—দেখো, তুমি পাও কি না।

তবে কি বাইরের দূষিত আবহাওয়া? এমন কোনো পৈশাচিক ঘটনা যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি, এবং সেই স্তম্ভনের সময় আমার অজানতে সে ঘটনা আমার হৃদয়মনে ঢুকে গিয়ে দুই জীবগুর মতো বছরের পর বছর ধরে আমার সর্ব অচেতন সত্তা বিধিয়ে দিয়ে দিয়ে শেষটায় হঠাৎ একদিন আমার মগজে ঢুকে আমায় বিবেকবুদ্ধিহীন উন্মাদ করে দিল? কিংবা কোনো মারাত্মক প্রবঞ্চনা, —যে-দেবীকে হৃদয়ের পদ্মাসনে বসিয়ে দিনযামিনী পূজা করেছে, হঠাৎ দোঁথ সে মায়াবিনী, পিশাচিনী—আমার বৃকের উপরে বসে আমারই হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে রক্ত শোষণ করছে? কিংবা প্রেমের দেউলের মমতাপ্রতিমা গোপনে গোপনে বারাক্কনার আচরণ করছে—হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল, আমার বিশ্বসংসার অন্ধকার হয়ে গেল?

না। আমার চোখের সামনে ঘটে নি। শুনেছি। তা সে তুমিও শুনেছ, সবাই শুনে থাকে, বইয়ে পড়ে থাকে।

তবু কি উলটোটা? অবিশ্বাস আত্মবিসর্জন, বহুযুগের বিরহ-দহনের পর মধুময় পুনর্মিলন, সমরে লুপ্ত পুত্রের গৃহ-প্রত্যাগমনে মাতার বিগলিত আনন্দাশ্রু সিকন?

না। তাও দেখি নি। সেখানেও ইউ উইল ড্র ব্লাক!

তবে হ্যাঁ, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা, মেব্লুকে দেখা, তাকে পেয়েও না-পাওয়া।

। ১৫ ।

আমার বাবা মা দুজনেই এক মাসের ভিতর মারা যান। আমি বৃত্তি পেয়ে লগুনে পড়াশুনো করতে এলুম।

আমার মনে হয় বড় শহরে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন। অকস্মাৎ সামাজিক সেখানে কিছু একটা ঘটে না। তার কারণ বড় শহরের জীবনশ্রোত বয় অতিশয় তীব্র গতিতে। তুমি তার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছ খরবেগে। সে বেগে চলার সময় ডাইনে বাঁয়ে মোড় নেওয়া অসম্ভব। আর ছোট শহর, কিংবা গ্রামে জীবনগতি শান্ত, মন্দ। সে যেন গ্রাসের নদী। তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় সামান্য খড়-কুটোটি নানা চক্রে বহু প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যায়। দেখে মনে হয় তার জীবনে স্বাধীনতা অনেক বেশী।

মানুষের জীবনের উপর লগুনের চাপ জগদল, তার দাবি বহুল—কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি মানুষ যে কী বন্ধ পাগলের মতো ছুটোছুটি ছুটোপুটি করে সেই তুমি মধুগঞ্জের লোক বুঝবে কী করে? এবং যতদূর দেখতে পাচ্ছি, থ্যাক্ গড্, মধুগঞ্জকে কখনও বুঝতে হবে না।

কিন্তু জানো সোম, সেই খরশ্রোতে ভেসে ভেসে হঠাৎ আমি একদিন শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলুম। দেখি সম্মুখে ঘন নীল সমুদ্র আর তার উপর ফিরোজা আকাশের ঢাকনা। বিলেতের সমুদ্র আর আকাশ সচরাচর নীল রঙের বাহার ধরতে জানে না—কুয়াশা, বৃষ্টি আর বরফ তাকে করে রাখে ঘোলাটে, তামাটে, পাণ্ডটে। আমার সঙ্গে সমুদ্রের চারি চক্রে মিলন হল নিদাঘ মধ্যাহ্নে—নীলাম্বুজ আর নীলাকাশ সেদিন বর্ষণশেষে আতপ্ত কিশোর রোদ্রে দেহখানি প্রসারিত করে দিয়েছিল।

সে সমুদ্র মেবল্।

তোমাকে বোকানো অসম্ভব, সোম, কারণ এ জিনিস বোকার জিনিস নয়। তোমার বহু সদগুণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু প্রেম কী বস্তু তা তুমি জান না। কতবার দেখেছি ছোঁড়া-ছুঁড়ি পালিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেছে, তুমি সর্বদাই সমাজের হয়ে তাদের উপর কড়া শাসন করেছ, পুলিশের কুলিশ-পাণি দিয়ে। তারা কিসের নেশায় পাগল হয়ে সমাজের সব বেড়া ভাঙল, সব দড়াদড়ি ছিঁড়ল তুমি কখনো বুঝতে পার নি। আমি দু-একবার ইঙ্গিত করে দেখেছি তুমি অন্ধ, বরঞ্চ নৈতিক, সামাজিক ধর্ম রক্ষা করা যার সর্ব প্রধান কর্তব্য সেই পাত্রী বুড়ো-

বুড়ীর হৃদয়ে অনেক বেশি দরদ, তাদের চিন্ত বহুগুণে প্রসারিত।

মেবল্ সেই গ্রীষ্মের ছপুরে হাইড পার্কের গাছতলার বেঞ্চিতে বসে অলস নয়নে সার্পেন্টাইনের জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল।

তুমি তাকে দেখেছ, বহুবার বহু পরিবেশে দেখেছ, অবশ্য আমার চোখ দিয়ে দেখ নি, কিন্তু তুমি জান সে সুন্দরী। অসাধারণ সুন্দরী।

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শনের অনেক কিছু আমি এদেশে এসে শুনেছি, পড়েছি; কিন্তু তার অল্প জিনিসই আমি বিশ্বাস করতে শিখেছি। তার একটা জন্মান্তরবাদ। না হলে কী করে বিশ্বাস করি সেই সামাজিক কড়াকড়ির যুগে বিনা মাধ্যমে কী করে আমাদের আলাপ হল, প্রথম দর্শনেই কী করে দুজনার হৃদয়ে একে অন্নের জন্তু ভালোবাসা জন্মাল? এ যুদ্ধ বিলেতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, অজানা মানুষের সঙ্গে বিলেতে আলাপ-পরিচয় করা এখন আর কঠিন নয়, তার ধাক্কা সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের আগাধরেও এসে পৌঁছেছে, সে খবর তুমি জান, কিন্তু সে যুগে দু-দণ্ডের ভিতর এতখানি হৃদয়তা পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া অল্প কোনো স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে বোঝানো যায় না।

মেবল্ আমার কাছে সমুদ্রের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

মধুগঞ্জ আমাদের লগুনকে হার মানায়। এই বক্সওয়ালারা কেন যে ভ্যানর-ভ্যানর করে মধুগঞ্জের নিন্দে করে আমি ঠিক মুঝতে পারি নে, বোধহয় করাটা ফ্যাশান, কিংবা হয়তো ভাবে, না করলে খানদানী সায়েবরা ভাববে ওরা বুঝি নেটিভ, কালা আদমী বনে গিয়েছে।

লগুন থেকে মধুগঞ্জ! এর চেয়ে দূরতর পরিবর্তন আমি কল্পনা করতে পারি নে।

সেই মধুগঞ্জে আমি অনেক কিছু পেলুম। ভগবান অক্লপণভাবে ঢেলে দিলেন তাঁর সব দৌলত, তাঁর তাবৎ ঐশ্বর্য। নৌকো বাচ থেকে আরম্ভ করে পাদ্রী-টিলার মেয়েগুলি।

ভালোই। এদের কথা উঠল। তুমি জান আমি ওদের সঙ্গে ঢলাঢলি করার মতলব নিয়ে পাদ্রী-টিলায় যাই নি, কিন্তু এক জায়গায় আমার অজানতে আমি একটা ভুল করে ফেলি। প্রাচ্য দেশের মেয়েরা যে এত স্পর্শকাতর হয় আমি অনুমান করতে পারি নি তাই আমি তাদের সামান্যতম গতাহুগতিক হৃদয়তা জানাতেই হঠাৎ দেখি, ওরা দিচ্ছে তরুণীর অকুণ্ঠ প্রেম। আমার আপসোসের অস্ত নেই যে, সে ভালোবাসার গায্য সম্মান আমি দেখাতে পারি নি। আশা করি ওরা জানতে পেরেছে যে, আমি ওদের ফিরিঙ্গি বলে অবহেলা করি নি।

আমি জানতুম, তুমি এই বিশ্বাসটি ওদের ভিতর জন্মাতে পারবে তোমার পাকা মুন্সিয়ানা দিয়ে, তাই তোমারই হাতে এটি সঁপে দিয়েছিলুম।

তারপর আমি বিলেতে গেলুম মেব্লকে নিয়ে আসতে।

এই পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সর্বত্রই প্রতি মুহূর্তে নরনারীর ভিতর প্রেম মুকুলিত হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে, তার ফল কখনো মধুময় কখনো তিক্ত—এই হল জীবনের দৈনন্দিন, গতানুগতিক ধারা। কিন্তু যদি প্রেমের মেলা দেখতে চাও, প্রেম যেখানে অস্ত্র সব-কিছু ছাপিয়ে উপচে পড়ছে, তবে একটি-বারের জন্য কোনো এক জাহাজে করে সপ্তাহ তিনেকের জন্য কোথাও চলে যেয়ো। দেখবে কী উন্মাদ অবদ্বন্দ মেলার ফুঁটি সেখানে চলে—ইচ্ছে করেই 'মেলা' বলছি কারণ এ জিনিস দৈনন্দিন নয়। জাহাজের অধিকাংশ নরনারী সেখানে সমাজের সর্বপ্রকার কড়া বন্ধন থেকে মুক্ত, প্রতিবেশীকে ডরিয়ে চলতে হয় না পাছে সে কেলেঙ্কারি কেছ। সর্বত্র রটিয়ে দেয়—জাহাজ মোকামে পৌঁছেলেই তো সবাই ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, কে কাকে জানাতে খাবে, কে কী করেছে? এবং সবচেয়ে বড় কথা, এ তিন হপ্তা মানুষ জীবন-সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সর্বপ্রকারের দায়িত্ব থেকে পূর্ণ মুক্ত। আহা! নিদ্রা আশ্রয়—এ তিন সমস্তার সমাধান হওয়া মাত্রই, তা সে বত সাময়িকিই হোক না কেন,—তিন সপ্তাহ কি কম সময়?—মানুষের জাগে আসক্তলিপ্সা, ঘোঁনক্ষুধা! সে যেমন-বিরাট তেমনি বিকট—স্থলবিশেষে। তাই এ রকম জাহাজে মানুষ এডনিস না হয়েও পায় কার্তিকের কদর, মোনা-লিসা না হয়েও তিনাসের পূজা।

বৃথা বিনয় করবো না। আমি জানি আমি কুরূপ কুচ্ছিত নই। তাই আমার কাছে তখন বহু হৃদয় অব্যবহৃত, বহু যুবতী আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করেছিল। আর দু-চারটি ভীকু লাজুক তরুণী নির্জনে পেলে ফিক করে একটুখানি হেসে কিশোরী-মূলভ নাতিশ্রুত নিতম্বে সচেতন চেউ তুলে দিয়ে জাহাজের নির্জনতর কোণের দিকে রওয়ানা দিত।

কিন্তু আমি তো চলেছি আমার বধুর সন্ধানে। আমার ফিয়ালে, যে আমার ব্রাইড হতে যাচ্ছে, আমার বধু, যে আমার বধু হতে চলেছে। প্রপোজারের প্রতি আঘাত আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই কাছে, এই লক্ষ লক্ষ টাকার জাহাজ, হাজার হাজার টাকার বেতনভোগী কর্মচারীরা এরা সবাই অহোমাজ খাটছে আমাকেই, শুধু আমাকেই, আমার দাবীর কাছে নিয়ে দাবার জন্তে। ঝড়-

ঝঞ্ঝায় এ জাহাজ ডুবতে পারে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পেলেও এ জাহাজ পৌঁছবে মার্সেলেস বন্দরে, যেখানে জাহাজ থেকে দেখতে পাব, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন মেবল যে পোশাক পরে হাইড পার্কে বসে ছিল, সেই পোশাক পরে বন্দরের পারে দাঁড়িয়ে তার মন্ত রঙের রুমাল দোলাচ্ছে।

‘ভগবান কোথায়?’—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে। কুরুসাধনাসক্ত দীর্ঘতপস্শ্রাবত চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, ‘তরুণ-তরুণীর চুশনের মাঝখানে থাকেন ভগবান।’ আমার হৃদয় আর আমার মেবলের রুমাল-নাড়ার মাঝখানে থাকবেন স্বয়ং ভগবান।

থাক, সোম। আগেই বলেছি তোমাকে এ-সব বলা বুঝা। তবু বলছি, কেন জান। হয়তো বুঝতে পারবে, হয়তো হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে। অবিশ্বাস তো কিছুই নয়, অসম্ভবই বা কোথায়?

। ১৬ ।

তুমি যে-সব ইংরেজদের চিনেছ তাদের ভিতর সত্যকার শিক্ষিত লোক কম। এবং যে দু-একটি লোক সাহিত্য বা অস্ত্র কোনো রসের সন্ধান কোনোকালে-বা হয়তো রাখত, তারাও আণ্ডাঘরের আবহাওয়ায় পড়ে এবং রসকব্ধহীন সরকারী-বেসরকারী কাজ করে করে স্থূল এবং অহুভূতিহীন হয়ে পড়ে। শেলি, কোটল পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার জন্ত বছরদিন বহু বৎসর ধরে মনে মনে হৃদয়ের অন্তস্তলে এক বিশেষ ‘ধর্মসাধনা’ করতে হয়। অল্প ইংরেজই সেটা করে থাকে, এবং করলেও সে আর পাঁচজনকে সে সম্বন্ধে কোনো খবর দেয় না। তাই ইচ্ছে করেই ‘ধর্মসাধনা’ সমাসটা ব্যবহার করলুম, কারণ তোমরা ঐ জিনিসকে করে থাক গোপনে গোপনে। আমার মনে হয় দুটো একই জিনিস, ধর্মসাধনা এবং কাব্যসাধনার শেষ রস নেই।

করাসীরা তোমাদের মতো। শক্ত সোমথ জোয়ান যদি গালগল্লের মাঝখানে হঠাৎ কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করে তবে আর পাঁচটা ফরাসী হকচকিয়ে ওঠে না, কিংবা বিষম খায় না। ক্রান্তে তাই কাব্যজীবন এবং ব্যবহারিক জীবনের ভিতর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাদের প্রেম যে রকম অনেকখানি খোলাখুলি, সে প্রেমকে তারা তেমনি কবিতা আবৃত্তি করে গান গেয়ে আর পাঁচজনের সামনে রূপ দিতে, প্রকাশ করতে লজ্জিত হয় না। তাই ইংরেজ হনিমুন কর্ত্তে যায় ক্রান্তে—জীবনের অন্তত ঐ কটা দিনের জন্ত সে খোলাখুলি প্রেম

করতে চায়। তার জীবনের এ কটা দিন তোমাদের হোলির যতো। মাতব্বর কাশীধর চক্রবর্তীকেও সেদিন আমি বং যেথে সং সেজে ঢং করতে দেখেছি। মুকুম্বী রায় বাহাদুর যদি প্যারিসে হনিমুন করতে যেতেন (ভাবতেই কি রকম হাসি পায়—প্যারিসের রাস্তায় চোগা-চাপকান-পর্যায় রায়বাহাদুরের সঙ্গে নোলক-পর্যায় চেলিতে জড়ানো আট বছরের বউ!) তবে তিনি অতি অবশ্য রাস্তার পাশের গাছতলায় দাঁড়িয়ে গলায় ঝুলানো হারমনিয়ামের প্যাঁ প্যাঁর সঙ্গে ভাটিয়ালি ধরতেন, খনে কনে-বউয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে খেমটা কিংবা পলকা নাচ জুড়তেন। ফ্রান্স দেশের বোতলেই শ্যাম্পেন নয়, তার আকাশে বাতাসে শ্যাম্পেন ছড়ানো।

মার্সেলেস থেকে দশ মাইল দূরে ছোট্ট শহর আকুন-আ-প্রভাসে আমরা বিয়ে করব বলে স্থির করলুম। বিয়ের ব্যবস্থা করতে করতে যে তিনদিন লাগল সে সময়টা আমরা মার্সেলেসের সেরা হোটেলে কাটালুম আলাদা কামরায়—তখনো বিয়ে হয় নি, এক ঘর করি কী করে? ফরাসীরা তাই দেখে কত না চোখ টিপে মুচকি হাসি হাসলে। একেই বলে ইংরেজের ‘লেকাফা-দুফুস্তমি’, ব্রিটিশ প্রভাবি, তোমাদের ভাষায় এদিকে ঘোমটা, ওদিকে খেমটা!

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তার ঘরে যে যেতে পারতাম না তা নয়। এমন কি হোটেলওয়ালার বুদ্ধি করে আমাদের যে দুখানা ঘর দিয়েছিল তার মাঝখানে একটা দরজাও ছিল। সে দরজাটি ওয়ালপেপারের সঙ্গে এমন নিখুঁত কারিগরিতে মেশানো যে, আমাদের কারো নজরেই পড়ে নি। যে লিফ্ট-বয় আমাদের স্টকেস ঘরে নিয়ে এসেছিল তার বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রেমের মন্দিরে আমরা একদম গাঁইয়া ভক্ত, আর ফরাসীরা সেখানে আমাদের তুলনায় বিদগ্ধ নাগরিক-পাণ্ডা। অর্থাৎ ফরাসী লিফ্ট-বয় পর্যন্ত বিলেতের ডন জুয়ানকে প্রেমের মুশায়েরায় দু-চারখানি মোলায়েম বয়েত শুনিতে পারে। একবাক্যে ইংরেজি না বলে ছোকরা অভিযায় সংস্কৃত কায়দায় শুধু মুদ্রা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে দরজাটা কোন্ জায়গায় এবং সেইটেই যেন আসল কথা নয়, যেন আসল কথা—ওটাকে দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায়। মেব্লের মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গিয়েছিল।

যে দরজা বন্ধ করা যায়, সেটা খোলাও যায়। বাঙলা কথা।

জানি নে, মেব্ল তার দিকটে খোলা রেখেছিল কি না।

তোমাদের রাধাকেই দেখা হত কুঞ্জবনে, সেখানে দরজা-দেউড়ির বায়নাঙ্ক নেই। আমাদের দেশে দরজা নিয়ে বিস্তর কবিত্ব করা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তোমাকে সে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডিত্রম।

আমি কিন্তু বাই নি অস্ত্র কারণে। যাকে দুদিন বাধে সব দিক দিয়ে আমি পাবই পাব, যে খনির সব মণি একদিন আমারই হবে, যে সমুদ্রের সব মুক্তা আমারই—একমাত্র আমারই গলায় একদিন ছলবে, সে খনিতে আমি ঢুকতে যাব কেন চোরের মতো, সে সমুদ্রে আমি কেন হতে যাব বোম্বটে? মেবল্কে আমি বরণ করতে যাব বিশ্বসংসারের প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, যৌন সম্পর্কে যদিও আমার দেশ তোমাদের তুলনায় অনেকখানি ঢিলে তবুও জিনিসটে আমার কাছে কখনো সরল বলে মনে হয় নি। আমার মনে কেমন জানি একটা ভয় কী যেন একটা সন্দেহ সব সময়েই জেগে থাকত। আশ্চর্য, নয় কি? যে সরল রহস্তের ফলে বিশ্বসংসারে প্রতি মুহূর্তে নবজীবন লাভ করছে পশুপক্ষী, ফুলে রেণুতে যার সহজ প্রকাশ, তার প্রতি ভয়, তার প্রতি সন্দেহ। এ ভয়, এ সন্দেহ আমার এখনো যায় নি। তুমি হয়তো এ চিঠি শেষ করার পর তার কারণ আমার চেয়েও ভালো করে বুঝতে পারবে।

১৫ই আগস্ট

আমি ভেবেছিলুম, এ চিঠি আমি একদিনেই শেষ করতে পারব; এখন দেখছি, ভুল করেছি। এত কথা যে আমার বকের ভিতর জমা হয়ে আছে সে-কথা আমি জানতুম না। আমার অজানতে যে আমি এতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং তারও এতখানি এখনো আমার স্মরণে রয়েছে সে-তথ্যই বা জানাব কী করে?

ওদিকে তুমি হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে সব-কিছু এক ঝটকায় জেনে নেবার জন্য। কিন্তু সোম, জীবন তো আর রহস্ত-উপন্যাস নয় যে, কোতুল দমন না করতে পারলে শেষ ক-খানা পাতা পড়েই সব-কিছু জেনে নেওয়া যায়। জীবন বরণ গানের মতো। তার গতি বিচিত্র, তার বিস্তার বহু। আমার সে গান তোমাদের ভাটিয়ালীর মত মধুর হয় নি এবং সরলও হয় নি—তা না হলে আজ আমার এ অবস্থা কেন—এ গানে অনেক কমস্বর, অনেক বেশ্বর। সে গানের রেকর্ড তুমি এক মিনিটে বাজাতে গেলে আরো বেশ্বর ঠেকবে, আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

অ্যাক্স-আ-প্রভাঁসের একটি ছোট্ট গির্জায় যেদিন আমাদের বিয়ে হয়, সেদিন বিধাতা ছিলেন আমাদের উপর অপ্রসন্ন। পুরোত যখন ভগবানের নামে একে অস্ত্রকে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য স্বরূপে সচেতন করে দিচ্ছেন, তখন বাইরে ভগবান ছাড়ছিলেন তাঁর হকার—বৃষ্টি ঝড় আর বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে। অ্যাক্স

সেদিন যেন প্রথম আবাড়ে মধুগন্ধ যে রক্ত রূপ নেয় তাই নিয়েছিল। আমি যখন মেবলকে বিয়ের আঙটি পরাচ্ছিলুম ঠিক সেই মুহূর্তে বিহ্বল চমকে উঠে গির্জের সমস্ত রঙীন শারিঙ্গুলোতে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মেবল তখন শিউরে উঠেছিল। আমি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে তাকে আশস্ত করেছিলুম। পুরোত যখন গভীর কণ্ঠে গির্জাতে সেই গতানুগতিক প্রশ্ন শুধালেন, এই যুবক-যুবতীর মিলনে কারো কোনো আপত্তি আছে কি না, তখন কড়কড় করে বাজ পড়েছিল—আরেকটু হলে গির্জের গাঙ্গীর্ঘ ভুলে গিয়ে মেবল আমাকে জড়িয়ে ধরত। মেবল বড় ধর্মভীরু, আকাশে বাতাসে, ঘাসে ঘাসে সে ভগবানের অদৃশ্য অঙ্গুলি দেখতে পায়। আমি তার হাতে আরো একটু চাপ দিয়ে তাকে আশস্ত করেছিলুম।

সেদিন কিন্তু এ-সব দুর্ভাগ্য আমার মনে কোনো দাগ কাটে নি। সেদিনের সে দুর্ভাগ্যে আমি ভগবানের করাজুলিসক্কেত দেখি নি, আজও দেখছি নে কিন্তু কেন জানি নে আজ যেন সমস্ত জিনিসটা এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে ধরা পড়েছে। দিনের আলোতে যে মাঠে ফুল জুড়িয়েছি, যে ঝরনায় পা ডুবিয়ে বসে ক্লান্তি জুড়িয়েছি, সন্ধ্যার অন্ধকারে সেখানে যেন প্রতিগর্তে কেউটির ফণা দেখতে পাচ্ছি। কী জানি, সব যেন ঘুলিয়ে গিয়েছে। কতবার ভেবেছি এ-সব কথা। কখনো এ-সব এলোমেলো চিন্তা পাট করে তাঁজে ফেলে গুছিয়ে তুলতে পারি নি।

সে রাত্রে আবেগে, উত্তেজনায় মেবল আমার বৃকে তার মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার চেউ-খেলানো শরীরে যেন আরেক ধরনের চেউয়ের পর চেউ জেগে উঠেছিল। আমার হাত 'হল তার কোমরের উপর। আমি আমার হাত দিয়ে তার বিকোত শাস্ত করার চেষ্টা করেছিলুম। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, এ দুই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় হয় বেশি, রসগ্রহণ করা যায় কম। স্পর্শের মাধ্যমে পাওয়া যায় রস—অল্পভূতি জ্ঞান যেটুকু সঞ্চয় হয় তা নগণ্য। স্পর্শের নিবিড়তা রসলোকে গভীরতম। সে মানুষকে একে অন্নের যত কাছে টেনে আনতে পারে অল্প কোনো ইন্দ্রিয় তা পারে না। চোখ দিয়ে যখন প্রিয়াকে দেখি কান দিয়ে যখন শুনি তার প্রেম নিবেদন, তখন সর্বচৈতন্য ভরে ওঠে এক বিপুল মাধুরীতে কিন্তু চূষনের ভিতর যখন তার স্পর্শলাভ করি তখন পাই গভীরতম একান্তবোধ। বরঞ্চ চূষনেরও সীমা আছে, সেখানেও ক্লান্তি আছে; কিন্তু গায়ে হাত বুলানোর কোনো সীমাবন্ধন নেই। তাই মায়ের গভীরতম ভালোবাসার প্রকাশ পুত্রের

গাঙ্গপর্শে। আরেকটু সাদামাঠা ভাষায় বলি, তোমাদেরই ভাষায়, মিঠে কথায় চিঁড়ে ভেজে না—তাতে দিতে হয় জল আর গুড়ের স্পর্শস্থ।

একটু চেষ্টা করলে হয়তো স্মরণ করতে পারবে ঠিক ঐ সময় মধুগঞ্জ অঞ্চলে হঠাৎ অদেখী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কর্তারা বিচলিত হয়ে আমাদের তার করেন, তদুপেই ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে ফিরে আসতে। সে তার লগুন, প্যারিস বহু জায়গায় বিস্তর গুস্তা খেয়ে শেষটায় এসে পৌঁছয় অ্যাক্স-ঈ-প্রভীসে আমাদের বিয়ের পরদিন ভোরবেলায়। তৎক্ষণাৎ ছুটি দিতে হল মার্সেলের বন্দরের দিকে।

মার্সেলের বন্দরে জাহাজ ধরা আমাদের মধুগঞ্জের বাজার-ঘাটে নৌকো ধরার মতো। সেখানে দুনিয়ায় জাত-বেজাতের জাহাজ—এমন কি গ্রীক, মিশরী, তুর্কী পর্যন্ত—খেয়া নৌকার মতো বসে থাকে এবং সেখানে দ্বিবি দরদস্তুর করা যায়, কত দামে তোমাকে ভূমধ্যসাগরের খেয়া পার করে পোর্ট সেন্টে নিয়ে যাবে—মধুগঞ্জের ঘাটে যেরকম দর-কষাকষি করি। মার্সেলেসে ভারতগামী বড় জাহাজ না পেলে পোর্ট সেন্টে গিয়ে সেখান থেকে অনায়াসে অল্প জাহাজ ধরা যায়—ঐ খাড়ি দিয়েই তো সব জাহাজকে বোঝাই, কলস ঘেতে হয়।

আমাদের কপাল ভালো না মন্দ বলতে পারব না; কোনো ভালো ব্যবস্থাই করতে পারলুম না। শেষটায় একটা মাল-জাহাজ জুটে গেল, সেটাই দেখলুম হিন্দুস্থান পৌঁছবে সন্তালের আগে, কারণ ছাড়বে ঘণ্টা তিনেক পরেই। তবে অসুবিধে এই যে, আমাদের নিজেদের জন্য কোনো কেবিন আর তাতে খালি নেই। আমাদের চুকতে হবে একটা পুরুষদের কেবিনে, আর মেব্লকে একটা মেয়েদের। একেবারে ভারতীয় ব্যবস্থা। মর্দানা জানান।

মেব্ল্ খুঁত-খুঁত করেছিল।

আমি হেসে বলেছিলুম, যে দেশে যাচ্ছ সেখানে ঠিক এই ব্যবস্থা। বিলেতে স্মোকিং, নন-স্মোকিং। ওদেশে লেডিজ এবং জেন্টলমেন।

আমার মনে হয়েছিল, ভালোই হল, তাড়াতাড়ির কী?

ছোট জাহাজের এক কোণে, নিভৃত, গুটিনো দড়াদড়ির মাঝখানে আমরা দুজনায় পাশাপাশি বসতুম। সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়া মেব্লের চুল নিয়ে হলস্থল বাধাত, কখনো খানিকটে নোনা জলের স্পর্শ কণা তার গালে চুমো খেয়ে যেত, কখনো বা সমুদ্রের ঢাঁদের জোয়ালো আলো এসে তার মুখ অজুত নীপ্তিতে উজ্জল

করে তুলত। রাত একটা, দুটো, তিনটে বেজে যেত। একে অস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গস্থ বর্জন করে কেউই আপন কেবিনে যেতে রাজী হতুম না। কী হবে কেবিনে গিয়ে। সেখানে তো শুধু ঘুমের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ছাড়া অস্ত্র কোনো অহুভূতি নেই। এখানে সমুদ্র-আকাশ, আলো-অন্ধকার, চন্দ্র-তারারাদের কত অফুরন্ত সৌন্দর্য রাত্রির পর রাত্রি উছলে ঢেলে দিচ্ছে। কেউ দেখবার নেই। এই বিরাট সমুদ্রের ক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে আছে ক-খানা জাহাজ? এবং সেই কটি জাহাজে স্রুষ্টিতে নিমগ্ন না হয়ে এ সৌন্দর্য পান করছে কটি নরনারী? আমিও এ সৌন্দর্য এরকম ভাবে, তার পরিপূর্ণরূপে, ক্রমবর্ধমান গতিতে আগে কখনো দেখি নি। এর পূর্বে যে একবার এসেছি গিয়েছি তখন বেশির ভাগ সময় কেটেছে লাউঞ্জে তাস খেলে, 'বারে' হুইষ্টি খেয়ে, কিংবা কেবিনে নাক ডাকিয়ে। 'বার' থেকে শেষ গেলাস খেয়ে কেবিনে যাবার সময় ডেকে দাঁড়িয়ে হয়তো দু-পাঁচ মিনিটের জন্য টুরিস্টদের মতো 'ও হাউ গ্র্যাণ্ড' বলেছি। পাকা ইংরেজ পাঁচজনের সামনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকক্ষণ ধরে দেখবার সাহস ধরে না—পাছে লোকে ভাবে লোকটা হয়তো কবি। 'ওয়াট? জাট চ্যাপি রাইটস্ পোয়েমস্? গশ্! ওয়া (ট) ফ (র)! মাই গিনেস্ (গুডেনস্)!' তার উপর আমি—অব অল পার্সনস্—পুলিসের লোক!

আমরা জাহাজে উঠেছিলুম কৃষ্ণ জ্যোদীশীতে আর বোম্বায়ে নামি পূর্ণিমাতে। এখানে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, সোম, কিছু মনে করো না, সেটা যদি উল্লেখ করি। এর সঙ্গে আমার মূল বক্তব্যের কোনো যোগ নেই। তোমার মনে আছে কি না জানি নে, মধুগঞ্জে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের দুদিন পরেই তুমি কথায় কথায় বলেছিলে, 'পরন্তু তো পূর্ণিমা, সমস্ত রাত নাকো বাওয়া যাবে।' আমি তখন কিছু বলি নি। পরে দেখলুম, শুধু তুমি না, তোমাদের দেশের আর সবাইও তাঁদের বাড়ী-কমা সম্বন্ধে সব সময়ই সচেতন। আমরা কেন অচেতন থাকি তার কারণ আমাদের দেশে বারো মাস যে কোন রাতে বৃষ্টি, ঝড় হতে পারে, শীতকালে বরফ, আর কুয়াশা তো লেগেই আছে চার শ পঁয়ষট্টি দিন—ইচ্ছে করেই চার শ বললুম। ওখানে কে হিসেব রাখে চাঁদ রাতের বেলায় কখন যায়, কখন আসে, মাজা-ঘষা কঁাসার থালায় মতো ঝকঝক করে, না নরুনে কাটা নখের মতো আকাশ থেকে কেটে পড়ে গাছের ডগায় আটকে থাকে।

ভারতবর্ষের চাঁদকে না চিনে মক্ষ্মলে কোন্ পুলিশ ঠিকঠিক কাজ করতে পারে? পূর্ণিমাতে চুরির এলাকায় মোতায়ন করলে আধা ডজন পুলিশ,

অস্বাভাব্য তিনটে! একমাত্র বর্ষাকালেই আগেভাগে কিছু ঠিক করা যায় না।
বিলেতে বারোমাস তাই।

কিন্তু আমি চাঁদকে সত্যি চিনতে শিখলুম জাহাজে, মেবলের সঙ্গে। কৃষ্ণা
ত্রয়োদশীতে চাঁদ কখন ওঠেন, কতখানি কাত হয়ে ওঠেন আর শুক্লা সপ্তমীতে চাঁদ
কখন অস্ত যান, এদিকে কাত হয়ে না ওদিকে কাত হয়ে সে আমি ভালো করে
জানলুম জাহাজে, ডেক-চেয়ারে, মেবলের গা ঘেঁষে। ক্লাস্টিতে সে বেচারী
চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ত, তবু কেবিনে ঘুমতে যাবে না। আমি ডেক-চেয়ারে ঘুমতে
পারি নে তাতে কিন্তু আমার কোনো ক্ষোভ ছিল না।

১৭ই আগস্ট

ইয়োত্রোপীয়দের সঙ্গে প্রচ্যার প্রথম পরিচয় হয় পোর্ট সর্দেদে।

পোর্ট সর্দেদের সঙ্গে গোটা মিশরের অতি অল্পট বোগসুত্র। তাই পোর্ট সর্দেদ
দেখে মিশর সম্বন্ধে রায় প্রকাশ ভুল। ও-শহরটা জন্মেছে এবং বেঁচে আছে
জাহাজ-যাত্রীদের কল্যাণে। এবং জাহাজে যে রকম বহু যাত্রী কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত
হয়ে নব নব উল্লাস-উত্তেজনার সন্ধান করে, এখানেও ঠিক তাই। বরঞ্চ বলব
বেশি। বরঞ্চ বলব, জাহাজে তুমি কী করলে না করলে তার সন্ধান তবু কেউ
কেউ পেয়ে যেতে পারে, এখানে সে বালাই-ই নেই। এখানে তুমি ঘণ্টা পাঁচেক
কী করে কাটালে, তার খবর জানবে কে? দেশভ্রমণ বড় ভাল, জিনিস—তার
'এক্সস্ট্র পাইপ' দিয়ে মেলা পাপ বেরিয়ে যায়।

পোর্ট সর্দেদের পাপ লুকিয়ে রাখা যায় না। মেবলের চোখে পর্যন্ত তার
অভ্যন্তর ইঙ্গিত খোঁচা মেরেছিল—যদিও আমি চেষ্টার ক্রটি করি নি, ও যেন সামান্য
দু-একটা কেনাকাটা করে, আর গোটা দুই মসজিদ দেখেই জাহাজে ফেরে।

শেষটায় মেবলকে বললুম, ও যে-দেশে যাচ্ছে, সেখানকার লোক লাঞ্ছ,
ডিনার আরম্ভ করে তেতো জিনিস দিয়ে। প্রাচ্যের সঙ্গে মোলাকাত-দাওয়াতের
আরম্ভেই পোর্ট সর্দেদের উচ্ছেভাজা, যদিও অনেক বৃদ্ধবৃদ্ধদের কাছে সেই বস্তুই
ক্রিসমাসকে লেডি ক্যানিং বলে মনে হয়।

পোর্ট সর্দেদ মিশরের প্রতীক নয়, বোম্বাইকে বরঞ্চ ভারতবর্ষের শহর বলা
চলে। তাই যখন বোম্বাই দেখে মেবল খুশি হলো, তখন আমার ভয়-ভাবনা
অনেকখানি কেটে গেল। যদিও সে বেচারী বোম্বাইয়ের রাস্তায় হাতি মাপ
আর গৌরীশঙ্করের জগ্না এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দেখতে না পেয়ে একটু মন-মরা
হয়েছিল বৈকি!

বোম্বাইয়ে নেমেই ধরতে হল কলকাতার মেল। সেখানে নেমে তড়িঘাড় ফের শেয়ালদা—গোয়ালন্দ-চাঁদপুর হয়ে মধুগঞ্জে। মেবল্ অভিজুতের মতো গাড়িতে জানালার কাছে বসে, গোয়ালন্দী জাহাজে ডেক-চেয়ারে খাড়া হয়ে হুটোথ দিয়ে বাইরের দৃশ্য ঘেন গিলছিল। তার কাছে সবই নতুন, সবই বিচিত্র। তার আনন্দে কিন্তু কাঁটা ফোঁটাত তোমাদের দেশের দারিদ্র্য। স্টেশনে স্টেশনে ভিথিরি দেখে দেখে শেবটায় বেচারী অল্প দিকে মুখ ফেরাত। বরঞ্চ আমি আয়ারল্যান্ডের ছেলে, ইংরেজ রাজত্বের ফলে আমার দেশে কী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছুটা সচেতন, কিন্তু লণ্ডনের মেয়ে মেবল্ এ-সব জানবে কী করে? আবার সব দারিদ্র্যের জন্ত কেবল ইংরেজই দায়ী, এই সহজ সমাধানই বা তাকে বলি কী প্রকারে? তাবলুম, মেবল্ বোকা মেয়ে নয়, নিজের থেকেই আন্তে আন্তে সবকিছু বুঝে নেবে।

মধুগঞ্জ আর আমাদের বাঙালোটি দেখে মেবল্ মুগ্ধ—ঠিক একদিন আমি যে রকম মুগ্ধ হয়েছিলুম। আম, জাম, নিম, লিচু গাছের কোনোটাই সে কখনো দেখে নি। খানার টেবিলে যে-সব ফল রাখা হল, তারও সব কটাই তার অজানা। ‘কারি’ যে এক নয়, দশ-বিশ রকমের হয়, সে কথা মধুগঞ্জে এসে প্রথম শুনল। এ-সব দেখে শুনে মেবলের বিশ্বাস হল, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যান্ডে ওয়াণ্ডার করবার মতো কিছুই নেই।

এ-সব জিনিস তোমাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলছি কেন সোম? একটু পরেই বুঝতে পারবে।

অ্যাক্স-আ-প্ৰভাস ছাড়ার পর মধুগঞ্জে এসেই আমাদের সত্যকার হনিমুন আরম্ভ হল। হনিমুন! হায় ভগবান, না শয়তান—কাকে ডাকব?

এক মাস ধরে প্রতি রাত্রে যে মর্যাস্তিক সত্য আমার সর্বক্ষে চাবুক মেরে গেল, তার মূল ট্রাজেডি—আমি নির্বীৰ্য—ইম্পোটেন্ট। মেবল্কে যৌনতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কথাটা কত সহজে বলা হয়ে গেল। এ রকম সহজ কথা শোনা তোমার আমার দুজনেরই অভ্যাস—পুলিসের লোক হিসেবে। জঙ্গ কত সহজ সরল ভাষায় আসামীকে বলেন, ‘তাই তোমার ফাঁসি।’ কিন্তু সে কি তখন তার পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে? পরেও কি পারে? এর অর্থ তাকে বুঝতে হয় প্রাণ দিয়ে এবং প্রাণ দেবার পর বোঝাবুঝির রইলই বা কী?

আমি ইম্পোটেন্ট। রায়টা কত সহজ। কিন্তু এর সম্পূর্ণ অর্থ আমি এখনো বুঝি নি। দিনে দিনে পলে পলে পড়াঘাত থেকে থেকে যেটুকু বুঝতে

পেরেছি সে জিনিস আমি তোমাকে কিংবা এ সংসারের অন্য কাউকে বোঝাব কী করে? আমার বেদিন ফাঁসি হবে সেদিন আমি বোঝাবুঝির বাইরে চলে যাব বটে, কিন্তু তোমরা হয়তো সেই দিনই খানিকটে বুঝতে পারবে।

পনেরো দিন পরে তাই আমি কলকাতা গিয়েছিলুম, ডাক্তারদের কাছে। তাঁরা অনেক পরীক্ষা করে যা বললেন সেটাও অতি সহজ। নিজের থেকে যদি না লারে তবে ওষুধপত্রে কিছু হবে না। কলকাতার ডাক্তারদের হাইকোর্টে আমার মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল।

ফিরে এসে যখন শুনলুম তুমি রটিয়েছ আমি কলকাতা গিয়েছি সরকারী কাজে তখনই বুঝতে পারলুম, তোমার আনক্যানি ষষ্ঠবুদ্ধি দিয়ে তুমি বুঝতে পেরেছ যে, কিছু একটা হয়েছে এবং আর পাঁচজন যেন তার কোনো ইঙ্গিত না পায়—তাই ও গুজবটা রটিয়েছ। থ্যাঙ্কস্।

এত সরল জিনিস, কিন্তু আমার কাছে এখনো এটা রহস্য।

আমি দেখতে ভাল, সৌন্দর্যবোধ আমার আছে, আমি প্রাণবান পুরুষ, আমার স্বাস্থ্য ভালো, আবার জোর দিয়ে বলছি, সোম, আমার মতো স্বাস্থ্য পৃথিবীর কম লোকই পেয়েছে, আমার অর্থের অভাব নেই, বিলাসেও আমার ঝোঁক নেই, পাঁচজনের তুলনায় আমাকে বোকা বলা যেতে পারে না, এবং সব চেয়ে বড় কথা মেবলের মতো সুন্দরী, প্রেমময়ী রমণী আমি পেয়েছি প্রিয়াক্রমে পত্নীরূপে, সে আমাকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসে, আমাকে সে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়েছে—

এই পরিপাটি প্যাটার্নটি বোনার পর ভগবানের এ কি নিষ্ঠুর ঠাট্টা না শয়তানের অট্টহাসি! এই পাক্‌ফ্রুইট প্যাটার্নটির উপর কে যেন ছড়িয়ে দিলে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে তার তাজা রক্ত। তোমাদের ভাষায় বলতে হলে, সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা বহু যত্নে তৈরি করার পর তার উপর কে যেন ছিটিয়ে দিলে গোরক্ত। মর্মর মসজিদের মেহরাবে না-পাক স্তম্ভের খুন!

কেন, কেন, কেন?

আমি কোনো উত্তর পাই নি।

অনেক ভেবেছি। অনেক ভেবেছি বললে অল্পই বলা হল। আট বছর ধরে ঐ একটি কথাই ভেবেছি বললে ভুল বলা হবে না। কাজকর্মে লিপ্ত থাকার সময় আমার চেতন মন এ সমস্তা ভুলে যেত সত্য, কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই মন আবার সেই প্রশ্নে ডুব মারত। এখনো মারে। আমার এ জীবন-চৈতন্তের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মন ঐ কথাই ভাববে। আমি শেষ

দিন পর্যন্ত ইডিয়ট ইমোসাইলের মতো খাচ্ছ শুধু চিবিয়েই যাব, কখনো গিলতে পারব না। এই যে পাঁচ লক্ষ ক্যাণ্ডল-লাইটের জোর সার্চলাইট আমার চোখের উপর জ্বলছে সেটাকে কখনো স্টিচ-অফ্ করতে পারব না।

নিরাশ হয়ে আমি এক বৎসর ধরে অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। সব ধর্মই দেখি সন্ধান করে একই বস্তু—তার নাম স্ত্রালভেশন, মোক্ষ, নির্বাণ, নজাত। কিন্তু আমি তো স্ত্রালভেশন চাইছি নে! আট বছরের বাচ্চা কি সুন্দরী কামনা করে?

তোমরা অর্থাৎ প্রাচ্যের লোকই তাবৎ ধর্ম বানিয়েছ। আমরা পশ্চিমের লোক, কী এক অভূত যোগাযোগের ফলে তারই একটা, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছি। কিন্তু মনে হয়, স্ত্রালভেশন জিনিসটির প্রতি আমাদের ক্ষুধা নেই বলে আমরা ধর্মটা নিয়েও নিই নি। তা না হলে এদিকে বলছি, কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে, ওদিকে দেখো জার্মানদের মারার জন্তু আমরা শত শত কোঁশল বের করছি, লক্ষ লক্ষ লোক মারছি। শুধু কি তাই? 'ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে', এ ধর্মে যে লোক বিশ্বাস করে না তাকে এটা গেলাবার জন্তু কত শার্লমেন, কত পোপ কত লোককে মেরেছে! পাত্রী-টিলার বুড়ো জোনকে বাদ দাও। বাদবাকি মিশনারিরা কী করছে? অসহায় নিরুপায় নিগ্রোদের জীবন অতিষ্ঠ করে তাদের ক্রোশান বানাচ্ছে।

শুধু একটা ধর্মে আমি কিছুটা হৃদিস পেয়েছি। এবং আশ্চর্য সে ধর্মে আজ পৃথিবীতে বিশ্বাস করে বড় জোর দশ লক্ষ লোক। পার্সীদের ধর্ম, জরথুষ্ট্রী ধর্ম।

জরথুষ্ট্র বলেন, সৃষ্টির প্রথম থেকেই আলো-আধারের দ্বন্দ্ব। আলোর প্রতীক আহুর মজদা—আমাদের ভাষায় ভগবান—আর অন্ধকারের প্রতীক আহির মন—আমাদের ভাষায় শয়তান। জরথুষ্ট্রীদের মতে যারা আহুর মজদার পক্ষে তাদের বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে জয়ী হবেন তিনিই। আহির মন আহুর মজদার সঙ্গে পেরে উঠবে না।

সংসারে যা কিছু সত্য শিব সুন্দর—তা আহুর মজদার সৃষ্টি, আর যত কিছু মিথ্যা, অমঙ্গল, কদর্য—তা আহির মনের।

তবে কোন্ সুস্থ মানুষ এই শয়তানের পক্ষ নেবে?

সেই তো মজা সোম, সেই তো মজা।

দেখো নি, এ সংসারে উন্নতির জন্তু, স্বার্থের খাতিরে মানুষ কতখানি মিথ্যা-চারী, ক্রুর, মিত্র হয়। আমরা পুলিশের লোক, আমাদের বিশ্বাস এই ধরনের

লোকই পৃথিবীতে বেশি। এরা মুখে ভগবান আহর মজদাকে মানে, পুজো চড়ায়, শিরনি বিলোয়, গির্জাতে মা-মেরির সামনে মোমবাতি জ্বালে, কিন্তু আসলে কি এরা আহির মনকেই জীবনদেবতারূপে বরণ করে নেয় নি? আপন জানা-অজানায় এরা কি মেনে নেয় নি যে—স্বদূর ভবিষ্যতে যা হবার হবে, মজদা জিতুন আর মনই জিতুন, আমার এ জীবনকালে যখন দেখতে পাচ্ছি ক্রুর কঠিন মিথ্যাচারী না হয়ে আমি সাংসারিক উন্নতি করতে পারব না তখন আর গতাস্তর কী?

এদের সবাইকে আমি দোষ দিই নে, সোম। কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে, তাদের থাওয়াতে পরাতে হবে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের কাছে, বিশেষ করে স্ত্রীর কাছে—যে তোমাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বসে আছে—, প্রতিদিন মাথা হেঁট করে স্বীকার করা যে আমি জীবনযুদ্ধে হেরেই চলেছি! কে স্তন্যদেয় সত্য্য-বলধন করে কিংবা না করে—এ কর্ম কি সহজ?

তবেই দেখো সোম, পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই এ যাবৎ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে, উপস্থিত আহির মনই শক্তিশালী, তাকে না মেনে উপায় নেই। এমন কি তাদের একটা ‘বনাফাইডি’ ‘ডিপেনন্স’ পর্যন্ত রয়েছে। শেষ বিচারের দিন যখন আহর মজদা এদের শুধাবেন, ‘তোমরা আহির মনের পক্ষ নিয়েছিলে কেন?’ উত্তরে তারা ক্ষীণকণ্ঠে বলবে—শ্রুতি দেখতে পাচ্ছে তখন তিনিই শক্তিমান—‘তখন, হজুর, তিনিই ছিলেন শক্তিশালী, তাঁকে না মেনে উপায় ছিল কি?’ এটা কি খুব সহজতর? কেন ভেবে দেখো, গ্রামের জুলুমবাজ জমিদারের ভয়ে যখন প্রজারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তখন তুমি কি সব সময় “ধর্মের শোলোক” কপচাও?

কিন্তু আমার জীবনে এ দর্শনের প্রয়োগ কোথায়?

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন শাস্ত্রেই আছে, অতি পূর্বযুগে নাকি একবার এক বিরাট বন্যা হয়েছিল; প্রাচীন আসিরীয় বাবিলনীয় প্রস্তরগাত্রে সে ঘটনার কথা খোদাই করা আছে, বাইবেলে তার বর্ণনা আছে, তোমাদের শাস্ত্রেও আছে কেশব তখন মীন-শগীর ধরে বেদ বাঁচিয়েছিলেন, অর্থাৎ সে বন্যায় তোমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ভেসে যায় নি, কোনো এক মহাপুরুষ তার শ্রেষ্ঠতম জিনিস বাঁচাতে পেরেছিলেন।

এই বন্যা নিয়ে একটি আধা-খ্রীষ্টানী আধা-মুসলমানী গল্প আছে।

দেই বন্যা আসার পূর্বে জেহোভা তখনকার দিনের পয়গম্বর নূহকে ডেকে বললেন, বন্যায় সব ভেসে যাবে, তুমি একটা নৌকো বানিয়ে তাতে পৃথিবীর সব গাছ, ফুলের বীজ এবং যত প্রকারের প্রাণী এক-এক-জোড়া করে রেখো। বন্যায়

পর তাই দিয়ে পৃথিবী আবার আবাদ করবে। সাবধান, কিছু যেন খোয়া না যায়।

নূহ তাই করলেন, কিন্তু বন্যার পর দেখেন কী, ইছুরে তাঁর আঙুরের বীজ থেয়ে ফেলেছে। আঙুর ফলের রাজা। গৌজামিল দিয়ে সে ফলটা হারিয়ে যাওয়ার কেছা তিনি চাপা দিতে পারবেন না। ভারি বিপদে পড়লেন।

ওদিকে কিন্তু হ'শিয়ার শয়তানও সব মাল এক-এক প্রস্তুত করে রেখেছিল। সে তখন নূহকে তার বাঁচানো আঙুরের বীজ দেবার প্রস্তাব করলে—তার বীজ তো আর ইছুর শয়তানি করে খেতে পারে না—অবশ্য কুমলতব নিয়ে। নূহের মনেও ধোঁকা ছিল, কিন্তু তিনি তখন নিরুপায়—বে-আঙুর ছুনিয়া নিয়ে তিনি আল্লাকে মুখ দেখাবেন কী করে?

পৃথিবীর জমিতে শয়তানের স্বত্ব নেই। তাই শর্ত হল, নূহ দেবেন জমি, শয়তান দেবে আঙুরের বীজ। গাছের তদারকিও ৫০-৫০।

নূহ তো যত্ন করে সকাল সন্ধ্যা চারার গোড়ায় ঢালেন সুমিষ্ট, সুগন্ধি বলরাই গোলাপজল আর শয়তান ঢালে গোপনে গোপনে না-পাক শুয়রের রক্ত।

নূহের পাক পানির ফলে, ফলে উঠল মিষ্টি আঙুর ফল। আঙুরের মতো ফল পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু শয়তান যে দিয়েছিল না-পাক চাঁজ; তারই ফলে আঙুর পচিয়ে তৈরী হয় মদ। সেই মদ খেয়ে মাহুষ করে মাতলামো, যত রকমের জঘন্য পাপ।

আহুর মজদা আমার জীবনের প্যাটার্ন গড়েছিলেন অতি যত্নে, ভালো কোনো রঙই তিনি সে প্যাটার্নে বাদ দেন নি, সে কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি।

আহির মন আড়ালে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সে তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। প্যাটার্ন যখন শেষ হবার উপক্রম তখন সে তার ভিতর ছেড়ে দিল মাত্র একটি পোকা, এক রাঙেই প্যাটার্ন কুটিকুটি হয়ে গেল।

বিশ্বকর্মা তিন ভুবনের স্পন্দর স্পন্দর জিনিস নিয়ে তিলে তিলে গড়লেন অনবস্থা তিলোস্তমা। আহির মন তার রক্তে ঢেলে দিল গলিত কুষ্ঠের ব্যাধি।

এ প্যাটার্ন রিপু-করা, এ গলিত কুষ্ঠকে নিরাময় করা আহুর মজদার মুরদের বাইরে।

১৮ই আগস্ট

যৌবনে বেঁচে থাকার আনন্দের (জোয়া শু ভিল্) মাহুষ এত মস্ত থাকে যে, মোক্ষের সন্ধান সে করে না। শেলি না কে যেন বলেছেন,

I have drunk deep of joy

And I will taste on other wine to-night.

যখন মানুষ সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, অথবা যখন বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ভয় পায় তখনই সে ও-সব জিনিস খোঁজে। এ-কথা শুধু ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়, গোটা জাতির পক্ষেও খাটে। তোমাদের জাতি যে কত পুরনো সেটা শুধু এই তত্ত্ব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তোমরা মোক্ষের অতুসন্ধান আরম্ভ করেছ খ্রীষ্ট-জন্মের পাঁচ শ কিংবা হাজার বছর পূর্বে। মুসলমানরা করল খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ছ শ বছর পরে। তাই দেখো, এই মধুগঞ্জের মুসলমানরাই তোমাদের তুলনায় ফুটি-ফাটি করে বেশি ; কামায় টাকাটা, খর্চা করে পাঁচমিকে।

আইরিশম্যানদের কাছেও মোক্ষ-সন্ধান এসেছে সম্প্রতি—তাও পাঁচহাত হয়ে, ঘষা-মাজা খেয়ে। তাই আমার জীবনে না ছিল মোক্ষ-সন্ধানের জাতীয় ঐতিহ্য, না ছিল কণামাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজন। যে সব ধর্মের কথা এসে যাচ্ছে সেগুলোর অতুসন্ধান আমি করেছি আহির মনের মার খেয়ে। এবং যে সব শ্রীমাংসায় পৌঁছেছি (তার কটা সম্বন্ধেই বা আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?—সম্পূর্ণ সত্য তো ভগবানের হাতে, মানুষের চেষ্টা তো ক্রমাগত ঘটদূর সম্ভব কাছে আসবার—) সেগুলো মাত্র কিছুদিন হল।

তাই আমার এ 'জবানবন্দিতে' আহির মজদা, আহির মনের কথা আসা উচিত ছিল হয়তো সর্বশেষে। কিন্তু তা-ই বা বলি কি করে? আমরা ইতিহাস লিখি ক্রনোলজিকালি—কোন ঘটনা আগে ঘটেছিল, কোনটা পরে সেই অহুযায়ী। কিন্তু অভিধান লেখার সময় অ্যালফাবেটিকালি ; যে শব্দ পৃথিবীতে প্রথম জন্ম নিয়েছিল সেইটে দিয়েই আমরা অভিধান লেখা আরম্ভ করি নে। আমার জীবন অভিধান তো নয়ই, ইতিহাসও নয়। আমি মরে যাওয়ার পর আমার জীবন তোমার কাছে ইতিহাসের রূপ নেবে। ইতিহাসের বর্তমান থাকে না, ভবিষ্যৎ নেই, তার আছে শুধু ভূত। আমি বেঁচে আছি, কাজেই আমার ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু সে থেকেও নেই আর ভূত আর বর্তমান এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, তার জট ছাড়িয়ে পাকাপাকি কালাহুক্রমিকভাবে সব কিছু বলতে পারব না।

আহির মনকে স্বীকার করে আমি অধর্ম করেছি? অধর্ম অগ্রায় বাই করে থাকি নে কেন, আমি কিন্তু ভগ্নামি করি নি। সে-ই আমার সব চেয়ে বড় সাক্ষ্য। কিন্তু আবার দেখো, আরেক নতুন ভিলেমায় পড়ে গেলুম। আমি যদি ভগ্নামি স্থণা করি তবে আমি আবার আহির মজদাপন্থী হয়ে গেলুম। ভগ্নামি

তো আহির মনের, সত্যনিষ্ঠা মজদার। এ স্বপ্নের কি অবসান নেই ?

হয়তো আছে হয়তো নেই। তাই হয়তো তখন অন্তরের দ্বন্দ্ব মূলতবী রেখে দেখতে হয় কর্মক্ষেত্রে মানুষ কী করে। সেখানে তো মানুষকে অহরহ ভিসিশন—মৌমাংসা, নিষ্পত্তি—করতে হয়। এ সংসারে সকলের ভিতরেই কিছু না কিছু হামলেট লুকিয়ে আছে যে সর্বক্ষণ ‘টু বি অর নট টু বি’র সন্দেহ-সমুদ্রে ঘোঁড়ল দোলায় দোলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডন্ কিংসটও রয়েছে যে ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে, নঙা-তলোয়ার হাতে নিয়ে থাকে তাকে তাড়া লাগায়—আমরা থাকে বলি বার্কস আপ দি রঙ্ ট্রা—যে গাছে বেড়াল ওঠে নি তারই তলায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে করতে থাকে ঘেউ-ঘেউ।

বেচারী মেব্ল! সে আমার ডন কিংসট রূপটাই চিনত। লগুনে অ্যাক্স-আ-প্রভাসে কিছুটা ঘটলেই আমি তড়িঘড়ি অ্যাকশন নিয়ে তার একটা সমাধান করে দিভুম। ভুল যে করি নি তা নয়। একটা ঘটনার কথা বলি। অ্যাক্সের বনে গিয়েছি মেব্লকে নিয়ে বেড়াতে। হঠাৎ শুনি নারীকণ্ঠে পরিভ্রাহি চিৎকার। ছুটে গিয়ে দেখি এক ছোকরা একটা মেয়েকে জাবড়ে ধরে চুমো খাবার চেষ্টা করছে, আর মেয়েটা—বাপরে বাপ সে কী তীক্ষ্ণকণ্ঠ—চোঁচাচ্ছে। আমি ডন কিংসটের মতো ছোঁড়াটার কলার ধরে দিলুম হ্যাঁচকা টান আর গালে গোটা দুই চড়। মেয়েটা আমার দিকে তাকালে। আমি ভাবলুম, সে বুঝি আমার শিভালরির কদর জানাতে গিয়ে আমাকেই চুমো খেয়ে বসবে! কী হল, জান, সোম ? মেয়েটা দৃঢ়পদে এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর বলা-নেই কওয়া-নেই, দুহাত দিয়ে ঠাস ঠাস করে মারলে আমার গালে—ছোঁড়াটার গালে নয়, আমার গালে—গাঙা পাঁচেক চড়! মোজা বৃহনির স্পীডে। আমি তো, বিলকুল বেকুব। তারপর মেয়েটা ছোঁড়াটার হাত ধরে হনহন করে চলে গেল বনের ভিতর।

মেব্ল শেষ অঙ্কটা দেখতে পেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছিল।

কী করে জানব, বলো, কোন্টা প্রেমের ছাকরামোর চিৎকার আর কোন্টা ধর্ষণভীতির সক্রমণ আর্তরব! একেই বলে বার্কিঙ আপ দি রঙ্ ট্রা !

সেই আমি কলকাতার ডাক্তারদের শেষ রায় শুনে ফিরে এলুম মধুগঞ্জে। মেব্লকে আদর না করে রূপ করে বসে পড়লুম ডেক-চেয়ারে ঘণ্টা তিনেকের তরে। ডন তখন হামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। মেব্ল তখন আমার কপালে হাত বুলিয়ে আদর করছিল—আমি মাড়া দিই নি।

সব কথা মেব্লকে খুলে বলার প্রয়োজন হয় নি। কলকাতা থেকে ফিরে

আমার পর আমি তার গাত্র স্পর্শ করছি নে দেখেই সে সমস্ত ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছিল। পরের দিন ভোরবেলা দেখি, মেবল ঘরে নেই। বারান্দায় পেলুম তাকে, একটা মোড়ার উপর হুঁহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সাহস পর্বত্ত করতে পারলুম না।

তোমাদের দেশে নাকি নিকাম প্রেমের আদর্শ আছে। যৌনক্ষুধাকে অবহেলা করে তোমাদের বহুলোক জীবনধারণ করে। আমাদের ক্যাথলিক পাত্রী আর মিস্টিকরা রমণী-সঙ্গ কামনা করে না, তোমাদের বিধবারা যে রকম যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকেন। কিন্তু সঙ্গে এঁরা সর্বপ্রকার প্রেমকেও কাঁটার মতো দেহ-মন থেকে তুলে দূরে ফেলে দেন। তাঁদের শুধু লড়তে হয় শারীরিক প্রলোভনের সঙ্গে। আমার বেলা তো তা নয়, আমি ভালবাসতে পারি, বাসিও, কিন্তু শরীর দিয়ে বাসতে পারব না। সেও হয়তো অসম্ভব কঠিন মনে হত না যদি মেবল আর আমি একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে নিতুম, আমরা আমাদের প্রেম দেহের স্তরে নিয়ে যাব না।

তোমার মনে আছে, সোম, তোমার আমার সামনে আমাদের জেলের একটা ঘটনা? স্বদেশী কয়েদীকে শেষ বিদায় দিতে এসেছে তার স্ত্রী, বাচ্চাকে কোলে করে। বাপ চেয়েছিল ছেলেকে কোলে নিতে, বাচ্চাটাও মায়ের কোল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছিল বাপের দিকে। মাঝখানে লোহার জাল।

আমরা দুজনাই সে জায়গা ছেড়ে চলে এসেছিলুম। অবাস্তব, তবু যখন সুবাদটা এল তাই বলি, পরে আমার কাছে খবর এল, তুমি নাকি গোপনে তাদের মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে। খবরটা আমাদের দিয়েছিল জেলার, আরো গোপনে—তোমার বিরুদ্ধে আমাকে তাতানোর জন্ত। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ব্যাটাকে ধরে হাণ্ডার নিয়ে তার গ্যাংটো পাছায় আচ্ছা করে চাবকাই। ভাষাটা একটু অভদ্র হল, না সোম? কিন্তু আমি তখন খুনিয়া রাগের মাথায় যে অভদ্র ভাষা মনে মনে ব্যবহার করেছিলুম তারই ছবছ প্রকাশ দিলুম মাত্র। আহির মনকে মেনে নিয়েও ভণ্ডামি মেনে নিতে পারি নি, সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সে কথা থাক।

আমার অবস্থা তখন আরো কঠোর। আমার আর মেবলের মাঝখানে যে জাল রয়েছে সেটা একদিন ছিন্ন হয়ে গেলে যেতেও পারে—কলকাতার ডাক্তাররা সেই অতি ক্রীণ আশাই দিয়েছিল—এবং প্রতিদিন প্রতি রাত্রি সেই আশাই আমাকে মুখ ভেঙচিয়েছে।

নিকাম প্রেমের কথায় ফিরে যাই। কাব্য যদি মানবজীবনের দর্পণ হয় তবে

তথাই তোমাদের সে দর্পণে নিকাম প্রেমের কতটুকু আভাস মেলে ? রায়বাহাদুর কালীধর আমাদের দিয়েছিলেন দুখানি সংস্কৃত কাব্যের ইংরেজি অহুবাদ। মেঘদূত আর গীতগোবিন্দ। (পর্বোপ্রাকি আর রিয়েল আর্টের মধ্যে তফাত কী তাই নিয়ে তখন একটা মোকদ্দমা চলছিল ; রায়বাহাদুরের মতে মেঘদূত-গীতগোবিন্দ আর্ট আর মিসট্রিজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন অস্বীকার, যদিও তাতে শরীরের খুঁটিনাটি বর্ণনা অনেক, অনেক কম)। এ বই দুখানিতে কী নিকাম প্রেমের ছড়াছড়ি ? অল্প বইয়ে থাকতে পারে এই ভেবে আমি রায়বাহাদুরের দ্বারস্থ হই। তিনি কবুল জবাব দিয়ে বললেন, ‘সংস্কৃতে নিকাম প্রেমের বালাই নেই, সে বস্তু এসেছে মুসলমান আগমনের পর বাঙলা-হিন্দীতে। খুব সম্ভব শ্রমীদের নিকাম প্রেম থেকে এ বস্তু এ-দেশে পাচার হয়েছে। আমি তা হলে বলব, তোমরা যতদিন ভিরাইল, বীর্ধবান ছিলে ততদিন নিকাম প্রেম সম্বন্ধে ছিলে সম্পূর্ণ অচেতন। নিকাম প্রেম অনৈসর্গিক। কিন্তু থাক তোমাদের হিন্দু-শাস্ত্র। আমি ক্রীষ্টানের ছেলে। আমি বরঞ্চ বাইবেলে যাই।

আমি বিলক্ষণ জানি বুড়ো পাত্রী তোমাকে অনেক বাইবেল উপহার দিয়েছেন, বহুবাব তোমাকে বইখানা পড়বার জন্য অহরোধ করেছেন, কিন্তু তুমি পড় নি। কাজেই যে কটি লাইন তোমাকে শোনাব সেগুলো তুমি আগে কখনো শোন নি।

“How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter !! The joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of cunning workman.

Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor : thy belly is like an heap of wheat set about with lilies.

Thy two breasts are like two young rose that are twins.

Thy neck is a tower of ivory ; thine eyes like the fish-pools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim : thy nose is as the tower of Lebanon, which looketh toward Damascus.

Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple ; the king is held in the galleries.

সৈ (৫২)—৬

How fair and how pleasant are thou, O love for delights !

This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.

I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs there of : now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples ;

And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.

I am beloved's, and his desire is towards me."

কী গভীর, হাউ সাবলাইম ! পাশবিক ঘোঁনক্ষুধাকে সৃষ্টির কী মহিমময় অনিন্দ্যসুন্দর নন্দন কাননে তুলে নিয়ে গেল তার স্বর্ণপক্ষ দিয়ে এ কবিতা ! এ ঘোঁনক্ষুধা নন্দনের স্বস্থায় সিক্ত না থাকলে এর বর্ষণে ইন্দ্রপুরীর হাসি মুখে মেখে নিয়ে দেবশিশুর মতো অবতীর্ণ হত কী করে ?

বিরাস্ট বাইবেলে এই একটি মাত্র প্রেমের কবিতা ছিটকে এসে পড়েছে। কী করে পড়ল তার সহস্রের কোনো পণ্ডিত এখনো দিতে পারেন নি। তাই বোধ করি তাঁরা ধমক দিয়ে বলেন, এ প্রেম রূপক-রূপে নিতে হবে, এ প্রেমের সঙ্গে মানব-মানবীর প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই—এ প্রেম নাকি 'দি মিউচেল লাভ অব ক্রাইস্ট আণ্ড হিল্ল চার্চ' বর্ণনা করেছে। চার্চের বড় কর্তা স্বয়ং পোপ। এখানে আমি পোপের স্বার্থাঘেযী করাজুলি-সঙ্কেত দেখতে পাই।

তোমাদের আদিরসাত্মক কামরসে-ঠাসা বৈষ্ণব কবিতাও নাকি শুধু বৈকুণ্ঠের দেবদেবীর জন্য। সেগুলোকেও নাকি প্রতীক হিসেবে নিতে হয়। এখানে কার স্বার্থ লুকোনো আছে জানি নে।

আমি মানি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-সব কবিতা শব্দার্থে নিতে হবে। ঘোঁন সম্পর্ক জীবনের অন্ততম গভীর সত্য। তাকে স্বীকার করে আমাদের কবিতা সত্যকে স্বীকার করেছেন মাত্র। এতে কোনো দুঃসাহস বা মৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে না। তোমাদের কোনো মন্দিরে ঘোঁন সম্পর্কের নয় প্রস্তরমূর্তি দেখে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়। আমি হই নে। কাব্যে যে সত্য কবিতা অকুণ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করে স্বীকৃতি দিয়েছেন, শিল্পী প্রস্তর-গাড়ে সেটা খোদাই করবে না কেন ?

তুমি বলবে, এ-সব গুরুগম্ভীর তত্ত্বের ঢাকা-টিপ্পনী কাটার কী অধিকার আমার ? অধিকার তবে কার ? পুরুষ-পাণ্ডাদের, পাত্রী-গোঁসাইদের ? কিন্তু ভগবান তো তাঁদের পকেটের ভিতর । এ-সব তত্ত্ব তাঁদের কী প্রয়োজন ? গীতগোবিন্দ, বাইবেল এগুলো তো আমার মতো পাণ্ডীতাপীদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে । যে ভক্ত ভগবানকে পেয়ে গিয়েছেন তিনি মন্দিরে যাবেন কী করতে ? মন্দিরে তো যাব আমি । এ-সবের মূল্য যাচাই করব আমি, অর্থ বের করব আমি ।

জীবনের এই গভীরতম রহস্যবৃত্ত সত্যের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছি বলেই কি আহির মন আমাকে এর অহুভূতি থেকে বঞ্চিত করল ?

২০শে আগস্ট

পলে পলে তিলে তিলে কত যুগ ধরে আমি কি দহনে দগ্ন হয়েছি, সে শুধু আমিই জানি । এ দহন কিন্তু সময়ের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না । বেদনা থেকে নিকৃতি পাবার জন্য তোমাদের সাধকেরা বলেন, বেদনা আসে মনের বটলনেকের ভিতর দিয়ে, সেই মনকে তুমি যদি আয়ত্তে আনতে পার তবে আর কোনো বেদনা-বোধ থাকবে না । এ-তত্ত্বটা আমি যাচাই করে দেখি নি, কারণ আমার মনে হয়েছে মনের বটলনেক যদি আমি বন্ধ করে দিই বেদনা-বোধকে ধামিয়ে দি, তবে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবোধের অহুভূতিও আমার চৈতন্যে প্রবেশ করতে পারবে না । তার অর্থ, সর্বপ্রকার অহুভূতি বিবর্জিত হয়ে জড়জগতে ইট-পাথরের মতো স্তব্ধমাত্র থানিকটে স্পেস নিয়ে এগিস্ট করা । তাহলে আত্মহত্যা করলেই হয় । পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলে গিয়ে যে বার পরিমিত জায়গা দখল করে অস্তিত্ব বজায় রাখবে । তফাত কোথায় ?

আমাদের গুণীরা বলেন, হৃদয়-বেদনা ভুলতে হলে কাজের মধ্যে ঝাঁপ দাও । মন তখন কাজে এমনি নিমগ্ন হয়ে যাবে যে অন্য কিছু ভাবতে পারবে না । আমি তাই সেই সময়ে কাজে দিলুম ঝাঁপ । তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি হঠাৎ কী রকম আমার এলাকার খুন-খারাবির আদমশুমারি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলুম, এলাকার বিরাট ম্যাপ তৈরী করে বদমায়েশির জায়গাগুলোতে চঙ্কর কেটে কেটে তার কেন্দ্রস্থলের বদমায়েশকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম ; দাগী আসামী জেল থেকে থালাস পেলেই তার গ্রামকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের গ্রামের চুরি-চামারির সংখ্যা বেড়ে বাঙলা থেকে তোমাদের কাছে সপ্রমাণ করলুম, ষড়ল বদমাইশ আপন গাঁয়ে বদ-কাজ করে না ।

তাতে করে শুধু তোমাদের অভিষ্ট করে তোলা হয়েছিল । আমার কোনো

লাভ হয় নি।-

কাজের ভিতর সমস্ত দিন তুমি যে বেদনা-বোধকে বীধ দিয়ে আটকে রেখে ভাবলে বেঁচে গেছ, সে তখন কাজের অবসানে তোমার সকল বীধ ভেঙে লগুত্তগু করে দেয় তোমার সর্ব অস্তিত্বকে। পলে পলে তিলে তিলে দিনভর তুমি যদি তোমার বেদনা-বোধকে নিয়ে পড়ে থাক, তাতে যদি কাজ কিংবা অজ্ঞ কোনো কৃত্রিম উপায়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা না কর, তবে তার ইনটেনসিটি অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু সলমনের বোতলে ভরা জিন্ যখন সক্ষ্যায় নিকৃতি পায়, তখন তার বেধড়ক মার থেকে আর কোনো নিকৃতি নেই।

সেই মার খেয়ে খেয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে করে—যেন এ-গালে চড় খেয়ে ও পাশ হয়ে শুই, যেন ও-গালে চড় খেয়ে এ-পাশ হয়ে শুই—রাত বারোটায় এল ঘুম। কিন্তু শয়তান তোমায় নিকৃতি দেবে কেন? ঘুম ভেঙে ঘাবে রাত ছুটায়।

পাশের খাটে মেবল্ শুয়ে। তার সোনালী টেউ-খেলানো এলো চুল চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে বালিশের উপর একেছে বিচিত্র নক্সা। তার কপালে ঘামের একটু একটু ভেজার আভাস, চাঁদের আলো তারই উপর সামান্য চিকচিক করছে, বিলের 'ভেট'-ফুলের পাপড়ির উপর এই আলোই আমি অনেকবার দেখেছি, ভাওয়ালির জানলা দিয়ে। মেবলের হাত দুখানি তার শরীরের দুদিকে আলসে লম্বমান হয়ে অর্ধমুষ্টিবদ্ধ যেন দুটি 'ভেট'-ফুলের কুঁড়ি। আর তার সমস্ত কিশোর তনু যেন গাদা করে রাখা শিউলি ফুলের পাপড়ি—হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল শিউলি ছিল মেবলের সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

এই গরমের দেশে শীতের দেশের মেয়েকে চাঁদের আলোতে কী রকম অদ্ভুত, রহস্যময় দেখাত। আজ যদি হঠাৎ দেখি, আমার লিচুবনের ঘন সবুজের উপর গাদা গাদা বরফ জমেছে, তাহলে যে রকম সমস্ত বাগানখানা এক অবিশ্বাস্ত সৌন্দর্যে ভরে উঠবে।

মেবলের এই নিশিকান্ত সৌন্দর্য আমার আত্মার স্খাধাকে অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে কত শতবার ভরে দিয়েছে। আশ্চর্য ফিকে বেগনি রঙের মসলিন নাইট-ড্রেসে জড়ানো মেবলের শরীর আমার কবি-মানসের শুদ্ধ যুৎপাতকে অমৃতরসে বার বার ভরে দিয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জালিয়ে দিত আমার সর্ব-ধমনীতে এক অদম্য ধৌনস্খা।

মনে আছে, লোম, তুমি আর আমি একদিন মফস্বলের এক গ্রামে নিষ্ক্রিয় ক্রোধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সমস্ত গ্রামখানা আজুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—জল ছিল না বলে আমরা নিম্নল আক্রোশে শুধু ছটকট করেছিলুম।

সে আগুন তবু ভালো। নিরন্তর বিধবার শেষ কাঁথাখানা পুড়িয়ে দিয়ে সে আগুন তবু তো তৃপ্ত হল।

আমার এ বহিজালার শেষ নেই। পিরামিডের উপরে দাঁড়িয়ে আমি এক-দিন গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সাহারার মরুভূমির দূরদৃশ্যের শুক তৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিলুম, আর তার রক্তমূর্তি দেখে ভয়ে ভগবানের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম। আহির মন আমার সর্বশরীরে সেই সাহারার জালা জালিয়ে দিল।

শরীরে এ জালা নিয়ে মানুষ সমাজে মিশতে পারে না। আমি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে কমিয়ে শেষটায় একেবারে আলেকজান্ডার সালকার্ক হয়ে গেলুম। বিষ্ণুছড়া আর মাদামপুরের মেয়েদের ফৌসফৌসানি আর ছোবলা-ছুবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার কোনো কষ্ট হয় নি; কিন্তু পাত্রী-টিলার মেয়েদের কলকল উচ্ছ্বাস, তাদের লাজুক নয়নে আশা-প্রেমের ক্ষীণ আভাস আমার জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে তাকে করে দিল আরো ফাঁকা। কে যেন বলেছে, ‘দি মোর লাইফ বিকাম্‌স্ এম্পটি দি হেভিয়ার ইট বিকাম্‌স্ টু ক্যারি ইট’। জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়, তাকে বহন করা হয়ে যায় ততই শক্ত। বড় খাটি কথা বলেছে। তবু আমি জীবনের সেই শূন্য ধামা বইতে পারতুম, কিন্তু সে ধামার সর্বাঙ্গে ছিল বিছুটি।

খুব সম্ভব আমারই দেখাদেখি মেব্‌ল্‌ও বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কী ভেবে বন্ধ করল জানি নে। তার মনের কথা কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাতে যাব না। তার প্রতি আমি অবিচার করেছি কি না, তার বিচার একদিন হয় তো হবে, কিন্তু তার মনের কথা বলতে গিয়ে আমি যদি উনিশ-বিশ করে ফেলি তবে সে অবিচার আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

আমার ভিতরকার ডন কিস্ট্র্‌ ক্রমে ক্রমে কাতর হতে হতে রোগশয্যায় পড়ল। আর আমি, ও-রেলি, আস্তে আস্তে হামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করলুম। বরঞ্চ হামলেট বক্তৃতা স্বাভাবিক প্রচুর—সামান্যতম প্রভোকেশনে সে বরবর করে নানা প্রকারের দার্শনিক রায় জাহির করত এস্তার—তোমাদের স্বাত্মগানে যে রকম ক্ষীণতম প্রভোকেশনে নায়ক-নায়িকা দূরে থাক, পাইক বরকন্দাজ পর্যন্ত ললা ললা গান গাইতে আরম্ভ করে। আমার মুখের কথাও শুকিয়ে গেল।

বেচারী মেব্‌ল্‌! গোড়ার দিকে সে আশ-কথা পাশ-কথা বলে বলে আমাকে আমার কচ্ছপের খোলার ভিতর থেকে বের করবার চেষ্টা করেছিল; শেষটায় সে চেষ্টাও ছেড়ে দিলে।

তখন আমি খেতে আরম্ভ করলুম মদ। মাস তিনেক দিন-রাত্তির আমি

ভাম হয়ে পড়ে থাকতুম। বাটলার জয়স্বৰ্ঘ, যে কি না ধাত্তোখরী মালের পাঁচ জলের মতো ঢকঢক করে গিলতে পারে, সে পৰ্বন্ত আমার পানের বহর দেখে রীতিমত বাবড়ে গেল। কখনো বলে হইকি ফুরিয়ে গিয়েছে, কখনো বলে সোভা নেই। তারপর একদিন মাতাল হয়ে তার গালে মারলুম ঠাশ ঠাশ করে চড়। সংবিতে ফিরে বড় লজ্জা পেয়েছিলুম, সোম। আমি কি অশিক্ষিত 'বক্সওয়াল' যে আমি এ রকম অজ্ঞায় আচরণ করব!

মদ খেয়ে লাভ হয় নি। মদ খেলে মাহুঘের ঘোনক্ষুধা উগ্রতর হয়, তৃপ্তির ক্ষমতা কমে যায়। আমার অতৃপ্তির আকোভ তাই মদ খেয়ে কখনো কখনো বিকট রূপ ধরে ছিল। তার কথা বলতে আমার ঘেন্না ধরে।

কিন্তু আসল কথাটা আমি শুধু এড়িয়েই যাচ্ছি। আমি শুধু বোঝাতে চাই, আমি কী কঠোর যন্ত্রণার ভিতর আমার জীবনটা কাটালুম, আর সেইটে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছি নে! কিন্তু এ দুর্দৈবে আমি একা নই। তোমার মনে আছে—চৌধুরীর কেসটা? ভদ্রলোক কী শাস্ত, দয়ালু প্রকৃতির, গরীব-দুঃখীদের ভিতর তাঁর দান-খয়রাতের কথা কে না জানে? আর কী অপূৰ্ব সন্দরী ছিলেন তাঁর স্ত্রী? দেখে মনে হত অনন্তর্যোবনা—তাঁর ছেলেমেয়ে হয় নি। তাঁর ঘাড়টির কথা তোমার মনে পড়ে কি? রাজধানীর গৰ্ব নিয়ে যেন সে ঘাড় তাঁর মাথাটি তুলে ধরত। একদিন তাঁর সে ঘাড় নিচু হয়েছিল—আমি অবশ্য স্বচক্ষে দেখি নি। তাঁর স্বামী যেদিন হোমোসেক্সুয়েল কেসে ধরা পড়লেন।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি এ রকম সাধুলোক কী করে এ রকম নোংরামি করতে পারে। তিনি নিজে আমার খাশ-কামরায় স্বীকার করেছিলেন বলেই শেষটায় আমার প্রত্যয় হল।

কি বিড়ম্বিত জীবন! ভগবান ভদ্রলোককে স্বাভাবিক ঘোনক্ষুধা দেন নি। তাঁর অনৈসর্গিক ঘোনক্ষুধাকে তিনি অদ্ভুত বিক্রমে কত বৎসর চেপে রেখে রেখে হঠাৎ একদিন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কুকর্মটা করে ফেললেন—তুনেছি তোমাদের সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেও দৈবাৎ কখনো এ রকমধারা হয়েছে। সে ঘটনা বলতে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখে যে আত্মাবমাননার প্রকাশ দেখেছিলুম, তার দাগ আমার মন থেকে কখনো উঠবে না। ভদ্রলোক শেষটায় বলেছিলেন, 'আমাকে এখন সমাজ ঘেন্না করবে, কুর্জরোগীকে মাহুঘ যে রকম বর্জন করে চলে। আমি সমাজের জন্ত কী করেছি, সে কথা সমাজ স্মরণ করবে না—আমি তাকে দোষও দিই নে—কিন্তু আমার সতী-সাধবী স্ত্রী, যিনি ভাবতেন আমি ধ্যান-ধারণায় আত্মসমর্পণ করেছি বলে তাঁকে অবহেলা করি, ধীরে পুত্রোৎপাদন-ঈশাকে পৰ্বন্ত আমি সমান

দিই নি, তিনি কী ভাববেন ?

ওঃ! এ কেসটা ধামা-চাপা দিতে তোমাকে কী বেগই না পেতে হয়েছিল। রায়বাহাদুর কাশীশ্বর যদি অস্বাভাবিকভাবে গুহ্য সন্ধিসূত্রক আমাদের বাতলে না দিতেন, তবে আমরা চৌধুরীকে বাঁচাতে পারতুম না। কিন্তু আমার বিশ্বাসের অবধি নেই, হিন্দু সমাজের বিরাট পাণ্ডা রায়বাহাদুর কী করে এতখানি দরাজ-দিল হলেন! তবে ই্যা শুনেছি, তোমাদের সাধু-সন্ন্যাসীর ভিতরও এ রকম কিছু একটা হলে অল্প সন্ন্যাসীরা তাকে খুন করে না। হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে তাকে পাঠিয়ে দেয়। তোমাদের ধর্ম সত্যই বড় অভূত! কত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে তোমাদের সাধুরা কত সত্য আবিষ্কার করেছে, আর তার থেকে পেয়েছে অস্বহীন সহিষ্ণুতা।

তুমি হয়তো জান না, চৌধুরী আমাকে এখনো দক্ষিণের এক আশ্রম থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। শুনে খুশি হবে, তার স্ত্রী তার সঙ্গেই আছেন।

দু বৎসর কঠোর সংযমে নিজেকে মেব্লের কাছ থেকে দূরে রেখে এক গভীর রাত্রে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি তার কাছে যাই। কী হয়েছিল, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না।

সেই রাত্রে ভোরের দিকে মেব্ল জয়স্বর্ঘের ঘরে যায়।

সেই ভোরেই সে আমার পায়ের উপর তার মাথা রেখে অনেককণ ধরে কেঁদেছিল। তার চুল ভিজে গিয়েছিল, আমার পা ভিজে গিয়েছিল। আমাদের দুজনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরয় নি।

থাক।

২২শে আগস্ট

মেব্ল যদি মরে যেত, তবে কি আমার এর চেয়ে বেশী কষ্ট হত? বলতে পারব না।

হঠাৎ যদি আমি অন্ধ হয়ে যেতুম, তাহলে কি বেশী কষ্ট পেতুম? বলতে পারব না। তখনো বলতে পারি নি, আজও পারব না।

আমি বিমূঢ়ের মতো বসে কয়েক দিন কাটাই।

আমার মনে হয় বড় শোক বখন আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রথম থাকতেই তার বেদনা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। আন্তে আন্তে যেমন যেমন দিন যায়, সঙ্গে সঙ্গে অসহায় হরিণ-শিশুর শরীরকে ঘিরে যেন পাইথনের পান একটার পর একটা করে বাড়তে থাকে। শুনেছি, সে নাকি তখন আর

আর্তস্বরে চিংকার পর্বন্ত করে না। শেষ পাশ দেওয়ার পর পাইখন লাগায় আস্তে আস্তে চাপ। আমি কখনো দেখি নি। আমার মনে প্রাণ জাগে, হরিণ কি আমার চেয়ে বেশী কষ্ট পায় ?

ফাঁসির আসামীও ঘুমোয়। ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই নাকি তার মনে পড়ে অমুক দিন তার ফাঁসি। নিদ্রার কোল থেকে প্রাণ-রস যুগিয়ে নিয়ে মানব-শিশু যখন জাগল, তখনই তার স্বরণে এল, সেই প্রাণটি তার অমুক দিন যাবে। পড়েছি, কোমর অবধি পুঁতে মাছকে যখন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বধ করা হয়, তখন প্রথম কয়েকটা পাথরের ঘা খেয়েই সে নাকি অজ্ঞান হয়ে ছমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চতুর্দিকের নরদানবরা তখন নাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে জল দিয়ে তাকে চৈতন্তে নিয়ে আসে। সংবিতে ফিরে এসে সে নাকি প্রথমটায় বুঝতে পারে না সে কোথায়—টোনে ঘুম ভাঙলে আমরা যে রকম প্রথমটায় বুঝতে পারি নে, আমরা কোথায়। তারপর আবার দুসরা কিস্তির প্রথম পাথরের ঘা খেয়েই নাকি সে সেই নির্ভয় সত্য বুঝতে পারে, তাকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। বর্ণনায় পড়েছি, তাকে নাকি অন্তত বার পাঁচেক এই রকম সংবিতে ফিরিয়ে এনে মারা হয়।

শুনছি, যে লোক যতটা খুন করে, চীন দেশে নাকি তার ততবার ফাঁসি হয়। কিন্তু ফাঁসি একবারের বেশী হতে পারে কী করে ? তোমরা এই নিয়ে একটা ঠাট্টা করো না, অমুক লোকটার তিন মাসের ফাঁসি ? কিন্তু তা-ও হয়। বিদগ্ধ চীনেরা তারও একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে। আসামীর গলায় ফাঁস দিয়ে আস্তে আস্তে তার দম বন্ধ করে আনতে আনতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। অজ্ঞান হওয়া মাত্রই ফাঁস ঢিলে করে দিয়ে জল ঢেলে, হাওয়া করে তাকে ফের সংবিতে আনা হয়। যে বার খুন করেছে, তার উপর এই প্রক্রিয়া ততবার চলে। প্রতিবার সংবিতে আসামাত্র তার কী মনে হয় ভেবে দেখো।

ধস্ত সে-সব লেখক, যারা এসব মর্মান্তিক ব্যাপার রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হয়, হয় তাঁরা স্ফাডিস্ট, নয় তাঁরা আপন জীবনে, আমারই মতো কোনো এক কিংবা একাধিক নির্দুঃ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন।

এখনো বলছি, শারীরিক ফাঁসির সংখ্যার একটা সীমানা আছে। পাঁচ-সাত বার করার পর আসামী নিশ্চয়ই আর সংবিতে ফিরে আসে না—অচৈতন্ত অবস্থা থেকে মৃত্যুর অভল গহ্বরে ডুবে যায়। কিন্তু মনের ফাঁসি, আত্মার ফাঁসির সীমা-সংখ্যা নেই। বাইরে প্রকৃতিতে যে রকম রেগুতে রেগুতে প্রতিদ্বন্দ্ব কোটি কোটি

নবজন্মের সৃষ্টি, একই মানুষ সেই রকম ভিতরে ভিতরে মরে কোটি কোটি বার। এবং প্রতি দুই মৃত্যুর ভিতর যে সংবিৎ, তখন সে সংবিৎ শুধু তাকে জানিয়ে দেবার জন্ত, এই শেষ নয়, এই মৃত্যুযন্ত্রণাই শেষ মৃত্যুযন্ত্রণা নয়, আরো অনেক-গুলো সম্মুখে রয়েছে।

এ-সব অভিজ্ঞতার সত্যতা সযত্নে তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তবে তারই একটা ক্ষুদ্রতম দৃষ্টান্ত আমি তোমাকে দিতে পারি যেখানে তুমি এ-সব অভিজ্ঞতার স্মৃতিভর রূপ খানিকটে ষাটাই করে নিতে পারবে।

কোনো কোনো রুগীকে সারাবার জন্ত তিন তিন বার অজ্ঞান করে অপারেশন করতে হয়। প্রথমবারে সে অতটা উরায় না, কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের মধ্যে কয়েক দিন এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বারের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ তার কী করে কেটেছিল, সে কথা তুমি তাদের কাউকে জিজ্ঞেসা করলে অনায়াসেই জেনে যাবে। তিন বারের পরও যদি সে না সারে, তখন, জান সোম, সে আর দ্বিতীয় কিস্তিতে চতুর্থ বারের মতো অপারেশন করাতে সম্মত হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে, এদিক ওদিক লুটতে লুটতে খাট থেকে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণা এড়াবার জন্ত আত্মহত্যা করবে বলে কাকুতি-মিনতি করে বিবের জন্ত, কিন্তু তবু আবার অপারেশন করাতে রাজী হয় না। তার সর্বক্ষণ মনে পড়ে, প্রথম অপারেশনের ক্লোরোফর্মের জড় নেশা কেটে যাওয়ার পর সে কী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিল, চিৎকার করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, গোঙরাতে গোঙরাতে মুখ দিয়ে শুধু ফেনা বের করেছিল।

সোম, আমার কিন্তু নিষ্কৃতি ছিল না। চিন্ময় বেদনার জগতে কোনো সরকারী আইন নেই, ডাক্তারী কোড নেই যে রোগীর বিনা অহুমতিতে তার অপারেশন করতে পারবে না। আমার মুখের প্রথম অপারেশনের ফেনা শুকতে না শুকতেই আমাকে সেই দুশমনের মতো যমদূতদর্শন ভোমেরা টেনে নিয়ে যেত অপারেশন ঘরের দিকে। সেখানে আমাকে অপারেশন করা হত অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্ধতিতে—যখন ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হয় নি। তারা আমাকে দুপায়ে তুলে ধরে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে ভিরমি খাইয়ে, কিংবা তাতেও না হলে মাথায় ডাঙশ ঘেরে অজ্ঞান করে অপারেশনের জন্ত তৈরী করত। ছুরির দ্বা ক্লোরোফর্মের নেশাকে কাটতে পারে না বলে আজকের দিনে অপারেশন চলে রোগীকে যন্ত্রণা না দিয়ে। আমার বেলা কিন্তু ছুরির দ্বা আমাকে সংবিত্তে ফিরে নিয়ে আসত আর আমি সজ্ঞানে দেখতুম, আমার উপর ছুরি চলছে। পাছে আমার বিকৃত চিৎকারে সার্জনদের অপারেশন করাতে বাধা জন্মায় তাই ভোমরা আমার মুখ চেপে ধরে রাখত। শুড়ের শুড়ের শরীর যে তার টব্‌চার

থেকে খানিকটে—সে কত অল্প—নিষ্কৃতি পাবে তার সর্ব পছা বন্ধ।

চোখের সামনে মেব্লকে দেখতে হত প্রতিদিন।

কেন আমি তাকে খুন করলুম না প্রথম দিনই?

কিন্তু তার দোষ কী? সে তো আর আমাকে ত্যাগ করে ঐ বাটলারটাকে গ্রহণ করে নি। বন্ধ পাগলও আমাদের দুজনকে একসনে বসিয়ে বিচার করবে না। আমার মনে হয় বহু বাজারের মেয়েও তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি?

ঐখানেই তো ভুল। জয়ন্ত্বের থাকবার মত কিছুই নেই, সত্য, কিন্তু তার একটা সম্পদ আছে যেটা আমার নেই। সে সম্পদ কুকুর-বেড়ালেরও থাকে, সে কথা বলে লাভ কী? যে মানুষ দু মিনিট বাদে মরবে তাকে কি এই বলে সাহুনা দেওয়া যায়, তুমি মরে যাবার পরও অনেক কুকুর-বেড়ালও বেঁচে থাকবে, তাই বলে কি তাদের বাঁচাটা তোমার মরার চেয়ে বড়? মেব্ল তো নিয়েছিল মাত্র এইটুকুই। তাকে ও জিনিস যে কোনো পুরুষই দিতে পারত। স্কুবার তাড়নায় মানুষ যে রকম নর্দমা থেকে খুঁটে তুলে তুলে ভাত খায়। তাকে কি আমরা দোষ দিই?

গোড়ার দিকে আচ্ছন্নের মতো বসে এই সব চিন্তা করেছিলুম কিন্তু তখন সব ছিল ছেঁড়াছেঁড়া! কোনো বিশেষ চিন্তা বা যুক্তি নিয়ে সেটাকে যে তার চরম ফৈসালার ফেলে গ্রহণ বা বর্জন করব সে শক্তি আমার ছিল না। ফডিঙের মতো আমার মন এ-ঘাস থেকে ও-ঘাসে ক্ষণে ক্ষণে লাফ দিত, কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না। আজও যে পারি তা নয়। তবে কয়েক মাসের জন্ত একবার পেরেছিলুম, এমন কি সেই অহুযায়ী কাজও করেছিলুম, এবং সেইটে বলবার জন্তই তো এই চিঠি লেখা। সে কথা পরে হবে।

সব জেনে বুকেও আমার মন অহরহ এক অঙ্ক আক্রোশে ভরে থাকত।

তুমি তো জানো আমাদের সিভিল সার্জন আর্মস্ট্রংয়ের মেম তার ছোকরা আরদাগিটাকে মোটর-সাইক্ল কিনে দিয়েছিল। এ শহরে কে না জানত তার স্বল্পায় কারণ। ওদিকে আর্মস্ট্রং তো আমার মতো মল্লভাগ্য ছিল না? মেম যখন ভারতীয় তাগড়া ছোকরার বাদামী রঙ, কালো চুল আর প্রাচ্যদেশীয় বর্বর চোখের (যাক করো) লোম, আমি তোমাকে অপমান করছি নে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার দেশে খানদানীরা যে রকম আমাদের ভুলনায় ঢের বেশী মার্জিত, ঐকি তেমনি তোমাদের চাষা-ভূবোরা আমাদের মজুরদের চেয়ে অনেক বেশী

প্রিমিটিভ, অনেক বেশী সেক্সি) প্রাণ-মাতানো নেশায় মজে গেল, তখন গোড়ার দিকে আর্মস্ট্রং বেশ কিছুটা চোটপাট করেছিল। এমন কি, আমার মনে হয় সে ইচ্ছে করলে আরদালিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারত—মেম আর কী করতে পারত—কিন্তু সে করে নি। আমার মনে হয়, প্রাণবন্ত স্বাভাবিক ঘোঁশ-শক্তিশালী পুরুষ এসব ব্যাপারে অনেকখানি ক্ষমাশীল হয়, ‘টু হেল, চুলোয় থাকগে,’ বলে সে শাস্তমনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে যায়। ঠিক কথা, কারণ আর্মস্ট্রং গিয়েছিল তেরিয়া হয়ে, উইথ ভেন্‌জেন্স। ঐ যে, কী সে বক্সওয়ালারটার নাম, যে তার টিলার কুলী মেয়েদের হারে ম পুষত? আর্মস্ট্রং তো প্রায়ই ওদিক পানে না-পাক্তা হয়ে যেত।

আবার দেখো, কিছুদিন পরে সায়েব মেম দুজনাতে ফের বেশ ভাব হয়ে গেল। আরদালি যে বরখাস্ত হল তা নয়, আর্মস্ট্রংয়ের হারে মগমনও বন্ধ হল না। ক্লাবে যেন তখন কোন্ এক সুরমিক বলেছিল, সিভিল সার্জন পরিবার দিশী-বিদেশী দুই খানাই পছন্দ করেন।

এ হল প্রাণবন্ত নরনারীর স্বাভাবিক দোঁভাগ্য—তার একটা ‘মডুস ডিভেপ্তি’ বঁচে থাকার পন্থা খুঁজে নিতে পারে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী সেখানে কেউই পদদলিত কিংবা অপমানিত হয় নি। অপমান, আমার মনে হয়, আত্মার মৃত্যু। আর আত্মা যখন মরে যায় তখন মাহুয হয়ে যায় পশু। নির্মম জিঘাংসু এবং মারাত্মক পশু, কারণ আত্মা মরে গেলেও তার থেকে যায় বুদ্ধিবৃত্তি, যে বুদ্ধিবৃত্তি পশুর নেই। সে তখন হয়ে যায় হাইড্। যত রকম পাশবিক, নারকীয় জঘন্ট পাপ তখন সে করতে পারে তার আহির-মনীয় বুদ্ধি, ছলচাতুরী দিয়ে।

আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু তার সব কথা বলার সময় এখনো আসে নি।

ঐ সময়ের অনেক কিছুই আমার মনে পড়ছে। তার একটা তোমাকে বলি।

জানো তো, পাত্রী জোনস্ গুড়ি-গুড়ি লোক, তোমরা যাকে বলে, ‘ভালোমাহুয’। ধার্মিক লোক আকস্মিকই তাই হয়। যদিও তাঁর অজানা ছিল না যে আমি তাঁকে পর্যন্ত বর্জন করেছি, তবু ভক্তলোক রাস্তায় একদিন বেয়াক্স দেখা হয়ে ষাওয়াতে আমার সঙ্গ নিল—আমি তো তাঁকে গুড় ঈভনিং বলে কেটে পড়ার চেষ্টাই করেছিলুম। আমি যে অশান্তিতে আছি সে কথা তো তাঁর অজানা ছিল না, কিন্তু সে অবস্থাতে যে পাত্রীর উপদেশে কোনো ফললাভ হয় না, সে তত্ত্বও তিনি জানতেন না।

ইতি-উতি করে, ভোল্ট্ পোক্ ইয়োর নোল্ ইন্ মাই অ্যাক্শ্যার্স (আপন চরকার তেল দাগে—এর তুলনায় অনেক মোলায়েম) এটা শোনার জন্ত বেশ তৈরি হয়েই ভক্তলোক আমাকে বললে, যার মর্মার্থ, ইতি-উতিটা বাদ দিয়ে বলছি সাদামাটা ভাষায়ই, তোমার কী বেদনা তা আমি জানি না। কিন্তু জানি, তুমি স্থূল ছিলে, তুমি ধর্মভীরু। তাই বলছি, ভগবান যদি তোমাকে অস্থূলী করে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তার কোনো কারণ আছে। যখন সে যুক্তি আমরা খুঁজে পাচ্ছি নে তখন তুমি এই ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দাও না কেন যে, আমার তোমার চেয়েও অস্থূলী লোক এ সংসারে আছে।

সারুমন্টার মধ্যে খানিকটে সত্য আছে নিশ্চয়ই। ঐ যে আমাদের বাদরটা, হার্ভে, কী কুচ্ছিত তার চেহারা, আর তার বিদ্যুটে জামাকাপড় আর চলন-বলন। ক্লাবে কোনো মেয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে চায় না, তার গা থেকে যা দুর্গন্ধ বেরোয় তাতে আমরাই নাক চেপে বাপ-বাপ করে পালাই। খাস খানদানী ইংরেজের বাচ্চা, পাত্রী-টিলার যে কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে জাতে উঠতে পারে কিন্তু বেচারীর কী দুঃবস্থা! সেখানেও ক্রিসমাসের রাস্তিরে গিয়ে পাস্তা পায় নি—কোনো মেয়ে তার সঙ্গে নাচে নি। নেচেছিলেন একমাত্র বুড়ী পাত্রীমেম। তাঁর কথা আলাদা, অসাধারণ নারী।

আমি সে রাতে ক্লাব এড়াবার জন্তে পাত্রী-টিলায় গিয়েছিলুম। মেয়েরা যা খুশি হয়েছিল তার স্মৃতি চিরকাল আমার মনের মধ্যে রইল। সেই আনন্দ লব্ধকে আতরের মতো মেখে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন দেখি হার্ভে তার মুখে ক্রন্দ আর গ্লানি মেখে নিয়ে শ্লথ গতিতে বাড়ি ফিরছে।

আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলুম, কিন্তু জান, সান্ত্বনাও পেয়েছিলুম পাত্রীর সারুমনের কথা ভেবে যে, আমার চেয়েও দুঃখী এ সংসারে আছে। বাড়িতে, আমার বৃকের ভিতর যে জ্বালা জ্বলে জ্বলুক; কিন্তু সমাজ তো আমাকে বেদনা করে না।

এই সান্ত্বনা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি, টেবিলের উপর একটা ক্রিসমাস প্যাকেট। খুলে দেখি, হাউসম্যানের কবিতার বই। আমার বন্ধু আর্নল্ড পাঠিয়েছে। ও বই আমি সে রাস্তিরে পেতুম না, কারণ সেদিন মধুগন্ধে ডাক বিলি হয় না। কিন্তু পোস্টমাস্টার লাহিড়ী গভীর রাত্রেও ইংরেজদের ক্রিসমাস ডাক বিতরণ করাত।

কবিতার বই। বেখানে খুশি পড়া যায়। খুলতেই চোখে পড়ল,

Little is the luck I've had

And oh, 'its comfort small
To think that many another lad
Has had no luck at all.

যে সাক্ষ্যটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম সেই মুহূর্তেই সেটি অন্তর্ধান করল। আর্নল্ড নয়, পাঠিয়েছিল আহির মন।

সব খবরই ক্রমে ক্রমে ক্লাব-বাড়িতে পৌঁছেছিল সে-কথা আমি জানি, কিন্তু কী চেহারা নিয়ে পৌঁছেছিল সে-কথা বলতে পারব না। একই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে দুই সত্যবাদী লোক যে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দিতে পারে সে সত্য, পুলিশের লোক হিসেবে, আমরা বেশ ভালো করেই জানি এবং সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই যে আসামী নিষ্কৃতি পায় সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়।

আগাধর আমাকে বেকসুর খালাসি হয়তো দেয় নি, কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে, এ ব্যাপার নিয়ে ক্লাবের মুকব্বিরা বেশী নাড়াচাড়া করতে তো চানই নি, যতদূর সম্ভব ধামা-চাপা দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। এ স্থলে যে তাঁরা 'যুমন্ত কুকুরটাকে শুধুমাত্র জাগাতে চান নি' তাই নয়, 'বাকিং ডগটাকে' পর্বন্ত স্ট্রাউল করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকখানি সক্ষমও হয়েছিলেন।

'বক্সওলাদের' নিয়ে আমিও বেথেয়ালে আর পাঁচজনের মতো ছোটখাটো ঠাট্টা-রসিকতা করেছি, কিন্তু যখনই তলিয়ে দেখছি, তখনই মনের ভিতর লজ্জা পেয়েছি। বক্সওলাদের তুলনায় আমি ভদ্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক, আর এ সংসারের রীতি, দৈবত্ববিপাকে বড়র যখন মাথা নিচু হয় তখন ছোট তাই দেখে হাসে। 'সার্ভ হিম রাইট', বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, তার মুখে তখন ঐ এক কথা। এই নিয়ে বাড়লায়ও একটা জোরদার প্রবাদ আছে, সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা, কারণ বাড়লা শেখার সময় তুমিই আমাকে এই প্রবাদের বইখানা দিয়েছিলে। বাড়লাটা আমার আর মনে নেই, তাই ইংরিজীটাই দিচ্ছি। 'হুয়েন্ দি এলিফেণ্ট লিঙ্ক্ ইনটু দি মায়ার, ঈভন্ দি ক্রগ্ গিভন্ হিম্ এ কিঙ্ক !' আমাদের দেশের তুলনায় তোমাদের দেশে বড়-ছোটর পার্থক্য অনেক বেশী, তাই বোধ করি তোমাদের তুলনাটায় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিটা ফুটে উঠেছে বেশী।

ক্লাব বাড়ির কোনো কোনো ব্যাঙ নিশ্চয়ই আমাকে লাগি মেরেছে, কিন্তু সেখানকার গুণ্ডার, হিপো, অর্থাৎ মাদামপুর বিস্কুছড়া তাঁদের জিভের লকলকানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর দৃষ্টান্তওদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয় কি ?

তবেই দেখ, আহির মজদাও হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। আহির মনের ক্রুর সর্পদংশনে আমার অন্তরাত্মা যাতে করে জর্জরিত না হয়ে যায় তাই তিনি আমার ধমনীতে ঢেলে দেবার চেষ্টা করলেন ক্লাব বাড়ির অবাচিত সহৃদয়তার সঞ্জীবনী স্বধারস।

কিন্তু জ্ঞান, সোম, শক্ত ব্যামোতে ওষুধ যদি ঠিক মাত্রায় না দেওয়া হয় তবে ফল হয় উলটো। বিষ তখন সেই ওষুধ থেকে নূতন শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। বীজাণুকে সিদ্ধ করে মারতে গিয়ে তুমি যদি জল যথেষ্ট না কোটাও তবে জল আরো বেশী বিধিয়ে ওঠে। আমার বেলা হল তাই, এবং সেই জিনিসটাই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। আহির মন আমাকে তার দাসাঙ্গদাস করে ফেলল।

আমি ক্লাব বাড়ির সদাশয়তা দেখে, উপলব্ধি করলুম, সংসারে যত বড় অজ্ঞায় অবিচার হোক না কেন, ধর্মের অনাচার অধর্মের যতই প্রসার হোক না কেন, একদল লোক সেটাকে চাপা দেবার জন্তে উঠে পড়ে লেগে যায়। এবং আশ্চর্য, তারা যে অসাধু তাও নয়। মাদামপুর বিমুগ্ধা এঁরা দুজনাই অতিশয় সহৃদয় ভদ্রলোক। এ পাপ ছড়িয়ে পড়লে অর্থাৎ আমাদের কেলেঙ্কারির কথা রাষ্ট্র হলে, ইউরোপীয় সমাজের অকল্যাণ হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা সেটা চেপে রেখেছিলেন।

অর্থাৎ পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে—ধেমন আমার বেলায়—সজ্জনরা সে পাপ লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন!

এ-সম্বন্ধে বাকি কথা পরে হবে।

তুমি তখন ছুটি নিয়ে কাশী না গম্বায় কোথায় গিয়েছ।

এদিকে মধুগঞ্জে এল বত্মা।

দিন সাতেক ঝামাঝম বৃষ্টি। তারপর দিন তিনেক পিটির-পিটির। তাই নিয়ে হুশিষ্ঠা করার কিছু নেই, কারণ আমাদের বছরের বরাদ্দ একশ বিশ ইঞ্চির তখনো একশ ইঞ্চি হয় নি। এমন সময় কোনো রকমের পূর্বাভাস না দিয়ে পাহাড় থেকে হুড়হুড় করে নেমে এল সাত-হাত-উঁচু জলের এক ধাক্কা। সঙ্গে নিয়ে এল বিরাট গাছের গুঁড়ি আর কুঁড়েঘরের আন্ত চাল। তার উপর আঁকড়ে ধরে আছে মৃত্যুভয়ে কম্পমান শত শত নরনারী, পশুপাখী, এমন কি, সাপ-বিজুও। সকলের সম্মুখেই মৃত্যু যখন সশরীর বর্তমান, মানুষ তখন সাপকে

মারে না, সাপ মানুষকে কামড়ায় না। স্ত্রধার উল্লেখও নিশ্চয় তখন হয় না— একই বাশের উপর আমি তখন সাপের কাছে ইঁহরকে বসে থাকতে দেখেছি। আর জলের তাড়া খেয়ে সাপ তো আমার ভিড়িতে আশ্রয় নিতে খেয়ে এসেছে কত গুণা—ওদিকে মাঝিরা লগি দিয়ে জলে ঝপাঝপ মার লাগাচ্ছে তারা যেন না আসে—তবু আসবেই।

মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত নরনারী উদ্ধারের জন্য চিংকার পর্যন্ত করছে না। গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই করেছিল। এখন বোধ হয় গলা ভেঙে গিয়েছে। আর বাঁচাবে কে? যে কথানা নৌকো ভেসে যাচ্ছে, সেগুলো মানুষের ভারে এই ডোবে কি ঐ ডোবে। যে লোকগুলো নৌকায় আশ্রয় পেয়েছে তারা আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে হয়ে গিয়েছে কঠিন। আস একটি মাত্র শিশুকেও তারা নৌকায় স্থান দিতে নারাজ।

জলের উপর দিবারাত্র ভেসে চলেছে অগুনতি মড়া। গোরু, বাছুর, শেয়াল, কুকুর, মোষ—হাতি পর্যন্ত। ভেবে আমি ক্লকিনারাই পেলুম না, পাহাড়ের উপর কতখানি ভোড়ে জলের স্রোত নেমে আসলে একটা হাতি পর্যন্ত বেকাবু হয়ে নদীর জলে ভেসে এসেছে। একটা হাতি কোনোগতিকৈ সঁতার কেটে কেটে পাড়ে এসে উঠল আমারই টিলার নিচে। দেখেই বুঝলুম, বুনো। তখন সে নির্জীব, কিন্তু পরে না আশপাশে আতঙ্কের স্রষ্টি করে, সেই আশঙ্কায় ওটাকে গুলি করে মারব কি না যখন ভাবছি, তখন মধুমাধব জমিদারির মাহুত—উঁচু জায়গার সন্ধানে সে তার হাতি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমার পিছনের টিলায়—তাকে দিব্য পোষ মানিয়ে নিয়ে গেল আপন হাতির সঙ্গে বনের ভিতর। ষাবার সময় আমাকে সেলাম করে বলল, ‘এ হাতি আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেছে হজুর।’ এ হাতি আর কখনো বনে ফিরে যাবে না, কারো অনিষ্টও করবে না। হাতি তো নেমক-হারাম জানোয়ার নয়।’

শুধু জল আর জল। বর্ষার প্রথম ধাক্কাতেই কাজলধারার কালো জল ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। এখন সে হয়ে গেল সাদা। কিন্তু ধবল-কুষ্ঠের মতো কী রকম যেন এক বীভৎস সাদা। কোনো কোনো সাপের গায়ে আমি এ রঙ দেখে শিউরে উঠেছি এবং বিবাক্ত কি না সে থবর না নিয়েই মাথা ঝাটিয়ে দিয়েছি। এ জলের মাখায় যদি লাঠি মেরে কেউ তাকে মেরে ফেলতে পারত!

প্রথম ধাক্কাতেই বান ভেঙে দিল আমাদের নদীর পাড়। ডুবিয়ে দিল শহরের নীচু জায়গার বাড়িঘর। ভাগ্যিস প্রথম জোর মারটা এসেছিল দিনের বেলায়, না হলে কতো লোক এবং আমাদেরই চেনা লোক যে এক ঝুম থেকে

আরেক ঘূমে চলে যেত তার সন্ধান পর্বন্ত আমরা পেতুম না। তারা আশ্রয় নিল জাত-বেজাতের নৌকায়, বাকিরা এসে উঠল টিলা-টালার উপরে। আমাদের মধুগন্ধে আছে কটাই বা তাঁবু! তারই সব কটা পড়ল এখানে-ওখানে। বাকিরা টিলা থেকে ভাল-পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তুললে চালাঘর। মুদীরাও আশ্রয় নিয়েছে সেইখানেই—আর যাবেই বা কোথায়? তোমার পরিবারের আশ্রয়ের জন্তে আমি আমার ভাওয়ালি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। সে নৌকো এনে বাঁধা হল আমার টিলার নিচের বটগাছের সঙ্গে।

আশ্চর্য, শহরে কোনো কুকীর্তি হলে আমরা যে কটা ভ্যাগাবণ্ড বকাটে ছোড়াকে সন্দেহ করে ধরে এনে তাদের ধরে চোটপাট লাগাতুম, তারাই দেখি সকলের পয়লা কোমর বেঁধে লেগে গেল উদ্ধারের কাজে। এক মুহূর্তেই কোথায় গেল তাদের তাস-পাশা, ইয়াকি-খিস্তি। আর সবচেয়ে ত্যাঁদোড় ঐ পরেশটা—যে আমার বাগানের লিচু পর্যন্ত চুরি করেছে, রায়বাহাদুর কাশীন্দরকে পর্যন্ত যে আড়াল থেকে মুখ ভ্যাঙচায়—সে দেখি তার ইয়ারদের নিয়ে কলাগাছের ভেলা বানিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর উপরে। সেই বানের ভরা গাঙে! কত লোক বাঁচাল তারা! দিনের শেষে, সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখি আর সবাই চলে গিয়েছে, সে একা ভেলার উপরে বসে নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। গায়ে ধুতির ভিজ্ঞে খুঁট। আমার বয়ষাতিটা আমি তার দিকে ছুঁড়ে দিতে সে সেটা লুফে নিয়ে আমার দিকে ফের ছুঁড়ে ফেরত দিলে। বজ্রিখানা দাঁত বের করে একান ও-কান জুড়ে হাঁ করলে—এই হল আমাদের ‘থ্যাক্স, নো’র বাঙলা অম্ববাদ।

তুমি জান মোম, বস্তার পর শহরে কোনো কুকর্মের জন্ত ওদের সন্দেহ করলে, ডেকে শুধু ‘বাপু, বাছা,’ করতুম, দু-একবার জেনে শুনে ছেড়ে দিয়েছি। কড়া কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় নি।

আহর মজদার আর আহির মনে নিরন্তর একী বন্দ! আহির মনের যে চেতার জালায় উদয়ান্ত সমস্ত পাড়া অতিষ্ঠ, সন্ধ্যার সময় সে দেখি হঠাৎ আহর মজদার ডাকে ‘হা-জি-র’ বলে তৈরী, প্রাণটা খোলামকুচির মতো বস্তার জলে ডুবিয়ে দেবার জন্ত প্রস্তুত!

তোমার বিশ্বাস, কোনো কোনো মাছধ পাণাত্মা—ক্রিমিনাল মাইণ্ড নিয়ে জন্মায়। শেষবারের মতো বলেছি, তা নয় মোম, এরা সব মিস্ফিট। এরা শুধু সন্ধ্যার মাকখানে জীবসন্তার চৈতন্তবোধে বেঁচে থাকার আনন্দ (জোয়া শু ভিত্তর) পায়। দৈনন্দিন জীবন এদের কাছে অসহ্য একঘেয়ে বলে মনে হয়।

আমার দেশে এ রকম ছোড়ারা পল্টনে ঢুকে গিয়ে আপন জীবনের সার্থকতা পায়। তাই বাঙালী পল্টন খোলা মাত্রই আমি সর্বপ্রথম এদেরই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এরা যে সেখানে স্থান্য করেছে, সে কথা তোমার অজানা নয়।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লাম।

সেই সর্বব্যাপী হাহাকারের ভিতর আমি কিন্তু একটি বড় মধুর দৃশ্য দেখেছি। আমার টিলা, পাঁজী-টিলার চতুর্দিকে যখন আশ্রয়ার্থীরা ঢালা, মাচাঙ বানান্তে ব্যস্ত, ভিজ়ে কঞ্চি-বাঁশ দিয়ে আগুন জালাতে গিয়ে মেয়েরা চোখের-জলে নাকের-জলে, তখন দেখি বাচ্চারা মহোলাসে শেফালীয়ারের ‘প্রিম্রোজ্ পাথ টু ইটানেল বন-ফায়ারের’ পিকনিক চডুই-ভাত বনের ভিতর সফল করে তুলেছে। এদের একের অগ্নের সঙ্গে দেখা হয় ইন্সুল ঘরে, কিংবা খেলার মাঠে তা-ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আজ যেন তারা সবাই এক বিরাট বাড়ির প্রকাণ্ড পরিবার। সে বাড়ির ছাদ আকাশ, দেয়াল টিলাগুলো, খেলবার জন্য ছুনিয়ার গাছপালা, টিপ-টিপা আর নাশ্তার জন্য পিষ্টি-বৈচিমন, আনারালি, কালোজাম, বুনো কাঁঠাল। আর সবচেয়ে বড় আনন্দ, বাপ মা শাসন করে না, তারা আশ্রয় নির্মাণে মগ্ন। এরা যত বাইরে বাইরে কাটায় ততই মগ্ন। এই হুমুমানের জালায় টিলার হুমুমানগুলো তখন বাপ-বাপ করে এ তলাট ছেড়ে পালিয়েছিল।

শেষটায় জল এসে ঢুকল আমার লিচুবাগানে।

আগে ছিল আমার বাড়ির সামনের গাছপালার সবুজ, তারপর কাজলধারার কালো জল, তারপর ফের ধানক্ষেতের কাঁচা সবুজ এবং সর্বশেষে কালাই পাহাড়ের নীল রঙ। এখন আমার আর পাহাড়ের মাঝখানে শুধু নোংরা খোলা জলের একরঙা উদরী রোগীর ফুলে-উঠা পেটের মতো এক ভয়াবহ সত্তা। তারই মাঝে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছে কোনো ঘর, আর কোনো ঘর মাথা অবধি ডুবিয়ে—জলের উপর শুধু টিনের চারখানা চাল বসে আছে, মোষ যে রকম সর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়ে দিয়ে শুধু মাথাটা উপরে ভাসিয়ে রাখে। সবকিছু জলে একাকার বলে আসল নদীটি কোথায়, সে শুধু বোকা যাচ্ছে, তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া কালো কালো টিপি থেকে—মড়া মোষ, শুয়োর, গরু আরো কত কী! আর আমার বারান্দায় লক্ষ লক্ষ কেঁচো—সাপ পর্বন্ত ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সত্যি বলতে কী, তখন এ-সব দেখেও দেখি নি। আজ দেখছি, আমার অজানতে মন অনেক কিছু স্মরণ রেখেছে। আমি তখন পাঁচশটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, যে-সব কাজ সম্বন্ধে আমার কণামাত্র অভিজ্ঞতা নেই।

তোমাদের জাতটা এহনিতে বড় ইনভিসিবিলিও কিন্তু বিপদের সময় আমাদের সৈ (সৈ)—৭

তুলনায় তোমরা অনেক বেশী কমনসেন্স ধর। আপনা থেকে কেমন যেন একটা ভিসিগ্নিন তোমাদের ভিতর এসে যায়। তা না হলে আমার সেই পাগলের মতে ছোটোছুটির ফলে ইষ্ট না হয়ে কী যে অনিষ্ট হত বলতে পারি নে।

সাত দিন ধরে আমি কলের মতো কাজ করে গিয়েছি—আমি সংবিত্তে ছিলুম না। এমন কি, আমার জীবনের আপন ট্রাজেডি সম্বন্ধেও আমি অচেতন হয়ে গিয়েছিলুম।

অষ্টম দিনে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সংবিত্তে ফিরলুম। ডাঙশ মেরে মাছুষ একে অন্ধকে অজ্ঞান করে। আমাকে ডাঙশ মেরে আনা হলো সংবিত্তে।

বাঙলোয় এসে শুনলুম, মেবলের বাচ্চা হয়েছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

তোমাদের সকলের মুখে শুনি, কর্ম করে যাবে, ফললাভের আশা ত্যাগ করে। ফল দেওয়া-না-দেওয়া ভগবানের হাতে। এই নাকি তোমাদের সর্ব অভিজ্ঞতা, সর্বশাস্ত্রের মূল কথা।

মা মেরী সাক্ষী, আমি বজ্রার সাত দিন কোনো ফললাভের আশা করে কাজ করি নি। আমি আমার আপন প্রাণ বিপন্ন করে যাদের বাঁচিয়েছিলুম, তাদের কেউ কেউ বজ্রার পর কলেরায় মারা যায়। তাই নিয়ে আমি শোক করি নি। অল্প ফলের কোনো প্ররই তো আমার মনে ওঠে নি।

কিন্তু কর্মফলের লোভ ত্যাগ করে যে মাছুষ কাজ করে গেল, তাকে অর্থাৎ তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রকে বৃষ্টি তোমাদের ভগবান বকশিশ দেন জারজ সন্তান।

১লা ডিসেম্বর

বতই ভাবি মনকে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হতে দেব না, মূল কথা সংক্ষেপে বলে ফেলব, ততই দেখি আস-কথা, পাশ-কথা সব কথাই মনের ভিড় থেকে বাইরের প্রকাশে এসে নিষ্কৃতি পেতে চায়। অথচ মনের গভীর গুহাতে যে সব ভূতের নৃত্য অহরহ চলেছে তাদের একটাকেও তো আমি ভালো করে ধরতে পারছি নে। অজ্ঞানে, সজ্ঞানে, হৃয়ুপ্তিতে, স্বপ্নে এরাই গড়ে তুলছে আমার জীবন-দর্শন—ভেন্ট-আনশাউউঙ—তারই বুদ্ধি শুধু চেতন মনে ভিড় করে, আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা।

সে মনের গুহায় আছে কত প্রাণী,—জারলেট, ডন কিক্সট, ডক্টর জীক্স, নিষ্টার হাইড এবং তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে এদের নাগাজেন আরয় মজরা, আহির

মন, হয়তো ছেলেবেলাকার আমার আরাধ্য দেবী মা-মেরি তখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে ফেলেন নি—এখনো আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, আমার ছেলেবেলাকার শহরের গির্জায় আমি হাঁটু গেড়ে উপাসনা করছি আর তিনি করুণ নয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ; এ স্বপ্ন আমি বড় ডরাই।

কখনো দিনের পর দিন বারান্দায় জড়ের মতো বসে রইতুম ছামলেট হয়ে, আর তাকে ডক্টর জীকল্ কানে কানে বলত, ‘এই ভালো, চুপ করে বসে থাকো। সংসারের অজ্ঞায় অবিচারের বিরুদ্ধে কী করতে পার তুমি? কোন কর্মের কী ফল, তা আগেভাগে, জানবে কী করে!’ ভুলে গেছ, অস্কার ওয়াইল্ডের সেই গল্পটা? প্রভু যীশু এক অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তার পর পথে যেতে যেতে একদিন দেখেন, এই লোকটা এক বারবনিতার দিকে লোলুপ নয়নে তাকিয়ে আছে। প্রভু বিরক্ত হয়ে তাকে শাসন করলেন। উত্তরে সে কাতর-কণ্ঠে বললে, ‘আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, আপনি আমাকে দয়া করে সে শক্তি দিলেন। এখন আমি তা দিয়ে অস্ত্র কী করতুম, বলুন।’ তাই দেখো, কোন কর্মের কী ফল তা স্বয়ং প্রভু যীশুই যখন জানেন না, তখন তুমি, কীটস্ত কীট, তুমি জানবে কী করে? কিংবা স্মরণ করো সেই চীনে গল্পটা। এক জমিদারের ছেলে বনে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে গুম্ব হয়ে গেল। পাড়া-প্রতিবেশী তার বাড়িতে এসে শোক প্রকাশ করে তাকে সাহসনা জানালে। জমিদার ছিলেন জ্ঞানী লোক, শুধু বললেন, ‘এ যে খারাপ হল, জানলে কী করে?’ তার দিনদশেক পরে ছেলেটা বন থেকে ফিরে এল একটা চমৎকার বুনো ঘোড়া সঙ্গে করে। সবাই এসে সানন্দে অভিনন্দন জানালে। জমিদার বললেন, ‘এ যে ভালো হল, জানলে কী করে?’ তার কিছুদিন পর ছেলেটা ঐ বুনো ঘোড়া থেকে পড়ে পা-খানা ভেঙে ফেললে। সবাই এসে শোক প্রকাশ করলে। জমিদার বললেন, ‘এ যে খারাপ হল, জানলে কী করে?’ তার কিছুদিন পর লাগল লড়াই, সম্রাটের লোক এসে ধরে নিয়ে গেল সব জোয়ানদের; ছেলেটার পা ভাঙা বলে তাকে যেতে হল না। সবাই এসে আনন্দ জানালে। জমিদার বললেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবেই দেখো, কিসে কী হয়, বলবে কে?

আর কখনো বা সেই মারমুখো ডন কিস্টটকে আরো গুশকাতে লাগত তার পিছনে দাঁড়িয়ে মিটার হাইড। ‘কী দেখছ, বসে বসে? তোমার লজ্জা-শরম নেই, অপমান-বোধ নেই? তুমি কী একটা পা-পোশ না আস্ত একটা ভেড়ুয়া? আগু-ঘর তোমাকে নিয়ে কী ঠাণ্ডা-ব্যঙ্গ করে তার খবর রাখ? ইভেক নেটিভ,

কাল-আদমী খানসামাগুলো ?' 'এদিকে চোরচোঁট্টার উপর কী রোয়াব ! ওঃ যেন কলকাতার হাই-কোর্টের বড় জজ সাহেব নেমে এসেছেন মধুগন্ধের গুনাহ-হারামি খতম করবার জন্তে, আর ওদিকে নিজের ঘরের বউ যে চুরি হয়ে গেল তার জন্তে কোনো গরম নেই। সায়েবের গায়ে বুঝি মাছের রক্ত—তাও শিঙি মাছের না, একদম পুঁটি।' বুঝলে হে মহামান্যবরেষু, সিন্নোর ডন্ কিথোঁঠে, ব্যাটারা এই কথা কয় কত রঙে কত চঙে ! আর তোমার বাটলারটা ! তওবা, তওবা—তা তোমাকে বলে আর কী হবে ? এইবার লেগে যাও, তোমার—হোঃ, হোঃ, হোঃ, তো-মা-র ছেলের ব্যাপ্টিজমের ব্যবস্থা করাতে !'

এই রকমই একদিন ডন কিক্সট, বা আমি, হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে করলুম বাচ্চার বাপ্তিস্মের প্রস্তাব, জয়সূর্যকে গড-ফাদার বানিয়ে। তোমার মনে থাকার কথা, কারণ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে তুমি।

কাকে অপমান করার জন্ত এ প্রস্তাব আমি করেছিলুম ? মেব্লুকে ? নিজেকে ? কী বলব ? ডন কিক্সট কি কোনো কিছু ভেবে-চিন্তে করে ? তবু লেখক সেরভাস্তেসের মানসপুত্র ডন কিক্সট কখনো কারো কিছু অনিষ্ট করে নি। আমি ডন্ কিক্সটের, পিছনে ছিল যে মিস্টার হাইড।

গির্জাবরের সে দৃশ্য তোমার মনে আছে ? মাঝে মাঝে আমার পর্ষন্ত মনে হয়েছিল, কাজটা বোধ হয় ঠিক হল না।

তখন মিস্টার হাইড ধমক দিয়ে বলেছে, 'ফের !'

আর আহির মন বলেছে, 'জীতে রহো বেটা !'

আমি যা-কিছু করেছি তার জন্ত তোমার কাছ থেকে আমি কোনো করুণা ভিক্ষা করছি নে, কোনো সহানুভূতিও চাইছি না, কিন্তু সোম, আমার ভিতর এই যে গোটা-ছয় ভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি অষ্টপ্রহর অনবরত লড়াই চালাত আমাকে নির্মমভাবে এদিক-ওদিক টানা-হ্যাঁচড়া করত—একটা মড়াকে যে রকম দশটা শকুন ছেঁড়াছেড়ি করে—আমার জাগরণ বিবাক্ত করে রাখত, আমি ঘুমতে গেলেই খাটটা নাড়াতে থাকত, ঘুমিয়ে পড়লে হৃৎস্পের মতো বুক চেপে বলত, জেগে উঠেই দেখতুম তারা সব লোলুপ নয়নে পহর গুনছে, কখন আমি জাগব, কেউ দেবে চোখ ঠোকরে, কেউ ফুটো করে দেবে তালুটা—এরা আমাকে দিয়ে কী করেছিল সেইটে তুমি কিছুটা বুঝতে পারলেই আমি আমার জীবনের এ দ্বিষ্টার কথা আর তুলব না।

আগিলে কাগজপত্র সই করার সময় তারিখ দিতে হয়, খবরের কাগজও মাঝে মাঝে পড়েছি, কাজেই দিন, মাস, বৎসর লখছে সম্পূর্ণ অচেতন কখনো

হতে পারি নি। তাই জানি এই করে করে বছর পাঁচেক কেটে গেল।

সত্যি বলছি, সোম, বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমার জীবনে এ পাঁচ বছরে কিছুই ঘটে নি। লড়াই লেগেছিল বলে প্রচুর খেটেছি, হাট লুঠ বন্ধ করে রেখেছি, স্বদেশী আন্দোলনকে ছড়াতে দিই নি। সাধারণ মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে, তার জীবন বিকাশ লাভ করে এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, বাইরের ঘটনা তার মনকে গড়ে তোলে; আমার সেই মন তার ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে নতুনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমার জীবনের উপর বাইরের কোনো ঘটনা এ পাঁচ বছর কোনো দাগ কাটতে পারে নি।

আর ভিতরের জীবনের কিছুটা ইঙ্গিত তোমাকে দিয়েছি। আর ভিতরকার জট যদি আমি নিজেই ভালো করে ছাড়াতে পারতুম তা হলে তোমাকে বলতুম— আমি পারি নি।

শুধু মেবল্‌ দূর হতে আরো দূরে চলে গেল।

যে মেবল্‌ একদিন মার্গেসেসে দাঁড়িয়ে মভ রঙের রুমাল নেড়ে নেড়ে জাহাজে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, পাড়ে নেমে আমি রেখেছিলুম তার কাঁধে আমার হাত দুখানি, সে চেপে ধরেছিল আমার বাহু দুখানি—সেই মেবল্‌ই হঠাৎ যেন আমাকে পাড়ে ফেলে উঠে পড়ল জাহাজে আর ধীরে ধীরে সে জাহাজ অদৃশ্য হলো অসীম নীলিমার অন্তহীন শূন্যতায়। কাতর আর্তনাদে, কল্পন নিবেদনে আমি তাকে ডাকতে পর্যন্ত পারলুম না।

আর সেই মেবল্‌-ই এই বারান্দাতেই বসে, আমার থেকে তিন হাত দূরে।

শুধু বুঝলুম, আমার জীবন থেকে এ দৃশ্য কখনো যাবে না। শাস্তি আমি কখনো পাব না।

এই ভিসেস্বর

পেট্রিকের জ্বর হয়েছে। সিভিল সার্জন দেখে গিয়েছে। বলেছে ভয় নেই। মেবল্‌ পাশ্চাত্য মুখে বারান্দায় পায়চারি করছে। একবার ছাট্টা মাথায় দিয়ে পাত্রী-টিলার দিকে রওনানা হল। বহুকাল হল সে বাড়ি থেকে আদপেই বেরোয় নি। কিন্তু গেল না। ফিরে এল। তারপর বারান্দায় রেগিঙে দুই কল্লুইয়ে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল।

আমি তো অন্ধ নই। দেখলুম, মাছুষের রসে মেবলের দেহখানির প্রতি অঙ্গটি কী অপকল্প পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য পেয়েছে। যেন এদেশের বর্ষার ভরা পুকুর।

অনেকক্ষণ পরে মেব্ল আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে, 'এদেশের আবহাওয়া পেট্রিকের সইছে না। তার পড়াশুনার ব্যবস্থাও এখানে ঠিকমত হবে না। আমরা বিলেত যাই। তুমিও সঙ্গে চলো না? তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে।'

বহুকাল পরে মেব্ল কথা বলল।

আমি বললুম, 'সেই ভালো। তবে আমি সঙ্গে আসতে পারব না। তোমরা ইংলণ্ডের কোথাও বাড়ি করে থাকো। আমি পরে স্বযোগ পেলে যাব।'

মেব্ল মাথা নেড়ে সায় দিলে। সে কখনো আমার কোনো ইচ্ছায় আপন অনিচ্ছা জানায় নি, নিজের ইচ্ছা তো প্রকাশ করতই না।

এ রকম ধারা কোনো একটা পরিবর্তন আমার জীবন-প্যাটার্নে আসতে পারে সে কথা আমি কখনো ভেবে দেখি নি।

অথচ এ তো কিছু খুদার-খামাখা আজগুबी সমাধান নয়। চার-পাঁচ বছরের লেখাপড়ার সুবিধের জন্তে আমার মতো দু-পয়সাওয়ালা লোকের পরিবার আকছারই তো বিলেত যাচ্ছে।

তবু আমি সমস্ত রাত বিছানায় পড়ে রইলুম অসাড়ের মতো। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল। আচমকা ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে।

দেখি সমস্তা সমাধান করে ফেলেছি। সব সমস্তার সমাধানই হয় ঘুমে, স্বপ্নে কিংবা অবচেতন মনে।

মাত্র যে তিনটি প্রাণীর সঙ্গে আমার জীবনের যোগসূত্র, বরঞ্চ বলি, যে তিনটি প্রাণী আর আমাকে নিয়ে আমার জীবন, তারাই আমার জীবনকে অসহ করে তুলেছে পলে পলে, প্রতি ক্ষণে তারা আমার আয়ু ক্ষীণ করে নিয়ে আসছে, তিন দিক থেকে তিন রাহ আমার জীবনকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে, একদিন বিলুপ্ত করে দেবে। এই নিয়ে আমার সিদ্ধান্তের আরম্ভ। পরের সিদ্ধান্তগুলো এক-এক করে এই :

দূরে চলে গিয়ে আমার উপর এদের শক্তি আরো বেড়ে যাবে। এ সংসারে এরা বেঁচে থাকবে, না আমি বেঁচে রইব ?

আমি।

এরা পাপী, মরা উচিত এদেরই। মেব্ল পাপী, জয়সূর্য পাপী আর পেট্রিক ওদের পাপ-জাত সন্তান। আমি নির্দোষ, আমি কোনো পাপ করি নি। আমি কল্পনিকালেও কারো হকের ধন থেকে একটি কানাকড়িও কেড়ে নিই নি। এরাই

দিয়েছে আমাকে ফাঁকি, এরা বতহিন বেঁচে থাকবে ততহিন আমাকে দেবে শুধু ফাঁকি।

এরা মরে গেলে আমি শান্তি পাব। আমার স্বপ্নের সমাধান হবে।

খুন কী করে করা হয়, তার সব কটা পদ্ধতিই জানি আমরা। তুমি আমি অর্থাৎ পুলিশ। খুনীরা আপন আপন সঙ্গীর্ষ বুদ্ধি অলুয়ায়ী পন্থা বেছে নিয়ে করে খুন। সব খুনের ইতিহাস, বিশ্লেষণ জড়ো হয় থানায়। কোন্ পন্থার কী গলদ, সামান্য কী একটা ত্রুটি কিংবা বিচ্যুতি এড়ালে খুনী ধরা পড়ত না, এসব তত্ত্ব আমাদের ভালো করে জানা। আমরা যদি নিখুঁত খুন না করতে পারি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন কোনো চ্যাঙা লোকও সে চাঁদ ধরবার আশা না করে।

এ তো চ্যালেঞ্জ নয়। এ তো অতি সোজা কাজ। কিন্তু অতি সরল কর্মও অবহেলার সঙ্গে করতে নেই।

আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আমার মনের গুহার হামলেট, কিংসট্র, জীকুল, হাইড, মজদা, মহু সবাই মরে গিয়েছে। এখন যা-সব আমি করতে যাচ্ছি, সে-সব ডেভিড ও-রেলির সম্পূর্ণ নিজস্ব।

নির্দম্ব চিন্তে যে রকম বস্তুর কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম, পেট্রিকের ব্যক্তিগত পরব করার সময় আমি যে রকম স্থির নিশ্চয় হয়ে এগিয়ে ছিলাম, এবারেও ঠিকই তাই।

সকালবেলা জয়সূর্যকে ডেকে বললুম, 'তুমি মেবল্‌দের জাহাজ ধরিয়ে দেবে বোম্বাই, মাদ্রাজ কিংবা অন্য কোনো বন্দরে। সেটা পরে স্থির হবে। তারপর তুমি কিছুদিনের জন্য সেখান থেকে সোজা দেশে যেয়ো। আগে যখন ছুটি চেয়েছিলে, তখন স্ববিধে হয় নি, এখন আমার একলার কাজ আরদালিই করতে পারবে।'।

জয়সূর্য খুশী না বেজার হল তার মুখ থেকে বোঝা গেল না।

আমি সেদিনই কুকটুক সাব ট্র্যাভেল এজেন্সিকে চিঠি লিখে দিলাম, কবে কোন্ বন্দর থেকে কোন্ জাহাজ ছাড়বে, জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, তাড়া কত—ইত্যাদি জানতে। ফলে যে সাত ডাঁই মালমশলা উপস্থিত হল, সে তো ঐ সময় তুমি এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেছ। আমার কেমন যেন আবছা আবছা মনে পড়ছে, সেদিন তোমার সঙ্গে একটু খিটখিটে ব্যবহার করেছিলাম। তার কারণ যদিও তখন আমি ঐসব কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, কিন্তু আসলে তারই আড়ালে আমার অন্ত প্রানটাকে আমি ফিটকাট ওয়াটার-টাইট করে নিচ্ছিলাম।

বাইরের শোটাকে তার কিনিশিং টাচ দেওয়ার জন্য আমার দরকার ছিল হুঙ্ক কয়েকখানা লাগেজ লেবেলের। কোনো কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সি খদ্দেরকে আপন চালাকি দেখাবার জন্য কেবিন বুক হওয়ার পূর্বেই কিছু লাগেজ টিকেট পাঠিয়ে দেয়। যেমন যেমন মেব্লের এক-একটা স্টকেস, ওশ্‌ন ট্রাক তৈরী হতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের উপর সেই লেবেলগুলো স্টেটে দিতে লাগলুম।

ওদের দিকটা তৈরী, এখন আমার দিকটা ঠিক করতে হবে।

মাছুষ মারা তো অতি সহজ, বিশেষ করে সে মাছুষ যখন তোমার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। আসল সমস্যা মড়া নিয়ে। বেশীর ভাগ খুন ধরা পড়ে মড়া থেকে এবং খুনী ধরা পড়ে তার থেকে।

ক্রমে ক্রমে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাস্ক-প্যাটরা তৈরী, রাস্তার জন্য অল্পখরচ খাবার দাবারও প্যাক করা হয়েছে। পরদিন ভোরবেলা আমি মেব্ল্‌দের মোটরে প্রায় হুড়ি মাইল দূরের রেল স্টেশনে পৌঁছে দেব।

সন্ধ্যার সময় চাকরবাকরদের ছুটি দিলুম। তারা যেন ভোরবেলা এসে মালপত্র মোটরে তুলে দেওয়াতে সাহায্য করে।

ডিনারের খবর নিয়ে যখন জয়সূর্য এল, তখন আমি হঠাৎ মেব্ল্‌কে বললুম, 'আজ এ ডিনারে জয়সূর্য আমাদের সঙ্গে বসে থানা থাক।'

মেব্ল্‌ অবাক হয়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে আপত্তির চিহ্ন ছিল।

আমি বললুম, 'আকটার অল, ও তোমাদেরই একজন। অন্তত এক দিনের জন্য তাকে তার ছায্য সম্মান দেখানো উচিত।'

মেব্ল্‌ চুপ করে রইল।

থানা টেবিলে জয়সূর্যকে বসতে দেখে পেট্রিক খুশি।

আমি বললুম, 'বাটলার, তুমি সুপটা নিয়ে এসো; মেব্ল্‌ তুমি নিয়ে আসবে মাংস; আর আমি নিয়ে আসব পুডিং।'

ব্যবস্থাটা সকলের মনঃপূত হল কি না তা ভাববার ফুরসত নেই। আমাকে আমার প্র্যান-মাসিক কাজ করে যেতে হবে।

সে এক অদ্ভুত ডিনার। সবাই চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে।

পুডিং আনার জন্য আমি গেলুম রান্নাঘরে।

পকেটে আর্সেনিক ছিল। ভাস্কারি শাস্ত্রে যে পরিমাণের প্রয়োজনের কথা বলে জর্জ চেন্নে একটু বেশী করেই জয়সূর্য মেব্ল্‌ আর পেট্রিকের পুডিঙে মিশিয়ে দিলুম।

ওদের ছটকটানি, মৃত্যু-বজ্রণা আমি দেখি নি। আমি ততক্ষণে বড় লিচু-গাছটার কাছে গোর খুঁড়তে লেগে গিয়েছি। কাজ সহজ করার জন্য দুদিন আগে মালিকে দিয়ে সেখানে মোহম্মী ফুল ফোটাবার ক্লাওয়ার বেড খুঁড়িয়ে রেখেছিলুম। এক বস্তা চুনও আনিয়ে রেখেছিলুম।

রাত প্রায় চারটের সময় গোর শেষ হল।

তারপর লাগেজগুলো নিজে মোটরে তুললুম চাকরদের আসবার আগেই বেরিয়ে যাব বলে, তাদের বলেছিলুম ছটায় আসতে। স্টেশনের পথে দশ মাইল দূরে ঝড়শীছড়া নদীর উপর যেখানে পোল, তারই ডান দিক দিয়ে যে ছোট্ট রাস্তা তারই উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে লাগেজগুলোর সঙ্গে ইট বেঁধে ডুবিয়ে দিলুম নদীর গভীরে।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম।

আমাদের মহাকবি বলেছেন, ঘুম সঞ্জীবনী রসে প্রাণকে নবজীবন দান করে। সে কথা আমি মানি। কিন্তু তার উল্টোটাও হয়, তুমি লক্ষ্য করেছ কি? নিশ্চিন্ত মনে ঘুমতে গেলে, ভাবলে অস্বস্ত ঘন্টা দশেক গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকবে। আধঘন্টা যেতে না যেতেই হঠাৎ পা দুটো হাঁচকা টানে মটান খাড়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল।

শুনি আহির মনের অট্টহাসি। যে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এতদিন প্রাণের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঠিক ঠিক নিখুঁত-পরিপূর্ণ করে সমস্ত কর্ম সমাধান করলুম, ঘুম ভাঙতেই দেখি পায়ের তলার সে দৃঢ় ভূমি হঠাৎ ভলভলে কাঁদা হয়ে গিয়েছে আর আমি ক্রমাগত তলার দিকে ডুবে যাচ্ছি। ঘামে আমার সর্ব শরীর ভিজ্ঞে গিয়েছে, আমি কলাপাতার মতো থরথর করে কাঁপছি। আমার শরীর, আমার মন আমার কজোর বাইরে চলে গিয়েছে। হঠাৎ হয়তো বা চিংকার করে ফেলি, ‘আমি খুন করেছি। লিচুগাছটার তলা খোঁড়ো, সব কটা মড়া সেখানে পাবে!’

নিজের গলা সবলে নিজের হাতে চেপে ধরে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করি। দেখি, হাত ওঠে না।

এই হল আহির মনের সবচেয়ে বড় শয়তানি। তোমাকে আত্মপ্রত্যয় দেবে, সাহস দেবে, সব বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হবার হাজারো সন্ধিস্থিত বাতলে দেবে, তারপর যে মুহূর্তে তার ইচ্ছামত কর্মটি সমাধান হয়ে গেল, অমনি তোমাকে তোমার বিভীষিকার হাতে সমর্পণ করে চলে যাবে।

আমি মর্মে মর্মে অহুভব করলুম, বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্বদেশ সর্বশাস্ত্র কেন

সবচেয়ে বড় পাপ বলে নির্দেশ করেছে।

তাই তখনো আমার যেটুকু শক্তি বাকি ছিল, তাই দিয়ে আমি আমার শেষ আশ্রয় আঁকড়ে ধরে রইলুম। সেটা কী?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এখনো আছে, মেবল্দের খোঁজ কেউ করবে না। আমার কিংবা মেবলের জিসংসারে কেউ নেই যে, আমরা কোথায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে। বিলেতে যে দু-একজনের সঙ্গে আমাদের সামান্য পরিচয়, তারা ভাববে, আমরা এদেশে; এদেশের লোক ভাববে মেবল্‌রা বিলেতে। যদি বা কারো মনে কোনো সন্দেহ হয়, তবে সে বিস্মৃহুড়া মাদাম-পুরের মুকুব্বীদের মতো ভাববে, কাজ কি এ পাপ ঘোঁটিয়ে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে হয়তো বেরিয়ে পড়বে, মেবল্‌ ঐ নেটিভ বাটলারটার মিস্ট্রেস হয়ে গোপনে দিন কাটাচ্ছে। হয়তো বিলেতে কিংবা মস্করিতে। মস্করির কথা ওঠাতে মনে পড়ল, একবার আণ্ডা-ঘরে গুজোব রটে, মেবল্‌রা মস্করিতে। তার কারণ, মেবল্‌দের ‘বিলেত যাওয়ার পর’ আমি একবার মস্করিতে বেড়াতে গিয়ে হোটেলে উঠি; সেখানে একটি মেম ও তার বাচ্চার সঙ্গে আলাপ হয়। ওদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতুম বলে কেউ হয়তো আমাদের দেখে মেম এবং বাচ্চাকে ভালো করে সনাক্ত না করতে পেরে খবরটা রটিয়েছিল।

তা সে বিলেতেই হোক আর মস্করিতেই হোক, সে কেলেকারির হাঁড়ি কালা-আদমিদের হাটের মাঝখানে ভেঙে ইয়োরোপীয় সমাজের ক্ষতি বৈ লাভের সম্ভাবনা কী?

এটা আমি জানলুম সেইদিন, যেদিন আমাদের পারিবারিক কেলেকারি নিয়ে ক্লাব আলোচনা করে স্থির করল, এ নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো, ‘লেট দি স্লিপিং ডগ্‌ লাই।’

তাই তোমাকে এই চিঠিতেই জোর দিয়ে লিখেছি, পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। তার ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক স্বার্থ হয়তো আছে, সে পাপ গোপন করার।

কাজেই আমাকে কেউ ধরিয়ে দেবে না।

১লা জুন

প্রিয় লোম,

প্রায় ছ মাস হল তোমাকে আমার চিঠি লেখা শেষ হয়। এরপর যে আবার কিছু লিখতে হবে সে কথা আমি ভাবি নি।

আজ কিন্তু নতুন করে লিখতে হচ্ছে। তার কারণ আমার হিলেবে একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

ত্রিসংসারে আমার বন্ধু নেই। যারা আছে তারা আমার, না-শত্রু না-মিত্র। এরা যাতে আমার খুন না ধরতে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করেছিলুম এবং ধরার কাছাকাছি এলেও কেন যে আমাকে ধরিয়ে দেবে না তার কারণও আমি তোমাকে বলেছি।

কিন্তু অযাচিতভাবে এ সংসারে হঠাৎ যে আমার এক 'মিত্র' দেখা দেবেন এবং আমার 'মঙ্গল' এবং 'উপকার' করতে গিয়ে আমার খুন ধরে ফেলবেন এ কথা আমি কল্পনা করতে পারি নি। তাই হয়েছে।

আমি যুদ্ধের জগৎ অনেক কিছু কবেছিলুম বলে আই. জি. মুক্ত হয়ে আমার সম্বন্ধে যে-সব 'গুজোব' রটেছে সেগুলো খণ্ডন করতে চান। করতে গিয়ে তিনি এবং ভীন সত্যের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছেন, এ খবর আমি পেয়েছি।

এর জগৎ আমি কোনো ব্যবস্থা করে রাখি নি, এখন আর করবারও উপায় নেই।

তাই যদি ধরা পড়ি তবে আমাকে হয়তো বুলতে হবে।

আমার জগৎ শেষকৃত্য হয়তো তোমাকেই করতে হবে।

তাই আমার গোরের উপর নিচের দুটোর যে-কোনো একটা খোদাই করে দিতে পার : .

(For a Godly Man's Tomb)

Here lies a piece of Christ ; a star in dust

A vein of gold ; a china dish that must

Be used in Heaven, when God shall feast the just.

কিংবা

(For a Wicked Man's Tomb)

Here lies the carcass of a cursed sinner,

Doomed to be roasted for the Devil's dinner.

ডেভিড ও-রেলি ।

शब्दम्

অমরাঙ্গা রাজশেখরকে

সাহিত্যচার্য পরম অক্ষানন্দ রাজশেখর বহুকে একখানা পুস্তক উৎসর্গ করিবার বাসনা আমি বহুকাল ধরিয়া মনে মনে পোষণ করিয়াছি, কিন্তু স্বরচনার মূল্য সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিহান থাকি বলিয়া সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গত পৌষে তাঁহার শরীর অকস্মাৎ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়াতে সর্ব শক্তি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দৌহিত্রের মাধ্যমে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্ত তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করি। রাজশেখর সহৃদয় সজ্জন ছিলেন—তাঁহার সদয় অনুমতি লাভ করিয়া অকিঞ্চন কৃতকৃতার্থ হয়।

আজ আমার কোড অপরিমীম যে স্বহস্তে তাঁহার চরণকমলে পুস্তিকাখানি নিবেদন করিতে পারিলাম না।

বাদশা আমাজ্জার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। না হলে আফগানিস্থানের মত
বিশ্বকুটে গোঁড়া দেশে বল-ভাল্লের ব্যবস্থা করতে যাবেন কেন? স্বাধীনতা
দিবসে পাগমান শহরে আফগানিস্থানের প্রথম বল-ডাল হবে।

আমরা যারা বিদেশী তারা এ নিয়ে খুব উত্তেজিত হই নি। উত্তেজনাটা
মোজাদদের এবং তাদের চেলা অর্থাৎ ভিশ্তী, দজী, মুদী, চাকর-বাকরদের
ভিতর।

আমার ভৃত্য আব্দুর রহমান সকালবেলা চা দেবার সময় বিড়বিড় করে
বললে, 'জাত ধম্মো আর কিছু রইল না।'

আব্দুর রহমানের কথায় আমি বড় একটা কান দিই নে। আমি শ্রীকৃষ্ণ
নই; 'জাত ধম্মো' বাঁচাবার ভার আমার স্বন্ধে নয়।

'খেড়ে খেড়ে ছনোরা ডপ্‌কি ডপ্‌কি মেনীদের গলা জড়িয়ে ধেই ধেই করে
নৃত্য করবে।'

আমি শুধালুম, 'কোথায়? সিনেমায়?'

আর আব্দুর রহমানকে পায় কে? সে তখন সেই হবু ভাল্লের যা একথানা
সরেস রগরগে বয়ান ছাড়লে, তার সামনে রোমান কুর্কম কুকীর্তি শিল্প। শেষটায়
বললে, 'রাত বারোটায় সময় সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপর
কি হয় সে-সব আমি জানি নে ছজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার তাতে কি, ভেটকি-লোচন?'

আব্দুর রহমান চুপ করে গেল। 'ভেটকি লোচন,' ওরে আমার আহ্লাদের
ফুটো ঘটি' এসব বললেই আব্দুর রহমান বুঝতে পারত বাবু বদমেজাজে আছেন।
এগুলো আমি মাতৃভাষা বাংলাতেই বলতুম। আব্দুর রহমান ঝাঙ লোক;
বাংলা না বুঝেও বুঝত।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার সময় বেরিয়েছি। পাগমানের কোপে ঝাপে
হেথা হোথা বিজলি বাতি জ্বলছে। পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে পিচ-ঢালা
রাস্তা। আমি আপন মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, এটা হল ভান্ডোর মাস।
কাল জন্মষ্টমী গেছে। আমার জন্মদিন। মা'র মুখে শোন। এখন শিলেটে
নিশ্চয়ই জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মা দক্ষিণের ঘরের উত্তরের বারান্দায় মোড়ার উপর
বসে আছে। তার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে চম্পা তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে
আর হনতো বা জিজ্ঞেস করছে, 'ছোট মিনা ফিরবে কবে?'

বিদেশে বর্ষাকাল আমার কাল। কাবুল কান্দাহার জেরুজালেম বার্লিন কোথাও মনস্থান নেই। ভাদ্রের মাসের পচা বিষ্টিতে মা অস্থির। তাঁর নাইবার শাড়ি শুকোচ্ছে না, ভিজ়ে কাঠের ধুঁয়োর তিনি পাগল, আর আমি দেখছি ছড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে আসছে, খানিকক্ষণ পরে আবার বোদ। আজিনায় গোলাপ গাছে, রান্নাঘরের কোণে শিউলি গাছে, পিছনের চাউর গাছের পাতায় পাতায় কী খুশির কিলিমিলি।

এখানে সে শ্রামল-হৃদয়ের দর্শন নেই।

সর্বনাশ! পথ হারিয়ে বসেছি। রাত ন-টা। রাস্তায় জনশ্রাণী নেই। কাকে পথ শুধাই।

ডান দিকে চাউর ইমারতে নাচের ব্যাণ্ডো বাজছে।

ওঃ! এটা তা হলে আমার ভৃত্য আব্দুর রহমান খান বর্ণিত সেই ডান্স-হল। এ বাড়ির খানশামা-বেয়ারা তা হলে আমাকে হোটেলের পথটা বাতলে দিতে পারবে। পিছনের চাকর-বাকরদের দরজার কাছে বাই।

গেলুম।

এমন সময় গটগট করে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী।

প্রথম দেখেছিলুম কপালটি। যেন তৃতীয়ার কীণচন্দ্র। শুধু, চাঁদ হয় চাঁপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাছাড়ের বরফের মতই ধবধবে সাদা। সেটি আপনি দেখেন নি? অতএব বলব, নির্জলা দুধের মত। সেও তো আপনি দেখেন নি। তা হলে বলি, বন-মল্লিকার পাণ্ডির মত। ওর ভেজাল এখনও হয় নি।

নাকটি যেন ছোট বাঁশী। ওইটুকুন বাঁশীতে কি করে দুটো ফুটো হয় জানি নে। নাকের ডগা আবার অল্প অল্প কাঁপছে। গাল দুটি কাবুলেরই পাকা আপেলের মত লাল টুকটুকে, তবে তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রক্ত দিয়ে তৈরী নয়। চোখ দুটি নীল না সবুজ বুঝতে পারলুম না। পরনে উত্তম কাটের গাউন। জুতো উচু হিলের।

রাজেশ্বরী কণ্ঠে হুকুম ঝাড়লে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খানের মোটর এদিকে ডাক তো।'।

আমি খতমত খেয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলুম।

মেয়েটি ততক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে আমি হোটেলের চাকর নই। তারপর বুঝেছে, আমি বিদেশী। প্রথমটার করাসীতে

বললে, ‘আ ভু দমাদ পার্দো, ম’সিয়ো—মাপ করবেন—’ তারপর বললে ফার্সীতে।

আমি আমার ভাড়া ভাড়া ফার্সীতেই বললুম, ‘আমি দেখছি।’

সে বললে, ‘চলুন।’

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বয়স এই আঠারো-উনিশ।

পার্কিঙের জায়গায় পৌঁছনোর পূর্বেই বললে, ‘না, আমাদের গাড়ি নেই।’

আমি বললুম, ‘দেখি, অল্প কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না।’

নাসিকাটি হাঁকি খানেক উপরের দিকে তুলে মুখ বেকিয়ে অত্যন্ত গাঁইয়া ফার্সীতে বললে, ‘সব ব্যাটা আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে বেলাল্লাপনা দেখছে। ড্রাইভার পাবেন কোথায়?’

আমার মুখ থেকে অজ্ঞান্তে বেরিয়ে গেল ‘কিসের বেলাল্লাপনা?’

মেয়েটি ঘুরে আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে এক লহমায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিলে। তারপর বললে, ‘আপনার কোনও তাড়া না থাকলে চলুন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।’

আমি ‘নিশ্চয় নিশ্চয়’ বলে সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম।

মেয়েটি সত্যি ভারি চটপটে।

চট করে শুধালে, ‘আপনি এদেশে কতদিন আছেন?—পার্দো—আমার ফ্রেন্ড প্রফেসর বলছেন, অজানা লোককে প্রেম শুধাতে নেই?’

আমি বললুম, ‘আমারও তাই। কিন্তু আমি মানি নে।’

বৌ করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, ‘একজাকুংমা, একদম খাঁটি কথা। আপনার সঙ্গে চলছি, কিংবা মনে করুন আমার আকা-জান আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, আর আপনি আমায় কোন প্রেম শুধালেন না, যেন আমি সাপ-ব্যাঙ কিছুই নই, আমিও শুধালুম না, যেন আপনার বাড়ি নেই, দেশ নেই। আমাদের দেশে তো জিজ্ঞাসাবাদ না করাটাই লখৎ বেয়াদবী।’

আমি বললুম, ‘আমার দেশেও তাই।’

ঝপ করে জিজ্ঞেস করে বলল, ‘কোন দেশ?’

আমি বললুম, ‘আমাকে দেখেই তো চেনা যায় আমি হিন্দুস্থানী।’

বললে, ‘বা রে। হিন্দুস্থানীরা তো ফ্রেন্ড বলতে পারে না।’

আমি বললুম, ‘কাবুলীরা বুঝি ফ্রেন্ড বলে।’

মেয়েটা খিলখিল করে হালতে গিয়ে হঠাৎ যেন পা মচকে বলল। বলল,

সৈ (৫২)—৮

‘আমি আর হাঁটতে পারছি নে। উচু-হিল জুতো পরা আমার অভ্যাস নেই। চলুন, ওই পাশের টেনিস কোর্টে যাই। সেখানে বেঞ্চি আছে।’

জমজমাট অন্ধকার। ওই দূরে, সেই দূরে বিজলী-বাতি। সামান্য এক-ফালি পথ দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে এগুতে হল। একটু অসাবধান হওয়ায় তার বাহুতে আমার বাহু ঠেকে যাওয়াতে আমি বললুম, ‘পারদৌ—মাক করুন।’ মেয়েটির হাসির অন্ত নেই। বললে, ‘আপনার ক্রেক অডুত, আপনার ফার্সীও অডুত।’

আমার বয়স কম। লাগল। বললুম, ‘মানমোয়াজেল—’

‘আমার নাম শব্‌নম।’

তদুৎপেই আমার হুঃখ কেটে গেল। এ রকম মিষ্টি নামওয়ালী মেয়ে যা-খুলী বলার হুক ধরে।

বেঞ্চিতে বসে হেলান দিয়ে পা দুখানা একেবারে হিন্দুকুশ পাহাড় ছাড়িয়ে কাতাখান-বদখশান অবধি লম্বা করে দিয়ে বাঁ পা দিয়ে হটুস্ করে ডান জুতো এক লাখে তাশকন্দ অবধি ছুঁড়ে মেয়ে বললে, ‘বাঁচলুম।’

আমি বললুম, ‘আমার উচ্চারণ খারাপ সে আমি জানি। কিন্তু ওটা বলে মানুষকে হুঃখ দেন কেন?’

চড়াক্সে একদম খাড়া হয়ে বসে, মোড় নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, ‘আশ্চর্য! কে বললে আপনার উচ্চারণ খারাপ! আমি বলেছি ‘অডুত’। অডুত মানে খারাপ? আপনার ফার্সী উচ্চারণে কেমন যেন পুরনো আভরের গন্ধ। দাঁড়ান, বলছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠাকুরমা সিন্দুক খুললে যে রকম পুরনো দিনের জমানো মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। অথ হিন্দুস্থানীরা কি রকম যেন ভোঁতা ভোঁতা ফার্সী বলে।’

আমি বললুম, ‘ওরা তো সব পাঞ্জাবী। আমি বাংলাদেশের লোক।’

এবার মেয়েটি প্রথমটায় একেবারে বাক্যহার। তার পর বললে, ‘বা-ক্সা-লা মুহুক! সেখানে তো শুনেছি পৃথিবীর শেষ। তার পর নাকি এক বিরাট অতল গর্ত। যতদূর দেখা যায়, কিছু নেই, কিছু নেই। সেখানে তাই রেলিং লাগানো আছে। পাছে কেউ পড়ে যায়। বাঙালীরাও নাকি তাই বাড়ি থেকে বেরয় না।’

আমি জানতুম, ভারতবর্ষে যে-সব কাবুলী যায় তারা বাঙলা দেশের পরে বড় কোথাও একটা যায় নি। এ সব গল্প নিশ্চয়ই তারা ছড়িয়েছে। আমি হেসে বললুম, ‘কি বললেন? বাঙালীরা তাই বাড়ি থেকে বেরয় না? যেমন আমি? না?’

এই প্রথম মেরেটি একটু কাতর হল। বললে, 'দেখুন, ম'সিয়ো—'

আমি বললুম, 'আমার নাম মজনুন।'

'মজনুন !!!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'মজনুন মানে তো পাগল। জিন্ যখন কারো কাঁধে চাপে তখন "জিন্" শব্দের পাসট্ পাটিসিপল্ মজনুন দিয়েই তো পাগল বোঝানো হয়। এ নাম আপনাকে দিলে কে?'

আমি বললুম, 'আমার বাবার মুরশীদ। দেখুন শব্দনম বাহু, সকলেরই কি আপনার মত মিষ্টি নাম হয়। শব্দনম মানে তো শিশিরবিন্দু, হিমকণা?'

'খুব ভোরে আমার জন্ম হয়েছিল।'

আমি গুন গুন করে বললুম,

“আমি তব সাধী

হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির সিক্ত

প্রভাতের বিচ্ছেদ বেদনা।”

'বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। কবি বলেছেন, শরৎ-নিশি সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখেছে শিউলি ফোটাবার—আর ভোর হতেই গাছকে বিচ্ছেদ-বেদনা দিয়ে ঝরে পড়ল সেই শিউলি।'

শব্দনমের কবিত্ব-রস আছে। বললে, 'চমৎকার! একটি ফুল সমস্ত রাতের স্বপ্ন। আচ্ছা, আমার নাম যদি শব্দনম শিউলি হয় তো কি রকম শোনায়?'

আমি বললুম, 'সে আপনি ধারণাই করতে পারবেন না, বাড়ালীর কানে কতখানি মিষ্টি শোনায়।'

হেসে বললে, 'ফুল সমস্ত কবি কিসাঙ্গি কি বলেছেন জানেন?'

'আমি হাফিজ, সাদী আর অল্প রুমী পড়েছি মাত্র।'

'তবে শুনুন, "গুল্ নিমতীন্-হিদয়া ফিরিস্তাদে আজ্ বেহেশ্-৭,

ময়দুন্ করীমতু শওন্ আন্দু নইম্-ই গুল্ ;

আয় গুল্-করুশ গুল্ চি করুশী বরায়ে সীম ?

ওয়া আজ্ গুল্ অজীজ্-তর চি সিতানী বি-সীম-ই-গুল্ ?'

'অমরবতীর সঙ্গাত এই ফুল এল ধরাভলে,

ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বর্গের দ্বার খোলে।

ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার হয়ে ?

প্রিয়তর তুমি কি কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে ?

আমি বললুম, ‘অদ্ভুত সুন্দর কবিতা। এটি আমার বাঙলাতে অমূল্যবান করতে হবে।’

‘আপনি বুঝি ছন্দ গাঁথতে জানেন ?’

আমি বললুম, ‘সর্বনাশ। আমি মাষ্টারি করি।’

‘সে আমি জানি। এদেশে ছ’ রকমের ভারতীয় আসে। হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, না হয় পড়াতে। তবে আপনাকে এর পূর্বে আমি কখনও দেখি নি। আচ্ছা, বলুন তো, আমানউল্লা বাদশার সব রকম সংস্কারকর্ম আপনার কি রকম লাগে ?’

‘আমার লাগা না-লাগাতে কি ? আমি তো বিদেশী।’

‘বিদেশী হলেও প্রতিবেশী তো। আমি ক্রান্ত থেকে ফেরার সময়—’

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, ‘ক্রান্ত থেকে—’

‘ইংরেজের কল্যাণে বাবাকে নির্বাসনে যেতে হয়। আমার জন্ম প্যারিসে। সেখানে দশ বছর আর এখানে ন’ বছর কাটিয়েছি। যাকগে সে-কথা। দেশে ফেরার সময় বোম্বাই পেশোওয়ার হয়ে আসি। দাঁড়ান, ভেবে বলছি। ঠিক এই আগস্টেই আমরা এসেছিলুম। সে কী বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি! বোম্বাই থেকে লাহোর পর্যন্ত। ঝপ্, ঝপ্, ঝপ্, ঝপ্। গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিলে গিয়ে চমৎকার শোনায়। তা সে যাকগে। কিন্তু ওই বোম্বাই থেকে এই পেশোওয়ার—এর সঙ্গে তো ক্রান্তের কোন মিল নেই। মিল আফগানিস্তানের সঙ্গে। দুটোই সুন্দর দেশ। আর তারতবর্ষ সম্বন্ধে ইরানী কবি কি বলেছেন, জানেন ?’

‘হাফিজ যেন কি বলেছেন ?’

‘না। আলীকুলী সলীম। বলেছেন :

‘নীন্তু, দরু ইরান জমীন্ সামান-ই তহসীল কামাল

তা নিয়ামদ্ শূ-ই হিন্দুস্তান হিনা রঙ্গীন্ নু শুদ্।’

‘পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা ইরান দেশের ভূঁয়ে,

মেহদির পাতা কড়া লাল হয় ভারতের মাটি ছুঁয়ে।’

আমি শুধালুম, ‘এদেশের হেনাতে কি কড়া রঙ হয় না ?’

‘বাজে। কিকে। হলদে।’

আমি বললুম, 'আপনি কথায় কথায় এত কবিতা বলতে পারেন কি করে ?'

হেসে বললে, 'বাবা আওড়ান। আর ন' দশ বছরেও আমার আঙ্গুলখান জ্ঞানটি ছিল অত্যাগ্ৰ। প্যারিসে ক্লাসে ফরাসী কবিতা কেউ আওড়ালে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফার্সী শুনিয়ে দিতুম।'

তারপর বললে, 'বড় রাস্তায় তো জন-মানব নেই। শুধুমনে হচ্ছে একখানা মোটর বার বার আসা-যাওয়া করছে। নয় কি ? আপনি লক্ষ্য করেছেন ?'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তাই।'

বললে, 'তবে আমাকে বলেন নি কেন ?'

আমি এক-মাথা লজ্জা পেয়ে বললুম, 'আমার ভালো লাগছিল বলে।'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

আমি শুধালাম, 'ওটা কি আপনাদের গাড়ি ? আপনাকে খুজছে ?'

'ঊ।'

'তবে চলুন।'

'না।'

'আচ্ছা। কিন্তু আপনার বাড়ির লোক আপনার জন্তে হুশিয়ার করবেন না ?'

'তবে চলুন।' উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'শব্দনম বাহু, আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'তওবা ! আপনাকে ভুল বুঝব কেন ?'

রাস্তায় যেতে যেতে বেশ কিছু পরে সে-ই কথায় খেই ধরে বললে, 'বিশেষীর সঙ্গে আলাপ করতে ওই তো আনন্দ। তার সষম্বে কিছু জানি নে। সেও কিছু জানে না। সেই যে কবিতা আছে,

‘মা আজ্, আগাজ্, ওয়া আনজামে জাহান্ বে-খবরীম্
আওওল ও আখির-ই দৈন কুহনে কিতাব ইফতাদে অস্‌’।’’

‘গোড়া আর শেষ এই সৃষ্টির জানা আছে, বলো, কার ?

প্রাচীন এ পুঁথি গোড়া আর শেষে পাতা কটি করা তার।’

এমন সময় ওই জলজলে আলোওলা পোড়ারমুখো মোটর এসে সামনে দাঁড়াল। শব্দনম বাহু বললে, ‘চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।’

এতক্ষণ দুজনাতে বেশ কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন ওই ড্রাইভারের সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। প্যারিস থেকে এসে থাক, আর খাস

কাবুলগামীই হোক, এরা যে কটর গোড়া সে কি কারও অজানা? বললুম, 'ধাক। আমার হোটেল কাছেই।'

শব্দনয় বাহু বুদ্ধিমতী। বললে, 'বেশ। তবে, দেখুন আগা, আপনি কোন কারণে কণামাত্র সন্দোচ করবেন না। আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

পরোয়া শব্দটি আসলে ফার্সী। শব্দনয় ওই শব্দটিই ব্যবহার করেছিল।

'আদাব আরজ।'

'খুদা হাকিম।'

হোটলে ঢোকবার সময় পিছনে শব্দ হুগুয়াতে তাকিয়ে দেখি, আব্দুর রহমান। নিজের থেকেই বললে, 'একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম।'

আমি তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলুম ইনি একটি হস্তীমূর্খ না মর্কটচূড়ামণি?

সমস্ত রাত ঘুম এল না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আদম-স্বরং—কালপুরুষ। অতি প্রসন্ন বদনে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আকাশের পরিপূর্ণ শান্তি যেন তার অঙ্গের প্রতিটি তারায় সঞ্চিত করে আমার দিকে বিচ্ছুরিত করে পাঠাচ্ছেন।

একটি ফার্সী-কবিতা মনে পড়ল।

ইরানের এক সভাকবি নাকি চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মত্তপান করেছিলেন। রাজা তাই নিয়ে অহুযোগ করাতে তিনি বলেছিলেন,

'হাজার বোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ওই তারা

গোম্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত ; তাই হ'ল মানহারা?'

শেষরাত্রে কালো মেঘ এসে আকাশের তারা একটি একটি করে নিবিয়ে দিতে লাগল। আমার মন অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠতে লাগল। বিবেকানন্দ ইংরাজী কবিতায় লিখেছিলেন, 'দি স্টার্স্‌ আন্‌ রটেড্‌ আউট'। সত্যেন দত্ত অহুবাদ করেছেন 'নিঃশেষে নিবেছে তারাদল'। কেমন যেন, কি-হবে কি-হবে একটা ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে দিল।

শেষ রাত্রে নামল খাঁটি লিলেটি বৃষ্টি।

প্রসন্নাস্ত, প্রসন্নাস্ত আমার অস্ত সন্ধ্যার সবিতার।

খুদাতালা বেহুদ মেহেরবান। আমার শেষ মনকামনা পূর্ণ করে দিলেন।

কী মূর্খ আমি! আমার প্রত্যাশা যে করুণাময়ের অক্ষরভর দান ছাড়িয়ে যেতে

পারে, এ দৃষ্ট আমি করেছিলুম কোন গবেষ্টামিতে ?

। ২ ।

ঘুম-ভাড়া-ঘুম-লাগা কল্পনা-অপ্নে-জড়ানো রাতের শেষ হল স্বর্ষ্যোদয়ের অনেক পর। কাল রাত্রে তো পারিই নি, আজ সকালেও বুঝতে পারলুম না, কাল রাত্রে কি হয়ে গেল। এ কি আরম্ভ, না এই শেষ ! এ কি অন্ধকার রাত্রে চন্দ্রোদয়ের মত আমার ভুবন প্রসারিত করে দেবে, না এ হঠাৎ চমক-মারা বিভ্রান্তি। শুধু ক্ষণেকের তরে স্বদূর আকাশপটে আমার ভাগ্যের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে লোপ পাবে !

আচ্ছন্নের মত জানলার ধারের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল চেয়ারে ঝোলানো আমার কোটের কাঁধের উপর এক গাছি লম্বা চুল।

কি করে এসে পৌঁছল ? কে জানে, এ জগতে অলৌকিক ঘটনা কি করে ঘটে ?

কিংবা এ ঘটনা কি অভিশয় দৈনন্দিন নিত্য প্রাচীন ? যে বিধাতা প্রতিটি ক্ষুদ্র কীটেরও আহাৰ যুগিয়ে দেন, তিনিই তো ভূষিত হিয়ার অপ্রত্যাশিত মরুতান রচে দেন। কিন্তু তার কাছে তখন সেটা অলৌকিক।

সুব্বের লক্ষ মৃত্যু লাভ অলৌকিক নয়, কিন্তু নিরয়ের অপ্রত্যাশিত মুষ্টি-ভিক্ষা অলৌকিক। কিংবা বলব, সরলা গোপিনীদের কৃষ্ণলাভ অলৌকিক—ইন্দ্রমতায় কৃষ্ণের প্রবেশ দৈনন্দিন ঘটনা।

অথবা কি এই হঠাৎ লটারি-লাভ আমার জুপিও বন্ধ করে দেবে ! অন্ধকার রাতের হুশিষ্ণু তার কালো চুলকে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সাদা করে দেবে ?

কি করি ? কি করি ?

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অল্প অল্প বৃষ্টি। এই বৃষ্টিকেই কাল রাত্রে কত লোহাগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলুম। এখন কোন-কিছুর সন্ধানে বাইরে যেতে পারব না বলে সেই লোহাগের ধন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কোথায় সন্ধান ?

সর্দার আওরঙ্গজেবের বাড়ি খুঁজে আমি পাব নিশ্চয়ই। সেই স্বদূর বাড়লা-দেশ থেকে যখন কারুল পৌঁছতে পেরেছি তবে এ আর কতটুকু ! কিন্তু পেয়ে লাভ ? সেখানে তো আর গট্‌গট্‌ করে চুকে গিয়ে বলতে পারব না, ‘শব্দনম বাহুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।’ এ দেশের ছেলেই এটা করতে পারে না,

আমি তো বিদেশী। আমি তো এমন কিছু স্বর্ণভাণ্ড নই যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাটি চাপা পড়ে গেলেও লোকে জানতে পারলে খুঁড়ে বের করবে ? বরঞ্চ শব্দনমই স্বর্ণ-পাত্র। আমি ভিখারী, তার দিকে নিকাম হৃদয়ে তাকালেও সর্দার আমার গর্দান নেবেন।

তা তিনি নিন। রাজারও একটা গর্দান, আমারও একটা। অথচ আশ্চর্য, রাজার গর্দান গেলে বিশ্বজোড়া হইহই পড়ে যায়—আমার বেলা হবে না। কিন্তু ওই কিশোরীকে জড়ানো ?

এ তো বুদ্ধির কথা, যুক্তির কথা, সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের কথা, কিন্তু হায়, হৃদয়েরও তো আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে, সে তো বুদ্ধির কাছে ভিখারীর মত তার যুক্তি ভিক্ষা চায় না। আকাশের জল আর চোখের জল তো একই যুক্তি-কারণে ঝরে না।

আব্দুর রহমান এসে খবর দিলে, আজ রুপুরে হোটেলো মাছ। অক্টোবর দিনে আনন্দে আমি তাকে বথশিশ দিভূম—এ দেশে এই প্রথম মাছের নাম শুনেও পেলুম। আজ শুধু অলস নয়নে তাকিয়ে রইলুম।

থেতে গিয়েছিলুম। এদিক ওদিক তাকাই নি। কারণ, কাবুল পাগমানে এখনও মেয়েরা রেষ্টুরাঁতে বেরয় না। অনেক সর্দারই থেতে এসেছিলেন ; হয়তো সর্দার আওরঙ্গজেবও ছিলেন।

হঠাৎ যত গুজরান আরম্ভ হল। তারপর সবাই খড়মড় করে ছুরি-কাঁটা ফেলে উঠে দাঁড়াল। ব্যাপার কি ? 'বাদশা, বাদশা' আসছেন।

আমার বৃকের রক্ত হিম। এই সর্বনেশে দেশে কি স্বয়ং বাদশা বেরন মজুন—অর্থাৎ পাগলদের কিংবা আসামীর সন্ধানে !

না। এটা সরকারী হোটেল। লাভ হচ্ছে না শুনে তিনি স্বয়ং এসেছেন বড় ভাই মুইন-উস-সুন্নাতানের সঙ্গে পেট্রোনাইজ করতে। রাজেন্দ্রসক্রে দীনও তা হলে তীর্থ দরশনে আসতে পারে। রাজার সঙ্গে গেলে দীনের রাহা-খরচাটা বাদ পড়ে বটে কিন্তু সেও তো পুরুত-পাণ্ডাকে দু পয়সা বিলোয়। পরে দেখা গেল তাঁর হিসেবটা ভুল নয়।

অনেক রকম খাবারই সেদিন ছিল। এমন কি সন্ত ভারতবর্ষ থেকে আগত এক পেশোওয়ারী সর্দার পাতি নেবু পর্বত বিলোলেন। অক্সাণ্ড ঠাণ্ড দেশের রক্ত কাবুলেও কোন টক জিনিস জন্মায় না। আমারটা আমি গোপনে পকেটে পুয়েছিলুম। পরে খুঁচিরে খুঁচিরে তার গন্ধ শুঁকব বলে। দেশের গন্ধ কত বিন

হল পাই নি। যে রাহাটি খেলুম সেটি ভালো হলেও তাতে দেশের গন্ধ ছিল না।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাবুলীদের অবস্থা-কর্তব্য ঢেঁকুটি তুললেন না। আমরাও উঠলুম। আমার খাওয়া অনেককাল হল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজা না ওঠা পর্যন্ত প্রজাকে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভান করতে হয়, যেন তার খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। রাজা তো প্রজার তুলনায় গোথ্রালে গিলতে পারেন না। গিললে প্রজাকে আরও বেশী গেলবার ভান করতে হয়।

ইরান-তুরানে অতিথি নিমন্ত্রিত-বাড়ি এলে গৃহস্থকে ওই ভান করতে হয়।

এসব আমার চিন্তা-ধারা নয়। আমার সঙ্গে বসেছিলেন তিনজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। এঁরাই গুনগুন করে এসব কথা উদ্বৃত্তে বলে যাচ্ছিলেন।

বেরিয়ে এসে দেখি বৃষ্টি থেমেছে। রোদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতা রোদের আলোতে ঝলমল করছে।

এখন বেরনো যায়। কিন্তু যাব কোথায়? সে চিন্তা তো আগেই করা হয়ে গিয়েছে! হলে কি হয়! পাগলামির প্রথম চিহ্ন, পাগল একই কথা বার বার বলে, একই গ্রাম বার বার চিবিয়ে চলে, গিলতে পারে না।

আর বেরতে গেলেই এই তিন ব্যবসায়ী দুশ্মন সঙ্গ নেবে। এরা এসেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কাবুলের ডাস্টবিনের ছবি তোলে, ছাট-পিনের পাইকারি দর তুথায়।

আর আমার ঘরে তো রয়েছে আমার সেই অমূল্য নিধি। আজ সকালের সঙ্গাত।

এদেশের সবুজ চা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তিনটের সময় পা টিপে টিপে নিচে নামলুম। সেখানে চা খেয়েই বেরিয়ে যাব। এ সময় আর সবাই আপন আপন ঘরে চা খায়।

টী-রুমে চুকেই এক কোণে এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখতে এবং শুনতে পেলুম। দেখি, আখ ভজনের বেশী কাবুলী তরুণী মাথার উপরকার ছাট থেকে কোলানে নেট্ বা বোরকার উত্তর-প্রান্ত—বাই বলা যাক না কেন—নামিয়ে, গোল টেবিল ঘিরে বসে কিচির মিচির লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, এ সময় হোটেলের নিচের তলাটা নির্জন থাকে বলে এই সুবাদে বেচারীরা ক্ষুধা করতে, নতুন কিছু-একটা করতে এসেছে। এবং এঁদের বুদ্ধিদায়িনীটি কে সেটা বুঝতেও বিলম্ব হল না। শব্দনম বাহু স্বয়ং দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে তথ্যিতবা করছেন ঝড়ের বেগে—‘পেস্ট্রি নেই! কেন? কেব্ আছে। সে তো

বলেছ। অর্ডারও তো দিয়েছি। ডিমের শ্রাণ্ডউইচ! কেন? শামী কাবাব দিয়ে শ্রাণ্ডউইচ বানাতে পার না? মাথায় খেলে নি? বত সব—’

আমার দিকে পাশ ফিরে কথা বলছিলেন। হঠাৎ কেন জানি নে আমার দিকে তাকাতোই তাঁর মুখের কথা আমাকে দেখার সঙ্গে কলিশন লেগে খেয়ে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে চক্কর খেয়ে বারান্দায়। রওশানা দিল্লুর গেটের দিকে।

সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিছন থেকে কি একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি, সেই ওয়েটার।

‘আপনাকে একটি বাছ ডাকছেন।’

এসে দেখি, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হাসি-মুখে বললে, ‘পালাচ্ছিলেন কেন। দাঁড়ান।’

হাণ্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বললে, ‘আজ সকালে বাবাকে ডিক্লেস করলুম, বাংলাদেশ কোথায়? তিনি বললেন, ওদেশের এক রাজা নাকি আমাদের মহাকবি হাফিজকে তাঁর দেশে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যেতে না পেয়ে একটি কবিতা লিখে পাঠান। সেটি আমি টুকে নিয়েছি। এই নিন।’

আমি তখন কিছুটা বাকুশক্তি ফিরে পেয়েছি। ধন্যবাদ জানিয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে সেই নেবুটায় হাত ঠেকল।

হঠাৎ আমার কি হল? কোন চিন্তা না করে এই সামান্য-পরিচিতা বিদেশিনীর হাতে কি করে সেটা তুলে ধরলুম?

‘এটা কি? ওঃ! নেবু? লীমুন। লীমুন-ই-হিন্দুস্তান!’ নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকে বললে, ‘পেলেন কোথায়? কী সুন্দর গন্ধ! কিন্তু ভিতরটা টক। না?’ বলে আবার হাসল।

ওয়েটার চলে গেছে। চতুর্দিক নির্জন। দূরে দূরে মালীরা কাজ করছে মাত্র।

তবু আমার মুখে কথা নেই।

মেয়েটি একবার আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি তাকিয়ে মাথা নিচু করলুম।

আঙুলে আঙুলে ভিতরে চলে গেল।

কী আহাম্মুখ! কী মূর্খ আমি!

প্রথম বারে না হয় বে-আদবী হত, কিন্তু এবারে এরকম অবস্থায়ও আমি স্তবোধে পারলুম না, আবার দেখা হবে কি না? এবারে তো লে-ই ভেঁকেছিল।

কবিতা দিলে। সেই কবিতাটি পড়ার ভান করে, ওই প্রশ্নটা ভালো করে বলার ধরনটা ভেবে নিলেই তো হত। না, না। ভালোই করেছি। যদি সে চুপ করে যেত তা হলেই তো সর্বনাশ। 'না' বললে তো আমি খতম হয়ে যেতুম। কিন্তু তবু কী মূর্থ আমি! এই যে আঠারো ঘণ্টা একই চিন্তায় বার বার ফিরে এসেছি তার ভিতর একবারও ভেবে নিতে পারলুম না, হঠাৎ যদি দৈবযোগে আবার দেখা হয়ে যায় তা হলে কি করতে হয়, কি বলতে হয়, সেই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—আবার দেখা হবে কি?—সেইটে কি করে ভক্তভাবে শুধোতে হয়?

ওরে মূর্থ? দিলি একটা নেবু!

তাও শুনেতে হল ভিতরটা টক!

না, সে মীন করে নি।

আলবাৎ করেছে।

না।

। ৩ ।

আমি জানি, কাবুলের শেষ বল-ডান্স কাল রাঞ্জেই হয়ে গিয়েছে। তবু সন্ধ্যার পর সেই অন্ধকার ভুতুড়ে বাড়ির চতুর্দিকে ঘোরপাক খেলুম। জানি, আজ আর টেনিস কোর্টে কেউ আসবে না। তবু সেখানে গেলুম। শুধু, সেই বেঞ্চিটিতে বসতে পারলুম না। বসলুম, একটা দূরের বেঞ্চিতে ওইদিকে তাকিয়ে। হায় রে, নির্বোধ মন। তোমার কতই না ছুরাশা! যদি, যদি কেউ মনের ভুলে সেখানে এসে বসে।

টেনিস খেলার ছলে পৃথিবীর সর্ব টেনিস-কোর্টেই বহু নরনারী আসে প্রিয়জনের সঙ্গনে, তার সঙ্গ-স্থখ মোহে। এই কোর্টেও আসে দেশী বিদেশী অনেক জন। আমিও আসতে পারি। কিন্তু আমার এসে লাভ? কাবুলী মেয়েরা তো এখনও বাইরে এসে কোন খেলা আরম্ভ করে নি।

আমার বন্ধু আসে যখন সব খেলা সাক্ষ হয়ে যায়। এ খেলাতে তার শখ নেই। দিনের আলোতে খেলা তো সহজ—সবাই সবাইকে দেখতে পার। তাতে আর রহস্য কোথায়? অন্ধকারের অজানাতে ঠিক-জনকে চিনে নিতে পারাই তো সব চেয়ে বড় খেলা। শিশু যেমন গভীরতম অন্ধকারে মাতৃস্তন খুঁজে পায়। তাই বুকি মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্ত সব চেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।

মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা। কেউ এল না।

অত্যন্ত দীর্ঘ গতিতে সে রাত্রি বাড়ি ফিরেছিলুম। তীর্থযাত্রী যে রকম নিম্নল
তীর্থ সেবে বাড়ি ফেরে।

ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আব্দুর রহমান কিছু জাওউইচ সাজিয়ে
রাখছিল। তাড়াতাড়ি বললে, 'এখনও কিচেন বোধহয় বন্ধ হয় নি; আমি
গরম সুপ নিয়ে আসি।'

আমি বললুম, 'না।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আব্দুর রহমান আমার কোট পাতলুন বুরুশ
করতে করতে কথায় কথায় বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান কাল সন্ধ্যায়ই বিবি
বাচ্চা-বাচ্চী সমেত কাবুল চলে গেছেন। তাঁর পিসী গত হয়েছেন।'

অল্প সময় হলে হয়তো শুনেও শুনতুম না, কিংবা হয়তো অলস কণ্ঠে নীরস
প্রশ্ন শুধাতুম, 'সর্দারটি কে?'

এখন আমি আব্দুর রহমান কি জানে, কি করে জানে, কতখানি জানে, এ-
সবের বাইরে। একদিন হয়তো আরও অনেকে জানবে, তাতেই বা কি? সেই
যে ইরানী কবি বলেছেন,

‘কত না হস্ত চুমিলাম আমি অক্ষমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মিতে ছিল আমার গ্রন্থি বত।’

‘দস্ত-ই হর-কসরা বসানে সবহৎ বুসীদম্ চি শ্বদ
হীচ্ কস্ ন্ কশওদ আখির অকদয়ে কারে মরা।’

অক্ষমালার মত পুতপবিত্র হয়ে সাধুসঙ্কনের মস্তোচ্চারণের পুণ্যকর্মে লেগেও
বদি তারা ‘গেরো’ থেকেই যায়, তবে আব্দুর রহমানের হাতে দু পাক খেতেই
বা আপত্তি কি?

প্রথমটা সত্যই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলুম।

অথচ দিনের আলো বতই রান হতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল এই
অকলী পাগমান শহরটা বড়ই নোংরা। দুনিয়ার যত বাজে লোক জমায়েৎ হয়ে
খায়কা হই-হুন্নাড় করে। এর চেয়ে কাবুল ঢের ভালো।

দেখি, আব্দুর রহমানেরও ওই একই মত। অথচ এখানে সাত দিনের ছুটি
কাঁটাবার ভক্ত সে-ই করেছিল চাপাচাপি। এখনো তার তিন দিন বাকি।

সকালে দেখি, আন্ধুর রহমান বাক্স পাটরা গোছাতে আরম্ভ করেছে ।
মনস্থির করাতে সে ভারী ওস্তাদ ।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দুঃখিত হলেন । বললেন, 'কাবুলে আবার দেখা
হবে ।'

বাস্ পাগমানে ছাড়তেই মনে হল, সর্বনাশ ।

শব্দনম বাহু যদি আবার পাগমানে ফিরে আসে ?

আর ভাবতে পারি নে রে, বাবা !

॥ ৪ ॥

পুরাতন ভৃত্যকে ছেড়ে বাড়ি ফেরা পীড়াদায়ক হলেও, সে সঙ্গে থাকলেই যে গৃহ
মধুময় হয়ে ওঠে তার কোন প্রমাণ আমি পেলুম না । সেই নিরানন্দ নির্জন
গৃহ । খান কয়েক বই । এগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ।

আচমকা একটা বুদ্ধি খেলল মাথায় । এক দোর বন্ধ হলে দশ দোর খুলে
যায়, বোবার এক মুখ বন্ধ হলে দশ আঙুল তার ভাষা তর্জমা করে দেয় ।
আমার যদি সব দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়ে মাত্র একটি খুলে যায় তাই আমার পক্ষে
যথেষ্ট । সে দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমি কোথায় গিয়ে পৌঁছব তার খবরও আমি
জানতে চাই নে । দিগন্তের কাবা'র ছবি আমি দেখতে চাই নে, হে প্রভু !
তুমি শুধু একটি কদম্ ওঠাবার মত আলো ফেলো ।

ফার্সী শিখব—যে ফার্সীকে এত দিন অবহেলা করেছি ।

তরুণরা এটা শুনে নিরাশ হবে । তারা ওই সময়ে স্বপ্ন দেখে অসম্ভব
অসম্ভব বিষয়ের । প্রিয়ার ঘরে যদি আগুন লাগে, দমকলের লোকও তাকে
বাঁচাবার জন্তে সাহসে বুক বেঁধে না এগোয়, সে তখন কি রকম লাফ দিয়ে
বাঁপিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্ত । ইংরেজকে খুন করে প্রিয়া ধরা পড়েছে ;
ফার্সির জন্ত তৈরী হয়ে সে সব দোষ আপন স্বক্ষে তুলে নিল—প্রিয়া জানতে
পর্বস্ত পারল না ।

প্রবীণরা এসব স্বপ্নের কথায় হাসেন । আমি হাসি নে ।

ধন্য হোক তাদের এ স্বপ্ন-স্বপ্ন ! মৃত্যুঞ্জয় হোক তাদের এ দুঃখাশা ! এ-
গুলোই তো তপ্ত ভূতলকে সরস শ্রামল করে রেখেছে । নন্দন-কাননের যে
হাসি মুখে নিয়ে শিশু মায়ের কোলে আসে, তরুণের সেই নন্দন-কানন থেকেই
আকাশ-কুসুম চয়নে তার শেষ বেশ ।

তার তুলনায় ফার্সী শেখা কিছুই নয়। বজ্র-নির্ঘোষে ঝিঁঝির নূপুর-নিকণ !

প্রবীণরা অবশ্র এটাকেই প্রশংসা করতেন। আজ যদি আমি শব্দম বাহুকে চিঠি লিখতে বাই ? আমার ফার্সী কাঁচা, কবানী দড়কচ্চা।

বেয়লুম ফার্সী বইয়ের সন্ধান, কাবুলী বন্ধুদের বাড়িতে। তারা খুশী হবে। নিরপরাধা অকারণে বর্জিতা প্রথমা প্রিয়ার সন্ধান নির্গত প্রণয়ীর নব অভিসার প্রিয়জন প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করে। ফার্সীকে আমি অকারণে বর্জন করেছিলুম।

এই বেরনোর পিছনে অস্ত্র কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এ কথা বলব না।

আজ কেন, সেদিনও আমার মাতৃভূমিতে ক্লাসিক্‌স্ অনাদৃত। অহুন্নত কাবুলে তা নয়। সেদিনও স্বয়ং মাইকেল যদি কলেজ স্ট্রীটে এসে নিজের বইয়ের সন্ধান করতেন তবে সেগুলো বের করা হত পিছনের গুদাম থেকে। তিনি তখন ইরানী কবির মতই দুঃখ করে বলতে পারতেন,

“রাজসভাতে এসেছিলাম বসতে দিলে পিছে,

সাগর জলে ময়লা ভাসে, মুক্তো থাকে নিচে।”

মাইকেলের দুঃখ বেলী। পুস্তক-সভাতেও তিনি পিছনে।

এখানে হাফিজ সাদী কলীম পয়লা শেল্‌ফে। কিছু বই কিনলুম। ধারের বইয়ে নাকি বিস্তার্ত্তন হয় না।

ফেরার পথে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে দেখা। তারা চেপে-ধরলে, কাবুল নদীতে সাঁতারে যেতে। মনে মনে বললুম, ওখানে যা জল তা দিয়ে কাশীরাম-দাসের জলের তিলকও ভালে কাটা যায় না। শেবটায় ঠিক হল তিন দিন পর, ছুটির শেষ দিনে।

তীব্র আবেগে ফল আসন্ন। তিন দিনেও অনেকখানি ফার্সী শেখা যায়।

তিন দিন পরে সাঁতারে এসেছি।

খানিকক্ষণ পরেই ছেলেরা আমার কথা ভুলে গিয়ে আপন আনন্দে মেতে উঠল। আমি আস্তে আস্তে ভাটির দিকে বুকজল ঠেলে ঠেলে, কখনও বা দু দিক থেকে ছুয়ে পড়া গাছের পাতা চোখের সামনে থেকে হাত দিয়ে ঠেলে এগুতে লাগলুম। সামনে একটু গভীর জল। সাঁতার কেটে ভান পায়ে উঠে গাছের ঝোপে জিরোতে বসলুম। স্বত মন্দমন্ডরই হোক, শ্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে সম্মোহন আছে।

পিছন থেকে তিনি, ‘এই যে !’

তাকিয়ে দেখি, শব্দনম ।

এক লক্ষে জলে নামলুম । ভেবে নয়, চিন্তা করে নয়—সাপ দেখলে মাহুৰ যে রকম লাফ দেয় । আমার পরনে সীতারের কস্ট্রাম । কত যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচ্যভূমির এ সংস্কার ।

‘উঠে আস্থন, উঠে আস্থন, এখুনি উঠে আস্থন ।’

কোন উত্তর নেই ।

‘উঠবেন না ? আচ্ছা, তবে দেখাচ্ছি ।’ বলেই হাওব্যাগ হাতড়াতে লাগল ।

মেরেছে ! না—মারবে—পিস্তল খুঁজছে নাকি ?

কাতর কণ্ঠে বললে, ‘দেখুন, আপনি মীন এডভেঞ্চার নেবেন না । আমার পিস্তলে গুলি নেই ।’ একটু ভেবে বললে, ‘ও, বুঝছি । পরনে কস্ট্রাম । তা, উঠে আস্থন । এই নিন আমার গায়ের ওড়না । এইটে জড়িয়ে বসবেন ।’

এ তো আরও মারাত্মক । কাবুলিনীবেশে ওড়না শুধু অঙ্গভরণ নহে, কিছুটা অঙ্গাবরণও বটে ।

ততক্ষণে আমার বেশ বিষয়ের সংস্কার কেটে গিয়েছে । তার চেয়েও যে প্রাচীন সংস্কার সেইটে এসে সোনার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে । সে সংস্কারের সোহাগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্রলোক আপন গতি খুঁজে পায় ।

‘আপনি আমাকে কি করে খুঁজে পেলেন ?’

প্রথমটায় চূপ করে গেলুম । মিথ্যে উত্তর দিতে যে একেবারেই ইচ্ছে যায় নি এ কথা বলব না ।

শব্দনম চূপ করে থাকতে পারে না । উত্তর না দিলে শাসায় । এবারে কিন্তু নীরব প্রতীক্ষায় বসে রইল ।

ভালো ভাবেই বুঝে গেলুম এবারে সে উত্তর না নিয়ে ছাড়বে না । বললুম, ‘আপনাকে আমি সব খানেই খুঁজছি ।’

মুখ খুশিতে ভরে উঠল । হঠাৎ আবার আকাশের এক কোণে মেঘ দেখা দিল । শুধালে, ‘আমাদের বাগান-বাড়ি কাছেই, জানতেন ?’

কেন জানি নে, বলতে ইচ্ছে হল না যে, তাদের কাবুলের বাড়ি বাইরে থেকে বতটুকু দেখা যায় তার সবটুকু ওর বানানেওলা রাজমিস্ত্রির চেয়েও আমি বেশী জানি । বললুম, ‘না ।’

এবারে যেন তার কান্না পেল । বললে, ‘ওঃ ! বুঝছি । সীতার কাটবার স্মৃতি করতে এশেছিলেন ।’

এই এত দিনে আমার সত্যকার বাজল !

আজ না হয় ঠাট্টা-মজ্জা, রঙ্গ-রসিকতা করে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বন্ধ পাগলামি স্বত্থানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায় ?

বললুম, 'দেখুন, শব্‌নম বাহু, আমি বিদেশী। বিদেশে অনেক মনোবেদনা। তার উপর যখন মাহু'র ভালবাসে—'

সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে শব্‌নম তার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল।

আমি ভয়ে লজ্জায় মারা গেলুম। ছি, ছি। আমি কী করে এ কথাটা বলে ফেললুম ? কোথা থেকে আমার এ সাহস এল ? কিন্তু আমি তো সাহসে বুক বেঁধে এ-কথা বলি নি। এ তো নিজের থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য, শব্‌নম আমার মুখের উপর তার হাতের চাপও ছাড়ছে না।

'ব'লো না, ব'লো না। আমি ঠিক করেছিলুম ও কথাটা আমি আগে তোমাকে বলব।'

হু জনাই অনেকক্ষণ চুপ।

শব্‌নমই প্রথম কথা বললে।

বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, আমি প্রথম বলব, আর তুমি আমাকে অবহেলা করবে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি ?'

তাড়াতাড়ি বললে, 'ধাক্, ধাক্। আজ এসব না। আরেক দিন এসব কথা হবে। আজ শুধু আনন্দের কথা বল। সব প্রথম বল, তুমি কখন আমাকে ভালবাসলে ?'

আমি বললুম, 'সে কি করে বলি ? তুমি কখন বাসলে বল।'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'সে অতি সহজ। হোটেলের বারান্দায় যখন তোমাকে ডেকে পাঠালুম। তুমি যখন কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছিলে না, তখন। জান না ইস্‌ফাহানী কবি সাজীব কি বলেছেন,

“খম্বী লজ্জতে নাতিক বুদ জুই আই-ই-গওহরহা,

কি আজ গওহাস্‌ দর দরিয়ান ফক্স বীরুন নমীআয়দ।”

‘গভীরে ডুবেছে যে জন, জানিবে মুক্তার সন্ধান,

বুদু হয়ে তার প্রাণাল ওঠে না উপর পানে।’

আমি বললুম, 'এ কবি মতাই জীবন দেখেছিলেন ; কাবুলে এ কবি কিন্তু জন্মাতে পারত না।'

'কেন ?'

'ভুব দেবার মত জল এখানে কোথায় ?'

'সে কথা থাক্। আমার কিন্তু ভারী দুঃখ হয়, তুমি আমার বয়েতের পান্টা বয়েৎ দিতে পার না বলে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'সে কি আমার হয় না।'

'চূপ। আবার ভুল করেছি। বলেছিলুম দুঃখের কথা তুলব না।'

'আমি কিন্তু জোর ফার্সী শিখতে আরম্ভ করেছি।'

'কী আনন্দ! বাবার মজলিসে কত বিদেশী আসে, কেউ ভালো ফার্সী বলতে পারে না। তুমি শিখলে আমার গর্ব হবে। তুমি আমারই জন্ত শিখছ। সে আমি জানি।'

'তোমার মুখে "তুমি" বড় সুন্দর শোনায়।'

বাধা পড়ল। কার যেন গলার আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে বললে, 'এবার তুমি এস। তোমাকে খুদার আমানতে দিলুম।'

আমি জলে নামতে নামতে বললুম, 'আর কিছু বল।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

॥ ৫ ॥

"ঠেকেছিল মনোত্তরীথান

প্রাণনাশা সংশয়-চড়ায়,

ভাবাহীন আশা পেয়ে আজ

হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।

ছিল ঠেকে মনোত্তরীথান—

চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?

কে গো তুমি দুজ্জের মহান ?

কে দেবতা এলে আজি চিতে ?"

যে 'চার্বাক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তিনি নাকি যজ্ঞভাবা'র কাছ থেকে
লৈ (৫২)—৯

তঁার প্রেমের প্রতিদানের আশা পেয়ে একদিনের তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন।

“সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক

নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার

প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন—

সে যে আনন্দের দিন—সে যে প্রত্যাশার।”

(সত্যেন দত্তের কবিতা।)

আমি ছেলেবেলা থেকেই আল্লাকে ভয় করতে শিখেছি, কৈশোরে কাব্য পড়েছি, তাঁকে নাকি ভালবাসাও যায়, আর এই যৌবনপ্রদোষে এক লহমায় তিনি যেন হঠাৎ এক নবরাজ প্রেমরাজ হয়ে আমাকে ভেঁকে তঁার সিংহাসনের পাশে বসালেন। শুধু তাই! ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রেম নিবেদনেরও প্রতীক্ষা করছেন। তঁার চোখেও যেন পাব-কি-পাব-না’র ভয়। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

“জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমের ভিখারী

দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি।”

সব দ্বার ছেড়ে তিনি যেন একমাত্র আমারই দ্বারে এসেছেন।

না, না, তিনি দ্বারে আসেন নি। মৌলা—প্রভু—যখন আসেন, তখন তিনি ‘ছল্লর ফোড় করকে আতে হ্যায়’—তিনি ছাত ভেঙে আসেন।

একটি কথা, দুটি চাউনি, তাতেই দেহের ক্ষুধা, হৃদয়ের তৃষ্ণা, মনের আকাঙ্ক্ষা সব ঘুচে যায়, সব পরিপূর্ণ হয়ে যায়!

ঘরে ফিরে দেখি সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, সন্ধ্যা সন্ধ্যা আবার রামধনু, তার-ই নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলাকার নর্মসখী গ্রামের ছোট নদীটি, এবং সমুখে এক গাঙ্গা শিউলি ফুল—সেই প্রথম সন্ধ্যার শিউলি ফুল—শব্দনম শিউলি। আর না, আর না! থামো! থামো! আর আমার সহবে না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন আরাম-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভাস্কর্যমতীময় দিয়ে সেই স্বপ্নকে সজীবিত করছি এমন সময় ঘরে ঢুকলেন আপাদমস্তক ভারী কালো বোরকায় ঢাকা এক মহিলা।

আমি ভালো করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বোরকা এক ঝটকায় সরে গেল।

শব্দনম!

হাত ছ'খানি এগিয়ে দিলে।

আমি ছুটে গিয়ে তার হাত ছ'খানি আপন হাতে তুলে নিলুম। তার পর কাবুলী ধরনে রাজা-বাদশা, গুরু-মুর্শীদের হাত ছুটি যে ভাবে চুমো খাওয়া হয় সেট ভাবে চুমো খেলুম।

বললে, 'হাঁটু গাড়ে।'

'জো হকুম!'

'বল, "আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে সর্বকাল তোমার সেবা করব"।'

'আমি সর্ব দেহ মন হৃদয় দিয়ে সেবা করব।'

খিলখিল করে হেসে উঠল।

ভাহুমতীমন্ত্র নিশ্চয়ই মাত্রাধিক করা হয়ে গিয়েছিল। সে মন্ত্ৰে ইজ্জতাল সৃষ্টি হয়। এ যে সত্যজ্ঞান—না, সত্যের দৃঢ় ভূমি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছ'হাত দিয়ে আমার মাথার ছ'দিক চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করে চিংকার করে বলবে, "না, তুমি আমার বশ্ততা স্বীকার কর"।'

আমি বললুম, 'আমাদের বাউল গেয়েছেন—একটু বদলে বলছি—

"কোথায় আমার ছত্র-দণ্ড কোথায় সিংহাসন?

প্রেমিকার পায়ের তলায় লুটায় জীবন"।'

'বেশ তো। তুমি ফার্সী শিখছ; আমি তা হলে বাঙলা শিখব।'

'সর্বনাশ! অমন কর্মটি করো না।'

'কেন?'

'তিন দিনে ধরে ফেলবে, আমি কত কম বাঙলা জানি।'

যেন আমার কথা শুনতে পায় নি। বললে, 'তুমি মুসাফির; কিন্তু ঘরটি সাজিয়েছ বেশ।' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেশ ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক দেখলে। তারপর সোফাতে বসে বললে, 'এস।' আমি পাশে বসতে যেতেই বললে, 'না, চেয়ারটা সামনে টেনে এনে বোস।' আমি একটু স্ক্ল হলাম। বললে, 'মুখোমুখি হয়ে বোস। তোমার মুখ দেখব।' তদ্বৎই মনটা খুলী হয়ে গেল—মাছধ কত সহজে তুল মীমাংসায় পৌঁছয়।

আমি কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম, 'তুমি ওই তারু, মানে বোরকা পর কেন?'

'স্বচ্ছন্দে যেখানে খুলী আসা-যাওয়া করা যায় বলে। আহাম্মুখ ইউরোপীয়ানরা ভাবে, ওটা পুরুষের সৃষ্টি, মেয়েদের লুকিয়ে রাখবার জন্ত।

আসলে ওটা মেয়েদেরই আবিষ্কার—আপন স্রবিকের জন্ত। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পরি, এ-দেশের পুরুষ এখনও মেয়েদের দিকে তাকাতে শেখে নি বলে—ছাটের সামনের পর্দায় আর কতটুকু ঢাকা পড়ে ?’ তারপর বললে, ‘আচ্ছা, বল তো, তুমি পাগমান থেকে পালিয়ে এলে কেন ?’

বললুম, ‘আমি তো খবর পেলুম, তুমি কাবুল চলে এসেছ।’

‘আমি তার পরদিনই পাগমান গিয়ে শুনি, তুমি কাবুলে চলে এসেছ।’

আমি শুধালুম, ‘আচ্ছা, বল তো, আমাদের বন্ধুত্ব এত তাড়াতাড়ি হল কি করে ?’

‘আজব্ বাৎ শুধালে। তবে কি বন্ধুত্ব হবে যখন আমার বয়স ষাট আর তোমার বয়স একশ তিরিশ ?’

আমি শুধালুম, ‘আমাদের বয়সে কি এতই তফাত ?’

‘তোমার গম্ভীর গম্ভীর কথা শুনে মনে হয় তারও বেশী। আবার কখনও মনে হয়, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সেটা আসল উত্তর নয়। আসল উত্তর আরেক দিন বলব।’

‘বলবে তো ঠিক ?’

‘নিশ্চয়।’

‘আচ্ছা, এবারে তোমাকে একটা শেষ প্রশ্ন শুধাই। তুমি এত সাহস কোথায় পেলে ? এই যে স্বচ্ছন্দে বল, কোন কিছুই পরোয়া তুমি কর না, সোজা আমার বাড়িতে চলে এলে—?’

‘তুমি আমাকে ভালবাস—আমি তোমার বাড়িতে আসব না তা যাব কি গুল-ই বাকাগুলীর পরিস্থানে ? জান, আমরা আসলে তুর্কী। আমাদের বাদশা আমাছল্লার গায়েও তুর্কী রক্ত আছে। আর তুর্কী রমণী কি জিনিস সেটা জানতেন আমাছল্লার বাপ শহীদ হবীবুল্লা। আমাছল্লার মায়ের প্যাচে তিনি পর্বস্ত হার মেনেছিলেন, জান ? আমাছল্লার তো রাজা হওয়ার কথা ছিল না।’

‘কিছু কিছু শুনেছি।’

‘ভালো। গওহর শাদের নাম শুনেছ ? ওই সুন্দর হিরাত শহরের চোদ্দ জনা সেই তুর্কী রমণীর তৈরি। তোমার আপন দেশে নূরজাহান বাদশা জাহাঙ্গীরকে চালাত না ? মোমতাজ—আরও যেন কে কে ? হারেমের ভিতরেই তুর্কী রমণী যে নল চালায় সেটা কতদূর যায় তার খবর রাখে কটা লোক ?’

‘তুমি অত ইতিহাস পড়লে কোথায় ?’

‘আমি পড়ি নি। আমি ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল এ-সব পড়ি নে। আমার আনন্দ শুধু বাবো। স্কুলে বাধ্য হয়ে “তুর্কী রমণীর ইতিহাস” পড়তে হয়েছিল— তার থেকে বলছি। কিন্তু তাই বলে ভেবো না আমি আমার বে-পরোয়া ভাব ইতিহাস থেকে পেলুম। আর জান না, কবি কামালুদীন কি বলেছেন—

“মরণের তরে ছুটি দিন তুমি করো নাকো কোনো ভয়,
যেদিন মরণ আসে না ; যেদিন আসিবে সে নিশ্চয়।”

আমি বললুম, ‘মৃত্যু ছাড়া অস্ত্র বিপদও তো আছে।’

‘কী আশ্চর্য! মৃত্যুর ওষুধই যখন পাওয়া গেল তখন অস্ত্র ব্যামোর ওষুধ মিলবে না? তোমার বিপদ, আমার বিপদ, আমাদের দুজনের মেলানো বিপদ—তার দাওয়াই আমার কাছে আছে। কিন্তু বলব না।’

‘কেন?’

‘ওষুধের রসায়ন (প্রেসক্রিপশন) জানাজানি হয়ে গেলে যোগী সারে না— হেকিমদের বিশ্বাস।’ তার পর সোফার কুশনগুলো জড়ো করে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ে বললে, ‘তুমি পাশে এসে বোস।’ একপাশে একটু জায়গা করে দিয়ে বললে, ‘ওসব কথা কেন তোল? এখন বল, তুমি আমায় কোথায় কোথায় খুঁজলে? আমার গুনতে বড় ভালো লাগে।’

আমি বললুম, ‘শব্দনম বাহু—’

‘উহঁ। হল না।’

‘কি?’

‘শব্দনম শিউলি।’

এ নামে কত মধু ধরে। তাই বুঝি ‘জপিতে জপিতে নাম অবশ হৈল তহু।’
কবার জপেছিলুম?

শব্দনম বললে, ‘উত্তর দাও।’

‘তোমাকে আমি সবখানে খুঁজেছি।’

এতক্ষণ সে শিলওয়ার পরা ডান পা বাঁ হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে মোজা-বিহীন ধবধবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পরের আঙুল নিয়ে খেলা করছিল; কখনও বা ওড়নাখানি বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে তার খুঁট পাকাচ্ছিল।

ধড়মড় করে সটান উঠে বসে বললে, ‘হ্যা, হ্যা। নদী-পাড়ে বলেছিলে। আমি তখন অর্ধ বুঝি নি। এখন কবি জামী বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি বলছি, কিন্তু তার আগে বল, খোঁজার সময় যে-কোনো মেয়ে আসতে দেখলেই ভাবতে,

আমি আলছি। না? শোন তবে—

“আতুর ছিয়ার নিদ্-হারা চোখে
অহরহ তুমি স্বামী,
দূর হতে দেখি যে কেহ আসিছে
তুমি এলে, ভাবি আমি।
মূর্খ দাঁড়ায় আছিল সেখানে’
তুখাল, ‘রাসভ এলে?’
কহিলেন জামী ‘বলিব তো আমি
তুমিই এসেছ’—হেলে।”

প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। শুক্ল সাধকজন হঠাৎ একটা লোককে, আপন গা বাঁচিয়ে গাধা বানিয়ে দেবেন, এতখানি রসবোধ তাঁদের কাছে আশা করে কে?

সে কথা বলাতে শব্দম বললে, ‘বহ কাবুলীকে আধ ঘণ্টা ধরে বোঝাতে হয়।’

আমি বললুম, ‘আমার একটা কথা মনে পড়েছে।’

‘শাবাশ্।’ বলে জামু পেতে বসে, ডান কনুই হাঁটুর উপর, হাত গালের উপর রেখে, কাত হয়ে, চোখ বন্ধ করে বললে, ‘বল।’

‘মজন্’র শেষ প্রাণ-নিশ্বাস করে লীন ধরাতলে

সেই নিশ্বাস ঘূর্ণির রূপে লায়লীকে খুঁজে চলে।’

‘বুঝছি। কিন্তু আরও বুঝিয়ে বল।’

আমি বললুম, ‘মজন্ যখনই শুনত, তার প্রিয়া লায়লীকে নজ্দ্ মক্ভুমির উপর দিয়ে উটে করে সরানো হচ্ছে সে তখন পাগলের মত এ-উট সে-উটের কাছে গিয়ে খুঁজত কোন্ মহ্মিলে (উটের হাওদা) লায়লী আছে। মজন্ মরে গেছেন কত শতাব্দী হল। কিন্তু এখনও তাঁর জীবিতাবস্থার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস মক্ভুমির ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু হয়ে লায়লীর মহ্মিল খুঁজছে। তুমি বুঝি কখনও মক্ভুমি দেখ নি? ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু (বগোলে) অল্প অল্প ধুলি উড়িয়ে এদিকে ধায়, ওদিকে ছোটে, সেদিকে ধোঁজে?’

‘না। কিন্তু মাহুকের কল্পনা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তাই দেখে অবাক মানছি। উছ’টা বল।’

মজন্কে হম্বকী রওনক মুন্সু হুর্ক সিধারে

অব্ কৌ নজ্দ্দাক বগোলে মহ্মিলকো টুঁটতে হৈ।’

এর ছ'টা শব্দ ফার্সী। শব্দনাম বুঝে গেল। বললে, 'অতি চমৎকার দোহা।'

আমি একটু কিস্ত-কিস্ত করে বললুম, 'বড় বেশী ঠাস বুনোট। আমার বুঝতে কষ্ট হয়েছিল।'

বললে, 'তার পর তুমি একে শুধালে, "শব্দনাম বাহু কোথায় থাকে?" ওকে শুধালে, "সে কখন বেড়াতে বেরয়?"—তাবলে কেউই তোমার গোপন খবর জানে না।'

'আমি কি এতই আহাম্মুক!'

আমার ডান হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'শোন দিল-ই-মন, (আমার দিল)—মুর্থই হও আর সোজাংই (সজাটিস্) হও, প্রেম কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। শোন,

"দিল গুমান দারদ কি পুনীদে অস্ত্ রাই-ই ইশ্‌করা

শমরা ফাহুস পন্দারদ কি পিনহান্ করদে অন্ত।

সবল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,

কাঁচের ফাহুস মনে মনে ভাবে লুকায়েছে শিখাটারে।"

কে পারে? কেউ পারে না। আজ না হয় কাল ধরা পড়বেই। আমি পারি? এই তো তুমি যে আমার নেবুটি দিয়েছিলে—আমি সেটি নথ দিয়ে অল্প অল্প চোঁনা দিয়ে শুকছিলুম। হঠাৎ বাবা এসে শুধালেন, "নেবু যে! কোথায় পেলে?" আমি বললুম, "হোটলে চা খেতে গিয়েছিলুম"—বাবা জানভেন, "সেখানে জুটল।" আমার মুখ যে তখন লাল হয়ে যায় নি, কি করে বলব? আব্বা বললেন যে, তিনিও লাঞ্চে একটা পেয়েছিলেন। কে দিলে, কি করে পেলে কিছু শুধালেন না। তিনিও একদিন জানবেন।'

'তখন?'

'তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তো বিদেশী। আমার, শুধু আমার, আপন-দেশী। তোমার ভাবনা ভাববো আমি। বলেছি তো আমার কাছে ওমুখ আছে। ওসব কথা ছাড়। একটা কবিতা বল—আমাদের কথার সঙ্গে খাপ থাক আর নাই থাক।'

আমি বললুম 'খাপ খাইয়েই বলছি। তোমার মুখ লাল হওয়ার সঙ্গে তার মিল আছে, আবার কাঁচের চিমনি যে গর্ব করে সে প্রহীনের আলো লুকিয়েছে

তার সঙ্গেও মিল আছে । তবে এটা সংস্কৃতে এবং শ্লোকটার ভাবার্থ শুধু আমার মনে আছে—

“গুধাইলু ‘হে নবীন,
ভালোবাস মোরে কি না ?’
রাঙা হ’ল তার মুখখানি ;
প্রেম ছিল হৃদে ঢাকা ।
তাই হবে হয় আঁকা
আকাশেতে লাল রঙ, জানি—
পাহাড়ের আড়ালেতে
সবিতা নিশ্চয় তাতে
রক্তাকাশ তাই নেই মানি ।”

শব্দনয় বললে, ‘আবার বল ।’

বললুম ।

শব্দনয় বললে, ‘এটি অতুলনীয় । বিশেষ করে প্রেমের সঙ্গে সূর্যেরই শুধু তুলনা হয় । আকাশ আর মুখ এক । ঘড়ি ঘড়ি রঙ বদলায় । সূর্য চিরন্তন । প্রেম-সূর্য একবার দেখা দিলে আর কোন ভাবনা নেই ।’

আমি বললুম, ‘তোমার বেলা একটা নেবুতেই মুখ লাল হয়ে গেল । প্রেম হলে কি হত ?’

বিরক্তির ভান করে বলল, ‘কি বললে ? প্রেম নেই ?’

আমিও বেদনার ভান করে বললুম, ‘তুমিই তো বললে নেবুর ভিতর টক ।’

‘ও ! আমি বলেছিলাম, “আঙুরগুলো টক”—সেই অর্থে । তোমাকে পাব না ভয়ে শেয়ালের মত মনকে বোকাচ্ছিলাম ।’

‘তোমার সঙ্গে কথায় পারা ভার । তবে আরেকটা ফরিয়াদ জানাই ।’

গভীর মনোবোগ সহকারে, অত্যন্ত দোষীর মত চেহারা করে বললে, ‘আদেশ কর ।’

আমি বললুম, ‘আমার উচ্চারণে ঠাকুমার সিন্দুকের গন্ধ ।’

খলখল করে হেসে উঠল ; ‘আচ্ছা পাগল তো । সার্থক নাম রেখেছিলেন তোমার আকা-জানের মুরশীদ । ওরে মজলুন সেই ভাল । জানেমন্ বলছিল—’

বাধা দিয়ে বললুম, ‘সে আবার কে ?’

হুঁই বেয়ে । বুকে ফেলেছে । তুক কুঁচকে শুধালে, ‘হিংসে হচ্ছে ?’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ ।’

আনন্দে আলিঙ্গন করতে গিয়ে যেন নিজেকে ঠেঁকালে। হাসিতে খুশিতে কান্নাতে মেশানো গলায় বললে, ‘বাঁচালে, আমাকে বাঁচালে!’

অবাক হয়ে শুধালুম, ‘মানে?’

‘বাঁচালে, বাঁচালে। গুলী-জানীরা বলেন, প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য তাকে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে, আত্মবিসর্জন করে নিজেকে মিলিয়ে দেবে—মানি নে, মানি নে, আমি একদম মানি নে। আজ যদি গওহরশাদ কিংবা নূরজাহান তোমাকে ভালবেসে পেতে চান—’

আমি বললুম, ‘শাবাশ্।’

‘কি বললে? শাবাশ্? দেখাচ্ছি। প্রথম মারব ওদের। তখন যদি “শাবাশ্” বল তবে বেঁচে গেলে। না হলে তোমাকে মেরে খেঁতলে, পিষে শামী-কাবাব বানাব, নিদেন পক্ষে শিক।’ হাওব্যাগ খুলে পিস্তল দেখালে।

আমি বললুম, ‘ওতে বুলেট থাকে না।’

‘সেদিনও ছিল।’

‘জানেনন্ কে?’

‘আমার জিগরের টুকরো, কলিজার আধা, দিলের খুন, চোখের রোশনাই, জানের মালিক—আমার জ্যাঠামনি। তোমার কাছে সিগারেট আছে। লাও তো!’

‘সুধোবেন না, কোথায় পেলে?’

‘উনি সব জানেন।’

‘তুমি বলেছ?’

‘না।’

‘আরও কিছুক্ষণ বসি। সিনেমার লাইট নিবে গিয়েছিল বলে “শো” শেষ হতে দেয়ি হল। আমাকে বলতে হবে না।’

‘জ্যাঠামনি?’

‘তিনি বলেন, “সিনেমায় কেন যাও, বাছা? সিনেমা তো জীবনই দেখায়। তার চেয়ে জীবনটাকে সিনেমার মত দেখতে শেখ। অনেক হাক্কাম-হুজ্জৎ থেকে বেঁচে যাবে।”’

তারপর বললে, ‘এবারে তুমি চূপ কর। আমি একটু দেখে নিই, ভেবে নিই।’ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ বড় চোখ আরও বড় করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ বন্ধ করল।

একবার শুধু বললে, ‘বল তো—। না থাক।’

ভারপর অনেককণ একেবারে নিশ্চল নিখর।

বললে, 'আমার পেয়ালা একেবারে পরিপূর্ণ করে তরে দিয়েছেন করুণাময়। এই তোমার ঘর, তুমি পাশে বসে—এর বেশী কি বলব! নিখাসে নিখাসে আমি সব-কিছু শুবে নিয়েছি।'

এই প্রথম দেখলুম, শব্দনয় কোন কবির কবিতা দিয়ে আপন ভাব প্রকাশ করল না। কোন কবিতা পারত?

'উঠি।'

আমি বললুম, 'আবার কবে দেখা হবে?' এবারেও ভুলতে বসেছিলুম শুধাতে। আনন্দের সময় মানুষ দুঃখের দিনের সম্বল সঞ্চয় করতে ভুলে যায়। আসলে তা নয়। পরিপূর্ণতা যদি ভবিষ্যৎ দৈত্যের কথা শ্রবণ করতে পারে, তবে সে পরিপূর্ণ হল কই?

বললে, 'তুমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখবার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, তুমি কখনও সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'দয়া করে কর। শাস্তি পাবার ওই একমাত্র পথ। না হলে পাগলের মত ছুটোছুটি করবে। আর দেখ, তুমি যদি আমার কথাটা বিশ্বাস কর, তবে যদি কখনও আমার শক্তিকর হয়, তবে তখন আমি বিশ্বাস করব যে আমাকে পাবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা সেটা আমি ছাড়িয়ে যেতে পারব না। তখন আমি পাব শাস্তি।'

দোরের কাছে এসে শেষ কথা বললে, 'আমার বিরহে তুমি অভিভূত হয়ে যেয়ো না—ওইটুকুতেই আমার চলবে।'

দ্বিতীয় অংশ

॥ ১ ॥

সকলেই বলে, পলে পলে তুবানলে দৃষ্টি হওয়ার চেয়ে বহুকুণ্ডে কাম্প দেওয়া ভাল। আমি জানি, আমার সমুখে কত দীর্ঘ দিনের বিরহ। সেটা যদি আমি প্রথম দিনে জানতে পারতুম তা হলে সেটা কিছুতেই সহ্যে পারতুম না। আমার প্রাণনাশিত আত্মাতা আমাকে এক সঙ্গে একটি কহমের বেশী ওঠাতে দেন নি।

আলো দিয়েছিলেন, কিংবা বেদনা দিয়েছিলেন এক পা চলার—বিরহদিগন্ত কত দূরে দেখতে দেন নি। তাঁকে দোষ দিই কি করে ?

আর শব্দনম ! সে তো শিউলি। শব্দ-নিশির স্বপ্ন—প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা। সে যখন ভোরবেলা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে কি খেচ্ছায় ?

ওই কঠিন কঠোর সময়েও সে একবার ঝড়ের মত আমার ঘরে এসেছিল।

এক নিশ্বাসে কথা শেষ করে কঁদেছিল। ওই প্রথম আর ওই তার শেষ কান্না। তার বাবাকে আমানুজা কান্দাহারের গবর্নর করে পাঠাচ্ছেন। ফ্রান্সের নির্বাসন শেষ হওয়ার পর দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু আমানুজা আর সর্দার আওরঙ্গজেব খানেতে বনাবনি হল না ; বিশেষত তিনি আমানুজার উগ্র ইউরোপীয় সংস্কার পদ্ধতি আদর্শেই পছন্দ করতেন না। এখন ইউরোপ যাবার মুখে তিনি বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আওরঙ্গজেব নাকি প্রথমটায় যেতে চান নি। এখন স্থির হয়েছে, তিনি মাত্র তিন মাসের জগ্না যাবেন। আওরঙ্গজেবের পিতৃভূমি কান্দাহার তিনি ভাল করে চেনেন—তিন মাস পরে অবস্থা দেখে আমানুজাকে জানাবেন, ঠিক কোন্ লোককে তাঁর পরের গবর্নর করে পাঠালে সে কান্দাহারের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

এত দুঃখের মাঝখানেও ওইটুকু ছিল আনন্দের বাণী। কাবুলে রাজনৈতিক মরুভূমিতে বাস এক রকম অসম্ভব। হয় তুমি রাজার পক্ষে, রাজার প্রিয়-ভাজন—নয় তুমি কারাগারে কিংবা ওপারে ; শব্দনম যদিও বললে তাঁর আব্বা এ-সব ব্যাপারে ঈষৎ উদাসীন। ফ্রান্সে নির্বাসনকালে তিনি সেখানকার স্যার সীর মিলিটারি কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মিলিটারি স্ট্রাটেজি সম্বন্ধে বিস্তার গবেষণা করেছিলেন, এখনও করেন—আর তার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য-চর্চা।

সেদিন শব্দনম তেজী তুর্কী রমণীর মত কথা বলে নি, কথায় কথায় কবিতা বলতে পারে নি। শুধু অহুসনয় বিনয় করেছিল।

আমি শুধু একটি কথা বলেছিলুম, 'তোমার না গেলে হয় না ?'

বেচারী ভেঙে পড়ে তখন।

টসটস করে, কোন আভাস না দিয়ে, ঝরে পড়েছিল অনেক ফোঁটা মোটা মোটা চোখের জল।

আমার দু হাত তুলে ধরে তাদেরই দু পিঠ দিয়ে আপন চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল, 'ওইটেই তুমি শুধু শুধিয়ে না লক্ষ্যটি। এই একটা প্রশ্ন আমার মাথার ভিতর ঢুকে যেন পোকাকর মত কুরে কুরে থাকছে। না গেলে হয় না ?'

না গেলে হয় না ?—অসম্ভব, অসম্ভব। কিন্তু কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে, তুমি ওকে রক্ততর করো না।’

দরজার কাছে এসে তার কথামত দাঁড়ালুম।—বললে—যেটা সে আগের বারও বলেছিল, ‘আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।’

ওর তো কথা বলার অভাব নেই। বুঝলুম, প্রাণের কথা মাত্র একটি।

ভোরবেলা আমি আধো ঘুমে। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কেটেছে। আমার শিররে বসে শব্দনম। আমি চোখ মেলেতেই সে দু হাত দিয়ে আমার চোখ বন্ধ করে দিল।

যেন শুনলুম, ‘ব্ আমানে খুদা’—তোমাকে খুদার আমানতে রাখলুম। ‘ব খুদা সপুর্দমৎ’—তোমাকে খুদার হাতে সর্পোদ করলুম।

‘আমার বিরহে—’

সমস্ত ব্যাপারটা কয়েক সেকেন্ডের। দীর্ঘতম স্বপ্নও নাকি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের।

বলতে পারব না, সত্য না স্বপ্ন। শব্দনমকে শুধোবার সুযোগ পাই নি। বোধ হয় সত্য-স্বপ্ন। কিংবা স্বপ্ন-সত্য।

প্রথম তিন মাস, তার পর চার মাস, তার পর ছ-মাস। আমাহুজ্জা বিদেশ থেকে এক এক দু দু মাসের ম্যায়াদ বাড়ান ; আর শব্দনমরা ফিরতে পারে না।

সহের সীমা পেরিয়ে গেল।

শব্দনমদের প্রাচীন ভৃত্য তোপল্ খান দু-তিন মাস অন্তর অন্তর একবার করে কাবুল আসে আর শব্দনমদের চিঠি দিয়ে যায়—ডাককে অবিশ্বাস করার তার যথেষ্ট জায্য হক ছিল।

সে চিঠিতে কি ছিল আমি বলতে পারব না। ফার্সীতে ফরাসীতে বেশানো চিঠি। যে শব্দনম কথায় কথায় কবিতা বলতে পারত সে বিদ্যায়ের সময়কার মত একটি কবিতাও উদ্ধৃত করে নি কিংবা করতে পারে নি। মাত্র একবার করেছিল।

তাও আমি আমার চিঠিতে সে-কথার উল্লেখ করেছিলুম বলে। তখন লিখেছিল :

“আজ হনরে হালে খরাব, মম্নু ওদ্ ইসলাহ পজীর
হমচু ওয়রানে কি আজ গন্জে খুদ আবাদ নু শুদ।”

‘এত শুধু ধরি কি হইবে বলো ছুরবহার মাঝে ?

পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন—লাগে তার কোনো কাজে ?’

আর ছিল কান্না আর কান্না ।

প্রত্যেকটি শব্দে, প্রত্যেকটি বাক্যে । এমন কি আমাকে খুলী করবার জন্তে বখন জোর করে কোন আনন্দ ঘটনার খবর দিত তখনও সেটি থাকত চোখের জলে ভেজা ।

থাক্ । আমার এ গুপ্তধনে কী আছে তার সামান্যতম ইঙ্গিত আমি দেব না । এখন এটি আমার চোখের জলে ভেজা ।

এক বছর ঘুরে যাওয়ার পর আমি একদিন যোজ্ঞা করলুম । সন্ধ্যার সময় গোসল করে, সামান্য ইফতার (পারণা) করে নমাজে বসলুম । হুপুর রাতে ঘুমুতে গেলুম । স্বপ্নে সত্যপথ নিরূপণের এই আমাদের একমাত্র পন্থা ।

স্বপ্নাদেশ হল, কান্দাহার যেয়ো না । ভোর রাতে ।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত । আমি ভেবেছিলুম, কোন আদেশই পাব না এবং বিবেককে সেই পন্থায় চালিয়ে দিয়ে আমি কান্দাহারের পথ নেব ।

অবশ্য কুরান শরীফে এ প্রক্রিয়ার উল্লেখ নেই । কাজেই না মানলেও কোন পাপ হবে না । কোন কোন মৌলানা এ প্রক্রিয়া অপছন্দও করে থাকেন ।

এমন সময় আকবুর রহমান এসে ঘরে দাঁড়াল । আমি তার দিকে তাকালুম । বললে, ‘কাল আমি কান্দাহার ঘাবার অহুমতি চাই ।’

আকবুর রহমান সেই যে পাগমানে গোড়ার দিকে একদিন বলেছিল আওরঙ্গজেব-পরিবার কাবুল চলে গিয়েছেন তারপর সে ওই বিষয়ে একটি কথাও বলে নি ।

আমি শুধালুম, ‘কেন ?’

‘ওখানে আমার এক ভাগ্নে আছে । তোপলু খান দু মাস হল আসে নি ।’

এ ছুটো কথাতে কি সম্পর্ক আছে ঠিক বুঝতে পারলুম না ।—একটু চিন্তা করে স্থির করলুম, আকবুর রহমানকে দিয়ে চিঠি লিখে কান্দাহার আসবার অহুমতি চাইব, আর আল রাতে যদি কোন প্রত্যাদেশ না আসে তবে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেও পারি । আকবুর রহমান চলে গেল ।

আমি নত মস্তকে স্নান গভিতে টেবিলের দিকে চললুম, চিঠিখানা তৈরী করে রাখতে । এই এক বৎসর আমি কার্গী শিখেছি প্রাণপণ—সে-ই ছিল আমার বিরহে সাধনার তীর্থ—তবু চিঠি লিখতে সময় লাগে ।

টেবিলের কাছে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, শব্দম।

। ২ ।

পরে শব্দমের কাছ থেকেই শুনেছি, আমি নাকি জাত-ইতিহাসের মত শুধু বিড়বিড় করে কি যেন একটা প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছিলুম। 'তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি। তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি।' আমার বিশ্বাস লাগে, এইটাই কি আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল!

অপমানিত, পদদলিত, ব্যঙ্গ-কশাঘাতে জর্জরিত নিরাশ দীনহীন জনকে যদি রাজাধিরাজ ধর্মরাজ সহসা আদর করে ডেকে নিয়ে সিংহাসনের এক পাশে বসান তখন তার কি অবস্থা হয়?

আশৈশব অপমানিত, যৌবনেও আপন নীচ-জন্ম সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন স্মৃতপুত্র কর্ণ যেনদিন মহামায়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা কুন্তীর কাছে শুনেতে পেলেন তিনি হীনজন্মা নন, তখন তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল?

শব্দম এতটুকু বদলায় নি। সৌন্দর্যহর কাল যেন তার সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। গাত্রস্পর্শ করতে পারে নি। ষাবার দিন যে রকমটি দেখেছিলুম, ঠিক সেই রকম। আমার বুকের ভিতর যে ছবি আমি এতদিন হিয়ার রক্ত দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলুম সে যেন আজ মুক্তিস্থান সেবে আমার সম্মুখে দেখা দিল। তার মুখে সব সময়েরই শিশির-মধুমাংস, আফগানিস্থান-হিন্দুস্থান বিরাজ করত; কপাল আফগানিস্থানের শীতের বরফের মত শুভ্র আর কপোল বোলপুরের বসন্ত-কিংকরকের মত রাঙা। ছবছ সেই রকমই আছে।

শুধু কোথায় যেন তবু পরিবর্তন হয়েছে। চোখে? সেইখানেই তো সর্ব-প্রথম পরিবর্তন আসে। না। চোঁটের কোণে? না। গালের টোল ভরে গিয়েছে? না সর্বস্বত্ব? তাও না।

অকস্মাৎ বুকে গেলুম ওর ভিতর আগুন জ্বলছে। সে আগুন সর্বাত্ম হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমার কাছে এসে, দুহাত আমার কাঁধে রেখে মন্তকাজ্ঞাপন করল। বনবাস-মুক্ত রামচন্দ্রকে কৌশল্যা যে-রকম মন্তকাজ্ঞাপন করেছিলেন।

বললে, 'হিঃ! তুমি রোগা হয়ে গিয়েছ।'।

বুঝলুম, ওকে পুড়িয়েছে বেশী। এবং নইবার শক্তিও তাঁর অনেক, অনেক

বেশী আমার চেয়ে। হৃদয়ঙ্গম করলুম, ওর কথাই ঠিক। ওর ব্যাকুলতাই বেশী। কিন্তু জীবনে বিশ্বাস ওকেই করতে হবে। মরুভূমিতে মাত্র দুজন্য এই কাকোলাতে সে-ই নিশানদায় সর্দার !

বড় ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'আমাকে একটু ঘুমতে দেবে ?'

খুঁড়ুওয়ালা চরণচক্রপরা বাড়ির নতুন বউ চলাফেরা করার সময় যে রকম দক্ষিণী বীণা বাজে, ওর গলার শব্দ সেই রকম।

শুয়ে পড়ে একটি অতি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস কেলে বললে, 'তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

আশ্চর্য এ আদেশ ! আমি আবার যাব কোথায় ? তখন বুঝলুম, যে আদেশ দেবার পূর্বেই প্রতিপালিত হয়ে গেছে সেইটেই সত্যকার আদেশ, যে বাক্য অর্থহীন সেইটেই সব অর্থ ধরে।

তবে শুনেছি, স্বয়ং লক্ষী এলেন ভাগ্যহীন চাষার কপালে ফোঁটা দিতে। সে গেল নদীতে মূখ ধুতে। ফিরে এসে দেখে তিনি অস্তর্ধান করেছেন। ওরে মূর্খ, ঘামে-ভেজা কাদা-মাখা কপালেই তখন ফোঁটা নিয়ে নিতে হয়। এক বছরের অবহেলায় গৃহ শ্রীহীন। তাই বলে আমি কি এখন ছুটব ডেকোরিটরের দোকানে !

শব্দ-নন্দের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছিল। তারপর সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি জানি, রোমাণ্টিকেরা, আমার তরুণ বন্ধুরা, মর্যাহত হবেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর এই অপ্ৰত্যাশিত মিলন ; আর একজন গেলেন ঘুমতে ! আর আমি কি করলুম ? সত্যি বলছি, একথানা বই নিয়ে পড়তে লাগলুম। এক ঘণ্টা পরে দেখি, এক বর্গও বুঝতে পারি নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান ? এক ঘণ্টারও বেশী সে ঘুমিয়েছিল। কতদিনের জমানো ঘুম কে জানে ? কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাবনা সে ওই ঘুমে চিরকালের তরে গোর দিতে চায় কে জানে ? ঘুম থেকে উঠে চুপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি লাজুক ছেলে বিপদে পড়লে যে রকম হয় সেই গলায় বললুম, 'কিছু বলছ না যে ?'

বললে—

'ওয়ালি হরফ-ই চুন ও চিরা বস্তে অস্ত্ লব্
চুন রহ-তমাম গশ্ জর্গ বি-জবান শওদ।'

'কাকোলা যখন পৌছিল গৃহে মরুভূমি হয়ে পার
সবাই নীরব। উটের গলায়ও ঘণ্টা বাজে না আর।'

বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যা বললে তার ভিতরই তার প্রতিবাদ হয়ে গিয়েছে। নিজের নীরবতা বোঝাতে গিয়ে শব্দনয়ন সব হয়েছে। আর শুধু কি তাই? সেই পুরনো শব্দনয়ন—যে কবিতা ছাড়া কথা কইতে পারে না। যে পরওয়ারানা প্রদীপের পানে ধায় না সে আবার পরওয়ারানা! পরক্ষণেই বললুম, যে খুদা এ কি অপরা চিন্তা এনে দিলে আমার মনে—এই আনন্দের দিনে? মনে মনে ইষ্টময় জপলুম।

সুনতে পেয়েছে। শুধালে, ‘কি বলছ?’

আমি পাছে ধরা পড়ে বাই তাই বললুম, ‘তুমি ঘুমোবার আগে আমাকে কি ঘেন বলছিলে?’

‘ও! বাড়ি ছাড়তে বায়ন করেছিলুম, আর বলেছিলুম—

“দীর্ঘনে থানা-ই খুদ হু গদা শাহানশাহ-ইন্ত
কদম্ বাকুন মনহ আজ হুদ-ই-খওয়িশ ও সুলতান বাশ।”

‘ভিখারী হলেও আপন বাড়িতে তুমি তো রাজার রাজা—
সে রাজ্য ছেড়ে বাহিরিয়া কেন মাত্র শুধু রাজা সাজা!’

‘কী রকম?’

‘এই মনে কর ইরানের শাহ-ইনশাহ—রাজার রাজা, মহারাজা। তিনি যদি আজ এদেশে আসেন তবে আমরা বলব ইরানের শাহ—রাজামাত্র। কারণ আমাদের তো রাজা রয়েছেন। আমাদের শাহের তিনি তো শাহ নন।’

‘আর যদি বক্ততা স্বীকার করেন?’

‘কী বোকা!’

‘হ্যা! যেমন মনে কর তুমি তোমার আপন বাড়িতে অল্প অনেক জনের ভিতর শাহজাদা, কিংবা শাহজাদী, কিংবা ধরলুম শাহুই। কিন্তু এ বাড়িতে তুমি শাহ-ইন শাহ—মহারাজা।’

‘ওতে আমার লোভ নেই।’

আমি দ্ব্যর্থ পেলেম।

বলে, ‘ওরে বোকা, ওরে হাবা, ওইখানে, ওইখানে’—বলে তার আঙুল দিয়ে আমার বুকের উপর বার বার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর বলল, ‘এবার তুমি বড় লক্ষী ছেলে হয়ে গিয়েছ। এখনও একটা করিয়াদও কর নি।’

‘করি নি? তা হলে কি করেছি এতদিন, প্রতি মুহুর্তে? হাকিম সেটা জানতেন না? আমার হয়ে সেটা করে দান নি?’—

“তুমি বলেছিলে ‘ভাবনা কিসের ? আমি তোমারেই ভালবাসি ;
 আনন্দে থাকো, ধৈর্য-সজিলে ভাবনা যে থাক ভালি ।’
 ধৈর্য কোথায় ? কিবা সে হৃদয় ? হৃদয় কাহারে কয় ?
 সে তো শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ফরিয়াদ-রাশি ।”
 বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, “ফরিয়াদ-রাশি” নয়, আছে “ভাবনার রাশি” ।
 আমি বললুম, ‘সে কি একই কথা নয় ?’

বললে, ‘কথাটা ঠিক । হৃদয় মানেই চিন্তা, ভাবনা, ফরিয়াদ—অতি কালে-
 ভদ্রে কিঞ্চিৎ সাস্থনা—। সেই সাস্থনাটুকু না থাকলেই ভালো হত । বেদনা-
 বোধটা হয়তো আন্তে আন্তে অসাড় হয়ে যেত । কিম্বত্তের এ কী বিয়সন্তোষী
 প্রবৃত্তি ! নিরাশায় ছুয়ে ছুয়ে গাছটা মরে যাচ্ছে । মরতে দে না । তা হলে
 তো বাঁচি । না ; তখন দেবে সাস্থনার এক ফোঁটা জল । আবার বাঁচ, আবার
 মর । যেন বেলাভূমির সঙ্গে তরঙ্গের প্রেম । দূর থেকে সাদা দাঁত দেখিয়ে
 হেসে হেসে আসে, আবার চলে যায়, আবার আসে, আবার যায় ।’ হঠাৎ
 হেসে উঠে বলল, ‘কিন্তু আমি শতবার মরতে রাজী আছি—একবার বাঁচবার
 তরে ।’ এটা যেন আপন মনের কথা । তারপর আমাকে শুধালে, ‘এখন
 ফরিয়াদ করছ না কেন ?’

আমি বললুম, ‘কাজল যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ—
 সে কালো । চোখে যখন মেখে নিই তখন তো তার কালিমা আর দেখতে পাই
 নে । সে তখন সৌন্দর্য বাড়ায় । এটা আমার নয়—কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত
 তিরুবল্লুবেরের ।’

‘চমৎকার । আমাদেরও তো হুঁমা আছে, কিন্তু কেউ কিছু লিখেছে বলে
 তো মনে পড়ছে না । আরও একটা বল ।’

‘গুরু কাব্য তো আমি সঙ্গে আনি নি । আচ্ছা দেখি ।’ একটু ভেবে
 বললুম, ‘নিষ্ঠুর প্রিয়ের সখ্যে প্রিয়া বলছেন, “সে আমার হৃদয়-বাড়িতে দিনে
 ঢোকে অন্তত লক্ষ বার কিন্তু তার বাড়িতে কি আমাকে একবারও ঢুকতে দেয় ?
 আমিই তাকে স্মরণ করি লক্ষ বার, সে একবারও করে না ।”’

হঠাৎ দেখি শব্দনম গভীর হয়ে গিয়েছে । কবিতাটি ভাল হোক মন্দ হোক
 এতে তো গভীর হওয়ার মত কিছু নেই ।

কান্নার স্বরে বললে, ‘আমার বাড়িতে নিয়ে ধাই নি—তোমাকে ? কবে
 যাবে বল ।’

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারি নি ‘বাড়ি’ বলতে সে ‘হৃদয়’ বুঝেও মতাকার
 লৈ (৫২)—১০

আপন বাড়ি বুঝেছে।

আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার হু হাক চেপে ধরলুম। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। কি যেন একটা 'হারাই হারাই' ভাব বুকটাকে ঝাঁকড়া করে দিল। আবার কথা বলতে গেলুম, পারলুম না।

আন্তে আন্তে তার হাত ছুটি ছাড়িয়ে নিয়ে আমার হাতের উপর বুলোতে বুলোতে বললে, 'আমি পাগল, না, কি? বন্ধু, তুমি কিছু মনে করো না। এই এক বছর ধরে—'

বাধা দিয়ে অতি কষ্টে বললুম, 'আমার উপর মেহেরবান হও—প্রসন্ন হও। আমি কি জানি নে আমি কত অভাজন। তুমি এ শহরে—'

এবারে হেসে উঠে বাধা দিয়ে বললে, ‘—সবচেয়ে হুমকী (আমি কিন্তু তার কুল-গোষ্ঠীর কথা বলতে যাচ্ছিলুম)। না? আমি কুৎসিত হলে তুমি আমায় ভালবাসতে না—সে তো কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমি মাঝারি হলে কি করতে বল তো?’

আমি ঝড় কাটাতে ব্যস্ত। হালের সঙ্গে পাল। বললুম, 'এ রকম প্রাণ আমি কোনও বইয়ে পড়ি নি। সাধারণত মেয়ে শুধায়, সে স্কন্দী না হলে ভালবাসা পেত কি না?'

‘উত্তর দাও।’

‘আমি নিজে তো মাঝারি। তুমি তো বেলেছ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি তর্কী রমণী। তুমি—’

‘বাস, বাস, থাক থাক। এবার এদিকে এস। আমার ব্যাগটা খোল তো। ই্যা ওই কয়লা বাঁধা জিনিস।’

সামনের টেবিলে সেটি রেখে রূপোতে সিঁকেতে কাজ করা কিংখাঁপের রুমালের গিঁট আন্তে আন্তে অতি সন্তর্পণে খুলতে লাগল—যেন তীর্থের প্রসাদী। আমি এক দৃষ্টে দেখছিলাম তার আঙুলের খেলা। প্রত্যেকটি আঙুল যেন এক একটি ব্যালে নর্তকী। হাতের কবজি ছুটি একদম নড়ছে না—আঙুলগুলো এখানে যায়, সেখানে যায়, একটা অসম্ভব অ্যান্ডল থেকে চট করে আরেক অসম্ভব অ্যান্ডলে চলে যায়। পিয়ানো বাজানো এর কাছে কিছুই নয়; সে তো শুধু ডাইনে বাঁয়ের নড়ন চড়ন।

ছুখানা কয়াল খোলায় গরুর গোবর দিলে রঙে চামড়ার বাঁধানো একখানি ছোট্ট বই। চামড়ার উপর লক্ষ্য পড়েছিল সত্যেন্দ্রের। চাইলে কোণ ভেঙ্গে টাটকা করে নিত। কিন্তু কখনও মূল-লতা-পাতার নকশার তুলনায়—চাক্ষুসী হস্তের রাগের বসে আছে

সুদে সুদে পাখি। বইয়ের বাঁকখানে একটি জোয়ালো গোল মেডালিয়ন, নামাঙ্কন-স্বাক্ষরলাহন সহ।

বললে, ‘আরও কাছে এস।’

আঙুলের ডগা দিয়ে আঙে আঙে এক একটি করে পাতার প্রান্ত বুলিয়ে সেটিকে উন্টায় আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে যেন একটি করে নূরুল বাগান। পাতার মাঝখানে কুচকুচে কালো কালিতে হাতের লেখা কলী কবিতা আর তার চতুর্দিকের বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির স্ফটিক। অতি ছোট ছোট গোলাপী রঙের পাশে ডালের উপর বসে সুদে সুদে বুলবুল। কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে লতার উপর জুলছে, কখনও বা ঘাড় নিচু করে গোলাপী কুড়ির সঙ্গে কানে কানে কথা কইছে। সখী, জাগো, জাগো। পাঁচ-ছটা বড়ের এক সপ্তকেই সংগীত বাঁধা হয়েছে, কিন্তু আসল পকড় সোনালী, নীল আর গোলাপীতে।

বললে, ‘লেখাটা করে দিয়েছেন আগা-ই-আগা ওস্তাদ শিব-বুলন্দ কিজল্বাশ। উনিই আমাদের শেষ জরীন্দ-কলম, সোনার কলমের মালিক। তাঁর ছেলে পর্যন্ত হিন্দুস্থান চলে গিয়েছে ছাপাখানার কাজ শিখতে!’ একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

প্রতি দু পাতার মাঝখানে এক একখানি করে অতি পাতলা সাধা কাগজ। আতর মাখানো।

বুলিয়ে বললে, ‘পোকায় কাটবে না আর আভরের ভেলের রেহ কাগজকে শুকনো হতে দেবে না।’ আমার মনে পড়ল সত্যেন দত্তের ফার্সী কবিতার অনুবাদ।

‘তবু বসন্ত ঘোবন সাথে হু’দিনেই লোপ পায়

কুহুমগন্ধী ঘোবন পুঁথি পলে উলটিয়া যায়।’

আবার এ কী অপরাধ বচন? না, না। সৃষ্টির প্রথম দিনের প্রথম বুলবুলের সঙ্গে প্রথম গোলাপের যুগ মর্মর গানে মর্মের বাণীর কানাকানি এখনও আছে, চিরকাল থাকবে।

শব্দম কিন্তু-কিন্তু করে কি যেন বলতে চাইছে, বলছে না। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে-মুখ একেবারে সিঁড়ির মত টকটকে।

আমি তাকাতেই সেই মুখে যেন ঘামের ফোটা দেখা দিল। শব্দমের মুখে শব্দম! ঘাড় ফিরিয়ে অপরাধীর যুদ্ধকণ্ঠে বলল, ‘আর বর্ডারগুলো আমার আঁকা!’

বলেই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে।

আমি হসিগশিত্তকে নরুগিস বনের ভিতর দিয়ে নাচতে দেখলুম। আমার বুথার-কার্পেট ছিল নরুগিস মতিক।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে হাঁকলে, ‘আগা আব্দুর রহমান। চা খাবে?’

আব্দুর রহমান হস্কার ছাড়লে, ‘চশ্ম!’—যেন হকুমটা কান্দাহার থেকে এসেছে, জবাব দেখানে পৌঁছনো চাই।

কী সৌভাগ্য! ‘চা খাবে?’—‘চা আন’, নয়। অর্থাৎ তুমি যদি খাও, তবে আমিও যেন এক পেয়ালা পাই।’ তৃত্যকে সহচরের মত মধুর সন্তাষণ। আর আমার আব্দুর রহমানও কিছু কম নয়। ‘চশ্ম’—অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার ‘চশ্ম’, চোখের মত কিস্মৎবার, মূল্যবান।’

আমার মূল বিষয় কিন্তু এতে তো চাপা পড়ে না।

‘তুমি একেছ?’

নীরব বীণা।

‘তুমি একেছ?’

যেন অতি দূরে সে বীণার প্রথম পিড়িং শোনা গেল ‘বড় কাঁচা।’

আমি সপ্তমে বললুম, ‘কাঁচা? আশ্চর্য! কাঁচা? তাজ্জব ক-টা ওস্তাদ এ রকম পারে?’

এবারে কাছে এসে হেসে বললে, ‘তুমি কিছু জান না। তাই তোমাকে কবিতা শুনিয়ে স্বথ, তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনন্দ।’

আমি রাগ করে বললুম, ‘তুমি কি আমাকে অজ গাইয়্যা পেয়েছ? দিল্লীর মহাকিছখানাতে আমার দোস্ত রায় আমাকে কলমী কিতাব দেখায় নি?’

আমাকে খুশী করার জন্ত বললে, ‘তাই সই, তাই সই ওগো তাই সই। কিন্তু আমার ওস্তাদ আগা জমশীদ বুথারী বলেন, ‘রোজ আট ঘণ্টা করে ত্রিশ বছর আঁকার রেওয়াজ করলে তবে ছবি আঁকার কল রপ্ত হয়। এবং তারপর চলে যাবে চোখের জ্যোতি।’

আমি অবাক হয়ে বললুম, ‘বল কি?’

‘হ্যাঁ। এবং বলেন, “কিন্তু কোনও দুঃখ নেই। তুমি নিজেই জান না তোমার মূল্য কি?”’

‘মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে?’

খুশী হয়ে বললে, ‘বিলহুল! —প্রকৃত জহরী সমঝে যাবে তোমার প্রথম ছবিতে কোন শেষ কথা লুকনো আছে, আর তোমার শেষ ছবির সব মিলে যাবে

প্রথম ছবিয় প্রথম চেকায়।” তারপর তিনি খুব জোর দিয়ে বলতেন, “হুনরে যখন পরিপূর্ণতাই এসে গেল তখন আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? এবং যদিহ্যাং তার পরও কিছু উদ্ভূত থেকে যায় তবে সেইটে ভাঙিয়ে থাকে তোমার নিয়ন্ত্রণ—তাদের জন্তও তো কিছু রাখতে হয়। তখন তোমার পাকা গম-রঙের বেহালার হুয় শোনা যাবে তাদের কাঁচা সবুজ বেহালার রেওয়াজে।”

আমি বললুম, ‘চমৎকার।’

‘আমি তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ কণ্ঠস্থ করে রেখেছি।’

আমি শুধালুম, ‘কার কাব্য আছে এতে?’

‘অনেকের। তোমাকে যেগুলো শুনিয়েছি আর যেগুলো শোনাব। তুমি যে ক-টি বলেছ তাও আছে। তবে বেশীর ভাগ আবু তালিব কলীম কাশানীর। ইনি আসলে ইরানী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাদশা জাহাঙ্গীরের সভাকবি হন। আর আছে সাদ্দিব্ তবরীজীর। ইনিও হিন্দুস্থানে কিছুকাল ছিলেন—কলীমের বন্ধু। তখন ইরানে রব উঠেছে—

“সকল মাথায় তুর্কী নাচন তোমার লাগি, প্রিয়ে,

লক্ষপতি হবে সবাই হিন্দুস্থানে গিয়ে।”

এসব আমি এবারে কান্দাহারে শিখেছি। পরে বলব।’

বললে, ‘তুমি কখনও জানবে কি, বুঝবে কি, ছবি আঁকার সময় প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আমার সামনে ছিলে? প্রতিটি তুলির টানে আছে তোমার চুল, প্রতিটি বাঁকা রেখায় আছে তোমার ভুরু। তোমার হাসি থেকে নিয়েছি গোলাপী, তোমার স্বর থেকে নিয়েছি রূপালী।’

আমি বললুম, ‘দয়া কর।’

‘আমায় বলতে দাও। এই একবারের মত।’

‘শেষ বলবলের চোখ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে জানেমন—বড়চাচা—ঘরে ঢুকে বললেন, “চলো মুসাফির, বাঁধ গাটুরিয়া, বহুদূর জানে হোয়েগা।” কাল সকালেই কাবুল যাত্রা। বাদশা আপন গাড়ি পাঠিয়েছেন। তাঁর সবুর সহ্যে না। তাই তো তোমাকে থবর দিতে পারি নি।’

আব্দুর রহমান চা নিয়ে এল। শব্দম বললে, ‘আগা রহমান, তুমি তোপল খানকে প্রতিবারে কোর্মা-কালিয়া খাইয়েছ আর সিনেমা দেখিয়েছ। খুঁধা তোমার মজল করুন। এদিকে এস। এই নাও। কান্দাহার থেকে এনেছি।’

বাগ খুলে শব্দম বের করলে তারিজের মত ছোট্ট একখানি কুমান্ শরীফ।

লগে আতশী কাঁচ। তাই দ্বিগুণে পড়তে হয়।

আব্দুর রহমান নিচু হয়ে হাত দুইয়ে হাতখানি আপন চোখে চেপে ধরল। তারপর কুরআনখানি দু-হাতে মাথার উপর তুলে ধরে আন্তে আন্তে চলে গেল। তার মুখের ভাব কি করে বর্ণাই! জোয়ানের ইয়া কবড়া মুখখানা যেন কচি শিশুর হাসিমুখে পরিণত হল।

কী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তী এই শব্দনম। জানত, অল্প কিছু আব্দুর রহমানকে গছানো যাবে না।

শব্দনমের আঁকা বর্ডার দেখতে গিয়ে সে শুধালে, 'আচ্ছা বল তো, এই বুলবুলের নাম কি?'

আমি বললুম, 'বুলবুল তো এক রকমেরই হয়।'

'এই বুলবুল, এ বইয়ের সব বুলবুল শব্দনম। বুলবুল এসেছিল বাগানে, সে-ই প্রথম গোলাপকে প্রেম নিবেদন করবে। এসে দেখে গোলাপ আগের থেকেই বাতাসে বাতাসে তার প্রেমের বারতা বিছিয়ে রেখেছে। গোলাপের কাছে পৌঁছবার বহু পূর্বেই সে সৌরভের ডাক শুনতে পেল, 'এস এস, প্রিয়। মনে আছে?'

'তুমি কেন দুঃখ কর, বুলবুল? শব্দনম যদি সমস্ত রাত গোলাপের উপর অশ্রুবর্ষণ না করত তবে কি সে ফুটতে পারত?'

জড়ানো কণ্ঠে বললে, 'সেই ভালো, ওগো শব্দনমের শরৎ-নিশির স্বপ্ন। এই নাও তোমার বই।'

আমি প্রতিবাদ করেছি।

শান্ত কণ্ঠে বললে, 'এতে আছে আমার চোখের বার জল। সে জল তো আমি চোখে পুরে নিতে পারব না। এই জল দেখে যখন তোমার চোখে জল টলটল করবে তখনই তো এ তার চরম মূল্য পাবে।'

আমি বইখানা দুই হাত দিয়ে তুলে ধরে ঠোঁট চেপে চুমা দিলুম—

কিন্তু আমার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

শব্দনম আন্তে আন্তে, অতি ধীরে ধীরে, ঘাড় ঘোরালে। তার চোখে ছিল 'বহু জলের অতল রহস্য।

আমি বললুম, 'কিন্তু বহু, তুমি তো এর আগেই আমাকে সওগাত দিয়েছ।'

অবাক হয়ে বললে, 'কখন?'

'প্রথম রাত্রেই।' বলতে বলতে আমি ওয়েস্ট কোর্টের বুক পকেট থেকে বের করলুম একটি সোনালি ভিজিটিং-কার্ড কেস। এটি আমি সওগাত রাখবার জন্য

প্যারিস থেকে আনিয়েছিল। শব্দনমের হাতে ছিলুম।

সে খুলে দেখে ভিতরে একখানি ভিজিটিং-কার্ড। সেই কার্ডে অতি লম্বা জড়ানো একগাছি চুল।

‘চোর, চোর’ বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ওস্তাদ সেতারী বাজনা আরম্ভ করার পূর্বে যে রকম সব কটা ঘাটের উপর টুংটাং করে হাত চালিয়ে নেন, সেইরকম পর্দার পর পর্দা হাসলে। বললে, ‘তাই বল। আমি পরদিন সকালবেলা চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি এক গাছা চুল কম। খোঁজ খোঁজ, টোড় টোড় রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। শাজাদীর একগাছা চুল চুরি গেছে। বাদশা জানতে পেরে কোটালকে ডেকে কোফতা কাবাব করেন আর কি! আমি স্বয়ং গেলুম টেনিসকোর্টে, তারপর গেলুম হোটেল, তোমার ঘরে—’

আমি অবাক হয়ে বললুম, ‘আমার ঘরে?’

‘হ্যাঁ রে, জান, হ্যাঁ। আমার জান্ গিয়েছিল। তখন আকাশে আদম স্বয়ং—কালপুরুষ। তারপর মেঘ। তারপর বৃষ্টি। আমার জান ভিজে নেয়ে বাড়ি ফিরল। সেই হৃদয়—যাকে তুমি বল, “সে তো একবিন্দু শোণিত আর তাবনার রাশি”।’

‘তাই বল! আমি ভেবেছিলুম, তোমার চোখ থেকে ভাষ্যমতী বেরিয়ে কালপুরুষের আয়োনোফিয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে ঢুকল আমার চোখে।’

‘ওরে খোদর সিধে, তাহলে যে এ ব্রহ্মাণ্ডে বস লোক তাকিয়েছিল—’ হঠাৎ থমকে গিয়ে বললে, ‘ওই ষ্ বা। যে কাজের জন্ত এসেছিলুম তার আসলটাই তুলে গিয়েছিলুম। তুমি বুধবার দিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে? এই ধর, তিনটে নাগাদ।’

আমি বললুম, ‘কি যে বল? কিন্তু কেন? আমি যে ভয় পাচ্ছি।’

‘এখনও তোমার ভয় গেল না? ওরে ভীক, আমাকে বিশ্বাস করতে শেখ।’ ব্যাগটা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেই বুঝলুম, এবারে তার ঘাবার সময় এসেছে।

শব্দনম আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলে।

আমি কাতর কণ্ঠে বললুম, ‘ও-রকম তুমি হঠাৎ যেতে চাইলে আমার বড় বাজে। আমাকে একটু সয়ে নিতে দাও।’

বললে, ‘আমি যখন আসি, তখন তো বল না, “বাইরে সি ডিতে গিয়ে বস, একটু সয়ে নিতে দাও”।’

তার বিদায়ের বেলা আমার কোন উত্তর যোগায় না।

দেউড়ির কাছে এসে আকাশের দিকে নাচটি তুলে ছুঁবার খান নিলে। বললে, ‘শব্দ নয় পড়ছে।’

এবারে কথা বলার শক্তি দয়াময় দিলেন। বললুম, ‘আমার শব্দ নয় যেন মাত্র একটি গোলাপে বর্ষে।’

‘গোলাপে ঢুকে সে মুক্তা হয়ে গিয়েছে।’

॥ ৩ ॥

আমি রোমান্টিক নই। এ-প্রেম আমার সাজে না। এ-প্রেম তারই জন্ম, যে বেদনা সহিতে জানে, যে সংগ্রামে ভয় পায় না।

আমি ছেলেবেলা থেকেই ভীষ্ম। কৈশোরে সাহস করে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি। অনাদৃতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোনও কোনও মেয়ের স্বভাব। তারা যেচে কথা কইলে আমি লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কি উত্তর দিয়েছি তা আমি চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারব না।

চণ্ডীদাস পড়ে পেয়েছি ভয়। দিনের পর দিন শ্রীরাধার মত সহিতে হবে আমাকে বিরহ দহন? দরকার নেই আমার কাছুর প্রেম। গোপিনীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হওয়ার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। বনস্পতি গৌরব নিয়ে, উচু হয়ে দাঁড়িয়ে, বিদ্যাপাত ঝঞ্ঝা-বাত সহিবার মত শক্তি আর সাহস আমার নেই। আমি মেহদির বেড়া হয়ে থাকতেই রাজী। আর তিনি যদি তার উপর দয়া করে সাদা-মাটা ছ-একটি ফুল ফোটান তবে আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলে তাঁকে বার বার নমস্কার করব।

আমি চেয়েছি ঘরের প্রেম, বধুর প্রেম,—বঁধুর প্রেম আমি চাই নি। সংসারের অবহেলা অনাদরের মাঝখানে এইটুকু সান্ত্বনা যে, বাড়ি ফিরলে আমি সেখানে সবচেয়ে আদরের ধন। সারা দিনমান সে আমার সঙ্গে থাকবে স্বপ্নের মত—আমি চলাফেরা করব সেই স্বপ্ন-সম্মোহনে, ঘুমে-চলার রোগী যে রকম হাঁটে। আর রাত্তিকালে সে পাশে থাকবে—জানলার কাছে চাঁদ যে রকম অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিতের শিরে জাগে।

মণি ভরা, প্রবাল-হার-পরা নীলাক্ষী নীলাবুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাই নি। গ্রামের নদীটি পর্বন্ত আমি হতে চাই নি। আমি হতে চেয়েছিলুম বাড়ির পিছনের ছোট্ট পুকুরটি। যেটি আমার বধুর, আমার নির্জনে পাক্সা সংসারের জননীর একান্ত আপন। সেখানে সান্নাধ্যতম তরঙ্গ উঠে আমাকে

বিস্ময় করে না, আমার বধূকে ভীতাক্ত করে না।

এ মণিহার আমায় নাহি লাজে।

তবু ভাগ্যের কাছে স্বীকার করব, এই চল্লিশ ঘণ্টা আমার কেটেছে যেন এক অপরূপ সংগীতের সুরলোকে। চল্লিশ ঘণ্টার দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি, আমার তীর্থবাসানের দরগা-চূড়ো। আর যেতে যেতে দেখছি, পথের দুপাশে কত অতিথিশালার বিজ্ঞাপ্তি, কত সাধু-সজ্জন-সঙ্গম, শুনছি মন্দিরের ঘণ্টা, দূর হতে ভেসে-আসা ভোরবেলাকার আজান।

এবারে ঘরে ঢুকল ঝড়ের বেগে। যেন আসলে কত দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমার সামনে এসে হিন্দুস্থানী কায়দায় নমস্কার-মূদ্রাতে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, ‘হামি তোকে স্বাগতবাসি।’

প্রথমটায় বুঝি নি। তারপর হো হো করে হেসে উঠেছিলুম।

‘বুঝেছ?’

আমি বললুম, ‘এ তুমি শিখলে কোথায়?’

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললে, ‘আমি করলুম প্রেম নিবেদন, আর তুমি হাসলে।’ চোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে না বটে, কিন্তু ভেজা দিনের দেশলাইয়ের মত কখন যে জ্বলবে ঠিক নেই।

আমি অতি কষ্টে তাকে শান্ত করলুম।

আমি কি মুখ! উচ্চারণ আর ব্যাকরণের দিকে গেল কান?—বক্তব্যটা উপেক্ষা করে গেলুম। ধৃত সেই রাজা যিনি ভিথারিগীর ছেঁড়া কাপড় দেখেন নি—দেখেছিলেন তার মুখ, তার হৃদয়, আর তাকে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে। আমি আহাম্মুক, শাহজাদীকে দেখছি ভিথারিগীর বেশে।

• নিজের গালে নিজে চড় মেরেছি বহুবাব—এবার মারলুম লাথি।

বললে, ‘হিংসে হল না কেন তোমার? কোনও ইয়াংম্যান আমাকে শিখিয়েছে সেই সন্দেহে?’

আমি বললুম, ‘সে বাঙালী ইয়াংম্যান নয়।’

হার মেনে বললে, ‘কান্দাহারে আমাদের এক চাপরাসী ছিল—সে ঘোঁরনে কল্‌কাতায় নোকরী করত। তার কাছ থেকে শিখেছি।’

শব্দনম ভালো করে উচ্চারণটা শিখল। কারণ এই কথাগুলো শুদ্ধভাবে বাঙলাতে বলতে বা উচ্চারণ করতে কোনও কাবুলীর অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। শুধু বাধল গিয়ে ‘ভ’ অক্ষরে। তারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ণ নেই

বললেও চলে—এমন কিংকক্ষি ভারতেও নেই।

শেষটায় যখন বললুম ‘ঠিক’ তখন তারি খুশী হল। শুধালে, ‘আর তো তোমার কোনও ফরিয়াদ নেই?’

আমি চিন্তা করে বললুম, ‘আমার আর কোনও ফরিয়াদ নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে না।’

সন্দেহ-নয়নে তাকিয়ে শুধালে, ‘হঠাৎ?’

‘হঠাৎ-ই। কাল রাat্রে মনে পড়ল একটি সংস্কৃত শ্লোক :—

“শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।

উত্তরোদ্ধঃখ দায়িত্বং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ?”

‘শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়

বন্ধু বিচ্ছেদে হয় কষ্ট সাতিশয়।

উত্তয়েই বহু কষ্ট দেয় যদি মনে

শত্রু মিত্রে কিবা ভেদ তবে এ ভুবনে?’

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্রের অহুবাদ)

শব্দম বললে, ‘পয়লা নখরী প্যারাডক্স। এরপর আর কোনও ফরিয়াদ থাকার কথা নয়।’ তারপর চিন্তা করতে করতে বলল, ‘কিন্তু এর উত্তরটা কি?’

‘তুমি বল।’

‘দোস্ত মজল কামনা করে, দুশমন বিনাশ কামনা করে। আমি কামনাটা বড় করে দেখি। ফলটা অত বড় করে না।’

আমি বললুম, ‘শাবাশ! দোস্ত-ই-জান-ই-মন্—আমার দিলের দোস্ত—শাবাশ। হিন্দুস্থানের ধর্মগুরুও বলেছেন, মা ফলেবু কদাচন।’

আরও কিছু কথা হল।

আজ কিন্তু সমস্তকণ লক্ষ্য করছিলুম, আজ বেন শব্দমের মন অস্ত্র কোনো-থানে। হয়তো কোনও কথা বলতে চায় কিংবা শুধাতে চায়।

এমন সময় হাত্তায় হঠাৎ চোঁচামেচি আর আর্ত কণ্ঠসব শোনা গেল। এত জোর যে আমরা দুজনেই শুনেতে পেলুম। শব্দটা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল বেধে আমি একটু উৎকণ্ঠিত হলুম। এমন সময় দূর হতে এক লগ্নে অনেকগুলো বন্দুক হোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনাতে নিচে নেমে খবর নিয়ে জানা গেল

ডাকাতের সর্দার ছাড়াইসকাও কাবুল আক্রমণ করতে এসেছে। আমাহুতাকে তাড়াবে।

আফগানিস্থানের এ-অধ্যায় বিশ্বজনক। যে কোনও প্রামাণিক ইতিহাসে পাওয়া যায়। এক বাঙালী মুসলমানও এ-বিষয়ে লিখেছেন।

শব্দম আমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে এল।

ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগল। একবার বললে, ‘আমাহুতাকে বাবা বার বার বলেছেন, তিনি বারুদের পিপের উপর বসে আছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চান নি। যাক্গে, আমার তাতে কি?’

এ রকম আতঁনাদ আর গুলির আওয়াজ মেশানো অট্টরোল আমি জীবনে কখনও শুনি নি। একবার ভাবলুম, শব্দমকে বলি, আমি আর আব্দুর রহমান তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি কিন্তু সেই সঙ্কে আমার সত্য কর্তব্য কি, কিছুতেই স্থির করতে পারলুম না। ঘরের চেয়ে রাস্তা যে বেশী বিপজ্জনক। ওদিকে আবার শব্দমদের আপন ভ্রাসন নিশ্চয়ই আমার বাড়ির চেয়ে অনেক বেশী সুরক্ষিত। কি করি?

শব্দম পায়চারি করছে। আপন মনে বললে, ‘কেউ জানতো না। বাবাও জানতেন না।’

পায়চারি বন্ধ করে বললে, ‘শুনতে পাচ্ছ, বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে?’

বহু দূরের বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে না পিছিয়ে যাচ্ছে বোঝবার মত শব্দ শ্রবণশক্তি সৃষ্টিকর্তা নিরীহ বঙ্গ সন্তানকে দেন নি।

শব্দম আবার বললে, ‘আমার তাতে কি?’

আমি তার মানে বুঝতে পারলুম না।

আধঘন্টার উপর হয়ে গিয়েছে—প্রথম বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর।

এমন সময় তোপলু খান এসে ঘরে ঢুকল। সেলাম করে শব্দমকে শুধালে, ‘বাড়ি যাবে না, দিদি?’

শব্দম বললে, ‘যাব। পরে। এখন তুমি নিচে গিয়ে আব্দুর রহমানের সঙ্গে দেউড়ি-দরজার উপর পাথর চাপাও। আর যা-যা সব করতে হয়।’

তোপলু খান যেভাবে বাড়ি নেড়ে চলে গেল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল শব্দমের প্রতি তোপলের নির্ভর মুর্শীদের উপর চেলাব বিশ্বাসের মত। ভ্যালের কাছের তা হলে দ্বিগুণ হওয়াটা অসম্ভব নয়।

শব্দমের মুখে হাসি ফুটেছে। আমার একটু দুঃখ হল। আমার গায়ের

জোর গর মত হল না কেন।

শব্দম আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'তুমি বড় সরল। ভাবলে, তোপলুকে দেখে আমি ভরসা পেলুম। এই বন্দুক পিস্তলের জমানায় ? থাক্গে।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

শাস্ত কঠে, আমার চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমি স্থির করেছি আমাদের বিয়ে হবে। তুমি ?'

ধাক্কাটা কি রকম লেগেছিল আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব না। আমার মুখে কথা ফোটে নি এবং চেহারায় যদি কোনও ভাব ফুটে থাকে তবে সেটা হতভম্বের।

সেই শাস্ত কঠেই বললে, 'তোমার চোখ আমি চিনি। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। এবারে আমি জিতেছি।'

তারপর চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দু'জামুর উপর দু'হাতে ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে বললে, 'এবারে সব কথা শোন।'

আমার মুখ দিয়ে তখনও কথা ফোটে নি।

বললে, 'আমি জানতুম, এর একটা বোঝা-পড়া একদিন করতেই হবে। তাই আজকের দিনটা ঠিক করেছিলুম, আস্তে ধীরে তোমার মনের গতি দেখে, প্রসন্ন মুহুর্তে আমি যে একান্ত সর্বস্বাস্ত তোমার হতে চাই সেইটে জানাব। ইতিমধ্যে ডাকু এসে জিনিসটা যেমন কঠিন করে তুলল, তেমনি সহজও করে দিল। এখন কতদিন এ রকম চলবে, কেউ বলতে পারে না! আর সময় নেই। আজই, এখুনি আমাদের বিয়ে।'

'হ্যাঁ, এখুনি।'

আমি কিছু বলতে চাই নি।

'হ্যাঁ। এখুনি। তুমি ভেবেছিলে, আমি উত্তেজিত হয়েছি, ডাকু এসেছে বলে। তা নয়। আমি খুঁজছিলুম বিয়ের দুজন সাক্ষী। আব্দুর রহমান তো আছেই কিন্তু ভিড় ঠেলে কাকে ডেকে নিয়ে আসি, দাস্তায় এই ভয়ে-পাগলমের ডাকলেও কেউ আসবে না। তোপলু খান আসাতে আমার দুশ্চিন্তার অবসান হল।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি ওজু করে এস।'

মোহগ্রস্তের মত ওজু সেরে বাইরে এসে দেখি তোপলু আর রহমানে মিলে

ড্রাইং রুমের আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে আরেকখানা কার্পেট পেতেছে।
তুনেছি চাকরবাকরদের বখশিশ দিলে তারা খুশী হয়। এদের মুখে আজ যে
বদান্ততা দেখলুম, সে তো লক্ষপতির মুখেও আমি কখনও দেখি নি।

শব্দম এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কী যেন পড়ছে। তার মুখচ্ছবি
বড়ই শাস্ত। আমি কাছে যেতে কী কী করতে হবে বলে দিল।

হুজনাতে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। শব্দম মুখের উপর ওড়না টেনে দিয়ে
মাথা নিচু করলে। আমি বললুম, 'আমি অমুক, অমুকের ছেলে, তুমি অমুক,
অমুকের মেয়ে তোমাকে জীধন দিয়ে—'

তোপল্ খান শুধালে, 'জীধন কত ?'

আমি বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

তোপল্ খান বললে, 'একটা অঙ্ক বললে ভাল হয়।'

আমি জোর দিয়ে আবার বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

'—জীধন দিয়ে মুহম্মদী চার শর্তে তোমাকে জীরুপে পেতে চাই। তুমি
রাজী ?'

এ যেন শব্দমের গলা নয়। দূর থেকে ভেসে আসছে, অতি মৃদুকণ্ঠে তার
সম্মতি।

তিনবার ওই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হল। তিনবার সে সম্মতি জানালে।

আমি সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আপনারা এই বিবাহের শাস্ত্র-সম্মত
হুই সাক্ষী। আপনারা আমার প্রস্তাব আর মুসম্মৎ শব্দম বাহুর সম্মতি তিনবার
তুনেছেন ?'

হুজনাই বললে, 'তুনেছি।'

শব্দমের কথা ঠিক হলে আহুষ্ঠানিক বিবাহ এইখানেই শেষ। তোপল্ খান
বহু বিয়ে দেখেছে বলে দু হাত তুলে একটা প্রার্থনা করল। আমিও হাত তুললুম।
শব্দম মাথা নিচু করে একেবারে মাটির কাছে নামিয়ে, দু হাত দিয়ে প্রায় মুখ
ঢেকে।

প্রার্থনাতে মাত্র একটি কথা ছিল। 'হে থুদা, আদম এবং হস্তার মধ্যে,
ইউজুক ও জোলেখার মধ্যে, হজরৎ ও খাদিজার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এ হুজনার
ভিতর সেই রকম প্রেম হোক।'

আব্দুর রহ্মান উবাছ হয়ে প্রার্থনার সময় জোর গলায় ঘনঘন বলল, 'আমিন,
আমিন—হে আজ্ঞা তাই হোক, তাই হোক।'

আমিন! আমিন!! আমিন!!!

ওরা দুজন চলে যাওয়ার পর আমি বেখানে ছিলুম সেইখানেই বসে রইলুম। কিছুই তো জানি নে তারপর কি করতে হয়। শব্দনমও কিছু বলে নি।

উঠে গিয়ে সামনে বসে বললুম, 'শব্দনম।'

তাকিয়ে দেখি ওড়না ভেঁজা।

কিছু না ভেবেই ওড়না সরালুম। হুহু বুদ্ধিতে পারতুম না। দেখি, শব্দনমের চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

ওখালুম, 'এ কী?'

শব্দনম চোখ মেলে বললে, 'বল।'

তখন দেখি, আমার বলবার কিছুই নেই।

তাকে তুলে ধরে সোফার দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি সেটাকে সরানো হয়েছে। আমি সেদিকে যাচ্ছিলুম। বললে, 'না। ওদের ডাক। তোমার ঘর আমি সেই রকমই চাই।' ঘর ঠিক করা হল।

বললে, 'তুমি শোও।'

আমার পাশে আধ-হেলান দিয়ে বসে আমার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'ঠিক এ-রকম হবে আমি ভাবি নি। আমি ভেবেছিলুম, হয়ত খানা-পিনা গান-বাজনা বোমা-বারুদ কাটিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতে পারব। আর তা সম্ভব না হলে আমি অগ্নিটার জন্তুও তৈরী ছিলুম।'

আমি বললুম, 'এই তো ভাল।'

'সে কি আমি জানি নে? খানা-পিনা বন্ধু-সমাগম হল না, তার জন্তে আমাদের কি দুঃখ? তবে একটা পদ এত বেশী হচ্ছে যে আর সব পুথিয়ে দিচ্ছে। ওনছ শাদির 'শাদিয়ানা'? বোমা-বারুদ? কী রকম বন্ধুক মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে? আমায়ুজ্জার শালীর বিয়েতেও এর এক আনা পরিমাণও হয় নি। তাকাত আমাদের বিয়ের শাদিয়ানার ভার নিয়েছে—না? এও তো ডাকাতির বিয়ে!'

আমি কিছুটা বলি নি। আমার হিয়া কানায় কানায় শুকা। আমার আহাজ বন্দরে ভিড়েছে। পাল দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ নিবাস কেলে হাওয়াকে মুক্তি দিয়েছে। হাল-বৈঠা নিস্তক। উটের খণ্টা আর ঝাল্লুছে না।

বললে, 'আমি তোমার কাছে কমা চাই।'

এবারে আমাকে হুখ খুলতে হল।

ডান হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললে, ‘আমার শওহর—স্বামী কথা বলে কম। শোন—

‘তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাকে কতখানি চাও, সে আমি জানতুম। আরও জানতুম, সর্বশেষে চাওয়া, সমাজের সামনে পাওয়া, তুমি সাহস করে নিজের মনের কাছেই চাইতে পার নি। আমার কাছে বলা—সে তো বহু দূরে। আমার কিন্তু তখন বড় কষ্ট হয়েছে। যখন নিতান্ত সইতে পারি নি তখন শুধু বলেছি, আমার কাছে ওযুধ আছে। তুমি নিশ্চয়ই আসমান-জমীন হাতড়েছ, কী ওযুধ? তুমি বিদেশী, তুমি কী করে জানবে যে, যত অস্ববিধেই হোক আমি আমার দেশের, সমাজের সন্মতি নিয়েই বিয়ে করতে চাই। আমার জন্ত অতখানি নয়, যতখানি তোমার জন্তে। তুমি কেন ডাকাতের বেশে আমাকে ছিনিয়ে নেবে? মায়-মুকরী, ইয়ার-দোস্ত এবং আরও পাঁচজনের প্রসন্ন কল্যাণ আশীর্বাদের মাঝখানে, আমরা একে অগ্নিকে বরণ করব। গুল বুলবুল এক বাগিচাতেই থাকবে। চতুর্দিকে আরও ফুল আরও বুলবুল। আমি কোন্‌ হুংথে আমার শাখা ছেড়ে তোমাকে ঠোটে করে নিয়ে মরুভূমির কিনারায় বসব?’

‘সমাজ আপত্তি করলে?’

‘খোড়াই পরোয়া করতুম। ধর্মমতে তুমি আমি, সমাজ কেন, বাপ-মায়ের আপত্তি সম্বন্ধে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু সমাজ কি শেষ না বাবু, বাঘ না সিংহ, যে তাকে হামেহাল পিস্তল দেখাতে হবে? সমাজ তেজী ঘোড়া। দানা-পানি দেবে, তার পিঠে চড়বে। বেয়াড়ামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুঁতো দেবে, আরও বেশি হলে চাবুক, আর একদম বিগড়ে গেলে পিস্তল। তারপর নূতন ঘোড়া কিনবে—নূতন সমাজ গড়বে।’

‘আর এখন?’

‘এখন তো সব-কিছু ফৈসালা হয়ে গেল। প্রথম বলি, কাবুলের সমাজ ঠিক আমাদের সমাজ নয়। আমাদের গুটিকয়েক পরিবার নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ। সে সমাজ এখন আমাদের আশীর্বাদ করবে। জান, এদেশে এরকম বিশৃঙ্খলা প্রায়ই হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই, শহরে শহরে লড়াই, রাজার রাজার লড়াই। রাজার ডাকুতে অবশ্য এই প্রথম। তখন ভিন্‌ মহলার গিয়ে কখনও কখনও পনেরো দিন, এক মাস আটকা পড়ে যেতে হয়। সমাজ শুনে কান্নবে, ‘এই রাজার রাজার লড়াই। তারা শাস্ত্রানুযায়ী কাজ করেছে।’ পরে যখন সমাজ-পক্ষের লড়াই-লড়াই শুনে, তাদের থেকে মহকুমা ছিল, তখন তারা আরও

খুলী হয়ে দাড়ি দুলোতে দুলোতে বলবেন, 'বেহতরু তনু, খয়লী বেহতরু তনু—
আয়ও ভাল। লোকলজ্জার ভয়ে বিয়ে করার চেয়ে দিলের টানে বিয়ে করা
অনেক ভাল—বহৎ বেহতরু।

'তুমি কিন্তু ভেবো না, তোমার বাড়িতে পনেরো দিন থাকতে হবে বলে সেই
অছিল। নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি
আমার হৃদয়ের হয়ে মনের কাছে প্রস্তাব পেশ করি হোটেলের বারান্দায়। মন
বিচক্ষণ জন। সে সার দিলে, অনেক ভেবে-চিন্তে—নদী তীরে।

'আর এখন? এখন যে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল তার শেষ কবে কোথায় কে
জানে? তাই বিয়েটা চুকিয়ে রাখলুম। ফ্যাতাকপ্পি। আমার যা করার করা
হয়ে গিয়েছে, এখন আর সবাই এর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াক।'

হুঃখ করে ফের বললে, 'ওরা দেখছে আমাহুজার রাজমুকুট। ওদিকে তার
যে শক্তিকর হয়ে যাচ্ছে সেটা কেউ লক্ষ্য করছে না। কবি সাদিব বড় বেদনাতেই
বলেছিলেন :

“মোমবাতিটির আলোর মুকুট বাখানি কবি কী বলে।

কেউ দেখে না তো ওদিকে বেচারী পলে পলে যায় গলে।”

তার পর শব্দনের মনে কী ভাবোদয় হল জানি নে। আমার কানের
কাছে মুখ এনে সেটাতে দিল কামড়। বললে, 'ভেবো না, তোপলুথানের
প্রার্থনা তোমার কান কামড়ানোর স্বর্গদ্বার আমার জন্য খুলে দিল। ও জানে না,
তুমিও জান না, আমি তার অনেক পূর্বেই স্বর্গের ভিতরে বসে আছি। কিন্তু
বন্ধু, আমার মনে সন্দেহ জাগছে, তুমি আমার কথায় কান দিচ্ছ না।'

আমি খোলাখুলি সব কিছু বলব বলে স্থির করেছি।

বললুম, 'দেখ শব্দন—'

'শব্দন শিউলি—না,—শিউলি শব্দন।'

আমি বললুম, 'শিশির-সিক্ত শেফালি—শব্দনে ভেজা শিউলি।
হিমিকা—'

'এটা কী শব্দ? আগে তো তনি নি।'

'শব্দনের অতি বিস্তৃত সংস্কৃত শব্দ। হিমালয় জান তো? তারই হিম।
বাঙলায় শুধু হিমি।'

'আমার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে, "হিমিকা"।'

আমি বললুম,

“কানে কানে কহি তোরে

বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব হিমিকা নাম ধরে।”

বললে, ‘ভারি মধুর। আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত রাত এই রকম কবিতা শুনি। কিন্তু এখন বল, তুমি কী ভাবছিলে।’

‘তোমার বাবা কি তোমার জন্ত চিন্তিত হচ্ছেন না?’ আমি ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলেছিলুম। ও যদি কিছু মনে করে। আমার ভয় ভুল।

নিঃসঙ্কেচে বললে, ‘আগে হলে বলতুম, তুমি তোমার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াচ্ছ। এখন এটা তো আমার বাড়ি। এটা আমার আশ্রয়। এন্টুনি যে মুহম্মদী চার শর্তে আমাকে বিয়ে করলে তার এক শর্ত হচ্ছে স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া।’

‘আপন বাড়িতে আশ্রয় দেব তো বলি নি। সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।’

চোখ পাকিয়ে বললে, ‘এ কী হচ্ছে? চার শর্তের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পূর্বেই তুমি শর্ত এড়াবার গলি খুঁজছ? তবে শোন, আমার আকাঙ্ক্ষা আমার জন্ত এক দান গম পর্যন্ত ভাববেন না। আমরা দু-তুটো লড়াই ফেসাদ দেখেছি। একবার তিনি আটকা পড়েন। আরেকবার আমি। তিনি বয়েৎ-বাজি (কবির লড়াই) করেছিলেন কোন এক আন্তাবলে আর আমি পাশবালিশ জাবড়ে ধরে ঊঁস ঊঁস করে ঘুমিয়েছিলুম এক বান্ধবীর বাড়িতে। আসলে তাঁর দুশ্চিন্তার অবশিষ্ট থাকবে না, যখন শুনবেন, তোপলু খান বাড়ি ফেরে নি। যত্ন হলে কী হয়, মাথায় যা মগজ তা দিয়ে মাছ ধরার একটা টোপ পর্যন্ত হয় না। এই দেখলে না, আজ সন্ধ্যায় আরেকটু হলে আমাকে কী রকম ডুবিয়েছিল। তুমি বলছিলে, তোমার সর্বস্ব দেবে, স্ত্রীধন হিসেবে, আর ওই অগা তোপলু। কেনেক্ষের সাক্ষী হয়ে “অক” চেয়ে সেটা কমাতে যাচ্ছিল। আব্বা জানতে পেলে ওকে আইসক্রীমফালুদা করে ছাড়বেন।’

আমি শুধালুম, ‘তিনি জানবেন নাকি?’

উৎসাহের সঙ্গে বললে, ‘নিশ্চয়ই জানবেন। আজ না হয় না-ই বা জানলেন।’

আমি শুধালুম, ‘তখন?’

হেসে উঠে যা বললে সেটি রবীন্দ্রনাথ অতি স্নন্দর ছন্দে গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন :

“ওরে ভীক, তোর উপরে নাই ভুবনের ভার।”

বললে, ‘জানেন না জানে আমি প্রেমে পড়েছি। আর কিছু না। কিন্তু

লৈ (৫য়) — ১১

আমার সম্পর্কে এক দ্বিমিশি আছেন। ক্রিশ্চিয়ান মত পবিত্র পুণ্যবতী। তাঁকে সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এক লম্বা মাত্র চিন্তা না করেই বললেন, “মাকে তোর হৃদয় চায় তাকে বিয়ে করবার অধিকার তোকে আদা দিয়েছে। আর কারও হক নেই তোদের মাঝখানে দাঁড়াবার।” ব্যাস্! বুঝলে? আমার বাবা আমাকে ভালবাসেন।”

‘সর্দার আওরঙ্গজেব খানকে আমি চটাতে পারি, দরকার হলে; কিন্তু আমার শতর মশাইয়ের বিরাগভাজন হতে চাই নে।’

খুশী হয়ে বললে, ‘ঠিক তাই। আমিও তাই চাই বলে এত মারপ্যাচ। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ এই শেষ কথা। গ্রামোফোনের এই শেষ রেকর্ড। বুঝলে?’

আর তার কী তুর্কী নাচ! কখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে কংগ্রেসী লেকচার দেয়, কখনও রূপ করে কার্পেটের উপর বসে দু’ হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিবুক হাঁটুর উপর রেখে, কখনও আর্ম-চেয়ারে বসে আমার কাছের চেয়ারটা টেনে এনে তার পা দু’খানা লম্বা করে দিচ্ছে, কখনও আমার জামা জড়িয়ে ধরে আমার হাঁটুর উপর তার চিবুক রেখে, কখনও আমাকে দাঁড় করিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দু’ হাত রেখে আর কখনও বা আমাকে সোফায় বসিয়ে একান্তে আমার পায়ের কাছে আসন নিয়ে।

আর ঘড়ি ঘড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘আচ্ছা, বল তো, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস? এক খরওয়ার? এক-ও নীম খরওয়ার?—এক গাধা-বোঝাই, দেড় গাধা-বোঝাই? বহর-ই-হিন্দ—ভারত সাগরের মত? থাইবার পাসের মত আকাবাকা না দাফল-আমানের রাস্তার মত নাক-বরাবর লোজা? তোমার হিমিকার—ঠিক উচ্চারণ করেছি তো—গালের টোলের মত ভয়ঙ্কর গভীর, না হিন্দুকুশ্ পাহাড়ের মত উঁচু?’

কখনও উত্তরের জন্ত অপেক্ষাই করে না, আর কখনও বা গ্যাট হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করে—বেন আমার উত্তরের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

আমি যদি একই প্রশ্ন শুধাই তবে ছোট্ট মেয়েটির মত টেচিয়ে বলে, ‘না, না, আমি আগে শুধিয়েছি।’

আমি উত্তর দিতে গেলে স্থল মাস্টারের মত উৎসাহ দিয়ে কথা ফুগিয়ে দেয়, তুলনা সাপ্লাই করে, প্যাডিং ট্রিমিং বাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে, পূজোর বাজারে প্রিয়জনদের হাতে তুলে দেবার মত পোশাকী-দ্রব্যস্ত করে। আর

কখনও বা ভীষ্ম নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে, ডান ভুরু ঠিক জারগায় রেখে বা ভুরু বা দিকটা ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে আমাকে পইপই করে পাকা উকিলের মত কন্স করে। ‘হিমালয়ের মত উচু?—সে আমার দরকার নেই। আমার হিন্দুকুশ হলেই চলবে। তার হাইট কত? জান না? তবে বলছিলে কেন অতখানি উচু?’

একবার নিজে দেখালে, সে আমাকে ততখানি ভালবাসে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বাহ প্রসারিত করে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে ব্যালেন-নর্তকীর মত দু হাতে দু পিঠ প্রায় ছুঁইয়ে ফেলে বললে, ‘অ্যাত্তো খানি। প্রাস—প্রাস—’ বলতে বলতে আমার কাছে এসে, আমার চোখের সামনে তার কড়ে আঙুল তুলে ধরে বড়ো আঙুলের নখ দিয়ে কড়ে আঙুলের ক্ষুদ্রতম কণায় ঠেকিয়ে বললে, ‘প্রাস—অ্যাটুকুন।’ তার পর শুধালে, ‘এর মানে বল তো?’

আমি বললুম, ‘বলার একটা সুন্দর ধরন আর কী।’

‘না। সবচেয়ে বেশি থেকে সবচেয়ে কম—দুয়ে মিলিয়ে, হল ইন্ফিনিটি।’

‘ওই য্যা ভুলে গিয়েছিলুম—’, বলে ছুটে জানলার ধারে গিয়ে বললে, ‘ওই দেখে আদম-সুরং—পাগমানের আদম-সুরং, কালপুরুষ। আমাদের বিয়ের ভোজে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—বেচারী!’ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তুমি আমাদের প্রেমের সাক্ষী।’

আমি তাকে সপ্তর্ষির অরুদ্ধতা বশিষ্ঠের গল্প বললুম। বৈদিক যুগে যে বর-কনেকে অরুদ্ধতা দেখিয়ে গুঁরই মত তাকে পাশে পাশে থাকতে বলতে সেটাও বললুম।

• শব্দনম উৎসাহের সঙ্গে বললে, ‘কোথায়? কোথায় দেখিয়ে দাও তো আমায়।’

আকাশে তখনও সপ্তর্ষির উদয় হয় নি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

মাত্র একটি অঙ্গে আমাদের বিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

শব্দনম এই প্রথম খবর দিয়ে আসছিল বলে আকবুর রহমান কাবুল বাজার বেঁটিয়ে থানা-পিনার লাজ-সরঞ্জাম কিনে রেখেছিল। রাত বারোটাখ দস্তরখান

পাতা হল, পদের পর পদ আসতে লাগল। শব্দনয় ওদের নিমন্ত্রণ করল, আমাদের সঙ্গে বসে খেতে। সিঁদুর ওপারে সেবকগণ প্রভু পরিবারের সঙ্গে বসে খেতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত নয়। ওরা কিন্তু রাজি হল না। শোনাবার মতলবে ওদের ফিসফিস থেকে বোঝা গেল, ওরা বাজি ধরেছে, কে বেশী পোলাও খেতে পারে—প্রচুর সময় লাগার কথা।

শব্দনয় মাথা গুঁজে খেল। কুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাংস, তরকারি এমন কি ঝোল পর্যন্ত তুলে খেল, অথচ কুটি ছাড়া অন্য কোনও জিনিস হাতের সংস্পর্শে এল না, এ শুধু আমি দুজন লোককে করতে দেখেছি, শব্দনয় আর ভূপালের এক প্রধান মন্ত্রী। এদের খাওয়ার পর হাত ধোবার প্রয়োজন হয় না। কুটির সেটুকু ময়দার গুঁড়ো আঙুল ডগায় লেগেছে সেটুকু জাপকিনে মুছে নিলেই হল। শব্দনয় আমাকে কিছু না বলে হাত ধুয়ে এসে আমার পাশে বসে বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না; এসব ব্যাপারে আমার লজ্জা-বোধ একটু বেশী।'

বাইরে ভয়ঙ্কর শীত। চিমনিতে আবার কাঠ দেওয়া হল।

আগুনের সামনে আমরা দুজনা কার্পেটের উপর বসে আছি।

শব্দনয় প্যারিসের গল্প বলছে। মাঝে মাঝে আমার হাতখানা কোলে তুলে নিয়ে আদর করছে। একবার হৃদয় সঞ্চড়ে কী একটা বলতে গিয়ে বললে, 'এই তো তোমার হার্ট—' বলে তার ডান হাত আমার বুকের উপর রাখতে গিয়ে তার হাত সেই ভিজিটিং-কার্ড কেসটায় ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চূপ করে গেল।

আমি শুধালুম, 'কী হল?'

'তোমার ঘরে কাঁচি আছে?'

'বোস! শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলুম—এনে দিছি।'

বললে, 'বা রে। এখন আমি সর্বত্র যেতে পারি।' বলেই, পাখি যে রকম বসা অবস্থাতেই ওড়া আরম্ভ করতে পারে সেই রকম ফুড়ুত করে উড়ে গিয়ে কাঁচিখানি নিয়ে এল।

আমাকে মুখোমুখি বসিয়ে আমার হাতে কাঁচি দিয়ে বললে, 'আমার জুল্ফ্ কাটো।'

বাঙলা জুল্ফি কথাটা 'জুল্ফ্' থেকে এসেছে। ইরান তুরানের কুমারীদের অনেকেই হু গুচ্ছ অলক রং থেকে কানের ডগা অবধি কুলিয়ে রাখে। শব্দনয়ের হুল চেউ-খেলানো বলে তার জুল্ফ্ দুটির লোন্দর্ধ ছিল অসামান্য।

আমি ঠিক জানি নে, একদা বোধহয় ইরান তুরানের বর বাসর ঘরে নব-

বধূর জুল্ফ দুটি পুরোপুরিই কেটে দিত। এর পর যে-নতুন চুল গজাত নববধূর সে চুল কানের পিছনে অস্ত্র চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিত। জুল্ফে হক কুমারীদের— ইরানে বলা হয় ‘হুখ্-তব’, সংস্কৃতে ‘হুহিত্’ পাট বোঝা যায়, একই শব্দ। আজকাল এই জুল্ফ কাটার রেওয়াজ যে-সব জায়গায় আছে সেখানেও বোধ হয় জুল্ফের শুধু ডগাগুলোই কেটে দেওয়া হয়।

আমি বললুম, ‘আমার হাত কেটে ফেললেও তোমার জুল্ফ কাটতে পারব না।’

অনুন্নয় করলে, ‘তা হলে ডগাগুলো কেটে দাও।’

আমি বললুম, ‘আমায় মাফ কর।’

‘আমি চিরকালই কুমারী থাকব?’

‘তুমি চিরকালই আমার সামনে পাগমানের সেই ডানস-হল থেকে নামছ, তুমি চিরকালই আমার প্রথম সন্ধ্যার হিমিকা। কিন্তু বল তো, তুমি এই জুল্ফ কাটা নিয়ে এত চাপ দিচ্ছ কেন?’

‘তবে কাছে এস।’

আমি আমার দুই তর্জনী দিয়ে তার দুটি জুল্ফ আঙুল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তার মুখ তুলে ধরে বললুম, ‘বল।’

‘দেখ, চারদিকে এই অশান্তি এই অনিশ্চয়তা, এর মাঝখানে তোমাকে নিঃশেষে পাবার জন্য আমার হৃদয় আমাকে ভরসা দিচ্ছে না।’

আমি বললুম, ‘আমি তো চাই।’

আমার দু হাতে ধরা জুল্ফি-বন্ধনের মাঝখানে যতটা পারে মাথা তুলিয়ে বললে, ‘না, না, না। তুমি আমাকে এত বেশি ভালবাস যে তোমার চাওয়া-না-চাওয়া সব লোপ পেয়েছে। আমার ভালবাসা তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না।’

‘এবারে ভাল করে শোন। বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমি এমন কোনও আচরণ করি নি যার জন্তে আল্লার সামনে আমাকে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে, এখানে, কান্দাহারে, দিনের পর দিন, রাজির পর রাজি, হুপুর রাজে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ না জ্বলে গৃহকোণে কতবার আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি জান না। চতুর্দিকের বিশ্বসংসার তখন প্রতিবার লোপ পেয়ে গিয়েছে একেবারে নিঃশেষে। আমি যেন বেলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে, আর তুমি মহালিঙ্গ, দূর থেকে ভরলেক ভরলেক ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছ। আমি দম নিয়ে নাকহুখ বন্ধ করায় আগেই তুমি

আমাকে তরঙ্গের আলিঙ্গনে আমার সর্বসত্তা লোপ করে দিলে। আর, কখনও তুমি এসেছ ঝড়ের মত। আমার ওড়না তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আমার জুল্ফ-গুচ্ছের ভিতর ঢুকে গিয়ে তার প্রত্যেকটি চুল আলাদা আলাদা করে এদিকে ওদিকে উড়িয়ে দিয়ে, আমার চোখের প্রতিটি কাজলের গুঁড়ো কেড়ে নিয়ে, আর সর্বশেষে আমার প্রতিটি লোমকূপে লিহরণ জাগিয়ে আমাকে যেন তোমার সর্বাত্মক জড়িয়ে কোথায় কোথায় উধাও হয়ে গেলে—কালপুরুষের পাশ দিয়ে কৃত্তিকা, সাত-ভাই-চম্পার কাঁকের মাঝখান দিয়ে।

‘জ্ঞান ফিরতে দেখি, আমি মাথা খুঁকে বর্ডারের উপর বুলবুলির চোখে তুলি লাগিয়ে বসে আছি।’

আমি চুপ করে শুনে গেলুম।

নিঃশ্বাস ফেলে বললে, ‘তুমি পুরুষ, তুমি কী করে বুঝবে কুমারীর প্রেম। তুমি তো সমুদ্র তরঙ্গ, ঝড়ের ঘূর্ণি। আর আমার প্রেম?—স্বপ্নে স্বপ্ন বোনা স্তম্ভির মুক্তা। কত ছোট আর কত অজানার নিভৃত কোণে তার নীড়। কত আঁখি-পল্লব থেকে নিংড়ে নিংড়ে বের-করা এক ফোঁটা আঁখি-জল। আর তার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণাতে আছে কুমারীর লজ্জা, ভয়, সংকোচ।’

চুপ করে গেল।

আমি কাঁচি হাতে নিয়ে জুল্ফ থেকে তিন গোছা চুল কেটে নিয়ে বললুম, ‘এই মুকুট করলুম আমি তোমার লজ্জা, সংকোচ, ভয়।’

আগুনের সামনে বসেও স্পষ্ট বোকা ঘাচ্ছিল বাইরে শীত কী রকম ঘনি়ে আসছে। সে শীত যখন তার চরমে পৌঁছেছে তখনও শব্দনম তার জুল্ফ কানের পিছনে ঠেলে দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ‘এ কি নেমকহারামির চূড়ান্ত নয়—ঘে-বাড়িতে কুড়িটি বছর কাটিয়েছি সেটা আর নিজের আপন বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না? আর এ বাড়ি? এ বাড়ি আসলে তোমার আপন বাড়িও নয়—এ বাড়িতে তো আমার শাশুড়ী-মা তোমাকে জন্ম দেন নি। তবু মনে হচ্ছে, এ বাড়িতেই যেন শিশুকাল থেকে আমরা খেলাধুলো ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমান করে করে আজ আমাদের চরম মিলনে পৌঁছলুম।’

একটুখানি ভাবলে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, ‘উহঁ, এটাও যেন সম্পূর্ণ লভ্য নয়। কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমরা দুটি শিশু এ বাড়ির আড়িনাতে খেলা করছি, আর ও বাড়ির ছাদে বসে আকাবান, জানেমন্ একে অতের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমাদের দিকে জেদ-দৃষ্টি রেখে সকল বিপদ আপদ ঠেকিয়ে

রাখছেন। খেলা ছেড়ে ছুটে গিয়ে একবার জানেমনের কোলে বসে জিরিয়ে আসি।’

আমার মোজাটা খুলতে খুলতে বলল, ‘এই যে লাগল গোলমাল, এর শেষ কবে, আর কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তোমাকে আবার কখন দেখতে পাব তাও জানি নে। তবে এখন আমার বুকভরা সান্দ্রনা। ওই বাচ্চা যদি কাল এসে যেত তা হলে আমাকে মহাবিপদে ফেলত। পাগলা-ভিড় ঠেলে এসে তোমাকে বিয়ে করতে হত। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছি।’

আমি অবাক হয়ে বললুম, ‘এই শীতে? এত রাস্তিরে?’

‘এই সময়টাই সব চেয়ে ভাল। ডাকুদের দামী দামী ওভারকোট নেই যে এই শীতে বেরবে। কাল সকালে দেখবে কাবুলে মেলার ভিড়। চোর ডাকাত বেবাক মোজুদ। প্রথম লুট আরম্ভ হলেই ওরা সব কাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা তো উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি এ দেশের হালহকীকং জান অতি অল্প। আমাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হও।’

আমি সেদিন তাকে বিশ্বাস করেছি। আজও করি।

খুশী হয়ে বললে, ‘এই তো চাই। আমি তোপলু খানকে ডাকি। তুমি যাও, শুয়ে পড়। কতক্ষণ ধরে স্ট পয়ে আছ।’

শীতের দেশ বলে আমি শিলওয়ার, চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে শুই।

শোবার ঘরে ঢুকেই বলে, ‘বাঃ! কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে! কিন্তু এ আবার কী রকমের কুর্ত? দু দিকে চেরা কেন? দেখি?’ হাত চুকিয়ে দিয়ে বললে, ‘ও! পকেট! ভারী অরিজিনাল আইডিয়া তো! হাতে আবার পটি মেরে বোতাম! ও, বুঝছি, খাবার সময় আস্তিন বাতে ঝোলে ডুবে না যায়। আমিও এরকম একটা করাব। সবাই বলবে, ‘আমি কী অরিজিনাল! এবারে তুমি শোও দিকি নি।’

তিন দিকে লেপ গুঁজতে গুঁজতে বললে, ‘তুমি কণামাত্র হুশিষ্ঠা করো না: তোপলু খান একটা সার্ভে করে এসেছে। আমার কথাই ঠিক। রাস্তায় কাক-কোকিল নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখবে তো?’

আমি বললুম, ‘নিশ্চয়ই।’

মাথা, জুঁক, কানের তুল দোলাতে দোলাতে বললে, ‘না, তা করতে পারবে না। আমার কড়া মানা। আমি খাটে শুয়ে ড্যাব ড্যাব করে অঙ্ককারের দিকে ডাকিয়ে থাকব আর তুমি প্রেমলে তোমার স্বপন-চারিণীর সঙ্গে লীলা-খেলা করবে—সেটি হচ্ছে না। ও আমার সতীন—দুজাল বেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।’

আমি বললুম, 'তুমিও আমাকে স্বপ্নে দেখলে পার।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বল কী তুমি? তুমি পুরুষমানুষ। চারটে প্রিয়কে বিয়ে করতে পার, স্বপ্নে জাগরণে যে রকম খুলি ভাগাভাগি করতে পার। কিন্তু আমি মেয়েছেলে। আমার কেবল তুমি।'

আমি বললুম :

'স্বপন হইতে শতশত গুণে
প্রিয়তর বলে শুনি !'

অর্থ আর স্বর দুইই তার মন পেল।

বললে, 'কান্দাহারে তোমাকে প্রতি রাতে স্বপ্নে আহ্বান জানাতুম। তখন তোমাকে বিয়ে করি নি, তাই। আচ্ছা, এবারে তুমি চূপ কর, আর চোখ বন্ধ কর।'

উঠে গিয়ে আলো নেবাল। ড্রইংরুম থেকে এ ঘরে সামান্য আলো আসে।

আমার ছোট চারপাটটির কাঠের বাজুতে হাঙ্কাভাবে বলে সেই আধো-আলো-অন্ধকারে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল—আমি বন্ধ চোখে সেটা চোখের তারাতে দেখতে পেলুম।

এবারে তার নিশ্বাস আমার ঠোঁটে এসে লাগছে।

ভীকু পাখির মত একবার তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করল—দুবার—শেষবারে একটু অতি ক্ষীণ চাপ।

এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম নয়।

কৈশোরে যখন গুষ্ঠাধরের গোপন রহস্য আধা আধা কল্পনায় বুঝতে শিখছি তখন আমি আকাশের তারার সঙ্গে মিতালী পাতাবার জন্ত রাজিযাপন করতুম খোলা বারান্দায়। শরতের ভোরবেলা দেখতুম পাশের শিউলি গাছের বিরহবেদনা—কোঁটা কোঁটা চোখের জলের শিউলি আমার চতুর্দিকে ছড়ানো।

এক ভোরে অশ্রুভব করলুম ঠোঁটের উপর তারই একটি।

এ সেই হিমিকা-মাথা, শব্দ-ম-ভেজা শিউলি।

শব্দ-মের কথা অকরে অকরে ফললো। পরদিন সকাল থেকেই কাবুল শহরের ক্রাশপাশের চোর ডাকু এসে 'রাজধানী' ভত্তি করে দিলে। দাঙ্গী খুনোরাও নাকি

গা-ঢাকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে ; কারণ পুলিশ হাওয়া, সাজী গায়ের ।

এতে করে আর পাঁচজন কাবুলী ষতখানি ভয় পেয়েছে, আমিও পেয়েছি ততটুকু । আসলে আমার বেদনা অস্ত্রখানে । দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দেখি, রাস্তা থেকে মেয়েরা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে । বে-বোরকার তো কথাই হচ্ছে না, ক্যাশনেব্ল বোরকাও দূরে থাক, দাদৌ-মা নানী-মার তাবুপানা বেচপ বোরকার ছায়া পর্যন্ত রাস্তায় নেই ।

শব্দম আসবে কি করে ?

দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মারাত্মক শীতে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ফাটিয়ে ফেলেছি—কখন প্রথম বোরকা বেকবে, কখন প্রথম বোরকা দেখতে পাব ? ব্যর্থ, ব্যর্থ, আর একটা দিন ব্যর্থ !

‘জাগিছ যখন উষা হাসে নাই,

ওধায় “সে আসিবে কি ?”

চলে যায় সীক, আর আশা নাই,

সে ত’ আসিল না, হায়, সখি !

নিশীথ রাতে ফুক ফদয়ে,

জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;

আপন রচন ব্যর্থ স্বপন

হুথ ভারে হুয়ে ডুবে যায় ।’

—(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

জর্মন কবি হাইনে আসলে ইহুদী—অর্থাৎ প্রাচ্য দেশীয় । অসহায় বিরহ বেদনার কাতরতা ইয়োরোপীয়রা বোঝে না । তাদের কাব্য সঙ্কল্পনে এ-কবিতা ঠাঁই পায় না । অথচ এই কবিতাটিই ত্রিপদীতে গেঁথে দিলে কোন্ গোঁসাই বলতে পারবেন, এটি পদাবলী কীর্তন নয় ? এ তো সেই কথাই বলেছে—‘মরমে সুরিয়া মরি ।’

এক মাস হতে চলল । তোপল্ খানই বা কোথায় ?

আবার দাঁড়িয়েছি দেউড়িতে দুপুরবেলা ।

ওই দূরের দক্ষিণ মহল্লার সদয় দেউড়ি থেকে বেরল এই প্রথম বোরকা ! ধোপানীর কালো-বোরকা-সাদা-হয়ে-বাওয়া পুরনো ছাতা রঙের । আমার ধোপানীও এই রকম বোরকা পরে আসে । জুখিনী বেরিয়েছে পেটের খান্দায় । কতদিন আর বাড়ি বসে বসে কাটাবে ? বেচারী আবার অল্প অল্প খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আমার দেউড়ি পেরিয়ে উত্তর দিকে কাবুল নদীর পানে চলে গেল। শব্দনমদের বাড়ি দক্ষিণ মহল্লায়ও দক্ষিণে। আমি আবার সেদিকে মুখ ফেরালুম। এবারে মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রথম বোরকা তো বেরিয়েছে।

ছ মিনিট হয় কি না হয়, এমন সময় কানের কাছে গলা স্তনতে পেলুম, 'মিনিট দশেক এখানে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে এস।'

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। আমার দাঁড়ানো যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি শব্দনম কোথাও নেই। কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, 'শব্দনম! হিমিকা!' উত্তর নেই। আবার ডাকলুম, 'হিমি!'

চারপাশের তলা থেকে উত্তর এল, 'হু।'

আমি এক লম্ফে কাছে গিয়ে লেপ বালিশস্বক্ খাট কাত করে দিয়ে দেখি, শব্দনম খাটের তলায় কার্পেটের উপর দিব্য শুয়ে আছে। আমার চুড়িদার পাঞ্জাবিটি পরে। একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছে বটে কিন্তু একটা জায়গায় ফিট হয়েছে চমৎকার—যেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কারিগর বিশ্বকর্মাণে দিয়ে সৃষ্টির সময়ই ফিট করিয়ে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য এই বিরহ বেদনার অঙ্ককার। মিলনের প্রথম মুহূর্তেই সর্ব হৃৎ হৃৎ হয়ে যায়—সে বিরহ এক দিনের হোক আর এক মাসেরই হোক। অঙ্ককার ঘরে আলো জ্বাললে যে রকম সে আলো তন্মুহূর্তেই অঙ্ককারকে তাড়িয়ে দেয়—সে অঙ্ককার এক মুহূর্তেরই হোক আর ফারাওয়ার কবরের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো জমানো অঙ্ককারই হোক।

অভিমানের স্বরে বললে, 'দশ মিনিট, আর এলে দশ ঘণ্টা পরে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি? আমি তো ঘড়ি ধরে আট মিনিট পরে এসেছি।'

বললে, 'তোমার ঘড়ি পুরনো। কাবুল মিউজিয়ামের গান্ধার সেকশন থেকে কিনেছ বুঝি?'

'আমি বললুম, 'পুরনো ঘড়ি হলেই বুঝি খারাপ টাইম দেয়?'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দেবে না? পুরনো খবরের কাগজ আজকের খবর দেয় নাকি?' খবরের কাগজের আসল নাম ক্রনিক্ল, আর ঘড়ির আসল নাম ক্রনোমিটার। ছটোই ক্রনস, সময়ের খবর দেয়। এতটুকু শব্দতত্ত্ব জানো না—প্যাসিসের ক্লাস সিক্সে বা শেখানো হয়?'

আমি বললুম, 'তুমি বুঝি যোজ্ঞ সকালে খবরের কাগজের সঙ্গে একটা নতুন ঘড়িও কেনো ?'

'তা কেন ? আমার ঘড়ি তো এইখানে।' বলে নিজের বুকে হাত দিলে। 'প্রথম দিনের ঘড়ি, নিত্য নবীন হয়ে চলেছে। দেখি, তোমার ঘড়িটা কি রকমের।' আমার বুকে কান পেতে বললে, 'জান, কি বলছে ?'

আমি বললুম, 'এক জাপানী শ্রমণ জীবনের দন্দ-ধনি শুনতে পেয়ে বলেছেন, 'ভুল্'-'ঠিক্', 'ভুল্'-'ঠিক্', 'ভুল্'-'ঠিক্' ?'

'বাজে। বলছে, 'শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম্' ! এইবারে আমারটা শোন।'।

আমি তার এত কাছে আর কখনও আসি নি। আমার বুক তখন ধপধপ করছে।

'বুঝতে পেরেছ নাকি ?' নিজেই কথা যুগিয়ে দিচ্ছে। 'বুল্'-'বুল্', 'বুল্',-'বুল্', 'বুল্'-'বুল্' বলছে—না ?'

আমি অতি কষ্টে বললুম, 'হ্যাঁ।'।

বললে, 'কলটা কিন্তু খুব ভাল না। মা মরেছে ওতে, নানী-মাও। কিন্তু ওকথা কক্ষনো তুলো না।'।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালে।

ডান পা একটু এগিয়ে দিয়ে, বাঁ হাতের মণিবন্ধ কোমরের উপর রেখে, ডান হাত আকাশের দিকে তুলে, অপেরার 'প্রিমা দম্মা' ভঙ্গীতে মুচকি হেসে বললে, 'মেদাম্ এ মেসিয়ো ! এই মুহূর্তে কাবুলের রাজা হতে চায় হুজ্জন লোক। আমাহুজ্জা থান আর বাচ্চা-ই-সকাও। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি হুজ্জনাতে মিলে আপোসে মিটমাট করে আমাকে বলে, "কাবুল শহর তোমাকে দিলুম"—তা হলে আমি কি করি ?' নাটকীয় ভঙ্গীতে আবার যুহু হাস্য করলে। কী স্বন্দর সে হাসি। গালের টোল দুটি আমার গায়ের ছোট্ট মস্ত-গাঙের ক্ষুদে ক্ষুদে দ'য়ের মত পাক খেতে লাগল, অথবা কি বলব, নজ্দের মরুভূমিতে মজন্র দীর্ঘনিশ্বাস-ঘূর্ণিচক্রের ছোট ছোট 'বগোলে' ?

আমি চারআনৌ টিকিট-দারের মত চোঁচিয়ে বললুম, 'সি'ল্ ভু প্লে, সি'ল্ ভু প্লে—মেহেরবানী করুন, মেহেরবানী করুন, বলুন, কি করবেন।'।

একেবারে হুবহু 'প্রিমা দম্মা' ভঙ্গীতে গান গেয়ে উঠল,

Si le roi m'avait donne

Paris, sa grand 'ville,

Et qu'il me fallut quitter

L'amour de ma mie,

Je dirais au roi Henri

'Reprenez votre Paris.

J'aime mieux ma mie, o gai !

J'aime mieux ma mie !'

‘এবারে তার ফার্সীটা শুহুন, মেদাম্ এ মেসিয়ো !

‘গর ব্-এক্ মোই, তুর্ক-ই-শীরাজী,

বদহদ্ পাদশাহ্ ব্-মন্ শীরাজ্,

গোইম্ ‘আয় পাদশাহ্ গরচি বোণাদ্

শহ্-ব্-ই-শীরাজ্ শহ্-ব্-ই-বিআনবার,

তুর্ক-ই-শীরাজী কাফী অন্ত্ মরা—

শহ্-ব্-ই-শীরাজ্ থইশ বসতান বাজ্ ।’

‘রাজা যদি, দেয় মোরে ওই, আজব শহর পারি (Paris)

কিন্তু যদি, শর্ত করে, ছাড়তে তোমার, প্যারী,

বলবো, ‘ওগো, রাজা আরি (Henri),

এই ফিরে নাও তোমার পারি (Paris)

প্যারীর প্রেম যে অনেক ভারি,

তারে আমি ছাড়তে নারি !

ওগো, আমার প্যারী ।’

কার্সী অম্ববাদটা গাইলে একদম ‘ফতুজান’ স্টাইলের কাবুলী লোকসকীতে ।

প্যারিসে চারআনী টিকিটের জায়গা হলের সকলের পিছনে, উপরে, প্রায় ছাত ছুঁয়ে । তাই সেটাকে বলা হয় ‘পারাদি’—প্যারাদাইস্—স্বর্গপুরী । খাটি জউরী, আসল সমাজদার, খানদানী কদরদানরা বসেন সেখানে । ঘন ঘন সাধুরব, বিকলে পচা ভিম হাজা টমাটো, শিটিফিটির থয়রাতি হাসপাতাল ওই স্বর্গপুরীতেই । স্টেজের ফাড়া-গর্দিশে বুদ্ধি বাতলে দেন ওনারই । তিরমি-খাওয়া ধুমদী নায়িকাকে কাঁধে করে বয়ে নিতে গিয়ে যদি টিঙটিঙে নায়ক হিমশিম খায় তবে এই সব দরদী জউরীরাই চিৎকার করে দাওয়াই বাতলান—‘হুই কিস্তিতে নিয়ে যা—ফ্যাং তু ভাইয়াজ—যেক্ টু ট্রিপ্‌স্ ।’

আমি এদের অহুকরণে একাই এক শ হরে বিস্তর ‘সাধু ! সাধু, ব্রাহ্মো,

ব্রাতো' বললুম।

সদয় হাসি হেসে খাজেখেবায় শব্দম বীবি ভাইনে বায়ে সামনের দিকে বাণ করে শোকরিয়া জানালেন, চম্পক করাঙ্গুলির প্রান্তদেশে মৃদুচূষন খেয়ে আঙুলটি উপরের দিকে তুলে হুঁ দিয়ে চূষনটি 'পারাদি'—বর্গপুরীর—দিকে উড্ডীয়মান করে দিলেন।

আমি স্টেজের দিকে ডাঁই ডাঁই রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছুঁড়ে পেলা দেবার মূর্ত্তা মারলুম।

দেবী প্রসন্নবয়ানে 'স্টেজ' থেকে অবতীর্ণা হয়ে সর্বজন সমক্ষে আমার বিরহ-তপ্ত আপাত্তুর ক্রান্ত ভালে তাঁর ঈষতর্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে নিশ্বাসসৌরভঘন অগুরু-কস্তুরী-চন্দন-মিশ্রিত ভ্রমর-গুঞ্জরিত প্রজাপতি-প্রকম্পিত চূষন প্রসাদ সিঞ্জন করলেন।

প্রসন্নোদয়, প্রসন্নোদয় আমার অস্ত উষার সবিত্ত উদয় প্রসন্নোদয়!

আমার জন্মজন্ম সঞ্চিত পুণ্য কর্মফল আজ উপারুত!

আমি তার পদচূষন করতে যাচ্ছিলুম। 'কর কি?' 'কর কি?' বলে ব্যাকুল হয়ে সে আমায় ঠেকিয়ে দিয়ে দুখানি আপন গোলাপ-পাপড়ি এগিয়ে দিলে!

আশ্চর্য এ মেয়ে! দেখি, আর বিশ্বাস মানি। ভয়ে আতকে তামাম কাবুল শহরের গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে—এই পাথর-কাটা শীতে শহরের রাস্তার মুখ পর্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছে, আর এ মেয়ে তারই মাঝখানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে কলকল খলখল করে হাসছে। প্রেমসাগরের কতখানি অন্তলে ডুব দিলে উপরের ঝড়ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে এ রকম সম্পূর্ণ নিলিপ্ত উদাসীন হওয়া যায়?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সব-কিছুর খবর রাখে।

বললে, 'এই যে ফ্রান্সের গাঁইয়া গান, এটার মর্মও আমাছুজা বুঝলেন না।

'বিদ্রোহীরা বলছে, তোমার বউ সুবাইয়া বিদেশে গিয়ে শৈরিগী হয়ে গিয়েছে—ষিচারিগী নয়, শৈরিগী। একে তুমি তালাক দাও, আমরা বিদ্রোহ বন্ধ করে দেব।

আমাছুজা নারাজ।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবিই তো বলেছেন,

কি বলিব, ভাই মূর্খের কিছু অভাব কি ছুনিয়ায়,

পাপড়ি বাঁচাতে হরবকতাই মাখাটারে বলি-ভায়ণ'

মাথা নেড়ে বললে, 'না। এখানে পাগড়ি অর্থ প্রিয়া, মাথাটা কাবুল শহর।

'আমি বলি, "দিয়ে নে না, বাপু, কাবুল শহর, চলে যা না, বাপু, প্রিয়াকে নিয়ে প্যারিস—যে প্যারিসের ঢঙে কাবুলের চেহারা বদলাতে গিয়ে আজ তুই এ-বিপদে পড়েছিস। নকল প্যারিস নিয়ে তোর কি হবে, আসল স্বখন হাতের কাছে? একটা কপিরই স্বখন দরকার তখন আসলটা নিয়ে কার্বন-কপিটা কেলে দে না। কান্সারী-শালের উপরের দিকটাই গায়ে জড়িয়ে নে, উণ্টো দিকটা দেখিয়ে তোর কি লাভ?" আশ্চর্য! তাঁর এখন ডান হাতে তলোয়ার, বাঁয়া বগলমে প্রিয়া—ডাকু পাকড়াবেন কৈসে?'

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমার বয়ে গেছে।

কাজী নই আমি, মোল্লাও নই, আমার কি দায় বল!

শীরাঙ্গী থাইব, প্রিয়ার চুমিব ওই মুখ ঢলঢল।'

এর প্রথম ছত্র হাফিজের, দ্বিতীয়টি আমার।

আমি বললুম, 'শাবাশ! লাল শীরাঙ্গী খেতে হলে তোমার ওই গোলাপী ঠোঁটেই মানাবে ভালো। আমার কিন্তু দুটো মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কি রকম?'

'তুমি পাশ ফিরে শুয়ে মুছ হাস্য করবে। তখন তোমার গালের টোল হবে গভীরতম—আমি সেটিকে ভর্তি করব শীরাঙ্গী দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে—অতি ধীরে ধীরে সেই শীরাঙ্গী চুমোয় চুমোয় তুলে নেব।'

বললে, 'বাপু! কী লয়ে কল্পনা, লম্বা রসনা, করিছে দোঁড়াদোঁড়ি। তা কল্পনা কর, কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না। খুষ্টানদের বঁ দিয়ে—ভগবান—তো এক মুহূর্তেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে দিতে পারতেন; তবে তিনি ছ-দিন লাগালেন কেন?'

আমি বললুম, 'এবারে তুমি আমার কথার উত্তর দাও।'

সুশীলা বালিকার মত মাথা নীচু করে বললে, 'বল।'

'আব্বাজান কোথায়?'

'দুর্গে। আমাহুল্লাকে মজ্ঞা দিচ্ছেন। ট্যাব থেকে বেরিয়ে আসা কালতো টুথপেস্ট ফের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'তোপল্ খান?'

'লড়াইয়ে।'

'তুমি কি করে এলে?'

'য়েওয়ার করে করে। ধোপানীর তাম্বুটা বোগাড় করে প্রথম প্রথম কাছে-নিচে বাস্বীদের আড়িতে ওদের তব্ব-তাবাশ করতে গেলুম।'.

একটু খেমে বললে, ‘আচ্ছা বল তো, তোমাকে ভালোবাসার পর থেকে আমি ওদের কথা একদম ভুলে গিয়েছি। আমার যে সব সখীদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তারাও আমাকে স্মরণ করে না। অথচ তুনেছি, পুরুষ-মামুষরা নাকি বিয়ের পর সখাদের অত সহজে ভোলে না? মেয়েরা তা হলে বেইমান নেমকহারাম?’

আমি বললুম, ‘গুণীরা বলেন, প্রেম মেয়েদের সর্বস্ব, পুরুষের জীবনের মাত্র একটি অংশ। তাই বোধ হয় মেয়েরা ওই রকম করে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়। আমি বিদেশী, আমি অসহায়, আমি নিজের থেকে কোন কিছু করতে গেলেই হয়তো তোমাকে বিপদে ফেলা হবে মাত্র, এই ভেদে আমি হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় কিস্তিতে কিল খাচ্ছি। তুমি সেটা জান বলে, সর্বক্ষণ তোমার চিন্তা, কি করে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, আমার বিরহ-বেদনা তোমাকে কাছে পাওয়ার কামনা আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আর্ত শিশুর মত আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার। তোমার সখীরা, আন্না, জানেনমন কেউই তো তোমার উপর কোন কিছুর জন্ত এতটুকু নির্ভর করছেন না। আর আমি করছি সম্পূর্ণ নির্ভর তোমার উপর। তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে। জিম্মাদারী-বোধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা-বোধও বেড়ে যায়।’

বললে, ‘সে না হয় তোমার আমার বেলা হয়—তুমি বিদেশী বলে।’

‘অগ্নদের বেলাও তাই। অধিকাংশ দেশেই মেয়ের জন্ম তো পরিবারের আপদ। সেই ‘আপদ’ যেদিন একটি লোককে পায়, যাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাকী জীবন তার উপর নির্ভর করতে হবে, তখন তার অবস্থা তোমারই মত হয়। কিন্তু আরেকটা কথা। এই একাগ্রতাটা মেয়েদের কিছু একচেটে নয়। লায়লীর জন্ত মজনূর একাগ্রতাই তো তাকে পাগল বানিয়ে দিলে?’

সুধালে, ‘কোন মজনু?’

আমি বললুম, ‘তার পর তুমি কি করলে বলছিলে?’

‘ওঃ! পাড়ার সখীদের বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস করলুম।’

আমি বললুম, ‘শ্রীরাধা যে রকম আঙিনায় কলসী কলসী জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে তুলে, বর্ষার রাতে পিছল অভিনায় বাণ্ডার প্র্যাকটিস করে নিতেন?’

ইরান তুরান আরবভূমির তাবৎ প্রেমের কাহিনী শব্দনয়ের হৃদয়স্থ। তাই আমি তাকে শোনাতুম হিন্দুস্থানী রমণীর বেদনাবাগী। সে সব কাহিনীর রাজ-মুহুর্ত স্থিতির অভাগিনী অভিমানিনী শ্রীরাধার চোখের জলের মূক্তো দিয়ে সাজাতে আমার বড় ভালো লাগে। কিন্তু একাধিকবার লক্ষ করেছি শব্দনয় যেন

শ্রীরাধাকে দ্বিধা দ্বিধা করে।

বললে, ‘হঁ! তোমার শুধু শ্রীরাধা শ্রীরাধা! তা সে থাক্গে। তার পর ধোপানীর তাম্বু পবে বেরিয়ে পড়লুম তোমার উদ্দেশে। আমার ভাবনা ছিল শুধু আমার পা ছুঁখানা নিয়ে। ও ছুটো বোরকা দিয়ে সব সময় ভালো করে ঢাকা যায় না।’

আমি বললুম, ‘রজকিনী চরণ বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর।’

‘মানে?’

আমি চোখ বন্ধ করে হিমির পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে মূগ্ধিত নয়নে গান ধরলুম,

‘শুন রজকিনী রামী

শীতল জানিয়া

ও-ছুটি চরণ

শরণ লইলু আমি।’

বললে, ‘এ সুরটা সত্যি আমার প্রিয়। এর ভিতর কত মধুর আকৃতি আর করুণ আত্মনিবেদন আছে।’

আমি বললুম, ‘আচ্ছা, “শীতল চরণ” কেন বললে, বল তো?’

নাক তুলে বললে, ‘বাঃ! সে তো সোজা। ধোপানী জলে দাঁড়িয়ে কাপড় আহুড়ায় তাই।’

জাহাঁবাজ মেয়ে।

বললে, ‘জান বঁধু, আজ ভোরবেলার আজান শুনে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন বুকের ভিতরটা যেন একেবারে ঝাঁঝরা ফাঁকা বলে মনে হল। কিছু নেই, কিছু নেই, যেন কিছু নেই। পেটটাও যেন একেবারে ফাঁপা, যেন দাঁড়াতে পারব না। বুকের ভিতর কি যেন একটা শূণ্যতা শুধু ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। সব যেন নিঙড়ে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করলুম, উঠতে পারলুম না। কোমরের সঙ্গে আমার বাকি শরীরের যেন কোন যোগ নেই।

‘মোয়াজ্জিন তখন বলছে, “অন্-সালাতু থৈকন্ মিন্ অন-নওন্—” নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ভালো।

‘আমি কাতর নিবেদনে আল্লাকে বললুম, হে খুদাতালা, তোমার দুনিয়ান্ন তো কোনও কিছুই অভাব নেই। আমাকে একটুখানি শক্তি দাও।’

আমি অছন্নয় করে বললুম, ‘থাক্ না।’

বললে, ‘কাকে তা হলে বলি, বল। জানি, তুমি এ-সব শুনে কষ্ট পাও। কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য তো আমি আমার দুঃখের কথা বলছি নে।

আবার না বলতে থাকতে পারছি নে। এ কী দম্ব, বল তো ?

আমি বললুম, 'তুমি বলে যাও। আমার শুনতেও ভাল লাগে যে সর্বকণ আমি তোমার মনের ভিতর আছি। এও তো দম্ব।'

'তবে শোন, আর শুনই তুলে যেয়ো। না হলে আমার বিরহে তোমার বেদনার ভার সেই স্মৃতি আরও ভারী করে তুলবে। নিজে কষ্ট তো পাবেই, তার উপর আমার কষ্টের স্মরণে বেদনা পাবে বেশী।'

'এই যে ফাঁকা ভাব ভোরবেলাকার, এইটে বওয়াই সব চেয়ে বেশী শক্ত।'

'কে বল সহজ, ফাঁকা বাহা তারে, কাঁধেতে বহিতে সওয়া ?'

জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায় ততই কঠিন বওয়া।'

'ফাঁকা জিনিস ভারি হয়ে যায়, এর কল্পনা কি আমি কখনও করতে পেরেছি ?'

'কোন গতিকে এই দেহটাকে টেনে টেনে বাইরে এনে নমাজ পড়লুম। হায় রে নমাজ! চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেওয়াকে যদি নমাজ বলে তবে আমার মত নমাজ কেউ কখনও পড়ে নি।'

আমি অতি কষ্টে চোখের জল থামিয়ে বলেছিলুম, 'সেই তো সব চেয়ে পাক নমাজ।'

যেন শুনতে পায় নি। বললে, 'ইহু-দিনাস্ সীরাতা-ল্ মুস্তকীয়ে' এলুম— "আমাকে সরল পথে চালাও"—তখন মন সেই সোজা পথ ছেড়ে চলে গেল নুতন অজানা দুর্ভাবনায়। তবে কি আমি ভুল পথে চলেছি বলে তাতে এত কাঁটা, বিভীষিকার বিকৃত ভান ?

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বল তো গো তুমি, তোমাকে বিয়ে করার আগে যে আমি তোমার গা ছ'তিনবার ছুঁয়েছি, তোমাকে হৃদয়-বেদনা বলেছি, তোমাকে স্বপ্নে কল্পনায় জড়িয়ে হৃদয়ে টেনে নিয়েছি, সেই কি আমার পাপ ? আমি তো অল্প কোন পাপ করি নি।' এবারে উত্তরের জন্ত চুপ করে গেল।

আমি বললুম, 'হিমি—'

'আঃ'। বলে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কোলে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপাটা আঁতে আঁতে আলগা করে দিল। সমস্ত পিঠ ছেয়ে কেলে তার চুল লম্বা কুঁচুর অঞ্চল-প্রান্ত অবধি পৌঁছল। আমি আঙুল দিয়ে তার ঐ বাঁ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরের দিকে তুলে বিলি দিতে দিতে অলকলবক অতৃপ্ত নিশ্বাসে শুবে বললুম, 'হিমিকা, আমি তো বেশী ধর্মগ্রন্থ পড়ি নি, আমি কি বলব ?'

বললে, 'না, গো, না। আমি মোল্লার কৎওয়া চাইছি নে। তোমার কথা বল।'

'আমিও শুধাই, সবই শাস্ত্র, হৃদয় বলে কিছু নেই?'

শাঠি অল্পভব করলুম, তার চোখের জলে আমার কোল ভিজে গেছে।

বললুম, 'কৈদো না, লক্ষীটি।'

বললে, 'তুমি মেহেরবানী করে আজকের মত শুধু আমাকে কাদতে দাও। আজ আমার শেষ সম্বল উজাড় করে দিয়ে আর কখনও কাদবো না।'

উঠে বলল। চোখ তখন ভেজা। শব্দনের আখিপল্লব বড় বেশী লম্বা। জোড়া লাগার পর উপরের সারি উপরের দিকে আর নিচের সারি নিচের দিকে অনেকখানি চলে গিয়েছে।

'জান তুমি, যখন সব সাঙ্ঘন্যের পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়? আছে তোমার অভিজ্ঞতা? আমার আজ ভোরে হল?'

'আমি নিজেকে বললুম, আমি যাচ্ছি আমার দয়িতের মিলনে, আমার স্বামী লজ্জমে। আজ আমাকে এ হুক দিয়েছেন। আমাদের মাঝখানে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তবে সে শয়তান। আমি তাকে গুলি করে মারবো—পাগলা কুকুরকে মানুষ যে রকম মারে, সাপের ফণা যে রকম রাইডিং বুট দিয়ে ধেঁতলে দেয়।

'এই দেখ।'

পাশের স্থপীকৃত বোরকার ভিতর থেকে বের করল এক বিরাট রিভলবার। তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের সেই ছোট্ট পিস্তলের তুলনায় এটা ভয়াবহ দানব।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালুম। চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরচ্ছে। কাঠের মত শুকনো প্রত্যেক চোখের প্রত্যেক পল্লব—আলগা আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে।

'প্রত্যেক শয়তানকে মারবো গুলি করে। অগুণতি, বেহিসাব—দরকার হলে। বোরকার ভিতরে রিভলবার উচু করে তাগের জন্ত তৈরী ছিলুম সমস্ত সময়। কেউ সামনে দাঁড়ালেই গুলি। প্রায়টি শুধাবো না। বোরকার ভিতর থেকেই।

'তাদের মরা লাশের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে আসতুম, তোমার কাছে।

'কী? আমার ছেলে হবে শুধু শাস্তির স্বথময় নীড়ে? বক্রীর কলিজা নিয়ে জন্ম নেবে তারা তা হলে। আমার নাস্তি কিংবা তার ছেলে হয়তো কোন কলিজা নিয়েই জন্মাবে না। শুধু রক্ত পাম্প করার জন্য এতখানি জারগা জুড়ে

এই বিরাট দ্বন্দ্ব। আর আজ যদি আমি বিষ-বিপদ তুচ্ছ করে শয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই তবে আমার ছেলে হবে বাঘের গুঁদা, সীনা, কলিজা নিয়ে।’

আমি শব্দমকে কখনও এরকম উত্তেজিত হতে দেখি নি। কি করে হল? এ তো মাত্র এক মাস। কান্দাহারে এক বছর কাটিয়ে আসার পরও তো এরকম ধারা দেখি নি। তবে কি সে কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে বনদেবতার শক্তিকামী অগ্রদূত বিহঙ্গের মত কলরবস্বরে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়? না, কোনও কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেছে, এই এক মাস ধরে?

বললুম, ‘তোমার রক্তরূপকে আমি ভয় করি, শব্দম। তুমি তোমার প্রসন্ন কল্যাণ মুখ আমাকে দেখাও।’

‘আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজনের শুভ আশীর্বাদ আমাদের মিলনের উপর আছে।’

কবিতা স্তনতে পেলে সে ভারী খুশী হয় বলে আমি বললুম,

‘দাবানল হবে বনস্পতির দগ্ধ দাহনে দহে

শুষ্কপত্র আর্দ্র পত্রে কোন না প্রভেদ সহে।’

শাস্ত হয়ে গেল। বললে, ‘কিন্তু!’

আমি তাকে আরও শাস্ত হবার জন্যে চূপ করে রইলুম।

বললে, ‘তুমি কিছু মনে করো না। ভেবেছিলুম বলব না, কিন্তু আমি পর পর তিনদিন উপোস করে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম, তাই এ-উত্তেজনা। উপোসের পরে মনে হল, তুমি যে সেই পাতিনেবুটি দিয়েছিলে সেইটে যদি তাজা থাকতো তবে শরবত বানিয়ে খেতুম।’

আমি বললুম, ‘হা অদৃষ্ট! আমার গাল টোল খায় না। তুমি কিসে ঢেলে খাবে? তা তুমি যত খুশী নেবু পাবে, আমাদের বাড়ির গাছে। আমরা যখন একসঙ্গে হিন্দুস্থান যাব—’

দেখি সে তার বড় বড় চোখ আরও বড় করে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, ‘কি হল?’

বললে, ‘তাজ্জব! তাজ্জব! আমার দিবাঞ্জে তো এ-আইটেমটা বিলকূল স্থান পায় নি। দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও। ঝোঁনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর আমি। না। তারই বা কি দরকার? তোমাকে তো কখনও ভিড়ের মাঝখানে আমি পাই নি। সে আনন্দ আমি পুরোপুরি রসিয়ে রসিয়ে চাখবো।

জিড়ের ধাক্কায় তুমি ছিটকে পড়েছ এক কোণে, দরজার কাছে, আর আমি, আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তোমার পানে পিছন কিরে। আয়নাতে দেখছি তোমার মুখের কাতর ভাব, আমার জন্ত বার্থ পাও নি বলে। একটুখানি ঝাড় ফিরিয়ে তোমাকে হানবো মধুরতম কটাক্ষ—একগাছি লোকের কোঁতুহল নয়নে তাকানোকে একদম পরোয়া না করে। আমার তখন কী গর্ব, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার জন্ত কত ভাবছ।’

আমি বললুম, ‘শোন শব্‌নম, তোমাকে একটা সত্য কথা আজ বলে রাখি। আমার মত লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী আজ্ঞার দুনিয়ায় রয়েছে। এমন কি এখানে যে কল্পন হিন্দুস্থানী আছে তার ভিতরও আমি অ্যাডোনিস বা রুডলফ ভালেটিনো নই। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি ওদিকে আমু দরিয়, পুবে পেশোওয়ার, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে দক্ষিণ-পাহাড় ছাড়িয়ে কই কই মুল্লুকে গেছে, কেউ জানে না। আমি শুনেছি ভারতীয় শিক্ষকদের কাছে, তাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্ত্রীস্বের কাছ থেকে। তাঁরা বলেন, বাদশা আমাছল্লা নিতান্ত একদারনিষ্ঠ বলে তুমি অবিবাহিতা—একই দেশে তো দুটো রাজা থাকতে পারে না, যদিও একই গাছ-তলায় একশ’টা দরবেশ্‌ রাজি কাটায়। গর্ব যদি কারও হয় সে হবে আমার। তামাম হিন্দুস্থান তোমার দিকে তাকাবে আর ভাববে কোন্‌ পুণ্যের ফলে আমি তোমাকে পেয়েছি।’

বললে, ‘শুনতে কী যে ভাল লাগে, কি বলব তোমায়। আমি জানি, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, মাথা নিচু করা উচিত কিন্তু আমি এমনি বে-আব্রু বেহায়া যে এসব কথা আমার আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি কুপে পেয়ে যাই তবে আমি খোলা জানালার উপর মুখ রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব, আর তুমি পিছনে বসে আমার পিঠের উপর খোলা চুলে মৃৎ গুঁজে এই সব কথা বলবে।’

তার পর আমার দিকে স্থির কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, ‘শুনে রাখ, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে দেহের সৌন্দর্যকে হার মানাবো। সে হবে পরিপূর্ণ একটি হিমকণিকার মত—যার প্রেমের ডাকে আকাশের শত লক্ষ তারা হবে প্রতিবিম্বিত, আর দিনের বেলা গভীর নীলাবুজের মত নীলাকাশ—তার অন্তহীন রহস্য নিয়ে।’

তারপর শব্‌নম পড়লো তার সন্ধ্য-ই-হিন্দুস্থান অর্বাৎ তারত ভ্রমণ নিয়ে।

হিন্দুস্থানের রেল জাইনের ছপাশে অক্সেসে সে গজালে আঙুর বন, দিল্লীর কাছে এসে রিচার্জের বরফে ট্রেন আটকা পড়লো দুদিন, জাইনিং করে অর্জার

দেওয়া মাত্র পেয়ে গেল কচি দুয়ার শিক্কাবাব, ট্রেন পুরো পাঁচা একটা দিন ছুটলো ঘন চিনার বনের মাঝখান দিয়ে, আশ্রা স্টেশনের প্র্যাটকর্মে সে কিনলে নরগিস্ ফুল আর হলদে গুল-ই-দায়ুদী, মোমতাজের গোরে দেবার জন্ত। আর সর্বক্ষণ পাশের গাড়িতে বসে আছে তোপলু খান, উরুর উপর দুখানি রাইফেল পাতা, পকেটে টোটা ভরা রিভলভার, বেন্টে দমক্সের তলোয়ার—পাছে চার মুহম্মদী শর্তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার কেনা টিকিট স্বামীটিকে কেউ কেড়ে নেয়!

আমার তো ভয় হচ্ছিল, আবার বুঝি শব্দম বোরকার ভিতর থেকেই পিস্তল মারতে আরম্ভ করে—মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই তাগ করে দুশমন ঝায়েল করতে পারে।

নানাবিধ মুশকিল যাবতীয় ফাঁড়া-গর্দিশ এবং তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ভিতর দিয়ে শব্দম বীবি তো শেষটায় পৌঁছলেন পূর্ব বাংলায় তাঁর স্বস্তরের ভিটায়।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, ‘বাঁচালে।’

‘দাঁড়াও না, তোমার খালি তাড়া। হাফিজ বাঙলাদেশে না আসতে পেরে বাঙলার রাজদূতকে তার বাদশার জন্ত কি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন? সেই যেটা তোমাকে হোটেলের বারান্দায় দিয়েছিলুম?’

আমি বললুম,

‘হেরো, হেরো, বিশ্বয়।’

দেশ কাল হয় লয়!

সবে কাল রাতে জনম লইয়া এই শিশু কবিতাটি।

রওয়ানা হইল পাড়ি দেবে বলে এক বছরের ঘাটি।’

‘তুমিও এক মাসের বধু, এক বছরের পথ পাঁচ দিনে পৌঁছলে।’

‘চুপ, চুপ, ওই বৈঠকখানায় মুক্কবীরা বসে আছেন। ওঁদের গিয়ে প্রথমে সালাম করতে হবে, না শোজা অন্দর মহলে যেতে হবে? কী মুশকিল, কিছু যে জানি নে।’

আমি বললুম, ‘এইবারে পথে এস—আমাকে যে কথা কইতে দাও না।’

‘তোমার পায়ে পড়ি, বলে দাও না। এই কি দাদ নেবার সময়?’

আমি বললুম, ‘প্রথম অন্দরে। মা বরবধু বরণ করবেন যে।’

‘সে আবার কি?’

‘মা মোড়ায় বসবেন, আমি তাঁর ডান উরুতে বসব, তুমি বাঁ উরুতে বসবে—’

‘সর্বনাশ! আমার ওজন তো কম নয়। তোমার কত?’

‘একশ দশ পৌণ্ড।’

‘কিলোগ্রামে বল।’

‘সে হিসেব জানি নে।’

‘দাঁড়াও, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি।’

ওর আঁক করার মাঝখানে আমি দরদ ভরা স্বরে বললুম, ‘হ্যাঁগা, তোমার হিসেবে তো দেখছি তোমার চারশ পৌণ্ড। আমার চেয়ে চারগুণ ভারি। তা হতেও পারে।’

‘ইয়ার্কি ছাড়। ওটা—ওটা—ওটা হল গিয়ে আউন্স।’

‘তা হলে তোমার ওজন আমার চার ভাগের এক ভাগ, হবেও বা।’

‘সর্বনাশ! তাও তো হয় না। এখন কি করা যায়?’

আমি বললুম, ‘আলতো আলতো বসলেই হবে।’

মা বরণ করলেন। কলাপাতা দিয়ে তেঁকোণা করে বানানো সমোসার মত পত্রপুটের ভিতর ধান—তিন কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে দুর্বা। আমাদের মাথার উপর অনেকগুলো রাখলেন। শব্‌নমের ওড়না তার হাঁটু পর্যন্ত নামানো।

আমার দুই ভাইঝি জাহানারা আর রাণী—‘কুটিমুটি’—প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে নূতন চাটীর মুখ সঙ্কলব পয়লা দেখবে বলে।

শব্‌নম স্বপ্ন দেখছে। আমি কথা বলে এক স্বপ্ন উড়িয়ে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে আরেক স্বপ্নে ঢুকে যায়। কিন্তু সব চেয়ে তার ভাল লাগে মায়ের কোলে ওই বসার্টা।

একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, ‘আমার রইল এ-জীবনে একটি মাত্র আশঙ্কা। মা যদি আমাকে ভালো না বাসে।’

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, ‘তুমি ওই ভয়টি করো না শব্‌নম—প্ৰীজ—লক্ষীটি। তোমাকে ভালবাসবেন মা সবচেয়ে বেশী। তুমি কত দূরদেশ থেকে এসেছ, সব আপন জন ছেড়ে, শুধু আমাকে ভালবাস বলে। একথা মা এক মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারবেন না। মাকে যদি কেউ ভালবাসে এক তিল, মা তাকে বাসেন একতাল। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে এক কণা, মা তাকে বাসবেন দুই ছনিয়া—ইহলোক, পরলোক।’

‘বাঁচালে। তুমি তো জান, আমার মা নেই।’

স্বাভাবিক সময় শব্‌নম বললে, ‘বিপদ বনিমে আসছে। শিগ্‌গিরই তার চরমে পৌঁছবে।’

আমি চিন্তিত হয়ে শুধালুম, ‘তুমি কিছু জান ?’

বললে, ‘না। আমি শুধু আমার হাড়ের ভিতর অহুভব করছি।’

‘আবার কবে দেখা হবে ?’

‘এরকম থাকলে রোজই আসতে পারব।’

তারপর দুজনাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম, মুখোমুখি হয়ে। বলার কথার অভাব আমাদের কারোরই হয় না, কিন্তু বিদায়ের সময় যতই বনিয়ে আসে ততই আমরা শুধু একে অন্ডের দিকে তাকাই আর আপন মনে অজুহাত খুঁজি কি করে বিচ্ছেদ-মুহূর্ত আরও শিথিয়ে দেওয়া যায়। শব্দনম আমার মনের কথা আমার বেদনাতুর চোখ দেখেই বুঝতে পারে আর নিজের চোখ ছুটি নিচের দিকে নামায়। হয়তো তার চোখে জল এসেছে। কখনও বা জড়িয়ে-বাওয়া গলায় কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

এবারে বললে, ‘তুমি প্রতিবারে আমাকে দাঁও আগের বারের চেয়েও বেশী। যত বেদনা নিয়েই বিদায়ের সময়টা আম্বক না কেন, পথে যেতে যেতে ভাবি তুমি যে আনন্দ দিয়েছ এর বেশী আর আসছে বার কি দেবে ? তবু তুমি দাঁও, প্রতিবারেই দাঁও, বেশী করে দাঁও, উজাড় করে দাঁও। কি দাঁও তুমি ? আমি অনেক বার ভেবেছি। উত্তর পাই নি। এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমার রাজার রাজা, গোলামের গোলাম এই তো আমার আনন্দের পরিপূর্ণতার চরম সীমা। এর বেশী আমি কীই বা চাইতে পারি, তুমি কীই বা দিতে পার ? তবু পাই, প্রতি বারেরই অদ্ভুত অনির্বচনীয় রসঘন আনন্দ। আর যখন তুমি আমাকে বল, “আমি তোমাকে ভালবাসি” তখন আমার হৃ’চোখ কেটে বেরয় অশ্রু। আমার কাণায় কাণায় ভরা হৃদয়-পাত্র তখন ঘেন আর বেদনার কূল না মেনে উপচে পড়তে চায়। বল, তুমি আমার ককখনও ত্যাগ করবে না ?’

আমি ধতমত খেয়ে গেলুম। এত কথা বলার পর এই অর্থহীন প্রশ্ন ? যেখানে আমরা পৌঁছেছি সেখানে এ-প্রশ্ন যে একেবারে অসম্ভব—পাগলেরও কল্পনার বাইরে।

বললে, ‘তুমি আমাকে মার, সাজা দাঁও, ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দাঁও, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করো না।’

আমি কিছু বলি নি। শুধু তাকে বৃকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

বললে, ‘বড় দুঃখে আজ সকালে একটি কবিতা লিখেছি। নিজে কখনও এ জিনিস লিখি নি বলে প্রথম দু লাইন এক বিদেশী কবির কাছ থেকে নিয়েছি।

কিন্তু আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতাটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। তোমার কলমটা দাঁও। এটা কিন্তু গড়ে লিখবো। এখন পড়ো না—
আমি চলে যাওয়ার পরে পড়ো।’

দেউড়িতে এসে অবাক হয়ে শুধোলে, ‘তুমি আবার চললে কোথায়?’

আমি বললুম, ‘তোমাকে পৌঁছে দিতে।’

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, ‘অসম্ভব।’

আমি তর্ক করি নি।

ওই একটি দিন, একটি বার, আমি আমার জীবনে তার আদেশ লঙ্ঘন করেছি। তর্ক না করে, আপত্তি না তুলে। শেষটায় সে হার মানল। আমি বেশ কিছুটা পিছনে তার উপর নজর রেখে রেখে চললুম। বাড়ির দেউড়িতে পৌঁছে একবার ঘুরে দাঁড়াল।

সে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি, কিন্তু আমি শুনেছি সে বলেছিল, ‘তোমাকে খুদার হাতে সমর্পণ করলুম।’

বাড়ি ফিরে এসে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলুম।’

‘তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার

কেমনে হইব পার?’

তুখ-রজনীর প্রেমের প্রদীপ ভাসিয়ে দিলেম আমি

দীর্ঘ নিশ্বাস পালেতে দিলেম জানে অন্তরধামী।

শেষ দীপ-শিখা দিলেম তোমারে মোর কিছু নাহি আর

স্বরা এস বঁধু, বেগে এস প্রভু, নামাও বেদনাতার।’

এর পর গড়ে লেখা : ‘এর আর প্রয়োজন নেই

তুমি যে অনিবার্য দীপশিখা জালিয়ে দিয়েছ—’

বাকিটা শেষ করে নি।

পুরুষ মানুষ হয়েও সে রাতে আমি কেঁদেছিলুম। ‘হে পরমেশ্বর’,—চোখের জলে বলেছিলুম, ‘হে দয়াময়, আমাকে কেন পুরুষ করে জন্ম দিলে? এই বলহীনা সব বিপদ তুলে নেবে আপন মাথায়, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব? আমি কোনদিন তার কোনও কাজে লাগব না?’

পরদিন সকালবেলাই খবর পেলুম, আমাছুল্লার সৈয়দুল রাজ্জিবেলা হেরে যাওয়াতে তিনি তাঁর বড় ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে কান্দাহার পালিয়ে গিয়েছেন।

রাজ্যের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। বোরকা তো অস্তর্ধান করেছেই, তাগড়া জোয়ানরাও একলা একলি বেয়শ না—এক একটা দলে অন্তত পাঁচ-সাতজন না থাকলে মাহুব নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। বাচ্চার ডাকু সৈয়দুল রাজ্জিবেলা ছেয়ে ফেলেছে।

তিন দিন পর আমাছুল্লার দাদাও সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাচ্চা সাড়ম্বরে সিংহাসনে বসল।

এসব খবর যে কোনও প্রামাণিক আফগান ইতিহাসে সবিস্তার পাওয়া যায়—একথা পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি; বাচ্চার আপন হাতে জ্বালানো দাবানল শব্দনম ও আমার মত নিরীহ শুক পত্রের দিকে কি ভাবে এগিয়ে এল সেইটে বোঝাবার জন্য হৃদয়তম খেঁইগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

দু হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবছি, কি করি, কি করি? কোন্ দিকে পথ, কোথায় আলো—আর কোনটাই বা আলোয়া?

স্বথ চাই নে, আনন্দ চাই নে, এমন কি প্রিয়মিলনও চাই নে—কি করে এই দাবানল থেকে শব্দনমকে রক্ষা করি?

আমি রক্ষা করবার কে?

এমন সময় হস্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে বুটের ধপাধপ শব্দ করে আকবুর রহমান ঘরে ঢুকে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, ‘সর্দার আওরঙ্গজেব খান এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।’ আকবুর রহমানের গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমি দুবার শুনেও প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম।

মাথা নীচু করে কিছু না বলে নীরব অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি গভীরে—এবং সেই অর্ধগম্বিতেও আমার মনে হল—প্রশ্নের অভিধান জানালেন। মুহূর্তে বললেন, ‘আপনার পরে’—অর্থাৎ ‘আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।’ তিনি কেন এসেছেন, এই ভাবনার ভিতরও আমি আশ্চর্য হয়ে

লক্ষ্য করলুম, শব্দনের গলা মধুর, এঁর গলা গভীর, অথচ দু-গলারই আদল এক, কংকরসর ধ্বনি। যেন শব্দনম বাপের পাগড়ি জোকা গৌরদাড়ি পরে এসেছে।

আমি আপত্তি না জানিয়ে শুধু ‘থানা-ই তুমা অন্ত’—‘এটা আপনার বাড়ি’ বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ইরানী কায়দায় একবার ‘এটা আপনার বাড়ি’ বলার পর অভ্যাগতজন আদেশ করবেন, গৃহস্থ তাঁর কথা মত চলবে।

আমাকে আসন দেখিয়ে নিজে সোফায় বসলেন।

আমি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইরান আফগানের মুকব্বারা এতে খুলী হয়ে বলেন, ‘বাক্সা খিজালু মী কশদ—ছেলেটার আত্ম শরম-বোধ আছে।’

তুখালেন, ‘আপনি আমার পরিচয় জানেন?’

আমি মূঢ় কণ্ঠে বললুম, ‘কিছু কিছু জানি।’

বললেন, ‘তাই যথেষ্ট। আমিও আপনাকে কিছু কিছু চিনি। এদেশে এখন অল্প-বিস্তর বিদেশী আসতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে আপ-পরিচয় করবার সুযোগ এখনও পাই নি। তবে গেল বছর আপনাদের কলেজের বাৎসরিক পরবে আপনি এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে শোনবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনি বড় একাগ্র মনে অত্যন্ত দরদ দিয়ে আপনার বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার মনে হয়েছিল, আপনি এই পরদেশকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছেন। নয় কি?’

আমি মাথা নীচু রেখেই বললুম, ‘এদেশ আমাকে অবহেলা করে নি। এদেশে আমি আশাতীত ভালবাসা পেয়েছি। প্রতিদানের চেয়েও বেশি দেবার চেষ্টা করেছি।’

‘এই তো ভদ্রজনের আচরণ।’

আমি তখন শুধু ভাবছি, তাঁর এখানে আসার রহস্য কি? তবে কি শব্দনম তাঁকে কিছু বলেছে? তাই বা কি করে হয়?

নিজের থেকেই তিনি কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি স্বন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বোঝালেন। তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল তিনি সাধারণ সৈন্তদেরও কঠিন জিনিস বোঝাতে অভ্যস্ত।

সর্বশেষ বললেন, ‘আমি সোজা কথা বলাটাই পছন্দ করি। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও সরল লোক। তাই আপনার কাছে অন্ত লোক না পাঠিয়ে আমি নিজেই এসেছি। যদিও এ অবস্থায় নিজে আসাটার রেওয়াজ এদেশে নেই।

‘আমি আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি নি। আমি সিপাই। প্রাণের প্রতি যাদের অত্যধিক মামা তারা কোঁজে বেশী দিন থাকে না—অন্তত স্বক্ৰমাত্র ছু’পয়সা কামাবার জন্য আমার কোঁজে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

‘এবারে আপনাকে যা বলছি তা গোপনে।’

‘আমার একটি কিশোরী কন্যা আছে। লোকে বলে অসাধারণ সুন্দরী। অন্তত তার সে খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আজ বিশ্বস্তস্বত্রে খবর পেয়েছি বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দ্বিতীয় সেনাপতি—প্রথম সেনাপতির ছোট ভাই—বছর দুই পূর্বে কাঠ বেচতে এসে তাকে কাবুলে দেখতে পেয়েছিল—আমার মেয়ে সচরাচর পর্দা মানতো না। যে জিনিস তখন তার বন্ধ উম্মাদাবস্থার ও উৎকট কল্পনার বাইরে ছিল আজ সৈন্তদল প্রয়োগে সেটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

‘আপনি হিন্দুস্তানী। আপনি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন তবে সে হিন্দুস্তানী গ্রামনাট্য পেয়ে যাবে। আমি আপনাদের রাজ-দূতাবাসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ; ভারতীয় এক বড় রাজকর্মচারী বললেন, “আইনত আমার মেয়ের যে অধিকার জন্মাবে সেটা তিনি রক্ষা করার সর্ব চেষ্টা করবেন।” যদিও প্রয়োজন ছিল না, তবুও কথা উঠেছিল, এখানে শিক্ষিত অবিবাহিত কে কে আছেন। সেই প্রসঙ্গে আপনার নাম যখন উঠল, মাত্র তখনই তিনি সন্তর্পণে তাঁর উৎসাহ দেখিয়েছেন।’

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সামনে পড়ে আমি বিস্ময়েই হোক, আনন্দেই হোক, কিছু না বুঝতে পেরেই হোক হয়তো একটা অশুট শব্দ করেছিলুম।

তিনি বললেন, ‘আপনি একটু চিন্তা করুন এবং তার পূর্বে বাকি কথা শুনে নিন।

‘বাচ্চা-ই-সকাও এখন মোল্লাদের কথা মত চলে। অন্তত তারা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটাতে সক্ষম দিতে পারবে না।

‘ব্রিটিশ এ্যারোপ্লেন ভারতীয় নারীদের আপন দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে সদয় আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম স্বযোগেই তিনি আমার মেয়েকে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেবেন।

‘এদেশে করাচী জরন—বিদেশী প্রায় সবাই অবিবাহিত। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই ইউরোপীয় বিয়ে করবে না। প্রথমত তারা খুঁটান, দ্বিতীয় তাদের সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্তি এবং তৃতীয়—বোধহয় এইটেই সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল—

ভাদেব শারীরিক অন্তিষ্ঠা সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। যদিও তার তমকুন-ফরহঙ্গের, তার বৈদ্যের অর্ধেকেরও বেশী ফরাসী।

‘এ কথাটা তুললুম, আপনি হয়তো শুধাবেন, আমার মেয়ের মত আছে কি না। আপনি মত দিলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব, কারণ ধর্মত আইনত সে প্রাপ্তবয়স্ক। যদি সে অমত করে, আশা করি আপনার অভিমানে লাগবে না। যে রকম আমি আপনাকে সরল মনে বলেছি, আপনি অমত করলে আমি কণামাত্র অপমানিত বোধ করব না।

‘কারণ, হয়তো আপনারা আপনাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করেন না, আমরাও আমাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করি নে—যদিও ইসলাম এরকম গোষ্ঠী পাকানো নিন্দার চোখে দেখে। আপনি রাজী না হলে আমি কখনও ভাববো না, আপনি আমার মেয়েকে কিংবা আমাকে এবং আমার গোষ্ঠীকে খাটো করে দেখলেন।

‘আমার মেয়ে সম্বন্ধে বাপ হয়ে আমি কি বলব। আমি প্রশংসা করতে চাই নে। সে আমার একমাত্র মেয়ে, ছেলেও নেই, তার গর্ভধারিণী—’

এই প্রথম তাঁর সরল দৃঢ় কথাতেও যেন একটু অতি ক্ষীণ কাঁপন শুনতে পেলুম।

‘—অল্প বয়সে মারা মান। বাপ হয়ে তাই ইংরেজের মত ম্যাটার অব্ ফ্যাক্ট বা সাদামাটা ভাবে বলি, তার চারটে ‘বি’-ই আছে। বিউটি, ব্রেন, বার্থ, ব্যাক—অবশ্য চতুর্থটা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘সর্বশেষে আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, আপনি রাজী হলে ফলস্বরূপ বাচ্চার সেনাপতির বিরাগভাজন হবেন।’

এতক্ষণ তিনি আমার দিকে ঝুঁকে, উরুতে দুই কনুই রেখে, চিবুক দুই হাতের উপর রেখে কথা বলছিলেন। এবারে শিরদাঁড়া খাড়া করে ফোঁজী কায়দায় শোজা হয়ে বসে বললেন, ‘এবারে আপনি চিন্তা করে বলুন।’

তিনি যে ভাবে শাস্ত হয়ে আসনে বসলেন তার থেকে বোকা গেল, প্রিয় অপ্রিয় নানারকম সংবাদ শুনে তিনি অভ্যস্ত। আমার ‘না’ তাকে বিচলিত করবে না, আমার ‘হাঁ’ তাঁকে প্রসন্ন করবে।

আমার ‘হাঁ’, ‘না’ ভাববার কি আছে! তবু আমি এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে প্রথমটায় আমি কিছুই বলতে পারি নি। তারপর মাথা নিচু রেখেই নববরের কণ্ঠে বলেছিলুম, ‘আপনার কন্যাকে আমি আদ্যাত্মার মেহেরবানীর মত পেতে চাই।’ আমি ইচ্ছে করেই আমার সম্মতি প্রস্তাবের রূপ

দিয়ে প্রকাশ করেছিলুম—কিন্তু আপন অজানতে। আমি বিশ্বাস করি, কল্পণাময় তাঁর অসীম দয়ায় মুক্কে যে শুধু তাবাই দেন তা নয়, সৌজন্মের ভাষাও বলতে শেখান।

আওরঙ্গজেব খান দাঁড়িয়ে উঠে আমার আলিঙ্গন করলেন।

আসন গ্রহণ করে বললেন, ‘আমার কস্তার কিম্বৎ যদি ভালো থাকে তবে আপনি অস্থগী হবেন না। আর আপনি আমার উপকার করলেন। জামাতার কাছে উপকৃত হওয়া বড় আনন্দের বিষয়।’

আমি বললুম, ‘আপনি গুরুজন। যদি অহুমতি করেন তবে একটি নিবেদন আছে।’ আমি আমার গলা ফিঁরে পেয়েছি।

প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, ‘আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।’

আমি হাত জোড় করে বললুম, ‘আপনি দয়া করে উপকারের কথা তুলবেন না। আমি আপনার কস্তার পাণি-প্রার্থনা করছি, শিষ্ট যে রকম মূর্শীদের কাছে গুরু-কল্যাণ কামনা করে।’

এবারে তিনি বিচলিত হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন আমার মস্তক চুষন করতে করতে বললেন, ‘বাচ্চা—বৎস—তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। তোমার পিতামাতার আশীর্বাদ তোমার উপর আছে।’

আমি তাঁর হস্তচুষন করলুম।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ‘পাণাচার শুভবুদ্ধির চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। তাই শুভকর্ম শীঘ্র করতে হয়। বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের পাণবুদ্ধিকে হারাবার জন্য তোমাদের বিবাহ যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত। তুমি কি বল?’

আমি বললুম, ‘আপনার কাছ থেকে আমার পরিচিত “শুভস্ত শীঘ্রম্” বাক্যের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ বুঝলুম। এখন থেকে আমার আর কোন মতামত নেই।’

‘আজ সন্ধ্যায়?’

‘আজ সন্ধ্যায়।’

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘সময় কম। ব্যবস্থা করতে হবে। কীই বা ব্যবস্থা করব? এই দুর্দিনে?’

আমি জানি শব্দম রাজী, কিন্তু ইনি কোন্ সাহসে সব ব্যবস্থা করার চিন্তাতে লেগে গেলেন? বোধহয় কস্তার জনকান্নুরাগে অথও বিশ্বাস ধরেন।

আমাকে কোনও কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তেই অন্তর্ধান করলেন।

মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি! আমি মুক্তি পেয়েছি।

আর আমাকে হাত-পা-বাঁধা অসহায়ের মত মার খেতে হবে না। ওই আমলেই বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে রটেছিল যে টেগার্টের পুলিশ বিপ্লবীদের হাত পা বেঁধে সর্বাত্মক মধু মাখিয়ে ডাঁশ পিঁপড়ের মাঝখানে ফেলে রাখে। আমাকে আর সে যজ্ঞা সহ্য করতে হবে না।

আমি এখন শব্দনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।

তার মিলনের জন্ত এখন আমাকে আর প্রহরের পর প্রহর গুনতে হবে না। আমি যে কোন মুহুর্তে তার সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি। আমার দশদিন এখন সত্যিই নিরবস্থা হয়ে গেল।

পরিপূর্ণ আনন্দের সময় মাহবুবের মন ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধায় না। একটা আনন্দ নিয়ে সে পড়ে থাকতে ভালবাসে। শিশুর মত একটি পুতুলই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমতে যায়। আমি আমার মুক্তির আনন্দ নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে রইলুম, আমার অন্ত সোঁতাগোর কথা ভাববারই প্রয়োজন হল না, ফুরসত হল না।

এক ঘণ্টা হয় কি না হয়, এমন সময় আক্ষর রহমান সৌম্যদর্শন এক অতি বুদ্ধকে আমার ঘরে নিয়ে এল। ধবধবে সাদা চাপ দাড়ি, সাদা গৌফ—মোল্লাদের মত ছোট করে ছাঁটা নয়, সাদা বাবরী চুল, তার উপর সাদা পাগড়ি, চোখের পাতা এমন কি ভুরু পর্যন্ত বরফের মত সাদা। এবং সে সাদা বেয়ে খেন তেল ঝরে পড়ছে। ঐর বয়স কম হলে আমি বলতুম, এটা সাদা নয়, সত্যিকারের প্র্যাটিনাম ব্লও।

আমি তাঁকে স্বস্তি করে বসালুম।

অতি সুন্দর ফার্সী উচ্চারণে বললেন, ‘আমি আওরঙ্গজেব খানের গুরু। তার মেয়েরও গুরু। দুজনাকেই ফার্সী পড়িয়েছি। এখনও আমাদের তিন জনাতে মুশাইরা হয়।

‘এই খানিকক্ষণ আগে আওরঙ্গজেব খান এসে আমায় স্বথবর শোনালে, আপনার সঙ্গে শব্দনের শাদি আজ সম্ভাব্যেলাই হবে। আমি বড় খুশী হয়েছি। আমি বড়ই খুশী হয়েছি।’

এইটুকু বলে তিনি দুখানা হাত তুলে আল্লার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করলেন। আমিও হাত তুলে আন্তে ‘আমিন’ ‘আমিন’ বললুম।

বললেন, ‘যেই গুনতে পেলুম, আপনার মুক্কী এখানে কেউ নেই, অমনি

আমি বললুম আমার উপর এর তার রইল। আওরজ্জব চায় নি যে এই খুন-রাহাজানির মাকথানে আমি রাস্তায় বেরই। আমি তাকে শট বলে দিলুম, এ সংসারে আমি এমনিতেই আর বেশী দিন থাকব না—না হয় দুদিন আগেই গেলুম।’

আমি বললুম, ‘আপনি শতায়ু হন।’

বৃদ্ধের বসবোধ আছে। বললেন, ‘আমার বয়স আশী হয়েছে। আরও কুড়ি বছর বাঁচতে চাই নে। বরঞ্চ ওই কুড়িটি বছর আপনি আপনার আয়ুতে জুড়ে দিন কিংবা শব্দ বাহু আর আপনাতে ভাগ করে। কোন জিনিস বরবাদ করাটা আমি আদর্শেই পছন্দ করি নে। এখন, প্রথম কথা : আওরজ্জব খান আপনাকে জানাতে বলেছেন, “আজ সন্ধ্যায় আপনাদের বিবাহ।” আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

‘দ্বিতীয় কথা : আপনার বন্ধুবান্ধব কে কে এখানে আছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা বলুন। আমি কিংবা আমার বাড়ির লোক তাঁদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসবে উভয় পক্ষ থেকে। দুজন করে লোক যাবে।’

আমি বললুম, ‘এই দুদিনে নিমন্ত্রণ করে কাকে আমি বিপদে ফেলি ? তাদের কারোর যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয় তবে তার বাল-বাচ্চার সামনে আমি আমার মুখ দেখাতে পারব না। আর আমার সেরকম মিত্র বা সখাও কেউ নেই। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এখানে—তাও সহকর্মীরূপে। কিন্তু তার পূর্বে আমার উচিত আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা।’

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে বললেন, ‘না, না, না। আপনি বিদেশী—এদেশের অবস্থা জানেন না। এখন শুদ্ধমাত্র লৌকিকতা করার জন্ত রাস্তায় বেরনো উচিত নয়। আমি আপনার হয়ে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাব। তারা সবাই বরপক্ষের হয়ে যাবে।

‘এবারে আপনার শ্বশুরমতগার আব্দুর রহমানকে দাওয়াত করতে হবে।’

আমি বললুম, ‘তাকে ডাকি।’

আবার ব্যাকুল হয়ে বললেন, ‘না, না, না। আমি তাকে হিন্দুস্তানী কায়দায় কনে পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানাব তার কাছে গিয়ে।

‘তৃতীয় কথা : আপনার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা আমি করব। আমার মেয়ে আপনার মোটামুটি উচ্চতা আওরজ্জব খানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে এবং সেলাইয়ের কলে বসে গিয়েছে। এ-তো জোকার ব্যাপার, হাঙ্গামা কম।

এবার আপনি আমার বুক বুক লাগিয়ে দাঁড়ান। আমি ঠিক ঠাহর করে নি।’

মোকা পেয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা আলিঙ্গনও দিলেন।

আমি তাঁর হস্তচূষন করে বললুম, ‘আমার বলতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের খরচটা?’

বুদ্ধ সপ্রতিভ। বললে, ‘নিশ্চয়! খয়রাতী বা ধারের আমাজোড়ায় বিয়ে করাটা মনহুসী—অপয়া।’

আমি বললুম, ‘এদেশে ভারতীয় কারেন্সির কদর আছে বলে শুনেছি।’

তাঁকে আমার মনিবাগটা দিলুম।

তিনি দু-একখানা নোট তুলে নিয়ে বললেন, ‘বিয়ের পর শব্ন্ম আর আমার মেয়েতে বোঝাপড়া করে নেবে।’

বুদ্ধ উঠলেন।

এঁর কথা বলার ধরন শোনবার মত। শব্ন্ম বয়েং ছাড়ে মাঝে-মধ্যে, ইনি প্রায় প্রত্যেকটি কথা বললেন বয়েতের মারফতে। ঠিক বলতে পারব না, বোধ হয় তাঁর মেয়ে যে সেলাইয়ের কলে বসে গেছেন সেটাও বয়েতেই বলেছিলেন। কিন্তু শব্ন্মের বেলা বেরকম তাকে থামিয়ে টুকে নিতে পারি, এর বেলা সেটা পারলুম না বলে ছুঃখ রয়ে গেল।

আস্কুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় আমাকে বললেন, ‘আপনাকে কয়েকটি বয়েং শোনালুম, আপনি তো আমাকে একটিও শোনালেন না। আপনার বুঝি ওতে মহস্বৎ নেই!’

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘আপনাকে শোনাব আ-মি? আপনার তো সব বয়েং জানা।’

তিনি বললেন, ‘সে কি কথা? চেনা গান লোকে শোনে না? নূতন লাইব্রেরিতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম চেনা বইয়ের সন্ধান করি নে? জলসা-ঘরে গিয়েও প্রথম খুঁজি চেনা মুখ এবং বলতে নেই, গোবস্তানে গিয়েও প্রস্তরফলকে চেনা জনেরই নাম খুঁজি।’

বাপ্‌স্‌! চার চারটে তুলনা—এক নিখাসে।

আমি সায় দিয়ে বললুম, ‘আমার এক বন্ধু একটি কবিতা লিখেছেন। শুনবেন?’ বলে নরগিসের...

তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার

কেমনে হইব পার—?

কবিতাটি শোনালুম। বৃড়ো একেবারে থ’ মেয়ে গেলেন। ‘কাবুলের লোক

এরকম লিখেছে ? অসম্ভব ! ওর সঙ্গে আমার আলাপ করতেই হবে। বয়সে নিশ্চয়ই কাঁচা। চিন্তাশীল এবং স্পর্শকাতর। ছন্দে মিলে সবুজ রঙের কাঁচা ভাব একটু রয়েছে। যদি লেগে থাকে তবে ইরান হিন্দুস্তানে একদিন নাম করবে। ইন্ শা আল্লা, ইন্ শা আল্লা—আল্লা যদি দেন, আল্লা যদি করান।’

দেউড়িতে বললুম, ‘আমাকে দয়া করে আপনি বলবেন না।’

হেসে বললেন, ‘নওশাহ, নতুন রাজা, নববর, তাই বলেছি। কাল থেকে তুমি বলব। আগুরুজ্জিবও বলেছিলেন, “বাক্সা থিজালং মৌ কশদ”—“ছেলেটির আক্র-শরম-বোধ আছে।” আমি বড় খুশী হয়েছি, আগাজান। আর কানে কানে বলি, শব্দনমের মত মেয়ে আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে ছুটি দেখি নি। নাম সার্থক করে শব্দনমের মত পবিত্র।’

অতি সত্য কথা। তবু আমার অভিমান হল। সবই শব্দনম, শব্দনম—আমি যেন কিছুই না।

। ৭ ।

আমার প্রিয়া, আমার বউ, আমার বিবাহিত স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে চলেছি !

এ যেন একই দিনে দুবার সূর্যোদয়। কিন্তু তাও হয়। সূর্যোদয়ের একটু পরে ঘন মেঘে সূর্য পড়ল সম্পূর্ণ ঢাকা। সব কিছু ভাসা-ভাসা অন্ধকার—সূর্যোদয়ের পূর্বে যে রকম। মেঘ কেটে পরিস্কার আকাশে আবার পূর্ণ সূর্যোদয় হল।

কিংবা বলব, ভারতবর্ষে মানুষ যেমন একই দেহ নিয়ে দুই জন্ম লাভ করে ‘দ্বিজ’ হয়। প্রথম জন্ম তার ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়বারে লাভ করে গুরুর আশীর্বাদ, সমাজের সম্মতি। আমাদের এই দ্বিতীয় বিয়েতে আমরা পাব পিতার আশীর্বাদ, সমাজের মঙ্গল কামনা।

সুস্থ বর স্বাভাবিক অবস্থায়ও পরের দিন ঠিক ঠিক বলতে পারে না কি কি হয়েছিল, কোন্টার পর কি ঘটেছিল। আমার অবস্থা আরও খারাপ।

কিংখাপের জামা-জোকা পরে মাথা নিচু করে বসে আছি শাদির মজলিসের মাঝখানে। একবার মাথাটা অল্প উচু করে চারদিকে তাকালুম। মাত্র একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলুম। আমার কলেজের আমারই ছাত্র। তারই কচি মুখটি শুধু হাস্তোজ্জ্বল। আর সকলের মুখে আনন্দ আভাসে মেশানো কেমন যেন এক আবছায়া-আবছায়া ভাব। আবার মাথা নিচু করলুম।

এবারের বিয়েতে শব্দন সত্তাতে এসে আমার মুখোমুখি হয়ে বসল না। আমার মুখপাত্র হয়ে একজন ‘উকীল’ ছুজন সাক্ষীসহ অন্দরমহলে গিয়ে বিবাহে শব্দনের সম্মতি নিয়ে এসে মজলিসে আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বসে বসলেন, ‘অমকের কত্তা অমুক, আপনি, অমকের পুত্র অমুককে এত জীধনে মুহম্মদী চার শর্তে বিবাহ করতে রাজী আছেন—আপনি কবুল আছেন?’ বাকিটা প্রথম বারেরই মত।

হ্যাঁ, মনে পড়ল। এর আগে একটা দম্পত্য হয়ে গিয়েছে জীধন কত হবে তাই নিয়ে। সাধারণত বর পক্ষ সেটা কমাতে চায়, কত্তা পক্ষ সেটা বাড়াতে চায়। এখানে হল উল্টো। পরিবারের ঐতিহ্য ও সম্মান বজায় রেখে আওরঙ্গজেব খান কমিয়ে কমিয়ে যে অঙ্ক বসলেন, আমি তাঁর গুস্তর মারফতে ঢের বেশী অঙ্ক জানিয়ে দিলুম। গুস্তরই শেষটায় রক্ষারফি করে দিলেন।

বড় ছুঁখে তোপলু খানের কথা মনে পড়ল।

বর-বধুর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন গুস্তর। সমস্তটা কবিতা কবিতায়। এবং সব কবিতা মাত্র একজন কবি মোলানা জালালউদ্দীন রুমী-র থেকে নিয়ে। আশ্চর্য, কি করে জানলেন উনিই আমার সব চেয়ে প্রিয় কবি!

তারপর সব ঝাপসা।

আমার অপরিচিত এক ভারতীয় বোধহয় আমাকে মুকুব্বীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সম্মান জানাতে তাঁরা আমাকে আলীবাদ করে-ছিলেন। সকলের পয়লা কার কাছে গিয়েছিলুম মনে নেই। স্বস্তরমশাই কিংবা জ্যার্ট-স্বস্তরমশাই—অর্থাৎ জানেনম্ন—আমি কারও মুখের দিকে তাকাই নি।

এসব কায়দা খাস আফগানী কি না আমি জানি নে। পরে শব্দনের কাছে শুনেছিলুম ওই অপরিচিত ভারতীয় মিজটি সব-কিছু আধা-আফগান আধা-হিন্দুস্তানী কায়দায় করিয়েছিলেন।

জিরোবার জন্ত আমাকে ছুটি দেওয়া হল। বেকতেই দেখি আমার ছাত্রটি। সে আনন্দে, উৎসাহে সেখানে চৌচামেটি লাগিয়েছে। আমার সম্বন্ধে তার গুণকীর্তনের যেটুকু কানে এসেছিল তার সিকি ভাগ সত্য হলে তুর্কীর খলিফার সিংহাসন ইস্তাভুল জাহুবর থেকে বের করে এনে তার উপর আমাকে বসাতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নোবেল প্রাইজের সব কটা পুরস্কার নাগাড়ে এক শ বছর ধরে আমাকে দিয়ে যেতে হয়।

আমাকে দেখতে পেয়ে লাক দিয়ে এসে আমার হাত ছুঁখানার উপর তার চোখ চেপে ধরে বার বার বলে, ‘হুস্তর, এ কী আনন্দ, আপনি আমাদের দেশে

বিয়ে করলেন! হজুর, ইত্যাদি।' শেষটায় বললে, 'কলেজের সবাই বড় পরিভ্রষ্ট হবে, হজুর, এ আমি বলে রাখছি।'

হায় রে কলেজ! আমরা তখনও জানতুম না বাচ্চা তিন দিন পরে কাবুলের তাবৎ ইন্সুল-কলেজ নশ্তাৎ করে দেবে।

একটা ঘরে বসিয়ে তামাক সিগারেট সামনে রাখা হল। শব্দনন্দের সমবয়সী আত্মীয়-স্বজনরা প্রথমটায় কিস্ত-কিস্ত করে পরে বাঁধন-ছাড়া বাছুরের মত লাফালাফি দাপাদাপি ঠাট্টা-রসিকতা করলে। আমার কবিতার শব্দ জেনে শেষটায় লেগে গেল বয়েতবাজি, কবিতার লড়াই এবং মুশাইরা। শুধু ফার্সী না—তুনিয়ার যত সব ভাষায়। তবে মোলায়েম প্রেমের কবিতার অধিকাংশই ছিল ফার্সীতে।

খবর এল, জানেনম্ন আমার জন্ম অপেক্ষা করছেন।

আমাকে সামনে বসিয়ে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুললেন। এমন কি চোখে, নাকে, গালে, কপালে, ঠোঁটে পর্যন্ত। তখন দেখলুম, তিনি অন্ধ।

অতি মুহূর্তে বলতে আরম্ভ করলেন, 'শোন বাচ্চা, তোমাকে সব-কথা বলার মত লোক এ বাড়িতে আর কেউ নেই আমি ছাড়া। জন্মের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত শব্দনন্দ একদিনের তরেও আমার চোখের আড়াল হয় নি। আমি জন্মান্ত নই, যৌবনে চোখের জ্যোতি হারাই। শব্দনন্দ সে জ্যোতি ফিরিয়ে এনেছে। আজ যদি কেউ বলে, শব্দনন্দের ভালবাসার পথে আমি একটিমাত্র কাঁটা পুঁতলে আমার চোখের জ্যোতি ফিরে পাব তা হলে আমি সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেব।

'প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, সে ভালবেসে ফিরেছে। যখন ফিরে এল, তখনই শুনি তার গলা বদলে গিয়েছে, তার হাসি বদলে গিয়েছে, আমাকে আদর করার ধরন বদলে গিয়েছে। যেন এতদিন ছিল পাতার আড়ালে লুকানো ফুল—এখন তার উপর পড়েছে প্রভাত বেলার স্নিগ্ধ আলো। ঘরের কোণের প্রদীপ হঠাৎ যেন আকাশের বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন নবীন মাদুরী এসে ধরা দিয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নূতন হলে নূতন তালে নেচে উঠেছে।

'আমার থেকে দূরে চলে গেল? না, বাচ্চা, না। সেই তো প্রেমের রহস্য।

'এতদিনে বুঝতে পারল, আমি তাকে কতখানি ভালবেসেছি—তোমাকে ভালবাসার পর। আগে আমার কাছে আসত স্বপ্নের মত, বেরিয়ে যেত

ভীরের মত। এখন আমার সঙ্গে কাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তোমার বিরহ থেকে বুকেছে, সে আড়ালে গেলে আমার কী হুশিষ্ঠা হয়। যে-বেদনা পেয়েছে, সেটা সে আমাকে দিতে চায় না। অথচ দুই ভালবাসার কত তফাত! আমার ভালবাসা বিশ্ব জ্যোৎস্নালোকের মত, তোমার ভালবাসা মরুভূমিতে মরণাপন্ন তৃষ্ণার্তকে সজীবনী অমৃতবারি দেওয়ার মত।

‘আমাকে কিছু বলে নি। আমিও জিজ্ঞেস করি নি। প্রেম গোপন রাখাতে যে গভীর আনন্দ আছে তার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে যার কেন? শুনেছি প্রথম গর্ভধারণ করে বহু মাতা সেটা ষত দিন পারে গোপন রাখে। নিভূতে আপন মনে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির কথা ধ্যান করতে করতে সে চলে যায় সেই স্বর্গলোকপানে, যেখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে নেমে আসবে এই শিশুটি।

আমিও নিভূতে অনেক চিন্তা করেছি, কে সে বীর যে শব্দনের চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছে। তার সঙ্গে যাদের বিয়ে হতে পারে তাদের সবাইকে তো আমি চিনি। এদের কেউই নয়, সে-কথা নিশ্চয়।

বুলুম, কোন জায়গায় কোন বিপত্তি বাধা আছে তাই সে তোমাকে পুরোপুরি পাচ্ছে না। আমার বেদনার অস্ত রইল না। ওই একবার আমার নিজের প্রতি থিকার জন্মাল, কেন আমি জ্যোতিহীন হলাম। না হলে আমি তোমাদের বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দিতুম না, যার সামনে দুজন দুদিক থেকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে?’

সে বেদনা আজ কেটে গিয়েছে বলে স্বরণে জানেমনের মুখ পরিতৃপ্তির স্মিত-হাস্তে কানায় কানায় ভরে উঠল।

আমি বললুম, ‘আমি বিদেশী। আপনারা আমাকে হিমি—শব্দনের উপযুক্ত মনে করেন কি না সেই ভয়ে আমিও অসহায়ের মত মার খেয়েছি। আমি বুঝি।’

‘তোমার গলাটি আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। এখন তো ওই দিয়েই আমি মাহুবকে চিনি। আরও কাছে এস বাচ্চা। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও। শব্দন যে রকম দেয়। এ কি, তোমার হাত অত নরম কেন? প্রায় শব্দনের মত!’

আমি হেসে বললুম, ‘বাংলাদেশের লোক আপনাদের মত শক্তিশালী হয় না।’

‘বাংলাদেশ? তাই বল। তাই শব্দনের এত প্রেম, হাফিজ বাংলাদেশে

গেলেন না কেন, হাফিজের অর্থকষ্ট বাঙলার রাজা তো দূর করে দিতে পারতেন, আরও কত কি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, একদিন সে যখন এক অজানা কবির কবিতা পড়ে আমার শোনাতো গেল। ভারী মধুর আর কল্পণ। ঠিক ফার্সী নয়, আবার ইউরোপীয় কবির ফার্সী অম্ববাদ নয়। কেমন যেন চেনা চেনা অথচ অচেনা। আবার কেমন যেন এটা-ওটায় মেশানো। যেন গন্ধ গোলাপের, চেহারা কিন্তু নরগিসের, এ আবার বসন্তে না ফুটে ফুটেছে যেন শীতকালে। একটি কবিতা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে—“খুদ-কুশী-ই-সিতারা”। বৃদ্ধ থামলেন। যেন মনে মনে কবিতাটির চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে নিলেন।

বুঝলুম, এটা ‘তারকার আত্মহত্যা’।

আমি বললুম, ‘এ কবির পিতা সূফী সাধক ছিলেন এবং অতি উত্তম ফার্সী জ্ঞানতেন। কবি বাল্যবয়সে পিতার কোলে বসে বিস্তর ফার্সী গজল-কসীদা শুনেছেন। আসছে গ্রীষ্মে এখানে তাঁর আসবার কথা ছিল; বোধহয় আপনাদের কবি হাফিজ বাংলাদেশে যেতে পারেন নি বলে বাংলার কবি তার প্রতিশোধ নিতে আসছিলেন। এখন তো সব-কিছু উলোট-পালোট হয়ে গেল।’

জানেনম্ন বললেন, ‘হাফিজের পাঁচ শ বছর পরে যোগাযোগ এসেছিল তোমাদের কবির মাধ্যমে। আরও ক’শ বছর লাগবে কেন এই যোগাযোগ হতে কে জানে? কে যেন এক বিদেশী জ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, মানুষ একে অন্ধকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে বেশী—দুজনের মাঝখানে সেতু বাঁধার চেষ্টা করে তার চেয়ে ঢের ঢের কম;—

হায় রে মানুষ

বাতুলতা তব

পাতাল চুমি;—

প্রাচীর যত না

গড়েছ, সেতু তো

গড়ো নি তুমি।

‘তাই প্রার্থনা করি শব্দনমে তোমাতে আজ যে সেতু গড়লে সেটি অক্ষয় হোক।’

আমি বললুম, ‘আমেন—তাই হোক।’

এমন সময় থবর এল, ভোজে বরকে ডাকা হচ্ছে।

উঠবার সময় জানেনম্ন আমাকে বুক জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘আমার যদি

একটা কথা বিশ্বাস কর, তবে বলি, শব্দনের মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে তোমার কক্থনো কোনও ক্ষতি হবে না। মিথ্যা কথনও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শিশিরবিন্দুর মত সত্যই সে পবিত্র, স্বর্গ হতে সে এসেছে সম্পূর্ণ কলুষ-কালিমা মুক্ত হয়ে। আমি বুঝছি, তুমিও বড় সরল প্রকৃতি ধর। তোমাদের মিলনে স্বর্গের আশীর্বাদ থাকবে।’

আমাকে উপহার দিলেন এক বিরাট বদখশানী রুবি। তার উপরে খোদাই সম্পূর্ণ কাবা শরীফের ছবি। এত বড় রুবি আর এ রকম সূক্ষ্ম খোদাই আমি কাবুল জাহুঘরেও দেখি নি অথচ আমি জানতুম, বদখশান আফগানিস্থানের প্রদেশ বলে কাবুলের জাহুঘরে রুবির যে সংখ্য আছে সেটি পৃথিবীতে অতুলনীয়।

বললেন, ‘মনে যদি কখনও অশান্তি আসে তবে এটি আতশী কাচ দিয়ে দেখো। শুনেছি, জমজমের কুয়ো পর্যন্ত দেখা যায়। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে নাকি জল ওঠাবার সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত পরিকার ফুটে ওঠে। এটি আমাদের পরিবারে ছ’শ বছর ধরে আছে। প্রার্থনা করি, কাবা যতদিন থাকবে, তোমাদের ভালবাসা ততদিন অক্ষয় থাকবে।’

‘আমেন।’

তারপর আবার সব কাপসা। আবছায়া-আবছায়া মনে পড়ছে, ভোজে পাশে বসেছিল আমার ছাত্রটি। সে আমাকে এটা ওটা খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল আর তার উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত আনন্দ সে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। আমি নিজের অপ্রতিভ ভাব ঢাকার জগত তাকে সংস্কৃতের ‘ইহীং দত্যাং, হুঁহুং দত্যাং’ এবং ‘পরামং প্রাপ্য হুবুদে—’ ফার্সীতে অনুবাদ করে মুহু কণ্ঠে শুনিয়েছিলুম।

রাত প্রায় বারোটোর সময় এক অপরিচিত নওজওয়ান আমাকে হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তেতলার মুখে এক দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, ‘বড়ই আফসোস, কি করে হৃদয়-দুয়ার ভেঙে নববরের—নওশাহের—নবীন বাদশার সিংহাসন লাভ করে অভিজিত হতে হয় তার খবর আমি জানি নে। আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নি। আপনাকে তাই কোন সহপদে দিতে পারলুম না। তবে এটুকু জানি, শব্দনম বাহুর প্রসন্ন, অতিশয় সুপ্রসন্ন সম্মতি নিয়েই এই স্তম্ভ মুহূর্ত এসেছে। আজ পর্বত কাবুল-কান্দাহার, জালালাবাদ-পঞ্জাবী কোন তরঙ্গই সাহস করে শব্দনম বাহুর পাণি কামনা করতে পারে নি।

আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনি তরুণ সমাজের স্থানিত অভিনন্দনসহ তাদের গর্বের ধনের সঙ্গে চারিচক্ষু মিলনে যাচ্ছেন। হুদিন এলে আমরা আপনাদের নিয়ে যে নয়া পরব করব তখন দেখতে পাবেন আপনি কারও দিলে এতখানি চোট না দিয়ে শব্দনম বাহুর দিল জয় করেছেন। এ রকম সচরাচর হয় না। শব্দনম বাহুর অসাধারণ বলেই এই অসম্ভবটা সম্ভব হল। আবার অভিনন্দন জানাই।’

দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে ছবি আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

যবে থেকে আমাদের এ-বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন থেকে এ ছবিটি কি রকম হতে পারে তার নানা স্বপ্ন আমি সমস্ত দিন ধরে দেখেছি। বরষাজায় আসার সময়, বিয়েবাড়ির চাপা কলরব মুহু গুঞ্জন, শাদি-মজলিসের গম্ভীর নৈস্তক্যে, এমন কি চাচা-জান যখন তাঁর স্নেহপ্লাবন দিয়ে আমার হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তখনও—তখনও আমি একটার পর একটা ছবি মনে মনে এঁকেছি আর মুছেছি, মুছেছি আর এঁকেছি। কখনও দেখেছি সখীজন পরিবৃত্তা শব্দনম বাসরঘরের কলগুঞ্জন মুখরিত উজ্জ্বললোকে নববধূর অতিভূষণে জর্জরিতা, আভূমি বিনতা। আর কখনও দেখেছি স্মৃচীভেদে অঙ্ককার ঘরের একপ্রান্তে আমি জাত-মুখের মত দাঁড়িয়ে ভাবছি—কিংবা বলব, ভাবতেই পারছি নে, কি করা উচিত। হয়তো অনেক কষ্টে এদিক ওদিক হাতড়ে হাতড়ে আসবাবপত্রের ধারাল খোঁচা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কোনও গতিকে শব্দনমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়, এমন সময় হঠাৎ ঘরের চারিদিকে জলে উঠল পঞ্চাশটা জোরাল টর্চ। সঙ্গে সঙ্গে অট্টরোল অট্টহাস্য। শব্দনমের সখীরা চতুর্দিকের দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিলেন এই শুভ মুহূর্তের জন্য। আলো জালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাইয়া গান ধরলে,

‘কুটি খায় নি, দাল খায় নি, খায় নি কতু দই,

হাড়-হাভাতে ওই এল রে—থাবে তোরে সই!

মরি, হায় হায় রে!’

কারুলের বজ্র-বিগলন শীতে আমার মন যেমে ঢোল—না, না, ঢোল নয়, জগদ্ধাম্প।

সব ছবি ভুল, কুলে তসবির তালগোল পাকিয়ে প্রথমটায় পিকাস্‌সোতে পরিবর্তিত হয়ে অন্তর্ধান করল।

বিরাট ঘর। কাবুলের গৃহস্থ বাড়ির চারখানা বৈঠকখানা নিয়ে এই একটা ঘর।

তার হৃদয়তম কোণে একটি গোল টেবিল। টেবিলপ্লথ ভারী মথমলের—জমে-বাওয়া রক্তের কালচে লাল রঙের। তার উপরে সেই প্রাচীন যুগের মোবওলা এক বিরাট রীডিং-ল্যাম্প। সমস্ত ঘর প্রায়াক্ষকার রেখে তার গোল আলো পড়েছে শব্নমের মাথার উপর, হাঁটুর উপর, পাদপীঠে রাখা তার ছোট্ট ছুটি পায়ের উপর। ঠাণ্ডা মোলায়েম আলো—আর সেই আলোতে শব্নম বাঁ হাতে তুলে ধরে একখানা চটি বই পড়ছে।

শাস্ত, নিস্তরঙ্গ, নির্দ্বন্দ্ব, গ্রন্থিমুক্ত বিশ্রাস্তি।

ত্রিভুবনে আর যেন কোনও জনপ্রাণী কীটপতঙ্গ নেই শুধু একা শব্নম। সে প্রশান্ত চিন্তে অপেক্ষা করছে তার দয়িতের জগৎ। সে আসছে দূর-দূরান্ত থেকে—যেখানে তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র গোখুলি লগনের তারাকে পাণ্ডু চুষন দিয়ে বাঁশবনের সবুজ নীড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আশ্চর্য! সে আমি। কে বিশ্বাস করবে সে আমি!

পা টিপে টিপে কিছুটা এগুতে না এগুতেই শব্নম মাথা তুলে আমার দিকে তাকালে। যত নিঃশব্দেই আমি এগুই না কেন, তার কান স্তনতে পাক আর না-ই পাক, তার সদাজাগ্রত কোটিকর্ষ হৃদয় তো স্তনতে পাবেই পাবে।

আমি দ্রুততর গতিতে এগুলুম। আমার হিয়ার বেগের সঙ্গে আমি পেরে উঠি কি করে?

শব্নম সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিংহাসনই বটে। সেই কালচে লালের মথমলে মোড়া, সোনালী কাঁধ হাতলওলা, তার মাঝে মাঝে রয়েল ব্লব মীনা দিয়ে আঙুরগুচ্ছ আঙুরপাতার নকশা কাটা হুউচ সিংহাসন। বসবার সীট মাটি থেকে আট দশ ইঞ্চি উচু হয় কি না হয়, কিন্তু পিছনের হেলানো মাহুঘের মাথা ছাড়িয়ে আরও দু-মাথা উচু।

এই প্রথম শব্নম আমার সঙ্গে লৌকিকতা করে উঠে দাঁড়ালে।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মুখ ঠোট গাল চিবুক নাসারন্ধ্র কানায় কানায় ভরে তুলে আমার দিকে তৃপ্তি দাক্ষিণ্য আর নর্মসজ্জাবণের মুহু হাসি হাসলে।

গালের টোল কোন্ অতল গভীরে লীন হয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্ধকার। আলো ঢুকতে পারে নি বলে? না, সেখানে কেউ এক ফোঁটা কাজল ঢেলে দিয়েছে বলে?

আজ শব্নম সেজেছে।

নববধূকে জবড়জব্ব করে সাজানোতে একটা গভীর তব্ব রয়েছে। রূপহীনায় দৈন্ত তখন এমনই চাপা পড়ে যায় যে সহৃদয় লোক ভাবে, 'আহা, একে যদি সরল সহজভাবে সাজানো হত তবে মিষ্টি দেখাতো ; আর স্বরূপার বেলাও ভাবে ওই একই কথা—না সাজালে তাকে আরও অনেক বেশী হৃদয় দেখাতো !'

শব্দনমকে সেভাবে সাজানো হয় নি, কিংবা সেভাবে -সে নিজেকে সাজাতে দেয় নি।

এ যেন পূর্ণচন্দ্রের দূরে দূরে কয়েকটি তারা ফোটানো হয়েছে—চন্দ্রের গরিমা বাড়ানোর জন্য। এ যেন উৎসব-গৃহের সৌন্দর্যের মাকথানে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছে। শব্দনমের ভাষায় বলি, বাতাসে বাতাসে পাতা গোলাপ-সৌগন্ধ্যের মাকথানে বুলবুলের বীথি-বৈতালিক।

তার চুলের বিচ্ছুরিত আলোর মাকথানে থাকে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ রূপালী শামা-প্রজাপতি। মাথায় অভ্র-আবীর ছড়ানো হয়েছে অশেষ সময়ে, এক একটি কণা করে—তিনি সখী বাসর গোধূলিতে আরম্ভ করে এইমাত্র বোধহয় কুন্তল প্রসাধন সমাপন করেছেন।

চোখের কোল, আঁখিপল্লব, ধস-ভুরু এত উজ্জ্বল নীল কেন ? এ তো কাজল কিংবা সূর্য্যার রঙ নয়। এ যে এক নবীন জলুস। তবে কি নীলকান্তমণি চূর্ণ করে কাজলের কাজ করা হয়েছে ! তারই শেষ কয়টি কণা টোলের অতলে ছেড়ে দিয়েছে !

এঁকে বঁকে নেমে-আসা দুই জুলফের ডগায় আবার সেই নীলমণি-চূর্ণ। একদিকে তুবার অভ্র কর্ণশঙ্খ, অগ্নদিকে রক্তকপোল।

সে কপোল এতই লাল যে আজ যেন কোনও প্রসাধন-প্রক্রিয়া দ্বারা সেটাকে ফিকে করা হয়েছে। বদখশানের রবি-চূর্ণ দিয়ে ? তা হলে ঠোঁট দুটিকে টসটসে রসাল ফেটে-যায়-যায় আঙুরের মত নধর মধুর করে লালের এ-আভা আনা হল কিসের চূর্ণ দিয়ে ? এ রঙ তো আমি আমার দেশের বিশ্ববিটপীর উচ্চতম শাখাতে পল্লববিতানের অন্তরালে দেখেছি—সেখানে মানুষের কলুষদৃষ্টি, দুটো বালকের স্থূল হস্ত পৌঁছয় না।

ওষ্ঠ পূর্বভাগে, স্মুরিত নাসারন্ধ্রের নিচে সামান্য, অতি সামান্য একটি নীলাঞ্জন রেখা। ভরা ভাদ্রের গোধূলি বেলা আকাশের বায়ু কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ জমে ওঠা জ্বামাষুদে আমি দেখেছি এই রঙ। গভীর রহস্তে ভরা এই রঙ। তারই উপরে স্মুরিত হচ্ছে শব্দনমের দুটি ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র। নিচে অতি ক্ষীণ কস্ত্রমান স্মুরণ লেগেছে তার ওষ্ঠাধরে।

এই প্রথম দেখলুম তার চোখ দুটি। এ দুটি থেকে আগুনের ফুলকি বেরুতে দেখেছি, এ আঁখি দুটিতে আঁচশিতে জল ভরে ফেটে পড়তে দেখেছি, কিন্তু এ চোখ দুটিকে আমি কখনও দেখি নি। আজ এই প্রাচীন দিনের ল্যাম্প আমাদের মিলনের শুভলগ্নে ঠিক সেই আলোটি ফেললে যার দাক্ষিণ্যে আমি শব্দনের চোখ দুটি দেখতে পেলুম।

সবুজ না নীল? নীল না সবুজ? অতৃপ্ত নয়নে আমি সে দুটি আঁখির গভীরতম অতলে অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম তবু বুঝতে পারলুম না সবুজ না নীল। হাঁ, হাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হাঁ, দেখেছি বটে এই রঙ আসামের হাফল্ডের কাছে। বড় বড় পাথরের মাঝখানে গিরিপ্ৰসবণ কুণ্ডের স্থির নীলজলের অতলে সবুজ শ্রাওলা। সেদিন ঠিক করতে পারি নি, কি রঙ দেখলুম, নীল না সবুজ—আজ বুঝলুম দুয়ের সংমিশ্রণে এমন এক কল্পলোকের রঙ প্রভাসিত হয় যে, সে রঙ ইহভূমের আর্টিস্টের পেলেটে তো নেই-ই, সৃষ্টিকর্তা যে আকাশে রঙ-বেবঙের তুলি বোলান তাতেও নেই।

শব্দনের স্মিত হাস্ত ফুরোতে চায় না। কী মধুর হাসি!

কাবুলের মেয়েরা কি বিয়ের রাতে গয়না পরে না! শব্দনম পরেছে সামান্য দু-তিনটি। তার সেই বিরাট খোঁপা জড়িয়ে একটি মোতির জাল। ঘনকুম্ব কুন্তলদামের উপর স্তরে স্তরে, পাকে পাকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমালীকণা বিলিমিলি মেলা লাগিয়েছে।

দু-কানে দুটি মস্তকালতা ঝুলছে আর তার শেষপ্রান্তে একটি করে রক্তমণি ঝুবি। শুভ্র মরাল কণ্ঠের বরফের উপর যেন দু'ফোঁটা সত্যকরা তাজা রক্ত পড়েছে। এই, এখুনি বুঝি রক্তের ফোঁটা দুটি ছড়াতে চুবসাতে আরম্ভ করবে।

কাবুলী কুর্ভা গলা-বন্ধ হয়—বিশেষ করে মেয়েদের। আজ দেখি, গলা অনেকখানি নিচে ঘুরিয়ে কাটা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটি মোতির মালা। তার শেষপ্রান্তে কি, দেখতে পেলুম না। সেটি জামার ভিতরে। সে কী সৌভাগ্যবান! এই এতদিনে বুঝতে পারলুম কালিদাস কোন্‌ দুঃখে বলেছিলেন, 'হে সৌভাগ্যবান মুক্তা, তুমি একবার মাত্র লৌহশলাকায় বিদ্ধ হয়ে তার পর থেকেই প্রিয়ার বন্ধ-দেশে বিরাজ করছ; আমি মন্দভাগ্য শতবার বিরহশলাকায় সছিদ্র হয়েও সেখানে স্থান পাই নে।'

শব্দনের পরনে সাটিনের শিলগয়র, কুর্ভার রঙ ফিকে লাইলেক, ওড়না কচি কলাপাতা রঙের, এবং দুধে-আলতা সংমিশ্রণের মত সেই কচি কলাপাতা রঙের নক্কে দুধ মেশানো। ইতস্তত রূপালী জরির চুমকি। কলাবনে জোনাকির

দেয়ালি।

শব্দমের স্মিত হস্ত অস্তহীন। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হাসতে হাসতে আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তার ক্ষুরিতাধরোষ্ঠ চেপে ধরে যেন অতৃপ্ত আবেগে আমার পাণ্ডুর অধরের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিতে লাগল।

আমি মোহমান, কম্পবন্ধ, বেপথুমান। আমার দৈহিক স্পর্শকাতরতা অস্তমিত। আমার সর্বসত্তা শব্দমে বিলীন।

কোন্ দিগন্তে সে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ তারা নির্ঝরির চায়াপথে সে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, কোন্ সপ্তর্ষির তারাজাল ছিন্ন করে কোন্ কোন্ লোকে নিয়ে গিয়েছিল জানি নে। অট্টেতত্ত্ব অবস্থায় দেখি, আমি শব্দমের সিংহাসনে বসে আছি, সে আমার কোলে আড়াআড়ি হয়ে বসে, তার বুক আমার বুকের উপর রেখে, ডান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে, বাঁ হাত দিয়ে আমার গাল বুলোতে বুলোতে, তার মুখ আমার কানের উপর চেপে ধরে শুধোচ্ছে, ‘খুশী ? খুশী ? খুশী ? খু...???’

আমি আলিঙ্গন ঘনতর করে বলেছিলুম, ‘আমি তোমার গোলাম। আমাকে তোমার সেবার কাজ দাও।’

শুধিয়ে চলেছে, ‘খুশী ? খুশী ? খুশী—’

আমি বললুম, ‘আল্লা সাক্ষী, আমি প্রথম যেদিন তোমাকে ভালবেসেছি সে দিন থেকে শত বিরহ-বেদনার পিছনেও খুশী। তুমি জান না, তুমি আছ, এতেই আমি খুশী। প্রথম দিনের প্রথম খুশীর প্রথম নবীনতা বারে বারে ফিরে আসছে।’

শব্দম গুনগুন করে ফরাসীতে গাইলে,

‘করেছি আবিষ্কার

তোমারে ভালবাসিবার

প্রথম যেমন বেসেছিছ ভালো, সেই বাসি প্রতিবার।’

‘নয় কি ?’

আমার উত্তরের জন্ত অপেক্ষা না করেই বললে, ‘দাঁড়াও ! আলো জ্বালি।’

আমার কথায় কান না দিয়ে ঘরের প্রায়াক্ষকার কোণ থেকে নিয়ে এল আকশি। তার ডগার চ্যাকডায় কি মাখানো জানি নে। শব্দম আনাড়ী হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটার কাছে নিতেই দপ্ করে জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত আকশি দিয়ে সে ঝাড়বাতির অগুনতি মোমবাতি জ্বালালে। ঘরের দেয়ালে দারী ফরাসী সিঁড়ির ওয়াল-পেনায়ে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ

ধাধিয়ে দিলে।

আমার পায়ের কাছে পাদপীঠে বসে বললে, ‘তুমি নূতন রাজা এসেছ, তোমাকে বরণ করার জন্ত সব কটা আলো জ্বালতে হয়। যে বেশ পরেছ, তার জন্ত এ আলোর প্রয়োজন। কী হুন্দরই না তোমাকে—’

‘থাক।’

‘চূপ!—দেখাচ্ছে। আমার ওস্তাদের মেয়ের রুচি আছে।’

আমি বললুম, ‘তোমাদের কবি হাফিজই তো বলেছেন।—

“বলে দাও বাতি না জ্বালায় আজি, আমোদের নাহি সীমা,

আজ প্রেমসীর মুখ চন্দের আনন্দ-পূর্ণিমা” ’

(সত্যেন দত্ত)’

শব্দ বললে, ‘ওঃ, হাফিজ! তিনি তো বলেছেন “আজ বাতি জ্বালিয়ে না—” অর্থাৎ তার পরব মাত্র দিনের তরে। আমাদের পরব হবে প্রতি রাত্রি। তাই আজ রাজ্যের আনুষ্ঠানিক আলো মাত্র একবারের তরে জ্বালিয়ে দিলুম। ভয় করো না, তাও নিভিয়ে দিচ্ছি এখুনি।’

আমি খুশী হয়ে বললুম, ‘টেবিল ল্যাম্পের ওই ঠাণ্ডা আলোতে তোমাকে কী অপূর্ব হুন্দর দেখাচ্ছিল কি বলব? মাথার চুল থেকে খালি পায়ের নখের ডগাটি পর্যন্ত কী এক অদ্ভুত রহস্যময় অথচ কী এক অনাবিল শাস্তিতে ভরপুর হয়ে বিভাসিত হচ্ছিল, কি করে বোঝাই? আচ্ছা, মোজা-ছাড়া পায়ের তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না—বাইরে যা শীত!’

অবাক হয়ে বললে, ‘বা রে! তুমি যে বলেছ আমার খালি পা দেখতে তোমার ভালো লাগে।’

আমি আপসোস করে বললুম, ‘তোমার কতটুকু দেখতে পাই?’

চোখ পাকিয়ে বললে, ‘চোপ! ছুঁইমি করো না। চোখ ঝলসে যাবে। সেমেরে যখন জুপিটারের দেবরূপ দেখতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর কি হয়েছিল জান না?’

আমি শুধালুম, ‘কি হয়েছিল?’

‘আলোতে পোকা পড়লে যেমন ফট করে ঝেঁটে যায়—তাই হয়েছিল। প্রত্যেক মাহুবই জুপিটার। তার দেবরূপ উন্মোচন করা বিপজ্জনক। জান, তাকাত গিয়ে আমারই মাঝে মাঝে ভয় হয়।’

স্বপ্ন করে উড়ে গিয়ে কোথা থেকে সিগারেট এনে ঠোঁটে চেপে, আনাড়ী স্বপ্নে দেশলাই ধরিয়ে কাশতে কাশতে আমার দ্বিগে বললে, ‘ভালো না লাগলে

ফেলে দিয়ে।’

এ দুদিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার মিশরী সিগারেট পেল কোথায় ?

বললে, ‘জানেনম্ন তিন মাস অন্তর অন্তর তিন তিন হাজার করে মিশর থেকে আনায়। আমাকে ধরাবার চেষ্টা করেছিল—পারে নি। কিন্তু কেউ খেলে সিগারেটের গন্ধ আমার ভালোই লাগে। ছাকরা করে ওয়াক্, থুঃ বলতে পারি নে।’

আমি বললুম, ‘সর্বনাশ ! এই সুপার স্পেশাল সিগারেট যিনি খান তাঁর জগতে তুমি এনেছিলে আমার সেই ওঁচা সিগারেট !’

বললে, ‘আমার বন্ধুর সিগারেট। জানেনম্ন দুটো ধরিয়ে একটা আমাকে দিয়ে বললে, “এ সিগারেট খেতে তো তোর আপত্তি হবে না”।’

আমি শঙ্কিত হয়ে শুধালুম, ‘তুমি কি বলেছিলে ?’

‘নির্ভয়ে বলেছিলুম, “লব-সুখ-তে !”—পোড়ার চোঁটো, পোড়ার মুখো, যা খুশী বলতে পার। ওই পোড়ার সিগারেট খেয়ে খেয়ে জানেনম্ন তার চোঁট মভ্ করে ফেলেছে, দেখ নি ?’

আমি শুধালুম, ‘তন্নয় হয়ে কি পড়ছিলে ? “গুড্ বাই টু ব্রীড্” ?’

বললে, ‘সে কি ? বরঞ্চ তোমার লীলা খেলা বন্ধ হল। কিন্তু আগে বলি, তোমার নিশ্চয়ই হাসি পাচ্ছে, একই কনেকে দু-দুবার বিয়ে করছ বলে ? আমারও পাচ্ছিল।—হঠাৎ মনে পড়ল, তোমাকে বলেছিলুম, তুমি দ্বিচারী—তুমি বাস্তবে আমাকে আদর কর, আর স্বপ্নে আরেক জনকে। আল্লাতাল্লা তাই একই শব্দনের সঙ্গে তোমার দু-দুবার বিয়ে দিয়ে তোমাকে দ্বিচারী বদনাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বপ্নের শব্দনম আর বাস্তবের হিমিকা এক হয়ে গেল। না ?’

আমি বললুম, ‘অতি নৃশঙ্ক যুক্তিভাল। কিংবা বলব হৃদয়ের শ্রায়-শাস্ত্র—নব্য “নব্য-শ্রায়”। তোমাকে তো বলেছি, হৃদয়ের যুক্তি তর্কশাস্ত্রের বিধিবিধানের অনুশাসন মানে না। আকাশের জল আর চোখের জল একই যুক্তিকারণে ঝরে না।’

আশ্চর্য হয়ে বললে, ‘এ কথাটা তুমি আমাকে কক্থনো বল নি। এ ভারী নূতন কথা।’

আমি বললুম, ‘হবেও বা, কারণ কোন্টা আমি তোমাকে বলি আর কোন্টা নিজেকে বলি এ দুটোতে আমার আকছারই ঘুলিয়ে যায়।’

আমার হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে শব্দনম অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে

তাকিয়ে রইল।

আমি আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম, শব্দনম কি গিরগিটি? সে যেমন দেহের রঙ বদলায় সেই রকম শব্দনম চোখের রঙ ঘড়ি ঘড়ি বদলাতে পারে। আলোর ফেরকারে তো এত বেশী অদলবদল হওয়ার কথা নয়। এখন তো দেখছি শ্রাণ্ডার ঘন সবুজ, অথচ এই অল্প কিছুক্ষণ হল দেখেছি একেবারে স্বচ্ছ নীল। তবে কি ওর হৃদয়াবেগ, চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের রঙও বদলায়! স্থির করলুম লক্ষ্য করে দেখতে হবে।

আমি মাথা নিচু করে, দুহাত দিয়ে তার মাথা তুলে, তার ঠোঁটের উপর ঠোট রাখলুম। আমার চোখ দুটি তার চোখের অতি কাছে এসে নিবিড় দৃষ্টিতে তার চোখের অভলে পৌঁছে গিয়েছে। শব্দনম অজানা আবেশে চোখ দুটি বন্ধ করলে।

কতক্ষণ চলে গেল কে জানে? বুকের ঘড়ি যেন প্রতি মুহূর্তে প্রহরের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হিমিকাকে এই আমার প্রথম চুম্বন।

অনেকক্ষণ পরে, বোধহয় একশ বছর পরে, শব্দনম তার ঠোট ষত্থানি সামান্যতম সরালে কথা বলা যায় সেটুকু সরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ‘চুমো খাওয়া তোমাকেই সাজে। সেই নদীপাড়ে প্রথম হার মানার পর আমি মনস্থির করেছিলুম, সব জিনিস আমি দেব, আর তুমি নেবে। চুমো খাব আমি, আলিঙ্গন করব আমি, আর তোমাকে যে তোমার ছেলেমেয়ে দেব আমি,’ সে তো জানা কথা। এখন দেখছি, তা হয় না। চুমো খাওয়া পুরুষেই সাজে।’

আমি বললুম, ‘কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি যখন আমাকে চুমো খাও তখন আমার কাছে সেটা অনন্তগুণ মধুময় বলে মনে হয়?’

‘বাঁচালে—’ বলে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চাপ দিলে নিবিড় আবেশে।

জানি নে, কতক্ষণ, বহুক্ষণ পরে দেখি, শব্দনম আমার কোলে মাথা রেখে যেন ঘুমুচ্ছে। বললে, ‘আমার থোঁপাটা খুলে দাও।’

তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে আবার উড়ে গিয়ে ফিরে এল ফিরোজা রঙের চীনা কাচের একটি ডিকেন্টার হাতে করে। কাচের ফিকে রঙের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কড়া লালের বেগুনী আভা।

বললে, ‘পার্দনে মোয়া মর্শেব—মাপ কর দোস্ত—একদম তুলে গিয়েছিলুম, তুমি আমার গালের টোল ভরে শীতাজী খেতে চেয়েছিলে।’

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে বললুম, ‘করেছ কি? এটা ঘোঁসাড়া করতে গিয়ে জানাঙ্গানি হয় নি?’

শব্দম হেসে ফেটে আটখানা। বললে, ‘তুমি কি ভেবেছ, তুমি মোজা-বাড়িতে বিয়ে করেছ? রাজা তিমুর থেকে আরম্ভ করে বাবুর হুমায়ুন—কে শরাব খেয়ে টং হয় নি বল তো? এ বাড়িতে আমার ঠাহুর্দা পর্যন্ত। তাঁর জমানো মাল এখনও নিচে যা আছে তা দিয়ে তিন পুরুষ চলবে।’

আমি বললুম, ‘আমার দরকার নেই। আমি হাফিজের চেলা। তিনি বলেছেন,

“শর্করা মিঠা, আমারে বল না, হিমি! আমি তাহা জানি”—’

সঙ্গে সঙ্গে শব্দম গেয়ে উঠল,

‘তবু সবচেয়ে, ভালবাসি ওই, মধুর অধরখানি!’

আমি বললুম, ‘তুমি যে এত আলো জালিয়েছ—তারও দরকার নেই—

“বলে দাঁও, বাতি না জ্বালায় আজি, আমোদের নাহি সীমা”—’

সেই আকাশির উল্টো দিক দিয়ে আলো নেবাতো নেবাতো গুনগুন করে বার বার শব্দম গাইলে,

‘আজ প্রেমসীর মুখচন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা।’

তারপর ঘরের কোণ থেকে সেতার এনে আমার কোলের উপর বসে তার খোলা চুল আমার বুকের উপর ছেয়ে দিয়ে সমস্ত গজলটি বার বার অনেকবার গাইলে। তন্নয় হয়ে শেষের দুটি ছত্র অনেকক্ষণ ধরে, কখনও গুনগুন করে, কখনও বেশ একটু গলা চড়িয়ে গাইলে,

‘প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকে না হাফিজ! ছেড় না অধর লাল

এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব-কাল।’

আমি একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, ‘তোমার এত গুণ! তোমাকে আমি কোথায় রাখি। সুন্দর ইউসুফ শুধু যে সে-যুগের সব চেয়ে সুপুরুষ ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত দূরদৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিল অল্প লোকই, এবং সব চেয়ে বড় ছিল তাঁর চরিত্রবল। তাই তাঁর মা’র কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিলে, সেই সুদূর মিশরের রাজ-সিংহাসনে।’

শব্দম বললে, ‘হ্যাঁ। আর তাই মাতৃভূমি কিনানের স্মরণে,

“মিশর দেশের সিংহাসনেতে বসিয়া ইহুফ রাজা

কহিত, হায়রে! এর চেয়ে ভাল কিনানে ভিখারী সাজা।”’

দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল দক্ষিণের দেয়ালের দিকে। খিল্লোটারের পরদার মত একখানা মধ্যমলের পরদা ছিল ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঝোলানো। একটানে সেটা সরাতোই সামনের খোলা পৃথিবী

তার অসীম সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে একেবারে বাক্যহারা করে দিল।

দুখানা চেয়ার পাশাপাশি রেখে আমায় শুধালে, ‘স্নীত করছে?’

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুস্তিনের একখানা কাবুকোট দুজনার জাহ্ন থেকে পা অবধি জড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

এ সৌন্দর্য শুধু স্নীতের দেশেই সম্ভবে।

সমুদ্রের জল আর বেলাভূমির বালির উপরে পূর্ণিমার আলো প্রতিফলিত হয়ে যে জ্যোৎস্না চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এখানে যেন তারই পৌনঃপুনিক দশমিক—এখানে শত শত যোজন-জোড়া নিরঙ্ক সর্বব্যাপী ধবলতম ধবল বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে এক পক্ষের পূর্ণচন্দ্র যেন শত পক্ষের জ্যোতি আহরণ করেছেন, হিম্যানী-যোগিনী উমারানীর এক বদন-ইন্দু চৌষটি যোগিনীর মুখেন্দীবর দীপাধিতায় রূপান্তরিত হচ্ছেন।

দূরে পাগমান পর্বতের সাহুদেশ, চূড়া—তারও দূর দিগন্তে হিন্দুকুশের অর্ধ-গগনচূষী শিখর, কাছে শিশির ঋতুর নিদ্রাবিজড়িত বিসপিল কাবুল নদী, আরও কাছের স্পৃগিময় নিস্প্রদৌপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্যামালা, পল্লবহীন নয় বৃক্ষ, হত-পত্র শাখা-প্রশাখা, উষ্মাহ মিনার-মিনারিকা, বিপরীতার্ধভিষ গম্বুজ, গোরস্তানের শায়িত সারি সারি কবরের নামলাঞ্জন-প্রস্তর-ফলক—সর্ব সৌন্দর্য সর্ব বিভীষিকা, সর্ব সর্বাধিকারীর অলঙ্কার, সর্ব সর্বহারার দৈন্ত, ভদ্রাভঙ্গ সকলের উপর নিবিচারে প্রসারিত হয়েছে তুষারের আন্তরণ। আকাশের মা-জননী যেন এক বিরাট শুভ্র কঙ্কল দিয়ে তাঁর একান্তপরিবারের ধনীদরিদ্র রাজা-প্রজা তাঁর সর্বসন্তান-সন্ততিকে আবরিত করে তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

কী নৈঃশব্দ্য, নৈঃসুন্দর্য! রাজপথের দ্বিতীয়ধামের মতাহুরাগী, সখা, ক্রূপ সঙ্কীতসুতনিত গণিকাবল্লভ সকলেই একই প্রিয়ার গভীর আলিঙ্গন-সোহাগে স্তম্ভ—সে প্রিয়া গৃহকোণের তপ্ত শয্যা। রাজপ্রাসাদের দুর্গপ্রাকারের প্রহর ডিওম নিস্তন্ধ। কল্যা উষার মধুর-কণ্ঠ মুআজ্জিন অত নিশার নিদ্রান্তরণে আকণ্ঠ বিলীন।

গভীর প্রহেলিকাময় এ দৃশ্য। কে বলে একা, একটিমাত্র রঙ দিয়ে ছবি আঁকা যায় না? কে বলে একা একমাত্র, সা স্বর দিয়ে গান গাওয়া যায় না? কে বলে একা, একটি ফুল ভূবন পুলকিত করতে পারে না? এই সর্বব্যাপী শুভ্রতা-সৌরভে যে সঙ্কীত মধুরিমা আছে সে তো মাহুকের সর্ব-চৈতন্তে প্রবেশ করে তাকেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মদেহ করে দেয়। স্বষ্টিকর্ত্ত তখন তার কাছে আর প্রহেলিকা থাকে না—সে তখন তারই

অংশাবতার। আমার স্বপ্ন তখন সে সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে হিন্দুকুশ পেরিয়ে আমুরিয়া তাশকন্দ ছাড়িয়ে বৈকালী হ্রদের কূলে কূলে সঞ্চার করেছে।

আমাদের মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র। এতকণে আমার চোখ থেকে টেবিল ল্যাম্পের শেষ জ্যোতিঃকণার রেশ কেটে গিয়েছে। দেখি, প্রথম চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে শব্দনের সিত ভালে, ক্ষুরিত নাসিকারঞ্জে, ঈষতর্দ্র ওষ্ঠাধরে, সমুন্নত কঙ্কলিকা শিখরাগ্রে। বেলাতটের নীলাভ কৃষ্ণাশ্রু মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্কৃত্য। গিরিকুমারীর মরালগ্রীবা, হিন্দুকুশ গিরির মতই ধবল-শুভ্র। এতদিনে বুঝতে পারলুম অক্ষতযোনি গৌরীকে কেন গিরিরাজতনয়া বলে কল্পনা করা হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মুহূ কণ্ঠে বললুম, ‘হে কমল কণকাব্। এই কমলমিসাকে আশীর্বাদ কর। হে ইন্দুবর—না, না,—হে ইন্দুমৌলি, তুমি একদা গিরিকুমারীর শুভ্রশুচিতার চরম মূল্য দিয়েছিলে। আজ এই কাবুলগিরিকন্ডাকে তুমি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দেখাও। আমাদের বাতায়নপ্রান্তে এসে তোমার ইন্দীবর নয়ন উন্মোচন করে দেখ, এই কুমারীর কটিতট তোমারই মত, হে নটরাজ, তোমারই ডমরুটির মত ক্ষীণচক্র—

“হেন ক্ষীণ কটি এ তিন ভুবনে নটরাজে শুধু রাজে

এ হিমা প্রতিমা আমারে বরিয়া নাহি যেন মরে লাজে।”

শব্দনয় আবার সেই প্রথম দর্শনের দীর্ঘ স্থিতহাস্ত দিয়ে ঘরের ভিতর চন্দ্রালোক এনে শুধালে, ‘আমার নৃ-ই-চন্দ্র—আখির আভা,—কি ভাবছ?’

আমি বললুম, ‘গিরিরাজ হিন্দুকুশকে বলেছিলুম, তোমার মঙ্গল কামনা করতে।’

‘সে কি বুৎ-পরন্তী—প্রতিমাপূজার শামিল নয়?’

‘আলবত নয়। আমি যখন আমার বন্ধুকে বলি, আমার মঙ্গল কামনা কর, তখন কি আমি তার পূজা করি? আমি যখন গিয়াস-উদ্-দীন চিরাগ-বিল্লির কবরে গিয়ে বলি, “হে খাজা, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর”, তখন কি আমি তাকে থুঁদা বানাই? অজ্ঞান যখন মনে করে ওই গোয়ের কোন অলৌকিক শক্তি আছে, অর্থাৎ গোরেই আল্লার অংশ বিবাজ করেছে তখনই হয় বুৎ-পরন্তী।’

আপন মনে একটু হেসে নিয়ে বললুম, ‘আর এই বুৎ-পরন্তী আরম্ভ হয় তোমাদের দেশেই প্রথম। আজ যে অঞ্চলের নাম জালালাবাদ তারই নাম সংক্ষেপে গাছার—’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও। মনে পড়েছে। এখনও জালালাবাদের বকরী-হাগলকে লৈ (৫২)—১৪

কাবুল-বাজারে বলে বুজ্-ই গান্ধারী। তার পর বল।’

‘আলেকজান্ডারের গ্রীক সৈন্তরা যখন সেখানে থাকার কলে বৌদ্ধ হয়ে গেল তখন তারাই সর্বপ্রথম গ্রীক দেব-দেবীর অঙ্কুরণে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে তাঁর পূজা করতে লাগল—ভারতবর্ষের আর সর্বত্র তখনও বুদ্ধের মূর্তি গড়া কড়া মানা, এমন কি বুদ্ধকে অলৌকিক শক্তির আধার রূপে ধারণা করে তাঁকে আল্লার আসনে বসানো বৌদ্ধদের কল্পনার বাইরে। সেই গ্রীক বৌদ্ধমূর্তি হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়বার পর, পরবর্তী যুগে সেই আর্টের নাম হল গান্ধার আর্ট।’

ভান্নি খুশি হয়ে বললে, ‘ওঃ! আমরা মহাজন।’

আমি আরও খুশি হয়ে বললুম, ‘বলে! এখনও কাবুলীরা আমাদের টাকা ধার দেয়।’

গম্ভীর হয়ে বললে, ‘সে কথা থাক।’ আরেকদিন এ কথা উঠলে পর শব্দনম বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ‘ভারত আফগান উভয় সরকারে মিলে এ বদামি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।’

‘আর তোমাদের মেয়ে গান্ধারী আমাদের ছেলে ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে করেছিল। তাদের হয়েছিল একশটা ছেলে আর একটি মেয়ে।’

‘ক’টি বললে?’

‘একশ এক।’

আমার হাঁটুতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললে, ‘হায়, হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি স্থির করেছিলুম, আমিই তোমাকে একশটা আঙা-বাচ্ছা দেব। এখন কি হবে?’

আমি আনমনে বাঁ হাত তার গ্রীবার উপর রেখে চুলে পাক মেরে ডান হাতে ডগাগুলো পাকের ভিতর ঢুকিয়ে চাপ দিতেই খাসা এলো-খোঁপা হয়ে গেল।

শব্দনম আপন জীবন মরণ সমস্তার কথা ভুলে গিয়ে, ফার কোটের ঢাকনা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুধালে, ‘তিনসত্টি করে বল, তুমি ক-জন মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে দিয়ে এ রকম হাত পাকিয়েছ?’

আমি অপাপবিদ্ধ স্বরে বললুম, ‘মায়ের হাত ছোড়া থাকলে আমাকে খোঁপাটা শক্ত করে দিতে বলতেন।’

আন্তে আন্তে ফের পাশে বসে বললে, ‘বাক্! তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আছে।’

অর্থাৎ বিশ্বাস করল কি না তার ইস্পার-উল্পার হল না।

আমি বললুম, ‘তুমি সেদিন আমার হাত টিপতে টিপতে বললে, আমার হাত

বড় নয়। আমি সরল ইমানদার মানুষ—কই আমি তো শুধাই নি, তুমি ক-জন পুরুষের হাত টিপে টিপে এ তস্কাট্টা আবিষ্কার করলে ?’

‘বিস্তর। আক্সা, জানেমন্—এ যাবৎ। টিপে দেব আরও বিস্তর। তোমার আক্সা—বল তো ভাই, তোমার জানেমন্ কজন ?’

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, ‘ছিঃ। শওহরের সঙ্গে প্রথম রাতে তর্ক করতে নেই। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে না, কি বই পড়ছি, যখন ঘরে ঢুকলে ? আমার এক সখী বইখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিলেন। ‘শব্-ই-জুফাক্’—‘বাসররাত্তি’। আল্লা-রহুলের দোহাই দিয়ে বিস্তর ভালো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ বইয়ের লেখক একটা উপদেশ দিয়েছে পঞ্চাশ বার—“শওহরের ভালো মন্দ বিচার করতে যেয়ো না। তিনি আল্লার দেওয়া উপহার।” ’

আমি পরম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, ‘এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন। আমি নিশ্চিন্ত হলাম—কারণ আমি—’

বাধা দিয়ে বললে, ‘তুমি একটু চুপ কর তো। আমি তোমাকে যে-কথা বলবার জন্ত জানলার কাছে নিয়ে এসেছিলুম সেইটের আখেরী সমাধান করতে চাই—এ নিয়ে যেন আর কোনদিন কোনও বাক্-বিতণ্ডা না হয়।’

আমি সত্যই ভয় পেয়ে বললুম, ‘আমি যে ভয় পাচ্ছি, হিমিকা।’

‘আবার ! শোন।

‘ওই যে পূর্ণচন্দ্র তাকে সাক্ষী রেখে বলছি—’

আমি জুর্লিয়েটের মত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, ‘না, না, ওকে না। বরঞ্চ তুমি ফজরের আজানের পূর্বক আর শব্দনম হিমিকার নাম করে—’

‘তা হলে তোমার প্রিয় গিরিরাজ হিন্দুকুশের উপর যে চির হিমিকা বিরাজ করছে, প্রচণ্ডতম নিদাঘেও যার ক্ষয়ক্ষতি হয় না—তাকে সামনে রেখে বলছি, তার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আত্মাবমাননা করো না, নিজেকে লঘু করে দেখো না। কুমারী কন্যা যে রকম প্রহরের পর প্রহর ধরে বছরের পর বছর আপন দয়িতের স্বপ্ন দেখে, মাতা যে রকম প্রথম গর্ভের কণিকাটিকে লোহাগ-কল্লনার প্রতিদিন রক্তমাংস দিয়ে গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি আমি তোমাকে তৈরি করেছি, সেই যে-দিন আমি প্রথম বুঝলুম, আমি অসম্পূর্ণ, আমি নিজিতা শাহজাদী, আমি অন্ধ প্রদীপ, আমার দয়িত রাজপুত্র দূরদ্রাব্য আমার প্রতীক্ষা-দিনান্তের ওপার থেকে এসে আমাকে সজীবিত করবে, অপ্রজ্ঞা লিখন করে করে আমি যে প্রেমের বল্লরী বাড়িয়ে তুলেছি, তারই করুণ করমর্শে পুষ্পে পুষ্পে

মগ্নরিত হবে সে একদিন—আকাশ-কুসুম চরন করে করে রচেছি তার অন্ত
আমার শব্দ-ই-কুফ্রাকের ফুলশয্যা, প্রার্থনা করেছি, সে রাজ্যে যেন পূর্ণচন্দ্র
গিরিশিখরের মুকুটরূপে আকাশে উদয় হয়। সূর্যের প্রেম পেয়ে সে হয় ভাষ্যর,
আমার অঙ্কবদনও তেমনি জ্যোতির্ময় হবে আমার ধাঁধুর ওষ্ঠাধরের সামান্ত্রতম
ছোয়াচ লেগে।

‘তাই যখন তোমাকে প্রথম দেখলুম তখন আপন চোথকে বিশ্বাস করতে
পারি নি।

‘আমি আমার হৃদয়ে ঝাপসা ঝাপসা যে স্কেচ এতদিন ধরে এঁকেছিলুম এ
যেন হঠাৎ ভাস্করের হাতে পরিপূর্ণ নির্মিত মূর্তি হয়ে আমার সামনে এসে
দাঁড়াল। চিন্ময় মুহূর্তে সৌরভ যেন মৃন্ময় নিকুঞ্জবনের কুসুমদানে রূপান্তরিত হল।

‘টেনিস কোর্টে তাই তত সহজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছিলুম কিন্তু
সমস্তক্ষণই ভাবছিলুম অস্ত্র কথা—

‘মৃন্ময় চিন্ময় হয় সে আমি জানি। কি যেন এক ফলের কয়েক ফোঁটা রসকে
শুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে করা হল ধূঁয়ো। তারই আড়াই পাক মগজের
সেল্কে আলতো আলতো ছুঁতে না ছুঁতেই পথের অন্ধ ভিখারী দেখে, সে রাজ-
বেশ পরে শুয়ে আছে বেহেশতের হরীর কোলে মাথা দিয়ে। প্রণয়পীড়ায় ব্যথিত
আতুর ক্রন্দন-প্রেরণী হরীরানী তারই দিকে তাকিয়ে আছে, করুণ নয়নে পথের
ভিখারীর মত, যেন অভাগিনীর প্রেম-নিবেদন পদদলিত না হয়!

‘অতদূর ষাই কেন, আর এ তো নেশার কথা।

‘একটি অতি তুচ্ছ কালো তিল। শীরজবাসিনী তুর্কী রমণী সাকীর গালে
সেইটি দেখে হাফিজ তন্মুহুর্তেই তার বদলে সমরুকন্দ আর বুখারা দিয়ে ফকীর
হয়ে গোরস্তানে গিয়ে বসে রইলেন।

‘কিন্তু চিন্ময় মৃন্ময় হয় কি করে?

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি। পরে বুঝেছি, আরোও ভাল করে, মর্যাস্তিক-
রূপে—কান্দাহারে। আমার হৃদয়-বেদনা তো সম্পূর্ণ চিন্ময়। তারই পেয়লা
যখন ভরে যায় তখন সে উপচে পড়ে আঁধি-বারি রূপে। তুমি স্বন্দর বলেছ,
“আকাশের জল আর চোখের জল একই কারণে ঝরে না”—আমি তাতে যোগ
দিলুম—তাদের উপাদানও সম্পূর্ণ আলাদা, একটা মৃন্ময় আরেকটা চিন্ময়, একটা
বাধ্য—সারা আকাশ মুখর করে তোলে, আরেকটা নৈস্তক্যে বিরাজ করে সর্ব
মনময়।’

আমি স্থির করেছিলুম, কিছু বলব না! শব্দনের আত্মপ্রকাশের আনন্দকে

আমার স্পর্শকাতরাকে অভিভূত করে দিলে। আন্তে আন্তে বললুম, ‘আমাদের এক কবি বলেছেন, তুমি আমার প্রিয়, কারণ “আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির”।’

বললে, ‘স্বপ্ন বলছেন। কিন্তু আজ আমি কবিতার ওপারে।

‘বিশ্বাস করবে না, ডান্স হলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তোমাকে ভাল করে না দেখে হোটেলের বেয়ারা ভেবে যখন হুকুম দিয়েছিলুম, গাড়ি আনতে, তখনও ভেবেছিলুম এ কি রকম বেয়ারা—এর তো বেয়ারার বেয়ারিও নয়—ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আজ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছি, যত বর্ণনা পড়েছি, যত ছবি দেখেছি এর বেয়ারিও তো তাদের একটার সঙ্গেও মিলছে না। তারপর কে যেন আমার বৃকের ভিতরে ছবির খাতা মোচড় মেরে মেরে পাতার পর পাতা খুলে যেতে লাগল—তাতে ব্যাখা—কিন্তু কী আনন্দ—এক এক বার তোমার দিকে তাকিয়ে দেখি আর ছবির দিকে তাকাই—কী অদ্ভুত—হবছ মিলে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে, তোমার বাহুতে যখন আমার বাহু ঠেকল, খেলার জায়গায়, নদীর পাড়ে, তোমার ঘরে—এখনও দেখেই যাচ্ছি, দেখেই যাচ্ছি, এ দেখা আমার কখনও ফুরবে না। যেমন যেমন পাতা মিলিয়ে দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে আরও নয়া নয়া তসবীর হয়ে যাচ্ছে।’

হঠাৎ সে হাঁটু গেড়ে আমার দুই জাহ্ন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে, ‘ওগো, তুমি কেন ভাব, তুমি অতি সাধারণ জন? তোমার এই একটিমাত্র জিনিসই আমার বৃকের ভিতর যেন ঝড় এনে আমার বৃকের বরফ ধুনরীর মত তুলো-পেঁজা করে দেয়। আমার অসহ্য কষ্ট হয়। তুমি কেন আমার দিকে আতুরের মত তাকাও, তুমি কেন তোমার যা হক তার কণাটুকু পেয়েও ভিতারীর মত গদগদ হও? তুমি কেন বিয়ের মনোচ্চারণ শেষ হতে না হতেই সদন্তে কাঁচি এনে আমার জুলুম কেটে দাও না, তুমি কেন আমার মুখের বসন দু হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল না—লিংহ যে রকম হরিণীর মাংস টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়?’

আমি নির্বাক।

চাঁদ বহুক্ষণ হল বাড়ির পিছনে আড়াল পড়েছে। আবছায়াতেও শব্দমের চোখ জলজল করছে।

হঠাৎ মধুর হেসে স্বধীরে তার মাথাটি আমার জাহ্নর উপর রেখে বললে, ‘না, গো, না। সেইখানেই তো তুমি। তোমার অজানতে তোমার ভিতর একজন আছে যাকে আমি চিনি। সে বলে, “আমার বা হৃকের মাল আমার কাছে

তাই এসেছে—আমার তাড়া কিসের।” আর জান, তুমিই একমাত্র লোক যে আমার প্রতি মুহূর্তে কবিতা উদ্ধৃতি শুনে কখনও শুধায় নি, তুমি বাস্তবে বাস কর, না, কাব্যলোকে? তুমিই একমাত্র যে বুঝেছে যে কাব্যলোকে বাস না করলে বাস কি করব ইতিহাস-লোকে, না দর্শনলোক না ডাক্তারদের হেঁড়া-খোঁড়ার শব্দলোকে? আর এ সব কোনও লোকেই যদি বাস না করি তবে তো নেমে আসবও সেই লোকে—গাধা গরু যেখানে বাস চিবোয় আর জাবর কাটে।

‘কিন্তু এসব কিছু নয়, কিছু নয়। আসল কথা, সে তোমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেম। আমি হুজাতা, হুচরিতা, হুম্বিতা আর আমার প্রেম যেন নববসন্তের মধু নরগিস—তোমার প্রেম ভরা-নিদাঘের বিরহরসঘন জ্বাক্ষাকুঞ্জ। তারই ছায়ায় আমি জিরবো, তারই দেহে হেলান দিয়ে আমি বসব, সেই আঙুর আমি জিভ আর তালুর মাঝখানে আস্তে আস্তে নিষ্পেষিত করে শুবে নেব। এই যে রকম এখন করছি।’

আমার মুখ কাছে টেনে নিল।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে শুধালে, ‘বল দেখি মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেতে পারে না কেন?’

‘কি করে বলব বল।’

দু-মিনিট মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না বলে। কথা কইতে ইচ্ছে যায়। আর শোন, জানেনম্ন আমাকে ডেকে কি বললে, জান? ‘বললে, তুমি নাকি আমার আঁধার ঘরের অনির্বাণ বিজলি। তোমার বৃকের ভিতর নাকি বিদ্যুৎ-বহি। আমরা একশ বছর বাঁচলেও নাকি তোমার প্রেম ক্ষণে ক্ষণে চমক দিয়ে আমাকে নিত্য নবীন করে রাখবে। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা কি বলেছে, জান? বলেছে, আমি যেন তোমার কাছ থেকে ভালবাসতে শিখি।’

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ‘তার মানে তুমি আমাকে বেশী ভালবাস। তাঁকে অবিশ্বাস করি কি করে? চোখের রোশনী নেই বলে তিনি হৃদয় দেখতে পান।’

আমার আত্মার দুকূল প্রাবিত হয়ে গেল। শব্দনমকে বৃকে ধরে বললুম, ‘বন্ধু তোমার ক্ষুদ্রতম দীর্ঘনিশ্বাস আমাকে কাতর করে। কিন্তু এখন যে হুশিয়ার তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সেটা দীর্ঘতর হোক।’

কান্না হাসিতে মিশিয়ে বললে, ‘আমি স্বামী-সোহাগিনী।’

কাবুল নদীর ওপারে সার-বাধা পল্লবহীন দীর্ঘ তরঙ্গী চিনার গাছের দল দাঁড়িয়ে

আছে বরকে পা ডুবিয়ে। যেন নদী গোপিনীর দল হর্যাসারির পশ্চাতে লুকায়ে
রাখামাধব চক্রে কাছ থেকে বস্ত্র ভিক্ষা করছে। তাদের ছায়; দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর
হতে লাগল। চন্দ্রাতা পাণ্ডুর।

‘এ কি?’ বলে উঠল হঠাৎ হিমিকা। ‘এ কি? এদিকে বলছি স্বামী-
সোহাগিনী ওদিকে তার আরাম স্থলের খেয়ালই নেই আমার মনে। তোমার
ঘুম পায় নি?’

আমি বললুম, ‘না তো। তোমার?’

‘আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন সমস্ত জীবন ঘুমিয়ে এইমাত্র জেগে উঠলুম।’

উঠে গিয়ে আলমারি খুলে আমার জন্ম পাজিমা কুঁতী নিয়ে এল। বললে,
‘দেখ দিকি মোটামুটি ফিট হয় কি না। আমি আন্দাজে সেলাই করেছি।’

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গেল, ‘আমি তাকে নিয়ে যাব, আমার
মায়ের বাড়িতে। মা আমায় শিখিয়ে দেবে। আমি তাকে পান করতে দেব
সুগন্ধি মদিরা—আমারই ডালিম নিংড়ে বের করা রসের স্মৃতি মদিরা। তার বাম
হাত রইবে আমার মাথার নিচে আর তার ডান হাত দিয়ে সে আমায় আলিঙ্গন
করবে। আমার অহরোধ, আমার আদেশ, অগ্নি জেরুজালেম-বালা-দল আমার
প্রেমকে চকলিত করে না, তাকে জাগ্রত করে না, যতক্ষণ সে না পরিতৃপ্ত
হয়।...আমি তাকে নিয়ে যাব আমার মায়ের ঘরে—যে ঘরে আমার মা আমাকে
গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আমি তাকে পান করতে দেব আমারই ডালিম
নিংড়ে—’

চার হাজার বৎসরের পুরাতন বাসর রাত্তি গীতি।

পুরাতন!

। ৮ ।

তপ্ত শব্দায় শব্দমের গায়ে দ্বিধা শিহরণ। অচ্ছাদ সরসী নীরে রমণীর কম্পন?

মোতির মালাটি গলাতেই আছে। আমি সেটি দানা দানায় অন্ন অন্ন
ঘোরাতে ঘোরাতে একটা লকেটে হাত ঠেকল। বললুম, ‘এর ভিতরে কিছু
আছে?’

চুপ।

আমি মালা ঘোরানো বন্ধ করে তার বুকের উপর হাত রেখে চুপ করে
বইলুম।

হঠাৎ লেপ সরিয়ে উঠে উড়ল ঘরের কোণের অভিশয় কীণ শিখাটির দিকে। আমি দেখতে পেলুম, ঘেন ঝড়ে উড়ে গেল একটি গোলাপ ফুল, তার দীর্ঘ ডাঁটাটির চতুর্দিকে আলুলায়িত, হিল্লোলিত অতি সূক্ষ্ম, অতি দিকে গোলাপী মসলিন। কীণালোকে তার প্রতিটি অঙ্গ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছেও না।

আলো জোর করে দিয়েছে। এখন প্রতি অঙ্গ—। আমি চোখ বন্ধ করলুম।

আমার পাশে শুয়ে লকেটটি খুলে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'এই আমার শেষ গোপন ধন। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

খুলে দেখি আমারই একটি ছোট্ট ফটো। অবাক হয়ে শুধালুম, 'এ তুমি কোথায় পেলো?'

বললে, 'চোখের জলে নাকের জলে।'

'সে কি?—এত দিনে বুঝলুম, শব্দনয় কেন কখনও আমার ছবি চায় নি।

'আব্বা ইংরিজী কাগজ নেন—হিন্দুস্থানী। জন্মের কয়েকদিন পরে তারই একটাতে দেখি পরবের সময় ব্রিটিশ লিগেশনে আর কাবুল টিমে যে ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল তারই থান তিন ফটো। কান্দাহার থেকে লিখলুম ওই কাগজকে ছবিটার কণ্টাক্ট প্রিন্ট পাঠাবার জন্ত। মূল্যস্বরূপ পাঠালুম, এ দেশের কয়েক-থানা বিরল স্ট্যাম্প—বিদেশে পয়সা পাঠানো যে কী কঠিন সেই জ্ঞান হল চোখের জলে নাকের জলে। সাস্থনা এই, যে লোকটার হাতে চিঠিখানা পড়েছিল সে নিশ্চয়ই স্ট্যাম্প বোঝে। আমাকে অনেক আবোলতাবোল ছবির মাঝখানে ওই ছবিও পাঠালে থান তিনেক। তোমার ছবি তুলে নিয়ে লকেটে পুরে দিলুম। হল?'

আমি কি বলব? আমি তার মুক্তামালারাত্রীর শেষ প্রান্তের ইষ্টমুগ্ধ।

দিনযামিনী সায়মুপ্রাতে শিশিরবসন্তে বকলয় হয়ে এ শুনেছে শব্দনয়ের আবুলতা ব্যাকুলতা—প্রতি হৃদয়স্পন্দনে। একে সিন্ত করে রেখেছে শব্দনয়ের অসহ বিরহশর্বরীর তপ্ত আঁখিবারি।

আমি কল্পনা করে মনে মনে সে ছবি দেখছি, না শব্দনয় কথা বলছে? দুটোর মাঝখানে আজ আর কোনও পার্থক্য নেই। কিংবা তার না-বলা-ব্যাখা ঘেন কোন মন্তব্যে শব্দতরঙ্গ উপেক্ষা করে তার হৃদয়স্পন্দন থেকে আমার হৃদয়স্পন্দনে অব্যবহিত সঞ্চারিত হচ্ছে। কর্তাশ্রমে বকালিঙ্গনে চেতনা চেতনায় এই বিজড়ন অস্ত রজনীর তৃতীয় ধামে আমা দৌহাকার জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞান, অপূর্বলঙ্ক বৈভব।

কত না সোহাগে কত না গান গুনগুন করে শব্দম সে রাতে আমাকে কানে কানে শুনিয়েছিল। লায়লী মজন্নের কাহিনী।

বাঙালী কীর্তনিয়া যে রকম রাধামাধবের কাহিনী নিবেদন করার সময় কখনও চণ্ডীদাস, কখনও জগদানন্দ, কখনও জ্ঞানদাস, কখনও বলরাম দাস, বহু পুষ্প থেকে মধু সঞ্চয় করে অমৃতভাণ্ড পরিপূর্ণ করে, শব্দম ঠিক তেমনি নিজামী, কখনও ফিরদৌসী, কখনও জামী, কখনও ফিগানী থেকে বাছাই বাছাই গান বের করে তাতে হিয়ার সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে আমাকে সেই স্বয়লোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেখানে সে আর আমি দুজনা, যেখানে কপোতী কপোতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় উৎসবের প্রেম গগনাকনে।

কপোত-কপোতী দিয়েই সে তার কীর্তন আরম্ভ করেছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণে মুকুলিকা লায়লী পুবেছিল কপোত-কপোতী। ঘোঁবন দেহলি-প্রান্তে সে কপোত-কপোতীকে দেখে আধো আধো বুদ্ধিতে শিথলে প্রেমের রহস্য।

দেহ তখন আর লায়লীর সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারছে না। ওষ্ঠাধর বিকশিত হয়ে ডেকে এনেছে প্রথম উবার নীরব পদক্ষেপে গোলাপী আলোর অবতরণ। তারই ছপাশে শুভ্র শর্করার মত তার বদন-ইন্দুর বর্ণচ্ছটা, কিন্তু কপোল ছুটির লালিমা হার মানিয়েছে বর্ণ শেবের রক্তাক্ত সূর্যাস্তকে। রক্ত কপোল আর শুভ্র বদনপ্রান্তের মাঝখানে একটি কজ্জল-কৃষ্ণ তিল, যেন হাবশী বালক লাল গালের গোলাপ বাগানের প্রান্তদেশে খুলেছে শুভ্র শর্করার হাট। সে বালক তৃপ্ত। তারই পাশে লায়লীর গালের টোলটি। সে ঘেন আব-ই-হায়াৎ, অমৃতবারির কূপ—অতল গভীর হতে উৎসারিত হচ্ছে অমৃতস্রা। স্থিত হাতের সামান্ততম নিপীড়নে উৎসমূলে যে আলোড়ন সৃষ্ট হয় তারই সৌন্দর্য প্রাবিত করে দেয় তার গুল-বদন, ফুল বগরী। সমুদ্র-কুমারীর চোখের জল জমে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেয় যে মূক্তা সে-ই এসে আলোর সন্ধান পেয়েছে লায়লীর ওষ্ঠাধরের মাঝখানে। সে ওষ্ঠে আমন্ত্রণ, অধরের প্রত্যাখ্যান—মজন্নের ওষ্ঠাধর যেদিন এদের সঙ্গে সম্মিলিত হবে সেদিন হবে এ-রহস্তের চূড়ান্ত সমাধান।

তরুণ রাজপুত্র কয়েক দূর হতে প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে আকুলি-বিকুলি করে কি ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে তার বালাসখাও বুদ্ধিতে পারে নি। সর্পদষ্টাতুরকে আশ্রয়ন যে রকম স্বগৃহে নিয়ে আসে, সখা সেইরকম কয়েককে নিয়ে গেল আপন দেশে।

অজ্ঞাপুরবালিনী অস্বপ্নাঙ্গা লায়লীকে প্রেমের পুকার, স্বপ্নের আহ্বান

পাঠাবে কয়েল কি করে ?

এখানে এসে শব্দ নয় যে কাহিনী বর্ণনা করল তার সঙ্গে আমাদের নল-দময়ন্তী কাহিনীর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে হৃদয়ের কন্দর্পভার ধারণে অসমর্থ নলরাজ কুহুমায়ুধের অগ্রদূত রূপে পাঠিয়েছিলেন বস্ত-হংসকে, আর শব্দময়ের কাহিনীতে কয়েল লায়লীর নবশ্রামদূর্বাদল-বন্ধুতলে পালিত কপোতকে বন্দী করে তার ক্ষীণপদে বিজড়িত করে পাঠিয়েছিল প্রেমের লিখন।

কি উত্তর দিয়েছিল লায়লী ? কে জানে ? কিন্তু আরব ভূমিতে আজও তাবৎ দরদী-হিয়া, শুষ্ক হৃদয়, সবাই জানে, সেই-দিন থেকে লায়লীর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত জ্যোতি—কণে কণে কারণে অকারণে তার চোখে হিল্লোলিত হতে লাগল এক অদৃষ্ট-পূর্ব বিহ্বলজ্ঞেতা।

রাজপ্রাসাদ থেকে যে দেওদার সারি চলে গেছে মরুভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত তারই শেষে ছিল ঝরনা-ধারা। এ দেওদার স্বদূর হিমালয় থেকে আনিয়ে-ছিলেন লায়লীর এক পূর্বপুরুষ। কিংবদন্তী বলে, শতশ্রামল-সজল বনভূমির শিশু দেবদার একমাত্র তাঁরই সোহাগ-মাতৃসুগ্ধ পেয়েছিল বলে এই অস্থিগুহ খরভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।

আর সেই ঝরনায় জল আনতে যেত নগরিকার কুমারীগণ।

যুগ যুগ ধরে তরুণ প্রেমিক দেওদার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেগুরবে, কখনও বা গানে গানে প্রেমের আহ্বান পাঠিয়েছে প্রেমিকাকে।

দেবদারু অন্তরালে মরুভূমির স্বদূর প্রান্তে ধীরে ধীরে উঠছে পূর্ণচন্দ্র। দীর্ঘ দেবদারু ছায়ায় ছায়ায় যেখানে আলোছায়ায় কস্মমান বেপথু আলিঙ্গন তারই পাশে গা মিশিয়ে দিয়ে মজন্ উদ্ভাষ হয়ে ধীর স্থির কর্তে লায়লীকে আহ্বান জানাচ্ছে অদৃষ্ট গীতাঞ্জলি স্তবকে স্তবকে নিবেদন করে।

এ আহ্বান জনগণের সুপরিচিত কিন্তু আজ সন্ধ্যার এ আহ্বান যে রহস্যময় মন্ত্রশক্তি নিয়ে বসন্ত সমীরণের চঞ্চলমুখরতা মৌন করে দিল, দেবদারুপল্লবদলকে স্তম্ভিত করে দিল সে যেন ইহলোকবাসী মর মানবের ক্ষণমুখর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনজাত নয়। গৃহে গৃহে বাতায়ন বন্ধ হল। হর্ম্যশিখর থেকে নাগর নাগরী ক্ষতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। বৃক্ষেরা মন্ডার উদ্দেশে মুখ করে আকাশের দিকে দু হাত তুলে প্রার্থনায় রত হলেন।

কার ওই ছায়াময়ী অশরীরী দেহ ? কার হৃদয় ছুটে চলেছে দেহের আগে আগে—ওইখানে, যেখানে উর্ধ্ব উচ্ছ্বসিত উৎসধারা বিগলিত আলিঙ্গনে দিল্লব করে দিচ্ছে দেবদারুস্বক ?

চৈতন্তের পরপারে অজরামর অন্তহীন আলিঙ্গন।

বেহেশত্ ত্যাগ করে ফিরিশতাগণ তাঁদের চুষনের মাঝখানে এসে আপন চন্দ্ররূপ বিগলিত করে দিলেন।

সংস্কারমুক্ত-জনও প্রিয়াসহ তাজমহল দর্শনে যায় না। যমুনা পুলিনের কিংবদন্তী বলে, হংস-মিথুন পর্যন্ত বৃন্দাবন বর্জন করে—তাজমহলের উৎসজল এক সঙ্গে পান করে না। যমুনা বিরহের প্রতীক। অপিচ বাসরঘর প্রথম মিলনকে চিরজীবী করে রাখতে চায়। সেখানে বিরহ-গাথার ঠাঁই নেই। শব্দম অতি সংক্ষেপে ক্ষীণ কাকলিতে লায়লী মজনু'র সে কাহিনী ছুঁয়ে গেল—কনিষ্ঠা যে রকম ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে তার কনিষ্ঠতম ভীষণ অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।

বর্ষাভোরের ঘন মেঘ হঠাৎ কেটে গেলে যে রকম শত শত বিহঙ্গ বনম্পতিকে মুখরিত করে তোলে ঠিক সেই রকম অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হল শব্দমের আনন্দ গান।

মর্ত্যের ধূলার শরীর আর মৃত্যুঞ্জয় প্রেমকে ধরে রাখতে পারল না। দিখলয়-প্রান্ত থেকে যে রামধনু উঠেছে মধ্য-গগনের স্বর্গদ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত তারই উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে লায়লী মজনু' চলেছে অমর্ত্যালোকে। কখনও গহন মেঘমায়া, কখনও তরল আলোছায়ায় মাঝে মাঝে, কখনও চূর্ণ স্বর্গরেণু সূর্যস্বি কণা আলোড়িত করে, কখনও ইন্দ্রধনুর ইন্দুনিভ বর্ণবজ্রায় প্রবহমান হয়ে তারা পৌঁছল স্বর্গদ্বারে। জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বেহেশতের আনন্দাঙ্গনে। পরিপূর্ণ প্রণয়-প্রতীক স্বর্গ হতে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেখানে প্রত্যাভর্জন করছে অনিন্দ্য নবজন্ম নিয়ে, মরজীবনের জীর্ণ বাস ত্যাগ করে, স্বরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।

সে কী ছবি! চতুর্দিকের ছরী ফিরিশতাগণের চোখে পলক পড়ছে না। দিব্যজ্যোতি ধারণ করে লায়লী মজনু' বসে আছেন মুখোমুখি হয়ে। ফিরিশতা-প্রবীণ জিব্রাইল তাঁদের সম্মুখে ধরেছেন পানপাত্র—আল্লাতালার কুরান শরীফে ষ্ঠে শরাবুতত্বুরা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন তাই জিব্রাইলের হাত থেকে তুলে নিয়ে লায়লী এগিয়ে ধরেছেন মজনু'র সামনে। দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই সুধাপাত্র হতে।

চতুর্দিকে মধুর হতে মধুরতর সঙ্গীত :

হে প্রেম, তুমি যন্তু হলে লায়লী মজনু'র বন্ধমাঝে স্থান পেয়ে।

হে প্রেম, তুমি অমরত্ব পেলে লায়লী মজনু'র মৃত্যুর ভিতর দিয়ে !

খুদাতালার সিংহাসন থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হল :

হে স্বরলোকবাসীগণ ! প্রেমের দ্বন্দ্ব দাহে দগ্ধ হয়ে অর্জন করেছে তোমরা
স্বরলোকের অকর আসন ।

হে মর্ত্যবাসীগণ ! সর্বচৈতন্ত সর্বকল্পনার অতীত যে মহান সত্তা তিনি তাঁর
বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপের একটি মাত্র রূপ প্রকাশ করেছেন মর্ত্যালোকে—তাঁর
প্রেমরূপ ।

তৃতীয় অণ্ড

॥ ১ ॥

যে মানুষ ছেলে-বয়স থেকে অন্ধের সেবা করেছে তার সেবা হয় নিখুঁত । এত-
খানি পাওয়ার পরও যে আমি শব্দের সেবার দিকে খুঁতখুঁতে চোখে তাকিয়ে-
ছিলুম একথা বললে নিজের প্রতি অপরাধ করা হয় । আমি দেখেছিলুম,
অসুভব করেছিলুম তার সেবানৈপুণ্য, আর্টিস্টের মডেল যে রকম ছবিটি যেমন
যেমন এগোয় তাকে মাঝে মধ্যে সজুট নয়নে দেখা যায় ।

ভোরবেলা অসুভব করলুম, চতুর্দিকে লেপ ওঁজে দেওয়ার সময় তার হাতের
ভীর্ণস্পর্শ ।

সকালবেলা সামনে যে ভাবে চায়ের সরঞ্জাম সাজালে তার থেকে বুঝলুম,
কান্দাহারে যে হাত বুলবুল-গুলের মাঝখানে বিচরণ করেছে সে মাটিতেও
নামতে জানে ।

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, শব্দের চোখ দুটি লাল । আমার হাতের পেয়লা
ঠোটে ষাবার মাঝপথে ধমকে দাঁড়াল ।

শব্দম বৃঝেছে । বললে, 'আজ অতি ভোরে বাবা কান্দাহারে চলে
গিয়েছেন । তোপলু খান এসে খবর দিলে, আমান উল্লা তাঁকে তাঁর শেষ
স্তরসার মালিকরূপে চিনতে পেরেছেন । বাবা জানেন, আমান উল্লা'র সর্ব
স্মির-ওমরাহ তাকে বর্জন করেছেন, কুরবানীর ছাগলকেও মানুষ জল দেয়,
তারা—ধাক্কে ।

'ষাবার সময় কলে গেছেন, তুমি যেন সকালবেলাই ব্রিটিশ লিগেশনে নিজে
গিয়ে আমাদের বিয়ের দলিল জিন্মা করে আসো ।'

'আর কি বলেছেন ?'

‘বলেছেন, স্বযোগ পেলে তুমি একাই হিন্দুস্থানে চলে যেয়ো।’

‘তুমি? সেই তো ভালো।’

‘না। তুমি।’ তার মুখ খুলিতে ভরে গিয়েছে। বললে, ‘জান, আকা! এখন তোমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন। বললেনও, “কেন” বেচারীকে আমাদের ঘরোয়া বিপদের ভিতর জড়ালুম!” এই প্রথম দেখলুম, বাবা কোনও কাজের জন্য অহুশোচনা করলেন। তখন আমি তাঁকে বললুম—অবশ্য আমি আগেই স্থির করে রেখেছিলুম, এক দিন না এক দিন জানেনমন্কে দিয়ে বলাব—যে তোমাকে আমি আগের থেকেই ভালবাসতুম। আমাদের প্রথম শাদির কথাটা কিন্তু বলি নি। সেটা বলব, যেদিন তাঁর কোলে তাঁর প্রথম নাতি দেব। বাবা ভারী খুলী হয়ে নিশ্চিন্ত মনে কান্দাহার গেছেন।’

‘আমি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলুম। শেষটায় বললুম, তোপলের সঙ্গে একবার দেখা হল না।’

বললে, ‘সে আস্তে আস্তে তোমাকে দেখে গেছে। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। আর তোমাকে বলতে বলে গেছে, সব-কিছু চুকেবকে গেলে তার আপন দেশ মজার-ই-শরীফে আমাকে নিয়ে যেতে।’

ছোট্ট বাচ্চাকে মা যে রকম জামা-কাপড় পরাতে ইচ্ছে করে দেরি করে, প্রতিপদ চড়াবার পর বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, শব্দম ঠিক সেই রকম আমাকে জামা-কাপড় পরালে। যখন আমার জুতোর কিতে বাঁধতে গেল মাজ। তখনই বাধা দিয়েছিলুম।

শব্দমের মুখ হাসি-কান্না মাথানো। তার পিছনে গান্ধীৰ্ব। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললে, ‘বেশি দেরি করো না।’

তার পর কানে কানে বললে, ‘তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।’

বয়স্করা বেরুচ্ছে না—বাচ্চারা রাস্তায় খেলা করছে ঠিকই।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, ‘দেবদূত ধোঁখানে যেতে ভয় পান, মূখেরা সেখানে চিন্তা না করে ঢোকে।’ এর উল্টোটাও ঠিক। মৃত্যুভয় শুধু মূখের, তাই বয়স্করা রাস্তায় বেরুচ্ছে না। বাচ্চারা দেব-শিশু, তারা নির্ভয়ে খেলছে। যেটা খেলছে সেটা শুধু এই সময়েই এবং শীতের দেশেই সম্ভব। কাবুলের অষ্টাবক্রপৃষ্ঠ রাস্তায় জারগায় জারগায় জল জমে যায়—সে কিছু নুতন কারবার নয়—সেই জমা জল কের জমে গিয়ে বরফ হয়ে দিব্য ষ্টিং-ব্রিঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। লাবধানী পথিকও সেখানে পা হড়কে দড়াম করে আছাড় খায়। বাচ্চাদের সেইটেই বর্ণপুরী।

অশ্রুত বলেছি, কাবুলীরা পরজারে শত শত লোহার পেরেক ঝুকে নেয় বলে তার তলাটা সবস্বত্ব জড়িয়ে মড়িয়ে হয়ে যায় পিছল। বাচ্চারা শুকনো মাটিতে একটুখানি দৌড়ে এসে সেই বরফের উপর নিজেকে ব্যালান্স করে লামনের দিকে একটু ভর দেয় এবং সাঁই করে বরফের অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমরা দেশে যে রকম নদীর ঢালু পাড়েতে জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে স্পুরির খোল দিয়ে আসন বানিয়ে হড়হড় করে নিচে নেমে যাই।

মাঝে মাঝে দেউড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও মা ছেলেকে গালিগালাজ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ডাকে—‘আয় পিদর-স্বত্তে—ওরে পিতৃদেহ (বাপকে পুড়িয়ে মারে), তোর বাপ নির্বংশ হোক—তোর যম বাড়ির ভিতরে না বাইরে ? এখখুনি ভিতরে আয় বলছি ।’

‘মাদর-স্বত্তে’ বা ‘মাতৃদেহ’ কখনও শুনি নি। বোধহয় উড়ো খইয়ের মত নরকায়িকুণ্ড ও ‘জনকায় নমঃ’।

ব্রিটিশ লিগেশনের যে কর্মচারীর সঙ্গে আমার শ্বশুর মশায়ের কথাবার্তা হয়েছিল তিনি আমাকে মাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমি কিছু বলার পূর্বেই আমাকে অভিনন্দন জানালেন, মিষ্টিমুখ করালেন। ইনি পেশাওয়ারের লোক। তবে কি কোর্টল্য ওই অঞ্চলের লোক ? গুপ্তচর বিতা উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণ্য পেয়েছেন ? কিন্তু লোকটি চমৎকার। বিয়ের দলিলখানা লোহার সিন্দুকে তুলতে তুলতে বললেন, ‘অনবত্ত হাতের লেখা। মনে হয়, দলিল নয়, ছন্দে গাঁথা অভিনন্দন পত্র। আমি যত শীঘ্র পারি বাচ্চাই সকাণ্ডকে কথাচ্ছলে জানিয়ে দেব যে হিন্দুস্থানে আফগানিস্থানে যুগ যুগ ধরে যে ‘জাঁতাং কর্দিয়াল’—‘হার্দিং রাখী-বন্ধন’—গড়ে উঠেছে, এই বিয়ের মারফতে তারই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল।’

যিনি এতখানি সহৃদয় তাঁকে ওকীব-হাল করতে হয়। তবু একটু চিন্তা করে বললুম, ‘সর্দার আওরঙ্গজেব খান আজ তোরে কান্দাহার চলে গেছেন।’

চমকে উঠে বললেন, ‘সে কি !’ একটু ভেবে বললেন, ‘নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে।’

আরও কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, ‘এটা কি ভালো করলেন ? আমি অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক চালের কথা ভাবছি নে, আমি ভাবছি, তিনি এই ছদ্মবেশে সবাইকে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন ?’

আমি কিছু বলবার পূর্বেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘অবশ্য তেমন কিছু কুশ্চিন্তা করার নেই।’

এই ভয়লোক আমাকে সাধারণত সহজে ছাড়তে চান না। আজ অবশ্য

দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

আমাদের দেশেই যখন বহু পাখি শীতকালে হাওয়া বদল করতে যায় তখন এই শীতের দেশে লতাপাতা কীটপতঙ্গহীন ঋতুতে থাকবে কে? তবু হঠাৎ দেখি, একজোড়া ক্ষুদ্র পাখি একে অগ্নিকে তাড়া করছে, বরফে লুটোপুটি খাচ্ছে, ফুডুং ফুডুং করে পালক থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়ছে। আমাকে দেখে উড়ে গিয়ে গাছের একটা শাড়া ডালে বসল।

আমি জানি এসব পাখি মাল্লবের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে, এবং শুধু জৈনরাই পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায় তাই নয়, কঠোর-দর্শন কাবুলী খানসাহেবকে আমি জোবার জেব থেকে শুকনো রুটি বেগ করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিতে দেখেছি।

আমি গাছটার কাছে আসতে আবার উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশের আরেকটা গাছে বসল। আমার পকেটে কিছু ছিল না বলে বড় দুঃখ হল। কাবুল শহরে না পৌঁছনো পর্যন্ত এরা উড়ে উড়ে আমাকে সঙ্গ দিল।

শব্দনের যত কাছে আসছি আমার হৃদয়ের ক্ষুধা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে তাকে পেয়েছি পাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে। আর আজ এই ঘণ্টা দুইয়ের বিচ্ছেদে প্রাণ এত ব্যাকুল হয়ে উঠল? এতদিন পরে বুঝতে পারলুম, লাখ লাখ যুগ ধরে হিয়ায় চেপে রাখলেও হিয়া জুড়ায় না।

এ কি? বাড়ির সদর দরজা খোলা কেন? কাবুলে তো এরকম হয় না—শান্তির সময়ে, দিন দুপুরেও।

একটু ইতস্তত করে বাড়িতে ঢুকলাম। এ কি! এত যে চাকর দাস-দাসী, আঞ্জিনা ভতি করে থাকে, আজও সকালে বিয়ের পরের দিনের কি এক পুরব তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল, তারা সব গেল কোথায়? জিনিসপত্র তেমনি ছড়ানো। সিঁড়ির মুখে একটা কলসী কাত হয়ে পড়ে আছে; তার জল জমা হয়ে খানিকটা বরফ হয়ে গিয়েছে। কাবুলীরা কি অমঙ্গল চিহ্ন চেনে না?

আমার বুকের ভিতর কি রকম করতে লাগল। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে!

কাকে ডাকি? আমি তো কারোরই নাম জানি নে।

হঠাৎ কি অজানা অমঙ্গল আশঙ্কা মনে জেগে উঠল। ছুটে গেলুম আমাদের বাসগৃহের দিকে। খোলা দরজা ঠা ঠা করছে।

‘শব্দন’, ‘শব্দন’—টেটিয়ে উঠলুম। কোনও উত্তর নেই।

সব-কিছু সাজানো গোছানো। এক ট্রে চা পৰ্বত। শুধু একদিকে একটি ছোট পেয়লা চা—তার আধ পেয়লা খাওয়া হয়েছে।

এঘর ওঘর সব ঘর খাঁখাঁ করছে। সেই পাগলের মত ছুটোছুটির ভিতর একই ঘরে ক-বার এসেছি বলতে পারব না। এমন কি জানেননের ঘরেও গেলুম। সেখানে কেউ নেই।

আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। আজিনার নেমে শুককণ্ঠে চোঁচাতে লাগলুম, ‘কে আছ, কোথায় আছ?’ ‘কে আছ, কোথায় আছ?’

কতক্ষণ কেটে গেল কে বলতে পারে।

আমার পিছন থেকে কে এসে আমার হু-পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এ বাড়ির চাকর। আমি ভাঙা গলায় যতই তাকে প্রশ্ন করি সে আরও চিৎকার করে কাঁদে। সে বরফের উপর শুয়ে পড়ে গোঙরাতে আরম্ভ করেছে।

দেউড়ি দিয়ে আরও লোক ঢুকছে। বাড়ির দাসদাসী। আমাকে ঘিরে তারা চিৎকার করে সবাই কাঁদছে। বুক-কাটা কান্না—জিগের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই আমার পা, হাঁটু, জাহ্নু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

এই অর্ধচেতন অবস্থায় বুঝতে পেরেছি, নিদারুণ অমঙ্গল না হলে এতগুলো মানুষ এরকম মাথা খুঁড়তে পারে না।

এরই মাঝখানে ভিড় ঠেলে সেই কলেজের ছোকরাটি আমার কাছে এগিয়ে এল। সেও পাগড়ির লেজ দিয়ে মুখ নাক ঢেকে সেটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে আত্মগোপন করছে। প্রথমটায় আমিও তাকে চিনতে পারি নি। তার চোখে আতঙ্ক, ঘৃণা আর কান্না। পাড়া-প্রতিবেশীর ভিতর একমাত্র সে-ই সাহস করে হুঃসংবাদ দিতে এসেছে। যত বড় হুঃসংবাদই হোক আমি সেটা শুনব। অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে হোক সেটা হুঃসংবাদের অসহ্য। কানের কাছে মুখ রেখে টেঁচিয়ে বললে, ‘শব্দনর বীবীকে বাচ্চার সেনাপতি জাহ্নব খানের লোক নিজে গিয়েছে—’ আমার পায়ের তলায় যেন কিছু নেই। ছেলেটি আমার কোমর হু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বললে, ‘হজুর, এ-সময়ে আপনি অবশ্য হবেন না। আপনার জ্যাঠা শক্তরমশাই তাঁর সম্মানে আর্ক জুর্গে গিয়েছেন। আপনাকে বাড়িতে থাকতে বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, আপনি যেন কিছুতেই না বেরোন।’

আমাকে ধরাধরি করে জানেননের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললে, ‘আমি আর্কে চলেলুম খবর নিতে।’

কতক্ষণ কি ভাবে কেটেছিল বলতে পারব না। দাসদাসীরা কাঁদছে। দু-একজন যেন কথাও বলছে, কারার সঙ্গে সঙ্গে। কেন সর্দার আগরজ্জেরব চলে গেলেন? তিনি থাকলে তো এরকম হত না! কেন তিনি কড়া মানা করে গেলেন, কেউ যেন ডাকুদের সঙ্গে লড়তে না যায়? তোপলু থাকলে, হুমুম পেলে একাই তো বিশজনকে শেষ করতে পারতো। ওরা—নিজেরাও তো কিছু কাপুরুষ নয়। আরও অনেক ফরিয়াদ তারা করেছিল।

এদের ভিতর যে সবচেয়ে বুদ্ধ সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে একটা চেয়ারে বসালে। তার চোখ শুকনো। মনে হল সে কাঁদে নি, কথাও বলে নি। আমি কোন কথা বুঝতে পারছি না দেখে আমাকে ধীর কণ্ঠে বললে, ছোট সাহেব, আপনি শক্ত হন। আপনি এ বাড়ির জোয়ান মালিক। আপনি ভেঙে পড়লে এই এতগুলো লোক পাগল হয়ে কি যে করবে ঠিক নেই। এরা প্রথমটায় প্রাণের ভয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে লুকিয়েছিল। এখন আবার ক্রোড়ে গিয়ে কি যে করবে বলা যায় না। বাচ্চার ডাকুরা লুটপাট করে নি কিন্তু এখন আর সবাই আসবে বাড়ি লুট করতে। আমি কিছুই বলি নি। এ বাড়িটা রক্ষা করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'দেখুন হুমুম, এ বাড়ির কত সম্মান, কত বড় ইজ্জত। সর্দার আগরজ্জেরব পরিবারের বাস্তুভিটে না হয়ে আর কারও হলে এতক্ষণে পাড়া-প্রতিবেশীরাই এ বাড়ির দোর জানালা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেত।'

আমি তখনও কোন সাড়া দিচ্ছি নে দেখে হতাশ কণ্ঠে বললে, 'এই যে এতগুলো লোক, এদের জীবন-মরণ আপনার হাতে। সর্দার হুমুম দিয়েছিলেন, বাচ্চার লোককে যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়। এখন অল্প লোক লুট করতে এসে এদের মেরে ফেলতে পারে—আপনি হুমুম না দিলে এরা পাগলের মত কি করে ফেলবে তার কোনই ঠিক নেই।'

ওই একই কথা বার বার বলে।

'আপনার শতরমশাই, আঠশতর মশাই আপনার প্রতি যে আদেশ রেখে গেছেন সেটা পালন করুন। শব্দম বীবীর জন্ত যা করার সে তাঁর জানেমন করবেন।'

এবারে শেষ অস্ত্র ছাড়লে—'তিনি কিরে এসে যদি শোনেন আপনি ভেঙে পড়েছিলেন তখন তিনি কি তাববেন।'

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ করলুম, ব্রিটিশ লিগেশনের লেই

ভারতীয় কর্মচারীকে সব খবর দিয়ে আসতে। কি ভাবে কি হয়েছিল আমি এখনও জানি নে—লিখে জানাব কী ?

এইবারে তার চোখে জল এল। অশ্রুট কঠে আল্লার বিরুদ্ধে কি এক করিয়াদ জানালে। রওয়ানা হওয়ার সময় তবু তার মুখের উপর কি রকম খেন একটা প্রসন্নতা দেখা গেল। বোধ হয় ভেবেছে, তবু শেষটায় বাড়ির কর্ণধার পাওয়া গেল।

হায় রে কর্ণধার !

একজনকে আদেশ দিতে বাকীরা কি জানি কি ভেবে, অন্ধভাবে কি যেন অহুভব করে চলে গেল।

আমি শব্নমের—আমার—আমাদের, আমাদের মিলন রাত্রির ঘরে আর যাই নি।

শব্নম নাকি দাস-দাসীদের হাতিয়ার নিয়ে বাড়ি রক্ষা করতে দেয় নি। বোরকাটা পরে নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল। জানেমন ডাকাতদের বলেছিলেন, শব্নম বিবাহিতা রমণী। তাঁর কথায় কেউ কান দেয় নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হন। দুজন লোক তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

আমাকে কি এঁরা বাড়ির তদারকির জন্তই রেখে গেলেন ? আমি কি অল্প কোনও কাজের উপযুক্ত নই ?

আমি যাব আর্কে ? এ বাড়িতে আমার কি মোহ

এই সময়ে লোকে চা খায়। দেখি, শব্নমের বুড়ী সেবাদাসী চা নিয়ে এসেছে।

আমাকে একটি চিরকুট এগিয়ে দিলে। বোধহয় ভেবেছে, আমি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

দুটি মাত্র কথা। ‘বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।’

আমি কাপুরুষ নই, আমি বীরও নই। এরকম অবস্থায় মানুষ ভানভণিতাও করতে পারে না। আমার ভিতরে যা আছে, তা ধরা পড়বেই।

বৃদ্ধকে বাড়িতে বসিয়ে যেতে পারতুম। অল্প কাউকে লিগেশনে পাঠালেই তো হত।

না, সর্দার হওয়ার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

কিন্তু লিগেশনে খবর পাঠাবার মত সন্মতমান লোক ও-ই তো একমাত্র ছিল। অল্প কাউকে পাঠালে যে দুশ্চিন্তা থাকত সে লোকটা খবর ঠিক আয়গার মত পৌঁছিয়েছে কি না।

না, সর্দার হুগ্গার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

শব্দনমের কোনও কথা তো আমি কখনও অমান্য করি নি। অনেকে অনেক কথা বলবে, অনেকে অনেক উপদেশ দেবে, তাই সে যাবার সময় স্থির বুদ্ধিতে পাকা আদেশ দিয়ে গিয়েছে।

এখন না হয় সবাই আমাকে বাড়িতে থাকতে বলছে, কিন্তু যদি বিপদ কেটে যায়, হাঁ, যদি বিপদ কেটে যায়, তবে একদিন সবাই ভাববে না যে আমি ভীকর মত বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছিলুম, সবাই যখন আর্কে!

হায় রে আত্মাভিমান! সবাই যেন বোঝে আমি বীরপুরুষ!

কায় কাছে আত্মাভিমান? শব্দনম কি এতদিনে জানে না, আমি বীর না কাপুরুষ! সে তো প্রথম দিনে—না, প্রথম মুহূর্তেই—আমাকে চিনে নিতে পারে নি?

লোকজনদের সবাই এখন আমার বাড়ি চেনে। একজনকে ডেকে বললুম, ‘যাও তো, আব্দুর রহমানকে ডেকে নিয়ে এস।’

হে খুদাতালা, তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমার আনন্দের দিনে তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে তোমাকে স্বরণ রাখতে—আজ এই চরম সঙ্কটের দিনে সেই অহুগ্রহ কর, মহারাজ। আমি তোমাকেই স্বরণ করছি।

খবর এল, আব্দুর রহমান আমার ছাত্রের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রতিবেশী কর্নেলের ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে আর্কে চলে গেছে।

তারপর আমার মতিভ্রম আরম্ভ হল।

স্বপ্ন দেখি নি, সে আমি ঠিক ঠিক জানি। যেন স্পষ্ট, স্পষ্ট কেন স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতর দেখতে পাচ্ছি, আমি মায়ের এক জাহুতে, শব্দনম অগ্র জাহুতে বসে আছে আর মা কলাপাতার সামোসাতে মোড়া ধান-দুর্বা আমাদের মাথার উপরে রেখে আশীর্বাদ করছেন। জাহানারা আর কুটি মুটি মাটিতে শুয়ে সকলের আগে নতুন চাঁচীর মুখ দেখবার চেষ্টা করছে।

সম্মিতি কিরেছিলুম বোধ হয় মায়েরই পুণ্যবলে, তাঁরই আশীর্বাদের ফলে।

মনস্কর সামনে দাঁড়িয়ে। সেই কলেজের সহদয়, বীর ছেলে।

নতমস্তকে বললে, ‘আপনার জ্যাঠাখন্ডর সোজা নতুন-বাদশা বাচ্চা-ই-সকাওয়ার দরবারে চলে যান। সে আর্কে ছিল না। তিনি মোকাদ্দার উদ্দেশ করে জাকর খান এবং তার দলবলকে চিৎকার করে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। তাঁকে একটা ছোট কুঠরিতে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে।’

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললুম, ‘তুমি আমার অনেক

উপকার করলে। এর চেয়ে মহত্তর কোনও গুণদক্ষিণা নেই।’

রাস্তায় নেমে বললুম, ‘এবারে তুমি বাড়ি যাও।’

বাড়ির লোক আবার অট্টরোল করে উঠেছে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে আমাকে বার বার যেতে মানা করছে, আর বলছে সেখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

আশ্চর্য! ওদের কথা, ওদের অল্পনয় আমি ঠিক মত শুনি নি কিন্তু নেড়া চিনার গাছের ডগায় যে ষোড়শীর চাঁদ উঠেছে সেটা ঠিক লক্ষ্য করেছি। বৃকে যেটুকু রক্ত ছিল সেও যেন জমে গেল। কাল রাত্রে শব্দম এই চাঁদের—

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। আর্কে ঢোকে কার সাধ্য। ষোড়সওয়ার অনেক। তারা বেপরোয়া মাহুঘের ভিতর দিয়ে, উপর দিয়ে, তাদের জখম করে চলেছে আরও বেপরোয়া হয়ে আর্কের দিকে, আর আর্কের ভিতর থেকে আরেক বিরাট জনধারা বেরিয়ে আসতে চাইছে শহরের দিকে। দু-দিক থেকেই জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই এবং দুই জনোচ্ছাস মিলে গিয়ে যে খণ্ড খণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে কোনও দিকেই কেউ এগুতে পিছোতে পারছে না। অথচ চাপ দুদিক থেকে বেড়েই যাচ্ছে ক্রমাগত। কেউ যেন আপন সস্থিতে নেই।

এই প্রথম আমি আমার আপন সস্থিতে ফিরে এলুম।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, এ জনতা ভেদ করে মনস্থরের আসতে সময় লেগেছিল কেন?

হঠাৎ দেখি, দূরে তিন জন ষোড়সওয়ার জনতার উপর মাথা তুলে আর্ক থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসছে। তাদের গতি অতি মন্থর, কিন্তু দৃঢ়। মাক্সথানের সওয়ার নিষ্ক্রিয়, নিরুৎসাহে বসে আছে। দু-পাশের দুই সওয়ার বজ্রম না কি দিয়ে যেন নির্মমভাবে উন্নত জনতাকে খোঁচা দিচ্ছে, পথ করে দেবার জন্ত।

চাঁদের আলো মুখে পড়েছে। এ কি? এ তো জানেমন্!

চিংকার করে উঠেছিলুম, ‘জানেমন্, জানেমন্, জা—’

কে শোনে?

আমার শরীরে হাতির বল থাকলেও আমি তাঁর দিকে এগুতে পারতুম না। জনতরঙ্গের যে সামান্ত্রতম গতিবেগ সে আমাকে নিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে।

‘নিরঙ্কুশ ছুতীয়া শাবি বেঁধে আসছে দেখে নিপীড়িত জন পাছে অজান

হয়ে সর্ব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায় তাই ব্যঙ্গরাজ কিস্তিধিপতি মাঝে মাঝে অভাগার কপালেও লক্ষীর অঞ্চল বুলিয়ে দেন। আমি জনপীড়ায় অনিচ্ছায় মরছি শহরের দিকে, জানেমনের গতিও সেদিকে—যদিও তিনি অনেক দূরে। একটুখানি কম ভিড়ে পৌঁছতেই আমি নেমে গেলুম রাস্তার পাশের বরফ-জমা নয়ানজুলিতে। সেখানে তাঁর পৌঁছতে লাগল যেন অনন্তকাল। চার-পাঁচ জন লোক তাঁর ও অগ্নি দুই ঘোড়সওয়ারের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছে—এদের দলেরই হবে। এদেরই একজন আমাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানেমনকে ডেকেছিলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় নি।

জানেমনের মুখের দিকে আমি এক লহমার তরে তাকিয়েছিলুম।

বিকৃত, বিকট, বীভৎস—যেন এর কোনটাই নয়—কিংবা সব কটাই—তিনি কিন্তু সেগুলো যেন সংহরণ করে নিয়েছেন রুদ্ররাজ পুষনের মত। এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরে বাম গালে জমে আছে।

তিনি নেমে আমাকে বৃকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর হৃদস্পন্দন আমি অহুভব করতে পারি নি। শুনেছি, ঘোঁসার নাকি স্বেচ্ছায় সেটা বন্ধ করে দিতে পারেন। মনে হল, তিনি স্বেচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে!

ঘোড়সওয়াররা আর্কের দিকে ফিরে গেল। সঙ্গীরা পিছনে পিছনে এল। তাদেরই একজন শুধু বার বার বিড়বিড় করে বলছে, ‘আমার কোনও দোষ নেই।’

জানেমন আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যে ভাবে দৃঢ়পদে চলেছেন তাতে আমাকেই জ্যোতিহীন বলে মনে হবে। তিনি কোনও কথা বলছিলেন না। তবু বুঝলুম, তিনি আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে শুধু আমার ডান হাতখানা তাঁর বৃকের উপর চেপে ধরছিলেন। আমার অশান্ত ভাব দেখে শেষটায় বললেন, ‘শব্দনম আর্কে নেই। তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।’

বাড়িতে ঢুকলে আবাস কান্নার রোল পড়ল। শব্দনমের বাড়ি ফেরার ক্রীণতম আশাটুকুও আমাদের গেল।

জানেমন্ বললেন, ‘বাছা, এবার নমাজের সময় হয়েছে। তুমি ইমাম হও।’

ব্যয়োজ্যেষ্ঠ সচরাচর নমাজের ইমাম—অধিপতি—হন। বিকলাঙ্গ হন না। আমি আপত্তি জানাতে তিনি উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, ‘আর, নমাজের শেষে দোওয়া মাঙ্‌বার সময় কোনও কিছু চেয়ে না। ঠাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তাই দেব।’

আল্লার উপর আভমান !

মনসুরের কাছে সব স্তনলুম।

বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ছিল না—জানেমন্ যখন সেখানে পৌঁছন। বাচ্চার খাস কামরার দিকে তিনি রওয়ানা হলে কেউ বাধা দেয় নি।

মনসুর বললে, ‘আপনি জানেন না, হুজুর, এদেশের লোক বড় সাহেবকে কি সম্মানের চোখে দেখে। শুধু কি বাচ্চার জন্মভূমি?—ময়মনা হিরাত, মজার বদখশান সর্বত্রই লোকে জানে তিনি সূফী, তিনি আল্লার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ডাকাতদের ভিতরও জাফর খান কি সহজে অত ঘোরতর পায়ণ্ড খুঁজে পেয়েছিল যারা শব্‌নম বীবীকে ধরে—’ ঢোক গিলে বললে, ‘আমি বলছি, নিয়ে যেতে ! এবং তারাও কি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে ?’

‘বড় সায়েব বাচ্চার খাসকামরায় শব্দ শুনে বুঝলেন, মোল্লারা সেখানে জমাআং। এরা কাবুল শহরের সব চেয়ে অপদার্থ। আমান উল্লার আমলে এরা প্রায় ভিক্ষা করে জিন্দগী চালাচ্ছিল। এদের কোন গোঁসাই বড় সায়েবের হুন-নেমক খায় নি—তিনি তো দানের সময় পাত্ৰাপাত্ৰ বিচার করেন না।

‘বড় সায়েব সেখানে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন।

‘সে আমি আপনাকে বলতে পারব না, হুজুর ; এ তো গালগালাজ, চিংকার চেঁচামেচি নয়। তিনি শাস্ত, দৃঢ়, উচ্চকণ্ঠে যেন আল্লার হয়ে পৃথিবীর সর্ব নরাধম পশুকে তাদের জন্য ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছিলেন।

‘হঠাৎ তাঁর বন্ধ চোখ ফেটে রক্ত বেরল। আমার শোনা কথা, ঘোঁবনে চোখের অপারেশন প্রায় শুকিয়ে গিয়ে জ্যোতি ফিরে পাবার মুখে তাঁর গলায় কি আটকে গিয়ে তিনি বিষম খান। তখন ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই হয় সর্বনাশ। আজ আমি দেখি, কোনও কিছু না, হঠাৎ বন্ধ

চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

‘পাপ-পুণ্যের কি জানি, হজুর? আপনার কাছেই তো শিখছি। জানি কুমারী, বিধবা কোনও অবলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া পাপ—আর ইনি তো বিবাহিতা রমণী। মোল্লারা, ওই অপদার্থ মোল্লারা—’

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, ‘সব মোল্লাই কি—?’

বললে, ‘সে আমি জানি, হজুর। আপনিও তো একদিন ক্লাসে নিজেকে মোল্লা বংশের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমিও মোল্লা, মোল্লার বেশে ওইখানে গিয়েছিলুম বলে।

‘সেই মোল্লাদের প্রবীণ যিনি, তাঁর আদেশে বড় সাহেবকে একটা কুঠরিতে নিয়ে বদ্ধ করে রাখা হল। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর সে বললে, “কি বলতে কি বলে ফেলবেন ইনি। হাজার হোক নতুন বাদশাকে চটিয়ে লাভ কি?” হয়তো এরা সত্যই আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল।

‘ফরসা লোকও ভয়ে পাংশু হয়—নির্লজ্জও লজ্জা পায়।

‘সে সব কথা থাক।

‘সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ খবর এল—কি করে, কোথা থেকে জানি নে, শব্দনম বীবী জাফর খানকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন।

‘হজুর, আপনি শক্ত হন।

‘আর জাফরের যে দেহরক্ষী শব্দনম বীবীকে বন্দী-খানায় নিয়ে যাচ্ছিল সে ও শব্দনম বীবী দুজনেই অস্ত্রধর্মান করেছেন।’

আমি বেরুবার জন্ত তৈরী ছিলাম। বললুম, ‘বৎস, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। এখন তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি সন্ধ্যানে বেরই।’

সে বললে, ‘আপনি সব কথা শুনে নিন। বড় সায়েব সেই হুকুম করেছেন।

‘যে রক্ষী শব্দনম বীবীকে নিয়ে যাচ্ছিল সে এখন বড় সায়েবের পা ধরে কাঁদছে। তাকে ডাকব, না আমি বলব? আদেশ করুন।’

আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

বললে, ‘ওর বাপদাদা সায়েবের হুন খেয়েছে কান্দাহারে। সে ডাকাত হয়ে বাচ্চার দলে ভিড়েছে। সে যা বলেছে তার মূল কথা শব্দনম বীবীকে প্রথমটায় একটা কুঠরিতে বদ্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যার দিকে জাফর তাকে ডেকে পাঠায়। জাফর সে ঘরে একা ছিল। ভিতরে কি হয়েছিল কেউ বলতে পারবে না একমাত্র শব্দনম বীবী ছাড়া। হঠাৎ একটি মাত্র গুলি হোড়ায় শব্দ

হল। দেহরক্ষীর দল যা দেখবে ভেবেছিল, তার উদ্দেশ্যে। জাফর খান ভূঁয়ে লুটিয়ে আর শব্‌নম বীবীর হাতে পিঙ্কল। হাসান আলী—আমাদের এই রক্ষী—বললে, সে কিছুই জানত না। আর পাঁচজন রক্ষীর সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে এই প্রথম দেখলে তার মনিবদের ঘরের মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে।

‘হাসান আলী ডাকাত—আহাম্মুথ নয়। সে তখন নাকি শব্‌নম বীবীকে বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়ার ভান করে আর্কের দেউড়ির দিকে রওয়ানা দেয়।’

মনে পড়লো, শান্তির সময়ও জানতুম না, শব্‌নমকে কোথায় খুঁজতে হবে।

‘ইতিমধ্যে বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ফিরেছেন এবং তার কিছুক্ষণ পর হাজার হাজার লোক, এবং শত শত ঘোড়া-গাধা-খচ্চর চড়ে গাঁয়ের লোক এসেছে নূতন বাদশাকে অভিনন্দন জানাতে—সোজা ফার্সীতে বলে, ইনাম, বখশিশ, লুটেরা হিত্তা কুড়োতে। এরা একবার আর্কে ঢুকতে পারলে বেশ কিছুটা খণ্ড-যুদ্ধ লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। জাফর খান তাই আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল, জনতা ভুর্গে ঢোকবার চেষ্টা করলে তাদের যেন ঠেকানো হয়। লেগে গেল ধুম্‌ধাম। আপনি তার শেষটুকু দেখেছেন, হজুর—বুঝুন তখন কি হয়েছিল।

‘বাচ্চা ফিরতেই মোজারী তাকে সব-কিছু বলে শব্‌নম বীবীকে ছেড়ে দিতে বলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাকি খবর আসে জাফর খান খুন হয়েছে। এবং আশ্চর্য, শব্‌নম বীবীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চার হুকুমে সমস্ত আর্ক তন্ন তন্ন করে তালাশ করা হয়েছে।’

আমি শুধালুম, ‘হাসান আলী কি বলে?’

‘ওই এক কথা—“আমার কোনও দোষ নেই, আমার কোনও কসুর নেই।” ভিড়ের চাপে নাকি একে অন্তর কাছ থেকে ছিটকে পড়ে।’

‘সে কতক্ষণ হল?’

‘ঘণ্টা দুই হবে। আপনি তো সে ভিড়ের এক আনা পরিমাণ দেখলেন।’

‘হাসান আলীকে ডাক।’

এল। আমার বা জানার সব চেয়ে প্রয়োজন সে কি আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে জিজ্ঞেস করি নি। ওই এক কথা। হাসান আলী হঠাৎ দেখে, শব্‌নম বাচ্চা তার কাছে নেই—ওই এক কথা।

আমি মনসুরকে বললুম, ‘চল।’

দেউড়িতে এসে মনসুর শুধালে, ‘কোথায় যাবেন, হজুর?’

তাই তো। কোথায় যাব? ‘চল, আর্কে। না। চল, আকুর রহমান কোথায় দেখি।’

কর্নেলের বাড়ি পৌঁছতে মনসুর লেখানে খরর নিলে। যখন ফিরলো তখন তার মুখ থেকেই আমি বুঝতে পারলুম, কোনও খবর নেই। মনসুর কিছুক্ষণ পরে বললে, ‘কর্নেলের বীবী আপনাকে বলতে বললেন, শব্দম বীবীকে লুকোবার প্রয়োজন হলে তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁদের গাঁয়ের বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ।’ তার পর মনসুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ‘কর্নেলের মত সজ্জন লোক মারা গেলেন যুদ্ধে—আর বেঁচে রইল এই ডাকাতরা।’ তারপর বিড়বিড় করে জুলপাঠ্য বই থেকে বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করল, ‘তব্বী কুমারী লজ্জা নিবারণের ট্যানা নেই বলে বাড়ি থেকে বেরতে পারছে না, আর ওদিকে বড় লোকের কুকুর মথমলের বিছানায় শুয়ে আছে। হে সংসার, আমি তোমার মুখের উপর থুথু ফেলি।’

আমি কি বলব, কি ভাবব। মনসুরের দার্শনিক কাব্যবৃত্তি আমার ভালোও লাগে নি মন্দও লাগে নি।

মনসুর শেষ কথা বললে, ‘কিন্তু দেখুন হজুর কর্নেলের স্ত্রী ভেঙে পড়েন নি।’

আমি গুরু সে শিষ্য।

মনে নেই, হয়তো কোনও দিন ক্লাসে চরিত্রবল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলুম।

আকুর রহমান বাড়ি ফেরে নি।

কাবুল নদীর পোলের উপর তার সঙ্গে দেখা। গায়ে ওভারকোট নেই। বাকি জামা-কাপড় টুকরো টুকরো। মনসুর তার সঙ্গে কথা বললে। বলায় শোনার কিছু নেই। আকুর রহমান ঘণ্টা তিনেক ওই জনসমুদ্র মন্বন করেছে। গালে, বাহুতে, হাতের কাছে জখমও তার দেখতে পেলুম। কোনও গতিকে পা টেনে টেনে চলে আসছিল। কিছুতেই বাড়ি যেতে রাজী হল না।

আর্কের সামনে ছুটি-একটি লোক। সেখানে মার্শল ল। পাঁচজনের বেশী একত্র দেখলে সাদ্রীদের গুলি চালানোর হুকুম। জায়গাটা এখন প্রায় ফাঁকা।

আকুর রহমান মনসুরকে বললে, ‘হজুরকে বলুন, এ জায়গার সব তর্র তর্র করে দেখেছি। এই পেয়েছি।’

তাকিয়ে দেখি আমার পাঞ্জাবির—আমারই হবে—এক পাশের হেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে একটি পকেট। এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়াল পাঞ্জাবি হয়

না। এটা শব্দন আমার কাছ থেকে নমুনা হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল, একদিন ওইটে আমার ঘরে পরেছিল।

এইটে পরেই কি সে আর্কে এসেছিল ?

দয়াময়, দয়া কর।

অনেকক্ষণ পর মনসুর যুগ্মস্বরে ফের শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হজুর ?'

'তোমার বাড়ি।'

ভারি খুশী হয়ে বললে, 'তাই চলুন হজুর।' আমি তাকে খুশী করার জন্য প্রস্তাবটি করি নি। তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। নেমক-হারামী ? হ্যাঁ। কিন্তু আমি একা, একবার নিজের সঙ্গে একা হতে চাই।

আলুর রহমানকে নিয়েও বিপদ। শেষটায় যখন বললুম, কর্নেলের ছেলেকে বলিয়ে রাখার হুক আমাদের নেই—তার মা ওদিকে হয়তো ব্যাকুল হচ্ছেন তখন সে রাজী হল। বাড়িতে ঢোকবার সময় হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটল। কেন ? হায় রে ! যদি বাবী সায়েবা ওই বাড়িতে ওঠেন।

মনসুর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, সে জানে, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি। আগের রাতে কতখানি খেয়েছিলুম, সে পাশে বসে দেখেছে—সে তো বরের খাওয়া !

তার প্রত্যেকটি কথা আমার বুকে বিঁধছিল। কেন সে কাল রাত্রে কথা আমাকে স্মরণ করায় ? আমি বললুম, 'বাবা, আমি এখন কিছু খেতে গেলে বমি হবে।'

কোথায় যাই ? কোথায় সন্ধান করি ? কোথায় গেল সে ? একটা মাহুফ কি করে হঠাৎ অদৃশ্য হতে পারে ? কেন দেখা দিচ্ছে না ? জাফরকে খুন করল কাদের ভয়ে ? খবর পাঠাচ্ছে না কেন ? আমাকে জড়াতে চায় না বলে ? কিংবা—কিংবা—না, না, আমি অমঙ্গল চিন্তা করব না।

এই দুপুর রাতে কার কাছে গিয়ে আমি সন্ধান নিই ? কড়া নাড়লে তো কেউ দরজা খুলবে না। নিশ্চয়ই ডাকাত—বাচ্চার ডাকাত। গৃহস্থ গুলি ছুঁড়তে পারে। তা ছুঁড়ুক।

মাত্র একটি প্রাণীর কথা মনে পড়ল। শব্দন বিশ্বের রাতে বলেছিল—না পরে ? আমার যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—যে তার সঙ্গীদের সে ভুলে গিয়েছে। তখন একজনের নাম ও করেছিল। সে-ই তা হলে সব 'চেয়ে তার প্রিয় সঙ্গী। ছাড়াটা আবছা-আবছা চিনি—স্বামীর নাম থেকে। তখন শুনেছিলুম কান না

দিয়ে। সেখানেই বাই। আর্কের অতি কাছে। হ্যা, হ্যা আশ্রয় নিতে হলে সেই তো সব চেয়ে কাছে।

আর্কের কাছে এসেছি। ক্লান্তিতে পা দু-খানা অবশ হয়ে এসেছে—না শীতে। হঠাৎ মনে হল, শব্দম যদি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে থাকে? হে খুদা! পাগলের মত ছুটলুম বাড়ির দিকে।

বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছি। কেউ ছাড়তে চায় নি। জানেনন্ শুধু বলেছিলেন,—‘বে-ফায়দা, বে-ফায়দা।’ কিন্তু ঠেকাবার চেষ্টা করেন নি।

বাঁচালে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। রাত কটা হল? ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি। চাঁদটা কাল-রাতের কথা বড্ড বেশী স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন আমার আপন মন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে কিছু কল্পন করছে!

কাবুলে দিনদুপুরেও অপরিচিত জনকে কেউ কোনও বাড়ি বাতলে দেয় না। কে জানে তুমি কে? হয়তো রাজার গুপ্তচর। তার বিপদ ঘটাতে এসেছ। বন্ধুজন যদি হবে তবে তো বাড়ি তোমার চেনা থাকার কথা।

এ-রাজা আবার ডাকু। বেধড়ক লুটপাট হচ্ছে। তাব উপর রাত দুপুর। তিনটেও হতে পারে।

তবু বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলুম। দরজাও খুলেছিল।

শব্দমের নব বর গভীর রাতে নিজের থেকে এসেছে—বার সঙ্গে কোনও চেনা-শোনা নেই। আনন্দোন্মত্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরা আর সব খবর ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। শোকে আনন্দে মিশিয়ে তারা আমাকে যা অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে-রকমধারা অপরিচিতের বাড়িতে কেউ কখনও পার আমি কল্পনাই করতে পারি নি। মুকুব্বীরা কেমন যেন অপরাধীর মত লান হাসি হেসে আমাদের একা রেখে চলে গেলেন। সখীর স্বামী বয়সে কম হলেও বিচক্ষণই লোক। আমাকে সখী—গুল-বদন বাহুর কাছে বসিয়ে কি একটা অছিলা করে উঠে গেলেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি—শাস্ত্রে নিশ্চয়ই বারণ—তবু সে আমাকে একা পাওয়া মাত্রই আমার হাত দু-খানা নিজের হাতে তুলে চোখে ঠেকিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে সে কত সুখস্বপ্ন দেখেছিল সে-কথা বলতে বলতে বার বার তার গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর কখনও বা হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

‘কোথায় যেতে পারে? তাকে কে না স্থান দেবে? কিন্তু আমার বাড়িতে না এসে সে অন্য কার বাড়িতে যাবে? আমার শত্রুর তার জ্যেষ্ঠার

বিশেষ বন্ধু।’

হঠাৎ তার কি খেয়াল গেল জানি না। বলে উঠল, ‘তাই হয়তো হবে, হ্যাঁ, তাই।’ যেন আপন মনে চিন্তা করছে। আমি কোনও কথায় বাধা দিই নি। পাছে সামান্ততম কোনও দিকনির্দেশ তারই ফলে কাটা পড়ে যায়, এবং পরে সেটা তার স্মরণে না আসে।

বললে, ‘তাই বোধহয় সে তার অতি অল্প চেনা কোনও লোকের বাড়িতে গিয়েছে।’ একসঙ্গে দু-জনাতে বলে উঠলুম, ‘তাহলে খোঁজ নেব কোথায়?’

গুল-বদন বাহুর শোক, হুশিয়ারতা, উদ্বেগের গভীরতা আমার ভাগ্য নিপীড়নের কাছে এসে দাঁড়াল যেন একাত্মদেহ স্থায় মত। এ তো সান্ত্বনানয়, প্রবোধ-বাণী নয়, এ যেন আমার হয়ে আরেকজন আমার সমস্ত দুর্ভাবনা আপন কাঁধে তুলে নিয়ে দূর-দূরান্তে তাকিয়ে দেখছে, কোথায় গিয়ে সে তার নামানো যায়।

‘কিন্তু খবর পাঠাচ্ছে না কেন? ধরা পড়ার ভয়ে, স্বেযোগ পায় নি বলে? কেউ তাকে আটকে রেখে স্বেযোগ দিচ্ছে না বলে?’—আপন মনে গুল-বদন বাহু কথা বলে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার হাত দুখানা আপন হাতে তুলে নিচ্ছে।

‘এই আমাদের প্রথম দর্শন—আর শব্দনয়ম কাছে নেই।’

এবার সে কৈদে ফেললে।

তার স্বামী আপন হাতে খুঁজায় করে রুটি-গোস্ত নিয়ে এসেছেন। চাকরের মত হাত ধোবার জাম-বাটি ধারায়ন্ত্র নিয়ে এলেন তারপর। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি ওঁকে শাস্ত করবে, না, তুমিই ভেঙে পড়ছ।’ অতি শাস্তকণ্ঠে, কোনও অস্বযোগ না করে।

আমি বললুম, ‘আমার বমি হয়ে যাবে।’

সেই কণ্ঠেই বললেন, ‘তা যাক। ষেটুকু পেটে রইবে সেইটুকুই কাজে লাগবে।’

পাশে বসে বাঁ হাত দিয়ে পিঠে হাত বুলতে বুলতে ডান হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলে দিয়েছিলেন। গুল-বদন সামনে এসে হাঁটু গেড়ে খাড়া গোড়ালির উপর বসে সামনে তোয়ালে ধরে দাসীর মত সেবার অপেক্ষা করছিল।

এরা বড়লোক। সেবা করার স্বেযোগ পেলে এরা জয়দাসকে হার মানায়।

আমি বললুম, ‘এবার উঠি।’ আমার সব শোনা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে গুল-বদন বাহু বাহুর উপরে কাগজ রেখে পরিষ্কার গোটা-গোটা অক্ষরে গুল-বদন বাহুর সন্তান-অসন্তান সব পরিচিতির কিরিস্তি তৈরী করেছেন। স্বামী

মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করলেন। গুল্-বদন বার বার আমাকে বললে, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। এসব জায়গায় আমার শওহর—স্বামী—যাবেন।' তার স্বামী স্বল্পভাবী। বললেন, 'এ বাড়িতে আমার কোনও কাজ নেই। আমি ছোট ছেলে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার কোনও ক্রেটি হবে না। আমাহুল্লার পরিত্যক্ত যেসব সত্যকার ভালো গোয়েন্দা ছিল তারাই আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কঠিন কাজ। আমি শব্দনম বীবীকে চিনি। তিনি যদি মনস্থির করে থাকেন কেউ যেন তাঁর খবর না পায়, তবে তিনি এমনই পরিপাটিক্রমে সেটা করবেন যে সে গিঁঠ খোলা বড় কঠিন হবে।'।

আমি ধন্যবাদ জানাই নি। উঠে দাঁড়ালুম। গুল্-বদন চোঁচিয়ে উঠলেন, 'এ রাতে আপনি কোথায় যাবেন? ঝড় উঠেছে।'।

তার স্বামী বললেন, 'চলুন।' চকমেলানো বাড়ির চত্বরে নামতে দেখি, উপরের বহু ঘরে আলো জ্বলছে। মুকুব্বীরা জেগে আছেন।

চত্বরেই বুলুম ঝড় কত বেগে চলেছে। যদিও চতুর্দিক তিনতলা ইমারতে ইমারতে নিরস্ত্র বন্ধ।

দেউড়ি খুলতেই আমরা ব্রিজার্ডের ধাক্কা পিছিয়ে গেলুম। বরফের সাইক্লোন। সামনে এক বিষতও দেখা যায় না।

স্বামী বললেন, 'আপনি না দেখলে বিশ্বাস না করে ঘরের ভিতর শুধু ছটফট করতেন। এবারে চলুন। ঘরে গিয়ে আলো নেবাই। না হলে মুকুব্বীরা জেগে রইবেন।'।

প্রথম আঘাতে মানুষ বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর আসে ভাগ্যবিধাতার উপর দ্বিধাদিকৃশ্ণ অন্ধ ক্রোধ। তারপর নির্জীব অসাড়তা।

কিন্তু সে জাভো নিজা আসে না।

দেশের মেঘলা ভোর তবু বোঝা যায়। এ দেশে বরফের ঝড়ের পিছনে সুর্যোদয় পক্ষেদ্রিয়াতীত ষড়মন্ত্রযোগে অসম্ভব করতে হয়।

ওরা বাধা দেয় নি। ঝড় থেমেছে কিন্তু যেভাবে একটানা বরফ পড়ছে তার ভিতর আমি কিছুতেই বাড়ির পথ খুঁজে পেতুম না। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, পথপ্রদর্শক আমাকে ঠিক উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! এমন জিনিসও মানুষ এসময় ভোলে! গুল্-বদনের ফিরিস্তি লঙ্ঘন নি!

আমি কোথায় পৌঁছলুম?

বিরহের দিনে শব্দনম বলেছিল, ‘তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।’ আমি তার সে আদেশ পালন করেছি। বিধাতা ঘাড় খরে করিয়েছিলেন।

যখন চিরন্তন মিলনের স্মৃতিস্বপ্ন সে দেখেছিল তখন সে বলেছিল—‘ওই—তার শেষ কথা এখনও স্পষ্ট স্মরণে পাচ্ছি—‘তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।’ এ কথা স্মরণ হলে ভাগ্য-বিধাতার মুখ-ভেংচানি দেখতে পাই।

কিন্তু শব্দনম তার কথা রাখে নি। সে তার শেষ আদেশ দিয়ে গিয়েছিল, আমি যেন বাড়িতে থাকি, সে ফিরে আসবে। সে আসে নি।

ক’ বছর হল, আকবুর রহমান?

কাবুল শহর আর তার আশ-পাশের গ্রামে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। লিগেশনের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে বার বার পরিষ্কার বললেন, সে আর্কের ভিতর নেই। আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর গুপ্তচর তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। আমার সামনেই তাকে তিনি ক্রস করলেন। এমন সব অসম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন যেগুলো কখনও আমার মাথায় আসত না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, অহুসঙ্কানে কণামাত্র ক্রটি হয় নি।

তার কিছুদিন পর তিনি একজন একজন করে তিনজন চর পাঠালেন। এরা কাবুল শহর ও উপত্যকার সব কটা গ্রাম ভালো করে দেখে নিয়েছে। ওগুলো আমি নিজে অহুসঙ্কান করেছি বছর। কোনও কোনও গ্রামে আমার আপন ছাত্র আছে। মনসুরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় থানা-তালাশী হাট-মাঠ তালাশী সব-কিছু করেছে, কিন্তু আমার সামনে আসে নি—মনসুরকে নিষ্ফলতা জানিয়ে গিয়েছে। আমাকে তাদের গ্রামে, তাদের গৃহে অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে দেখে তারা আমাকে কোথায় বসাবে, কি সেবা করবে ভেবে না পেয়ে অভিভূত হয়েছে। তিন শ’ বছর আগে ভারতবর্ষে গুরু তার শিষ্যগৃহে অবাচিত আগমন করলে যা হত এখানে তাই হল। তারও বেশী। গুরুপন্থীর অহুসঙ্কানে গাকিলি করবে এমন পাষাণ আফগানিস্থানে এখনও জন্মায় নি। লিগেশনের সব ক’জন চরই একবাক্যে স্বীকার করলে, তারা এমন কোনও জায়গায় যেতে পারে নি যেখানে আমি এবং আমার চেলারা তাদের পূর্বেই যায় নি।

এত দুঃখের ভিতরও মনসুর একদিন একটি হাসির কথা বলেছিল। তার ক্লাসের সব চেয়ে দুর্দান্ত ছেলে ছিল ইউসুফ। মনসুর বললে, ‘এই কাবুল

উপত্যকার প্রথম চেহি, প্রথম নাসপাতি—তা সে যেখানেই পাকুক না কেন—থায় ইউহুক। শব্দনম বীবী ইউহুকের চোখের আড়ালে বেশীদিন থাকতে পারবেন না। এ শহরের সব দুঁদে ছেলের সর্দার সে-ই। ওদের নিয়ে সে লেগেছে। কোন বাড়িতে কে বীবীকে লুকিয়ে রাখতে পারবে আর ক-দিন?’

আমি শুধালুম, ‘আর সবাই আমাকে দেখতে এল সে এল না?’

‘সে বলেছে খবর না নিয়ে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।’

আমি যে অবস্থায়, তখন আমার কাছে সম্ভব অসম্ভব কোনও পার্থক্য নেই। তবু জানি উপত্যকার বাইরে এখন কেউ যেতে পারে না, এবং বাইরের লোক আসতে পারছে না বলেই খাওয়াদাওয়ার অভাবে গরীব-দুঃখীদের ভিতর দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছে। সিগারেট তো কবে শেষ হয়েছে ঠিক নেই—চালান আসে হিন্দুস্থান থেকে—এ-বাড়ি ও-বাড়িতে তামাকের জন্ত হাত পাতা-পাতি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাবুলের পূর্বদিকের গিরিপথ বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ। পশ্চিমের পথে গজনীর ডাকাতির বসে আছে, বাচ্চা একটু বেখেয়াল হলেই উপত্যকায় ঢুকে লুটপাট আরম্ভ করবে এবং তার পর শহরের পালা। এই পশ্চিমের পথ দিয়েই আব্দুর রহমান গিয়েছে আওরঙ্গজেব খানকে খবর দিতে। যাবার সময় সে দরবেশের পোশাক পরে নিয়েছিল, এ ছাড়া আর কোনও মাহুষ ডাকাতদের হাতে থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

উত্তরের পথে বাচ্চা-ই-সকাওর গ্রাম। সে পথে তারই লোকজন ছাড়া কেউ আসা-যাওয়া করে না। দক্ষিণ দিকে পথ নেই, যেটুকু আছে তার উপর কত ফুট বরফ কে জানে!

পুষ্করের পক্ষে বেরনো অসম্ভব, দরবেশবেশী আব্দুর রহমানও শেষ পর্যন্ত কান্দাহার পৌঁছবে কি না সে নিয়ে সকলেরই গভীর দুশ্চিন্তা, মেয়েছেলের তো কঁথাই ওঠে না। এই কাবুল উপত্যকাতেই শব্দনম আছে, কিংবা—?

রাস্তায় যেতে যেতে একদিন দুই সম্পূর্ণ অজানা লোককে কথা বলাবলি করতে শুনেছিলাম। একজন বললে, ‘আওরঙ্গজেব খানের মেয়ে বোধহয় কোনও বাড়িতে—গ্রামেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বোধহয় খুন হয়েছেন।’

অন্যজন শুধালে, ‘তাকে খুন করবে কেন?’

সে বললে, ‘বাচ্চার ভয়ে, জাকিরের সঙ্গী-সাথী আত্মীয়স্বজনের ভয়ে। ধরা তো পড়বেই একদিন। তখন তার উপায় কী?’

আমি জানতুম বাচ্চা শব্দনম বীবীর সন্ধানের জন্তে কোনও হুকুম দেয় নি।

জাফরের আত্মীয়স্বজনের তার জন্ত রক্তের সন্ধানে বেরবার কথা ; তারাও বেরায় নি ।

কোন ভয়সায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলুম সে কথা বলতে পারব না । আপন পরিচয় দিয়ে তাদের করজোড়ে শুধিয়েছিলুম, তারা আমাকে কোনও নির্দেশ দিতে পারে কি না ? দুজনাই অত্যন্ত কুত্তিত হয়ে বার বার মাফ চেয়ে বললে, তারা সভাই কোনও খবর জানে না—চা-খানায় আলোচনার খেই ধরে নিজেন্দের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল মাত্র । দ্বিতীয় লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিকবার বললে, 'আমার বাড়িতে যদি কোনও মেয়েছেলে একবার ঢুকে আশ্রয় নিতে পারে, তবে আমি খুন না হওয়া পর্যন্ত তার দেখ-ভাল করব ।'

কোনও খবরের সন্ধানে মানুষ এ-দেশে যায় সরাইয়ে কিংবা বড়বাজারে । বাজার বন্ধ । সরাইয়ে নতুন লোক তিন মাস ধরে আসে নি । পূর্বনোরা আটকা পড়ে কষ্টেপ্রেটে দিন কাটাচ্ছে । সরাইয়ের মালিক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করলে । বললে, 'ইউহুক প্রায়ই এসে খবর নেয়, নতুন কোনও মুসাফির কোনও দিক দিয়ে শহরে ঢুকতে পেয়েছে কি না !' ওকে আমরা সবাই খুব ভালো করে চিনি । আগে এলে আমাদের ভিতর সামান্য সামান্য রব পড়ে যেত । এখন এসে একবার সকলের দিকে তাকায়, নতুন কেউ এসেছে কি না, আমাকে দু-একটি প্রশ্ন শুধায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায় । এই যে আমার চক্ষুর বরফজল জমেছে, আগে হলে ইউহুক স্কেটিং করে করে এখানে পুরো দিনটা কাটিয়ে দিত ।'

আমি তাকে শুধালুম, তার কি মনে হয়, শব্দ-ম কোথায় ?

অনেক চিন্তা করে বললে, 'দেখুন, আমি সরাই চালাই ! তার পূর্বে আমার বাবা সরাই-ই চালাতেন । আমার জন্ম ওই উপরের তলার ছোট্ট কুঠরিতে । চোর-ডাকু, পীর-দরবেশ, ধনী-গরীব দুয়-দরাজের মুসাফিরদের উপর কড়া নজর রেখে তাদের দেখ-ভাল করে আমার দাড়ি পাকল । আমাকে সব খবরই রাখতে হয় । আমি অনেক ভেবেছি । এই সরাইয়ে শীতের রাতে আগুনের চতুর্দিকে বসে দুনিয়ার বত গুলী-জানী ঘড়েল-বদমাশরা এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, কিন্তু সবাই হার মেনেছে ।'

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললে, 'একমাত্র জায়গা কোনও দরবেশের আস্তানা । সেখানে অনেক গোপন কুঠরি গুহা থাকে । রাজনীতির খেলায় কেউ সম্পূর্ণ হার মানলে হয় পালায় মক্কা-শরীফে—সময় পেলে—না হয় আশ্রয় নেয় দরগাহ-আস্তানায় ।'

আমি প্রত্যেক আন্তানায় একাধিকবার গিয়েছি।

আবার ভেবে বললে, ‘তা-ই বা কি করে হয়? বয়স্ক লোকদের কীকি দেওয়া যায়। কিন্তু বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনও জিনিস গোপন রাখা অসম্ভব। ইউহুফ যখন লেগেছে তখন—? না, সে হয় না। আপনিও তো প্রত্যেক দরগায় গিয়েছেন। পীর দরবেশরা অন্তত আপনাকে তো গোপন খবরটা দিয়ে আপনার এ যজ্ঞা থেকে মুক্তি দিতেন। দরবেশও তো মাহুয। দরবেশ হলেই তো হৃদয়টা আর খুইয়ে বসে না।’

বিদায় দেবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বার বার সহৃদয় নিশ্চয়তা দিলে, যে-কোনও সময়ে কোনও দিকে যদি সে খবর পায় তবে নিজে এসে আমায় খবর দিয়ে যাবে।

জীবনই অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতাই জীবন। অভিজ্ঞতাসমষ্টির নাম জীবন আর জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে এক-একটি অভিজ্ঞতা। এক-একটি অভিজ্ঞতা যেন এক ফোঁটা চোখের জলের রুদ্রাক্ষ। সব কটা গাঁথা হয়ে যে তসবী-মালা হয় তারই নাম জীবন।

একটি অক্ষ দিয়েই আমার সম্পূর্ণ মালা।

সেই অক্ষবিন্দুতে দেখলুম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বহুজনের মুখ। এরা কেন এত দরদী? এদের কী দায়, আমি শব্দমকে খুঁজে পেলুম কি না? আল্লা আমাকে মারছেন। তাই দেখে তো ভয় পেয়ে এদের উচিত আমার সঙ্গ বর্জন করা। কই, তারা তো তা করছে না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ল এদের এই অঞ্চলের একটি কাহিনী—

বাচ্চারা পেয়েছে বাদাম। ভাগাভাগি নিয়ে লেগেছে ঝগড়া। পণ্ডিত নসর-উদ্দীন খোজা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে করতে আল্লার প্রশংসাধ্বনি (হামদ) উচ্চারণ করছিলেন। ছেলেরা তাঁকে মধ্যস্থ মানলে ভাগ-বন্টন করে দেবার জন্ত। তিনি হেসে শুধালেন, ‘আল্লা যে ভাবে ভাগ করে দেয় সেই ভাবে, না মাহুযের মত ভাগ করে দেব?’ বাচ্চারাও কিংবা বলব বাচ্চারা ই আল্লার গুণ মানে বেশী, সমস্বরে বললে, ‘আল্লার মত।’

খোজা কাউকে দিলেন পাঁচটা, কাউকে ছুটো, কাউকে একটাও না। বাচ্চারা অবাক হয়ে শুধালে, ‘এ কি? একে কি ভাগ করা বলে?’ খোজা গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লা মাহুযকে কোনও কিছু সমান সমান দিয়েছেন কি না। সে-রকম সমান ভাগাভাগি শুধু মাহুযই করে।’

তাই বুদ্ধি করুণাময় আমার প্রতি অকরণ হয়েছেন দেখে মাহুব সেটা সহ্যহুত্ব দিয়ে পুথিয়ে দিতে চায়। তাই বুদ্ধি তিনি যখন বিধবার একমাত্র শিশুকে কেড়ে নেন তখন স্বপ্নদেবী তাকে বার বার মা-জননীর কোলে তুলে দেন। তাই বুদ্ধি সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিতে বার বার অসম্পূর্ণতা রেখে দেন—মাহুব যাতে করে সেটাকে পরিপূর্ণ করে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু আমার গুরু, আমার একমাত্র সাহেব, মুহম্মদ সাহেব যে বার বার বলেছেন, তিনি আল্লার পরিপূর্ণতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, শব্দর যে বলেন তিনিই পরিপূর্ণ সত্য, অথ সব মিথ্যা—তার কী ?

আমার এই দুঃসহ বিরহ-ভার আর অসহায় অনিশ্চয়তা ?

মিথ্যা।

মানলুম। কিন্তু এই যে এতগুলো লোকের অন্তরের দরদ তাদের কথায় ভাষায়, তাদের চোখের জলে টলটল করছে ?

মিথ্যা।

মানি নে। আল্লা যদি তাঁর পরিপূর্ণতা কোনও জায়গায় প্রকাশ করে থাকেন তবে সেটা দরদী হৃদয়ে। সৃষ্টির সঙ্গেকার সেই প্রাচীন কথা আজ কি আমাকে নূতন করে বলতে হবে, 'বরঞ্চ আল্লার মসজিদ ভেঙে ফেল কিন্তু মাহুবের হৃদয় ভেঙে না।'।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, বাসর রাতে লায়লী-মজনুঁ কাহিনী শেষ করেছিল শব্দনম ওই কথা বলে, পরমেশ্বর এ সংসারে স্বপ্রকাশ হয়েছেন একটিমাত্র রূপে—সে প্রেমস্বরূপ।

আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছিলুম।

জানেনমেনের ঘরে শব্দনমের সখী।

তিনি বললেন, 'সেই ভালো। ওকে নিয়ে যাও সখী সাহেবের কাছে।'।

পাগলকে মাহুব নিয়ে যায় সাধুসন্তদের কাছে। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি ?

সখীর বয় সঙ্গে চললেন। সখী অল্পবয়সের স্ত্রী বলে, 'কোথায় না তুমি জ্যোতিহীন বুদ্ধ চাচাশুশুরের সেবা করবে, না তিনি তোমার চিন্তায় ব্যাকুল।'।

স্বামী বললে, 'ধাক্ না এসব কথা।'।

এই প্রথম একটি লোক পেলুম, বিনি আমাদের কথা কিছুই জানেন না।

সব কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার চাচাখত্তর জানেন না, এমন কি কথা আমার আছে যা তোমাকে আরি বলব? তিনি সংসারে থেকেও বৈরাগী। তিনি 'স্বক' (পশম) না পরলেও স্কফী।'

আমি অভিযম বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।'

বললেন, 'তিনিই বা বলবেন কী, আমিই বা বলব কী? আমরা যা-কিছুই বলি না কেন, তুমি তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করবে তোমার মন দিয়ে। সেই মন কী, তুমি তাকে চেন? এ যেন একটা কাঠি দিয়ে কাপড় মেপে দেখলে বারো কাঠি হল। যদি সেই কাঠিটা কতখানি লম্বা সেটা তোমার জানা না থাকে তবে কাপড় মেপে বারো বার না বাইশ বার জেনে তো লাভ হল না। নিজের মন হচ্ছে মাপকাঠি। সেই মনকে প্রথম চিনতে শেখ।'

সখী বললে, 'সে মন চেনা যায় কী প্রকারে?'

স্বকী সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম।

বললেন, 'মনকে শাস্ত করতে হবে। বিষ্ণু জলরাশিতে বনানী প্রতিবিম্বিত হয় না।'

আমি শুধালুম, 'আরম্ভ করতে হবে কী করে?'

কণামাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'স্বকী-রাজ ইমাম গজালী সকল স্বকীদের হয়ে বলেছেন, "মন্দ আচরণ থেকে নিজেকে সংহত করে, বাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, নির্জনে চক্ষু বদ্ধ করে, অন্তর্জগতের সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্থাপনা করে, হৃদয় থেকে আল্লা আল্লা বলে তাঁকে স্মরণ করা।"'

আমার দিকে তাকিয়ে মুহূ হাসি হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি এখন আল্লার উপর বিরূপ। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বিরূপ ভাব তাঁর প্রেমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে—এ তার দম্ভ। কিন্তু সে-কথা এখানে অবাস্তব। তুমি সেদিকে মন দিতে চাও না, তবে আপন আত্মার দিকে সমস্ত চৈতন্য একাগ্র কর। সেই আত্মা—যিনি স্বথ-দুঃখের অতীত। হদীসে আছে, "মন অরফা নফ্-সুহ ফক্-ল অরফা রুকাহ।" যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।'

আরেকবার টোটেব কোণে মুহূ হাসি খেলে গেল।

'মন সর্বক্ষণ অন্ত দিকে যায়? তাতেই বা ক্ষতি কী? থাকে তুমি ভালোবাস তার সঙ্গে যদি একাত্ম দেহ হয়ে গিয়ে থাক তবে নিজের আত্মার দিকে, না তার দিকে মন বন্ধ করেছ তাতে কী এসে-যায়! সে তো শুধু নামের পার্থক্য।'

বেদনা আমার জিহ্বার জড়তা কেটে কেলেছে। বললুম, 'একাত্ম দেহ হতে

পারলে তার বিরহে বেদনা পেতুম না, তার চিন্তা অসহ্য হত না।'

গভীর সম্মেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নেই। ঠিক পথে চলেছ। একাধিক সূফী বলেছেন, আল্লার দিকে মন যাচ্ছে না আত্মার দিকে মন যাচ্ছে না—? নাই বা গেল। তোমার কাছে সব চেয়ে যা প্রিয় তাই নিয়ে ধ্যানে বস। সে যদি সত্যই প্রিয় হয় তবে মন সেটা থেকে সরবে কেন?—আর মূল কথা তো মনকে একাগ্র করা, অর্থাৎ মনকে শান্ত করা।

'আসলে কী জান, মন গল্গাফড়িঙের মত। ক্ষণে সে এদিকে লাফ দেয়, ক্ষণে ওদিকে লাফ দেয়। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে চায় না। কিংবা রলতে পার, কাবুল উপত্যকার চাষার মত ছায়ায় জিরোচ্ছে, কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতে-যেতেই রৌদ্রে গিয়ে কাজ করছে, ফের ছায়ায় ফিরে আসছে, ফের রৌদ্রে ফের ছায়া।

'তার গায়ে জর—তোমার মত। তাকে একনাগাড়ে সমস্ত দিন ছায়ায় শুইয়ে রাখতে হবে, তবে ছাড়বে তার জর।

'তোমার মন হবে শান্ত।'

সূফী সাহেব খামলেন। আমি সব-কিছু ভুলে গিয়ে শুখালুম, 'তার পর?'

ইচ্ছে করে অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'তার পর আর কি বাকী রইল? তখন মালিক যা করার করবেন। তুমি তখন শান্ত হুদ—মালিক তাঁর ছায়া ফেলবেন। তোমার অজ্ঞেয় অগম্য কিছুই থাকবে না।'

হেসে বললেন, 'তঁাকেও তো কিছু একটা করার দিতে হয়। সব দুর্ভাবনা কি তোমার?'

আমি সেই পুরাতন প্রশ্ন শুখালুম, যে প্রশ্ন আজ নয়—বহুকাল ধরে মনে জেগে আছে, 'বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা যখন চিন্তা করি, কল্পনাতীত অন্তহীন দূরত্বের পিছনে বিরাটতর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ যখন বৈজ্ঞানিকেরা দেয় তখন ভাবি, আমি এই কীটের কীট, আমার জন্তু আর কে কতখানি ভাবতে যাবে?'

সূফী সাহেব বললেন, 'সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার উপর। এই যে কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বললে—তুমি কল্পনা কর না কেন, তিনি আরও কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তা হলেই তো তিনি সম্পূর্ণ একটা ব্রহ্মাণ্ড তোমার—একমাত্র তোমারই—দেখাশোনার জন্তু মোতায়ন করতে পারেন। তা হলেই দেখতে পাবে লক্ষ লক্ষ ফিরিশত'-দেবদূত তোমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তোমার প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব রাখছেন হাজার হাজার দেবদূত, তোমার প্রতিটি কল্পনাক্রমের খবর লিখে

রাখছেন লক্ষ লক্ষ কিয়দশতা। আর তুমি যদি কল্পনা কর তোমার খুদা মাজ মশটা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তা হলে অবশ্য তুমি অসহায়।

‘কিন্তু তিনি তো অনন্ত-ব্রাহ্ম। তিনি সংখ্যাতীতের মালিক।

‘কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড চাও, একমাত্র তোমারই তদারকি করার জন্ত?’

আমি অভিভূত হয়ে তাঁর কথা শুনে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি আমাকে যেন সর্বদ্বন্দ্ব ধরে দিলেন এক ভীষণ নাড়া। বললেন, ‘কিন্তু এ সব কথা বুধা, এর কোনও মূল্যই নেই। কারণ গোড়াতেই বলেছি, আপন মনকে না চিনে সেই মন দিয়ে কোনও কিছু বোঝার চেষ্টা করা বুধা। তার প্রমাণস্বরূপ দেখতে পাবে, বাড়ি পৌঁছতে না-পৌঁছতেই তোমার গাছতলার ছায়ার চাষা আবার রোঁজ্রে ঘোরাঘুরি করছে—তোমার মন আমার কথাগুলোর দিকে আর কান দিচ্ছে না। এবং এগুলো আমার কথা নয়—বড় বড় সূফীরা যা বলেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি আমি করেছি মাত্র।’

আমি নিরাশ হয়ে বললুম, ‘তা হলে উপায়?’

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, ‘মনকে শাস্ত করা। আর ভুলে যেয়ো না, সাধনা না করে কোন কিছু হয় না। পায়লোয়ানের উপদেশ পড়ে মাংসপেশী সবল হয় না, হেকিমীর কেতাব পড়ে পেটের অস্থি সারে না। মনকেও শাস্ত করতে হয় মনের ব্যায়াম করে।

‘আর ঠিক পথে চলেছ কি না তার পরখ—প্রতিবার সাধনা করার পর মনটা যেন প্রফুল্লতর বলে মনে হয়। ক্লান্তি বোধ যেন না হয়। পায়লোয়ানরাও বলেছেন, প্রতিবার ব্যায়াম করার পর শরীরটা যেন হাল্কা, ঝরঝরে বলে মনে হয়।

‘না হলে বুঝতে হবে, ব্যায়ামে গলদ আছে।’

আমাদের সামনে হালুয়া ধরে বিদায় দিলেন।

আমরা আসন ছেড়ে উঠেছি এমন সময়ে তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বাক্সা, তোমার একটি আচরণে আমি খুশী হয়েছি। গ্রামের চাষা তিন মাস রোগে ভুগে শহরে এসে হেকিমের কাছ থেকে দাওয়াই নিয়েই শুধায়, “কাল সেরে যাবে তো?”—তুমি যে সে-রকম শুধাও নি, “কল পাব কবে?”

‘কল নির্ভর করে তোমার কামনার দৃঢ়তার উপর। দিলকে একরকম করে যদি প্রাণপণ চাও, তবে দেখবে নতীজা নজ্জিক্—কল সামনে।’

ধর্ম ধর্মে জ্বলনা করার মত মনের অবস্থা আমার তখন নয়। তবু মনে

পড়ে গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গুরুকে শুধিয়েছিলেন, “অনায়ালে সংস্কৃত কাব্য পড়তে পারব কবে?” তিনি বলেছিলেন, “তীত্র লংবেগানাম্ আসন্নঃ” অর্থাৎ “আবেগ তীত্র থাকলে ফল আসন্ন”।

তার পর বলেছিলেন, ‘শুধু ভাবার ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই এটা প্রযোজ্য—পতঞ্জলি বলেছেন “যোগস্থত্রে”, সাধনার ক্ষেত্রে।’

১৪ ॥

আমার মন শান্ত হয় নি, অশান্তও থাকে নি। আমার মানসসরোবরের জল—জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

ওদিকে কাবুলের বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। কাবুল উপত্যকার উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম গিরিপথে সঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ তুষারস্তুপও গলতে আরম্ভ করেছে। এবার জনগণের গমনাগমন আরম্ভ হবে। যে সব পণ্যবাহিনী এখানে আটকা পড়েছিল তারা হস্তে হয়ে উঠেছে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে বলে। কাবুল উপত্যকার বাইরে যারা আটকা পড়েছিল তারাও যে করেই হোক শহরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতিরও মরুমুম গরম হয়ে উঠবে। বাচ্চা বাছবল কাবুল উপত্যকার বাইরে সম্ভ্রাসারিত নয়। কাজেই দু-দলে লড়াই লাগবে মোক্ষম। তার কারণ এ দেশের ডাকাত আর বণিকে তফাত কম। যে দু-দিন পূর্বে বণিক ছিল সে কিছুটা পয়সা জমিয়ে ডাকাতের দল গড়েছে। আবার যে দু-দিন পূর্বে ডাকাত ছিল সে কিছুটা পয়সা করে আজ পণ্যবাহিনী তৈরী করেছে এবং এর পরও অন্ত এক শ্রেণীও আছে। এরা দুটো একসঙ্গে চালায়। পণ্যবাহিনী নিয়ে যেতে যেতে স্বযোগ পেলে ডাকাতিও করে।

কিন্তু এ সবেরে আমার কী?

আমার স্বার্থ মাত্র এইটুকুই—কাবুল উপত্যকা তো তন্ন তন্ন করে দেখা হয়ে গিয়েছে। এবার যদি বাইরের থেকে কোনও খবর আসে।

আব্দুর রহমান এখনও কান্দাহার থেকে কেয়ে নি। তার থেকেই আমার বোকা উচিত এখনও গমনাগমন অসম্ভব।

জানেনমের সেবা করতে গিয়ে বার বার হার মানি।

তিনি ডান হাত বাড়িয়ে বা দিকে কি যেন খুঁজলেন। আমি শুধালুম, ‘জানেনমা (আমাদের জান), কী চাই?’

‘না বাচ্চা, কিছু না।’

পীড়াপীড়ি করি। নিমকদান—সবশের পাজ।

শব্দনম জানত।

তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন ; আমি প্রভুত্বের দিতে পারি নে।

প্রতি পদে ধরা পড়ে সেবার কাজে আমার অনভ্যাস, অপটুত্ব। অথচ ঠিক সেই কারণেই আমি তাঁর কাছে পেলাম আরও বেশী আদর-সোহাগ। শিশুর আধো-আধো কথা শুনে পিতামাতা যে রকম গদগদ হয়, আমার আধো-আধো সেবা তেমনি তাঁর হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে যেন বান ডাকলে।

এক রকম লোক আছে যারা সর্বক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পর দেখা যায়, তারা কিছুই বলে নি। অল্প দল সংখ্যায় কম। এঁদের নীরবতা যেন বাস্তব। এঁরা নীরবতা দিয়ে এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেন যে, শুভ মুহূর্তে সেই ঘন বাস্পে তাঁরা একটি ফোঁটা বাষ্প-বারির ছোয়াচ দেওয়া মাত্রই আকাশ-বাতাস মুখর করে ঝরঝরধারে বারিধারা নেমে আসে।

এই রকম একটা সূযোগ পেয়ে আমি তাঁকে শুধালুম, ‘আপনি আমার শব্দর মশাইকে কোলে-পিঠে করে মাহুষ করেছেন। আমাকে বলুন তো, তিনি কান্দাহার যাওয়ার সময় বাড়িতে কেন হুকুম রেখে গেলেন, ডাকাতদের যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়?’

জানেনম বললেন, ‘আওরঙ্গজেব সাধারণ সেনাপতি নয়। প্রকৃত সেনাপতি যে রকম যুদ্ধ জয় করতে জানে, ঠিক সেই রকম জানে কখন আর জয়লাভ করতে নেই। সেই সময় সে যতদূর সম্ভব স্বল্প ক্ষয়ক্ষতি হতে দিয়ে সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গন থেকে হাট্টিয়ে আনে।

‘আওরঙ্গজেব জানত, বাধা দিলে এ বাড়ির কেউই প্রাণে বাঁচবে না। ওদিকে শব্দনমের উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। এ-সব ব্যাপারে সে যে-কোনও পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়।

‘একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, শব্দনম যদি অল্প কিছুক্ষণ জাকর খানকে আটকে রাখতে পারত, তা হলেই তো ততক্ষণে বাচ্চার হুকুম পৌঁছে যেত যে তাকে যেন নিরাপদে আপন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

‘স্বকৌণ্ডের অনেকেই তাই পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার বিশ্বাস করেন। সংকর্ম, অসংকর্ম, প্রয়োজনীয় কর্ম, অপ্রয়োজনীয় কর্ম বাই কয় না কেন, তার কলখরপ উৎপাদিত হবে নূতন কর্ম—এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকে সেই কর্ম-জিঞ্জিরা—চেন-অ্যাকশন। এই কিস্কণ্ডের অক্ষমতার কোনও আরগায় তো গি’ট খুলতে হবে।

না হলে এই অন্তহীন জপমালা তো ঘুরেই যাবে, ঘুরেই যাবে ; এর তো শেষ নেই।

‘অথচ এ-কথা আমি স্থির-নিশ্চয় জানি, শব্দনম ঠাণ্ডা-মাথা মেয়ে। কণিক উত্তেজনার সংবিৎ হারিয়ে উন্মাদ আচরণ সে করে না। নিশ্চয়ই কোন-কিছু একটা চরমে পৌঁছেছিল।’

আমি চিন্তা করে প্রত্যেকটি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি এমন সময় দাসীরা কলরব করে ঘরে ঢুকে বললে, একজন বোরকা-পরিহিতা রমণীকে হিন্দুকুশের গিরি উপত্যকায় দেখা গিয়েছে মজার-ই-শরীফের পথে যেতে।

চিংকার চেঁচামেচির মাঝখানে এইটুকু বুঝতে আমাদের অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল।

জানেনম্ন নীরব।

আমি তাড়াতাড়ি মনসুরকে চিঠি লিখলুম, সে যেন পত্রপাঠ ইউজ্জফকে সঙ্গে নিয়ে আসে। অল্প লোক পাঠালুম সরাইখানাতে।

কিন্তু শব্দনম আফগানিস্থানের উত্তরতম প্রদেশ সূদূরতম তীর্থ মজার-ই-শরীফের দিকে যাচ্ছে কেন? প্রাণরক্ষার্থে? সে কি জানে না জাফর খানের খুনের জঘ্ন বাচ্চা তার খুন চায় না?

ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর মনসুর এল। সন্মুখ সরাইওলাও স্বয়ং এসে উপস্থিত। ইউজ্জফ আসে নি। খবর পাঠিয়েছে, বহু বোরকা-পরা রমণী বহু তীর্থে একা একা যায়। এ রমণী কিছুতেই শব্দনম বাহু হতে পারেন না। আরও বলেছে, এ রকম গুজব এখন ঘড়ি ঘড়ি বাজারে রটবে—আমি যেন ও সবতে কান না দিই।

মনসুর বললে, ‘ইউজ্জফ তো আসবে না, পাকা খবর না নিয়ে। আমি এই গুজবটা শুনেতে পাই কাল। সঙ্গে সঙ্গে গেলুম সরাইয়ে। তার খবর পেয়েছে তার আগের দিন। তার পর গেলুম ইউজ্জফের কাছে। সে বললে, এসব পুরনো খবর। মিথ্যে—সে যাচাই করে দেখেছে। তার পর হজুর, আমাকে হিসবে করে দেখালে, কাবুল গিরিপথের বরফ গলতে যে সময় লাগে তার আগে সেটা ছাড়িয়ে কেউ হিন্দুকুশ পৌঁছতে পারে না। ও মেয়ে হিন্দুকুশ অঞ্চল থেকেই বেরিয়েছে। আরও অনেক কি সব প্রমাণ দিলে যেগুলো আমি বুঝতেই পারলুম না।’

সকলেরই এক মত। ও মেয়ে কিছুতেই কাবুল থেকে বেরোয় নি। ওর সন্ধান করতে বাওয়া আর চাঁদের আলোতে কাপড় শুকোতে দেওয়া—একই কথা।

আমি সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের যুক্তিহীন তর্ক এবং তর্কহীন নীরবতা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব তা সম্ভব হতে পারে বোঝাবার চেষ্টা করলে সবাই এমন সব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট আপত্তি তুললে যে শেষ-চায় আমি বেগে উঠলুম। তখন সবাই একে অন্তের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করে গেল।

আমি আমার আহাম্মুকি বুঝতে পারলুম। এদের না চটিয়ে এদের কাছ থেকে আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল, মজার-ই-শরীফ যাবার জন্য আমার কী প্রস্তুতির প্রয়োজন? এখন যখন শুধালুম, সবাই আশকথা পাশকথা বলতে বলতে বাড়ি চলে গেল।

কান্দাহার থেকে শব্দনমের কোনও খবর না পেয়ে শেষটায় স্বপ্নে প্রত্যাদেশ ভিক্ষে করেছিলুম, কান্দাহার যাব কি না, আজ রাতে ঠিক তেমনি সমস্ত হৃদয় মন চলে দিয়ে নামাজ পড়লুম মাঝরাত অবধি। বার বার কাতর রোদনে প্রভুকে বললুম, 'হে করুণাময়, আমাকে দয়া কর, আমাকে দয়া কর।'

সেবারে প্রার্থনাস্ত্রে যেন তাঁরই কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বপ্নে প্রত্যাদেশও পেয়েছিলুম, 'কান্দাহার যেয়ো না'—আমার তখন সেটা মনঃপূত হয় নি।

তাই কি করীম-করুণাময় আমাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন তাঁর কাহির-কদরূপে?

সমস্ত রাত চোখে এক ফোঁটা নিদ্রা এল না।

সমস্ত দিন কাটল ওই ভাবে। মাঝে মাঝে তজ্জা আসে। ঘুম প্রত্যাদেশ পাব আশা করে যেই স্ততে যাই, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব নিদ্রার অন্তর্ধান। তিন দিন পর যখন নির্জীব, ক্লান্ত দেহে প্রত্যাদেশের শেষ আশা ছেড়ে দিলুম সেদিন স্নিহিতা হল। আশা ছাড়লে দেখি ভগবানও সমঝে চলেন।

শব্দনম যে রকম পূব-বাঙলার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত—যখন-তখন পেশাওয়ার গিয়ে দিল্লী কলকাতা হয়ে পূব-বাঙলায় পৌঁছত, আমিও সে-রকম মজার-ই-শরীফের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতুম। প্রথম দিন সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যি জান না, হজরৎ আলী (কর'মজাহ ওয়া'জহাহ—আল্লা তাঁর বদন জ্যোতির্ময় করুন) মাঝা যান আরবভূমিতে এবং তাঁর গোর দেখানোই! অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকের মত বিশ্বাস কর তাঁর কবর উত্তর আফগানিস্তানে!'

আমি বললুম, 'বেথানে এত লোক তাদের শ্রদ্ধা জানায়, সেখানে না হয় আমি সেই শ্রদ্ধাটিকেই শ্রদ্ধা জানালুম।'

অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, 'তা হলে কাবুলী ম্‌টেমজুর যখন নতুন কোনও সোনা-বানানেওলা গুজরাতির মুর্শাদবাবাজীর সন্ধান পেয়ে তার পারের উপর গিয়ে আছাড় খায়, তখন তুমিও সেদিকে ছুট লাগাও না কেন? যত সব!'

আমি বললুম, 'মজার-ই-শরীফে কিন্তু ইরান-তুরান-হিন্দুস্থান-আফগানিস্থানের বিস্তৃত কবি জমা'অং হয়ে কবর-চত্বরে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন—মুশাইরা সেখানে স্ববো-শাম্।'

সঙ্গে সঙ্গে শব্দনের মুখ খুশীতে ভরে উঠল, 'তাই নাকি? এতক্ষণ বল নি কেন? চল।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন তদুত্তরেই আমাদের যাত্রারন্ত!

শব্দনের কাছে কল্পনা বাস্তবে কোন তফাত ছিল না। না হলে সে আমাকে ভালোবাসল কি করে?

আসলে আমার লোভ হত, হিউয়েন সাঙ তথাগতের দেশ ভারতবর্ষে যাবার সময় যে পথ বেয়ে মজার-ই-শরীফের কাছে বাহুলীক নগরী—আজকের দিনের বলখ—থেকে বামিয়ানের কাছে হিন্দুকুশ পেরিয়ে কপিশ—আজকের দিনে কাবুল শহর—এসে পৌঁছেছিলেন সেই পথটি দেখার। তখনকার দিনে তুবারভূমি (আজকের তুখার—স্থান) পেরিয়ে যখন বৌদ্ধ ভ্রমণ বাহুলীকে পৌঁছলেন, তখনই তাঁর চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি তাঁর অসহ পথভ্রম সার্থক মনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন একশত সজ্জারাম, তিনশত সুবির আর কত হাজার ভ্রমণ-ভিক্ষু কে জানে? এরই কাছে কোথায় যেন এক ভারতীয় মহাসুবির প্রজ্ঞাকরের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিজ্ঞ। আর বামিয়ানে পৌঁছে দেখেছিলেন, তারও বাড়া—হাজার হাজার—সজ্জারাম—পর্বতগুহার, সমতল ভূমিতে, উপত্যকায়। আর দেখেছিলেন, পাহাড়ের গায়ে দণ্ডায়মান, আসীন, শায়িত শত শত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধ-মূর্তি। শ'-হুশ' ফিট উচু!

তার পর তিনি পঞ্জাব হয়ে পৌঁছেছিলেন কাবুল উপত্যকায়।

যবে থেকে এখানে এসেছি সেগুলোর সন্ধান করেছি এখানে। এখানে কীর্তিনাশা পদ্মা নদী নেই, এখানে কোনও-কিছুই সম্পূর্ণ লোপ পায় না। নবীন যুগের অবহেলা পেলে এখানে প্রাচীন যুগ মাটির তলায় আশ্রয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে নবীনতর যুগের লোক শাবল-কোদাল নিয়ে তাদের সন্ধানে বেরবে।

তারও আগের কথা। আমি বাংলাদেশের লোক। হিউয়েন সাঙের

ভারতবর্ষ-পরিক্রমার সর্বশেষ প্রাচ্য-প্রান্ত ছিল বাংলা। বগুড়ার কাছে মহাশান-গড় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন বল্ম্ থেকে হিউয়েন সাঙ—আর কয়েক শতাব্দী পরে সেখানেই আসেন ওই বল্ম্ থেকে দরবেশ শাহ্ সুলতান বল্ম্—কত কাছাকাছি ছিল সেদিন বল্ম্ আর বগুড়া।

সেই ষেই ধরে ধরে দেখেছি বিক্রমশীলা, নালন্দা। কাবুলে আসার পথে ট্রেন থেমেছিল এক মিনিটের তরে তক্ষশীলায়। সেখানে নামবার লোভ হয় নি এ কথা বলব না। তারপর পেশাওয়ার—কনিষ্কের রাজধানী। সেখানেও সময় পাই নি। গান্ধারভূমি জলালাবাদে শুধু আখ খেয়েই চিত্তকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, এই আখ খেয়েই হিউয়েন সাঙ শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন। ভেবেছিলুম পরবর্তী যুগে এই যে আখের গুড় চীন দেশে গিয়ে রিফাইন্ড্ হয়ে ষেতবর্ষ ধরে যখন ফিরে এল, তখন চীনের স্মরণে এর নাম হল চিনি—তার পিছনে কি হিউয়েন সাঙ ছিলেন? একে উপহাস করেই কি আমাদের দেশে চীনের রাজার আম খাওয়ার গল্প হল?

আজ আবার এই সব কথা মনে পড়ছে। শব্দনম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত—পুব বাঙলায় তার স্বপ্তরের ভিটেয় পৌঁছবার পথে এগুলো পড়ে বলে।

কিন্তু যখন কাবুল ছেড়ে আচ্ছন্নের মত বেরলুম মজার-ই-শরীফের সন্ধ্যানে তখন এসব কিছুই মনে পড়ে নি। কী কাজে লাগবে আমার এই ‘পাণ্ডিত্য’র মধুভাণ্ড! জয়া-জীর্ণ অর্ধলুপ্ত বাড়ির নিচে লুকনো যে সোনার তাল আছে, সেটা কি তার সামান্ততম উপকারে আসে? ওর শতাংশ ব্যয় করে বাড়িটা মেরামত হয়, কলি ফেরানো যায়, সে তার লুপ্ত ষৌবন ফিরে পায়। শব্দনমই বলেছিল,

‘এত গুণ ধরি কী হইবে বল ছরবস্তার মাঝে,

পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন লাগে তার কোনো কাজে?’

কবিতা আমার মুখস্থ থাকে না। শুধু শব্দনমের উৎসাহের আতিশয্যে আমার নিকর্য্য স্মৃতিশক্তিও যেন ক্ষণেকের তরে জেগে উঠত। উদ্বৃত্তে বলেছিলুম,

দুর্দিনে, বল, কোথা সে স্মৃজন হেথা তব সাথী হয়

আধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় নয়!

তজ-দন্তীমে কোন কিস্কা সাত দেতা হৈ?

কি তারিকীর্মে সায়ানী জুলা হোতা হৈ হনসীসে!

আমার নিজের সামান্ত জ্ঞান, কাবুলে ফরাসী রাজদূতবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক

যিনি জলালবাদ-গাফার এবং হামিয়ানে খোঁড়াখুঁড়ি করে শত শত ক্ষত বৃহৎ অনিন্দ্যহৃদয় বুদ্ধমূর্তি বের করেছিলেন—তঁার দিনে দিনে দেওয়া অসংখ্য তথ্য ও ভক্তজ্ঞান, আমার কোনও কাজেই লাগল না।

কাজে লাগল সে এক সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

কাবুল ছেড়ে আসার পর, হিন্দুকুশের চড়াই তখনও আরম্ভ হয়নি, এমন সময়—বেশ কিছুক্ষণ ধরে—ক্ষণে ক্ষণে আমার সেই আচ্ছন্ন অবস্থার ভিতরও আমার মনে হতে লাগল, এ জায়গায় আমি যেন পূর্বেও একবার, কিংবা একাধিকবার এসেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা নাকি সকলের জীবনেই হয়—কেমন যেন স্বপ্নে না জাগরণে দেখা, আধচেনা-আধভোলা একটা জায়গা বা পরিবেষ্টনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় যে মানুষ পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর ভাবে, সামনের মোড় নেওয়া মাত্রই একেবারে সম্পূর্ণ এক চেনা জায়গায় এসে পৌঁছবে।

তাই আমি বিশেষ কোনও খেয়াল করি নি।

হঠাৎ মোড় নিতেই দেখি, হাতে ঝুলনো ট্রাউট মাছ নিয়ে একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—এ জায়গা আব্দুর রহমানের পঞ্জীর।

সামনেই বাজার। চুকেই বায়ে দজীর দোকান, ডাইনে ফলওলা—তারপর মুদী—সর্বশেষে চায়ের দোকান। নিদেন একশ'বার দেখেছি। দোকানীর মেহদী-মাখানো দাড়ি, কালো-সাদায় ভোরাকাটা পাগড়ি আব্দুর রহমানের চোখ দিয়ে আমার বহুকালের চেনা। আরেকটু হলেই তাকে অভিবাদন করে ফেলতুম। তার দৃষ্টিতে অপরিচিতের দিকে তাকানোর অলস কৌতূহলের স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে। এই চায়ের দোকানই আব্দুর রহমানের ফার্পো, পেলিটি।

আব্দুর রহমান নিরক্ষর। ফার্সী সাহিত্যে তার কোনও সঙ্গতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস অজানা পরিবেশ যদি শুদ্ধমাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ আটপৌরে শব্দের ব্যবহারে চোখের সামনে তুলে ধরাটা আটের সর্বপ্রধান আদর্শ হয়—বহু আলঙ্কারিক তাই বলেন—তবে আব্দুর রহমান অনায়াসে লোতি দোদে মমকে দোস্ত বলে ডাকবার হুকু ধরে। এ বাজারে প্রত্যেকটি দোকান আমার চেনা—আর এখানে দাঁড়ানো নয়, আব্দুর রহমান সাবধান করে দিয়েছিল—ওই যে কাঁচা-পাকা দাড়িওলা লোকটা তামাক খাচ্ছে, সে বিদেশীকে পেলেই ভ্যাচর ভ্যাচর করে তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

চায়ের দোকানে পেরোতেই বা দিকে যে রাস্তা তারই শেষ বাড়ি আকবুর রহমানদের। বাড়িতে সে নেই—কান্দাহারে। তার বাপকে আমি চিনি। ধরা পড়ার ভয় আছে।

সামনে খাড়া হিন্দুকুল। আকবুর রহমানদের মনে মনে সেলাম জানিয়ে একটু পা চালিয়ে তার দিকে এগোলুম।

হিন্দুকুলে এখনও বরফ তার সর্ব দার্ঢ্য নিয়ে বর্তমান। আসলে তার শরীর সার্বদানার চেয়েও শূন্য কণা দিয়ে তৈরি আর হিমকণারই মত নরম। কিন্তু বসন্ত-সূর্যও একে গলাতে পারে নি। শক্তকে ভাঙা যায়, নরমকে ভাঙা শক্ত।

ঝড়-তুফানে দিশাহারা হয়ে আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে দেখেছি, তখন জানতুম না যে এখানে পথ মাত্র একটাই, নিরুদ্দেশ হবার উপায় নেই। বামিয়ানেও পৌঁছলুম। বিরাট বুদ্ধমূর্তি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই চিনলুম, এ জায়গা বামিয়ান—না হলে কোনও জায়গার নাম আমি কাউকেও জিজ্ঞেস করি নি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে চেয়েছি, কেউ বোরকা-পরা একটি মেয়েকে একা একা মজারের পথে যেতে দেখেছে কি না? ‘হাঁ’, ‘না’, ‘কাবুলের দিকে গিয়েছে’, ‘না, মজারের দিকে গিয়েছে’, ‘কোন এক সরাইয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে’—সব ধরনের উত্তরই শুনেছি। দরদী জন আমাকে কাবুলে ফিরে যেতে বলেছে।

দেখি নি, দেখি নি, কিছুই দেখি নি। কয়েদীকে যখন পাঁচশ’ মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কি সে কিছু দেখে? সাইবেরিয়া নির্বাসনে গিয়েছেন সেরা সেরা সাহিত্যিক—তারা কিছুই দেখেন নি। না হলে শোনাতেন না?

হায় রে হিউয়েন সাঙ! স্মৃতির কপালে শুধু করাঘাত।

হিউয়েন সাঙ এ পথে যেতে ঝড়-ঝঞ্ঝার মৃত্যুযজ্ঞগায় একাধিকবার তাঁর জীবন কাতর রোদনে তথাগতের চরণে নিবেদন করেছিলেন। আমি করি নি। তার কারণ এ নয় যে আমি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের চেয়েও অধিক বীতরাগ—দুঃখে অহুঃশ্বাসন, স্বখে বিগতপূহ হয়ে গিয়েছিলুম। আমি হয়ে গিয়েছিলুম জড়, অবশ। ক্লোরোফর্মে বিগতচেতন রুগীর যখন পা কাটা যায়, সে যে তখন চিৎকার করে না তার কারণ এ নয় যে সে তখন কায়াক্লেসমুক্ত স্থিতধী মুনিপ্রবর। চিন্তামণির অধেষণে বিষমকল যা সব করেছিল সে সজ্ঞানে নয়—সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়। কী স্মরণ নাম চিন্তামণি! এ নাম বাঙালী মেয়ে অবহেলা করে কেন? অহল্যার মত ‘অসত্য’ ছিল বলে? হায়! আজ যদি ঐর শুদ্ধজ্ঞানের এক কণা আমি পেয়ে যেতুম।

ক্রমে আমার সময়ের জ্ঞান লোপ পেল। কবে বেরিয়েছি, কবে মজার

পৌছব কোনও বোধই আর রইল না।

সরাইয়ের এক কোণে ঠেসান দিয়ে বসে আছি। যে কাফেলার সঙ্গে আজ তোরে যোগ দিয়েছিলুম তারা কুঠরির মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে যুদ্ধযবে কথা বলছে। এদের বেশীর ভাগই আমদরিয়া পারের উজ্জবেগ। বাঙলা ভাষায় এদের বলে 'উজবুক'। এরা যে কি সরল বিশ্বাসে ট্যারচা চোখ মেলে তাকাতে জানে সে না দেখলে তুলনা শুনে বোঝা যায় না। এদের ভাবা আমার অজানা। কিন্তু এরা আমাকে ভালবেসেছে। আজ সকালে একরকম জোর করেই আমাকে একটা থচ্চরের উপর বসিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ কানে গেল কে যেন বললে, 'জশ্ন'।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিকার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, স্বপ্নমায়া—মতিভ্রম কিছুই নয়, পরিকার দেখতে পেলুম জশ্ন পরবের রাত্রে ডান্স হলের মি'ড়ি দিয়ে নেমে আসছে শব্নম। সে রাত্রে তার ছিল ক্রকুটিকুটিল ভাল, আজ দেখি সে জাবিলাসী, তার মুখে আনন্দহাসি।

তার পরই জ্ঞান হারাই।

॥ ৫ ॥

চোখ মেলে দেখি, শব্নমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। শুচিস্মিতা শব্নম প্রসন্নবয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে।

হায় এ-ই সত্য হল না কেন? আন্তে আন্তে তার চেহারা মিলিয়ে গেল কেন?

এই 'বিকারে' কত দিন কেটেছিল জানি না। শব্নমকে কাছে পাওয়া, তার মুখে সান্ত্বনার বাণী শোনা যদি 'বিকার' হয় তবে আমি 'হুহু' হতে চাই নে। আমি হুহু হলাম কেন?

মজার-ই-শরীফে হজরৎ আলির কবর-চত্বরের এক প্রান্তে চূপচাপ বসে থাকি গভীর স্বাপ্নি পর্যন্ত।

কাবুলের শূকী সাহেব আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে সেখানকার সরাইখানাতে আমার সন্ধান নিয়ে কিছুদিনের ভিতরই জানতে পারলেন, আমাকে মজারের পথে দেখা গিয়েছে। আমার কাবুল ফেরার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে গেল তখন তিনি বেরলেন আমার সন্ধানে। আমাকে যখন পেলেন তখন আমি মজারের কাছেই। উজ্জবেগদের সাহায্যে আমাকে অচৈতন্তাবস্থায়ই এখানে নিয়ে আসেন।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। মধ্যগগনে দশরীর চন্দ্র। হাওয়া আসছে উত্তর-পূর্ব—
আমুদরিয়া আর বল্খ থেকে। মসজিদচত্বরে পুণ্যার্থীরা এবার সমবেত উপাসনা
শেষ করে এখানে ওখানে নৈমিত্তিক (নফল) আরাধনা করছে। সূর্য্যোদয়
মত নিশ্চলক দৃষ্টিতে, কিংবা মুদ্রিত নয়নে আপন গভীরে নিবিষ্ট। রাত গভীর
হলে মজারের ছায়ায় কেউ বা মধুর কণ্ঠে জিক্বু গেয়ে ওঠে।

এ সব রোজ দেখি, আবার রোজই ভুলে যাই। আমার স্বতিশক্তি কিছুই
ধারণ করতে পারে না। প্রতিদিন মনে হয়, জীবনে এই প্রথম আঁখি মেলে
এসব দেখছি। কোনদিন বা সরাই থেকে এখানে আসবার সময় পথ খুঁজে
পাই না। শহরের লোক আমাকে চিনে গিয়েছে। কেউ-না-কেউ পথ দেখিয়ে
রওজাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

আমি মজনুন, আমি পাগল—এ কথা আমি সরাইয়ে, রাস্তায় ফিসফিস
কথাতে একাধিকবার শুনেছি। এ দেশে প্রিয়বিচ্ছেদে কাতর জনকে কেউ
বিজ্ঞপের চোখে দেখে না। শুনেছি, ‘সভ্য’ দেশের কেউ কেউ নাকি এদের এ
দৃষ্টান্ত হালে অমুকরণ করতে শিখছেন। এদের চোখে দেখি, আমার জন্ত
নীরবে মজল কামনা। দরগায় বসে বসেও যে আমি নমাজ পড়ি নে, তাই নিয়ে
এরা মোটেই বিচলিত নয়। ‘মজনুনে’র উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।
আর একদিন শুনেছিলুম বোরকা-পর্য্য ছুটি তরুণীর একজন আরেকজনকে বলছে,
‘কী তোর প্রেম যে তাই নিয়ে হর-হামেশা আপসা-আপসি করছিস! ওই
দেখ প্রেম কী গরল! শব-ই-জুফ্-কাফের ফুল শুকোবার আগেই এর প্রিয়া
শুকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। হয়েছিস ওর মত তুই মজনুন—পাগল?’

আমি মাথা হেঁট করে এগিয়ে গিয়েছিলুম। প্রেম কি গরল? প্রেম তো
অমৃত। আমার মত অপাত্রে পড়েছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে পাত্র চিড় খেল।
আমার নামের মিতা আরবভূমির মজনুন তো পাগল হন নি। তিনি প্রেমের
অমৃত খেয়ে পেয়েছিলেন দিব্য রূপ। সংসারের আর-কেউ সেটি খায় নি বলে
ওঁর সে রূপ চিনতে না পেরে তাঁকে বলেছিল পাগল। যে দু-একটি চিত্রকর বুঝতে
পেরেছিল, তারা ছবিতে সেই দিব্যজ্যোতি দেখবার চেষ্টা করেছে।

‘সেরে উঠছি’। যদি এটাকে ‘সেরে ওঠা’ বলে। এতদিন অবশ ছিলুম,
এখন এখানে ওখানে বেদনা পাচ্ছি। শব্দনম এখন আর আমার সম্মুখে বখন-
তখন উপস্থিত হয় না। হলেও তার মুখে বিষম হাসি। সূর্য্য সাহেবকে সেটা
জানাতে তিনি ভারি খুশী হলেন। তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস তিনি অলৌকিক
শক্তির অধিকারী; তিনি অভিজ্ঞাত্তে একদম বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস

করেন, শোকে কাতর অপ্রকৃতিস্থ লোকের মনে শাস্তি এনে তাকে সবল স্তম্ভ করতে পারা এ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অলৌকিক ঐশী শক্তি।

এ কথা আমিও মানি। কিন্তু এই যে শব্দনম আমাকে এসে দেখা দিয়ে যায়, এটাকে তিনি এত সন্দেহের চোখে দেখেন কেন? স্বপ্নে মায়ায় শব্দনমের এই যে দান এ তো সত্যকে অসম্মান করে না—সে তো তখন অবাস্তব, অসত্যের পরীর ডানা পরে এসে আকাশকুসুম দিয়ে আমার গলায় ইন্দ্রমালা পরায় না। কৈশোরে এক সঞ্চয়িতায় পড়েছিলুম, কে যেন এক চানদেনীয় ভাবুক বলেছেন, ‘স্বপ্নে দেখলুম, আমি প্রজাপতির শরীর নিয়ে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন ভেগে উঠে আমার ভাবনা লেগেছে, এই যে আমি মানুষরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি কোনও প্রজাপতির স্বপ্ন নয়—সে স্বপ্নে দেখছে যে সে মানুষের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?’ সর্বগত্যা নিয়ে যেখানে সন্দেহ সেখানে তাঁর বিবেক আমার স্বপ্নের প্রতি।

সুফী সাহেব বললেন, জানেমন্ খবর পাঠিয়ে জানিয়েছেন, আমি কাবুল না ফিরলে তিনি নিজে আমার সন্ধানে বেরবেন। তাঁর লোক উস্তরের জন্ত বসে আছে।

আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

তিনি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন। শাস্তকণ্ঠে বললেন, তার কোনও খবর নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে ভালো আছে।

আমি বললুম, ‘চলুন।’

আব্দুর রহমানের পিতাকে এবারে আর ফাঁকি দেওয়া যায় নি। ক্ষেত-খামারের কাজ করে বাকী সময় সে নাকি বাজারের চায়ের দোকানে বসে আমার প্রতীক্ষা করত। তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হলেও সমস্ত বাজার আমাকে দেখামাত্রই যে রকম হলুধনি দিয়ে উঠেছিল তা থেকেই বুঝেছিলুম, বিখ্যাত বা কুখ্যাত হওয়া যায় নানা পদ্ধতিতে, এবং কোনও চেষ্টা না করেও।

তার উপর সুফী সাহেব বড়োর মুরশীদ বা গুরু।

ভুললুম, আমাহুজ্জা কর্তৃক ক্রান্তে নির্বাসিত তাঁর সিপাহসলার বা প্রধান সেনাপতি নাদির খান বাচ্চাকে তাড়াবার জন্ত গজনী পর্বন্ত পৌছে গেছেন। রঙকটের অপেক্ষা না করে কান্দাহারেই আব্দুর রহমান তাঁর সৈন্তদলে ঢুকেছে।

শব্দনমের কাছে শুনেছিলুম, ক্রান্তের নির্বাসনে আমার স্বত্তর মশাই আর নাদির খানে তাঁদের পূর্বপরিচয় গভীরতর হয়েছিল। বহু যুগের পারিবারিক বন্দ ছিল বলেই একদিন যখন হঠাৎ মৈত্রী স্থাপিত হল তখন লেটা গভীরতম বন্ধুত্বের

রূপ নিল। ফ্রান্সে সব মেয়েরই একটি করে গড্-ফাদার থাকে, শব্দনমের ছিল না বলে ছুঁত করতে নাদির নিজে যেচে তার গড্-ফাদার হবার সম্মান লাভ করেছিলেন—শব্দনম বলেছিল। তবু আমার স্বত্তর আমানউল্লা আফগানিস্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত নাদিরের অভিযানে যোগ দেন নি।

আমার ভয় হল, বাচ্চা যদি জানেমনের উপর দাদ নেয়!

কুহ-ই-দামন, জবল্-উস-সিরাজ অঞ্চল পেরবার সময় দেখি বাচ্চার সঙ্গী ডাকাতরা তাকে ডেজার্ট করে পালাচ্ছে! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! অত্যাচারী মাস্টারের নিপীড়নে যখন নিরীহ শিশু ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে তখন করুণা হয়, কিন্তু সেই স্ট্রাডিস্ট মাস্টার যখন হেড-মাস্টারের হুড়ো খেয়ে কেঁচোটি হয়ে যান তখন যেম্মা ধরে, হাসি পায়। নিরীহ বাচ্চাদের দুশমন শ্যোরকে বাঘ তাড়া লাগালে যেমন মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠে। রাস্তার উপরে, এদিকে ওদিকে ছড়ানো তাদের পরিত্যক্ত লুটের মাল, দামী দামী রাইফেল। নাদির-বাঘ আসছে, ওগুলো কুড়োবার সাহস কারও নেই। শুনেছি কোনও শাস্ত্র জনপদবাসী নাকি নিরপরাধ প্রাণ শুধিয়েছিল এক পলায়মান ডাকাতকে, সে কোন দিকে যাচ্ছে, আর অমনি নাকি ডাকাত বন্দুক ফেলে নিরস্ত্র পথচারীর পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ঐতিহাসিক খাফী খান তাহলে বোধহয় খুব বেশী বাড়িয়ে বলেন নি যে, আবদালী দিল্লী আসছে শুনে মারাঠা ‘সৈন্যরা’ নাকি ‘আইমা’ ‘কাইমা’—অর্থাৎ অর্থাৎ মায়ের স্মরণে—চিৎকার করতে করতে যখন দিল্লী থেকে পালাচ্ছিল তখন নাকি শহরের রাঁড়ী-বুড়ীরাও ধমক দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করে মালপত্র কেড়ে নিয়েছিল।

বিজয়ী নাদির কাবুলে প্রবেশ করলেন নগরীর পশ্চিম দ্বার দিয়ে। পরাজিত আমি উত্তর দ্বার দিয়ে।

॥ ৬ ॥

কত মাস, কত বৎসর কেটে গিয়েছে কে জানে!

বাদশা এবং আমার স্বত্তরও হার মেনেছেন।

সে নেই, এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। নিশ্চিহ্ন নিরুদ্দেশ হয়ে প্রত্যাভর্জন করার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ নির্দয়তর সন্দেহই মেনে নেব—আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা ছিল বলেই শব্দনম অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করছে, কবে আমি তাকে গ্রহণ করার জন্য

সৈ (৫৫)—১৭

উপযুক্ত হব, কবে আমার বিরহ-বেদনা-বিক্ষুব্ধ সরোবর নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত হবে সেই শব্দমকমলিনীকে তার বক্ষে প্রস্তুতি করার জন্ত।

নিশ্চয়ই আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা আছে।

শব্দমকেই একদিন সংস্কৃতে শুনিয়েছিলাম, শত্রু বেদনা দেয় মিলনে, মিত্র দেয় বিরহে—শত্রু-মিত্রে তা হলে পার্থক্য কোথায়? অথচ মিত্র যখন দূরে চলে যায় সে তো প্রিয়জনকে বেদনা দেবার জন্ত যায় না। তবে কেন হাসিমুখে তাকে বিদায় দিতে পারি নে, তবে কেন হাসিমুখে তার পুনর্মিলনের জন্ত প্রতীক্ষা করতে পারি নে—শব্দম যে রকম কাঙ্গাহারে স্নান মুখে, বিষগ্নবদনে সঙ্ঘাতীপ জ্বলত সে রকম না, উজ্জ্বল প্রদীপ, উজ্জ্বলতর মুখ নিয়ে।

সুখী সাহেবও তো ওই কথাই বলেছিলেন—অন্তপ্রসঙ্গে! বলেছিলেন, প্রতিবার ষোণাভ্যাসের পর দেহ মন যেন প্রফুল্লতর বলে বোধ হয়, না হলে বুঝতে হবে অভ্যাসের কোনও স্থলে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। প্রেম-ষোণেও নিশ্চয়ই তা হলে একই সত্য। সে যোগ, সে মিলনের পর যখন প্রিয়-বিচ্ছেদ আসে তখন আমার হৃদয় থেকে কাতর-ক্রন্দন বেরবে কেন? আমি কেন হাসিমুখে মুহুমুহু বিরহ-দিনান্তের পানে তাকাতে পারব না, সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, সময় হলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবেই হবে। আমি কি মূর্থ যে দাহন-বেলায় ইন্দুলেখা কামনা করব। আমি হব সমাহিত জ্যোতিষীর গ্রায়, যে সূর্যগ্রাসের সময় বর্ষের মত সূর্য চিরতরে লোপ পেল ভয়ে বিকট অট্টরব করে ওঠে না। অবলুপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য তখন বিরাজ করেন তাঁর জ্ঞানাকাশে। শব্দম আমারই বৃকের মাঝে চন্দ্রমা হয়ে নিত্য তো রাজে। শব্দম-শিশিরকুমারী প্রাতে যদি অন্তর্ধান হয়ে থাকে তবে কি আজই সন্ধ্যায় পুনরায় সে আমার শুকাধরে সিদ্ধি হবে না?

আমি কেন হাসিমুখ দেখাব না? আমি কি আশানের বৈরাগ্য-বিলাসী নন্দী-ভৃঙ্গী যে দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে জিতুবন শঙ্কায়িত করব? আমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের সঙ্গে হরিহরাভা আমিও মৃত্যুঞ্জয়—মধুমাসে আমার মিলনের লগ্ন আসবে, আমার ভালো তখন পুষ্পরেণু, বিরহ-দিগম্বর তখন প্রাতঃসূর্যকচি বস্ত্রাংগক পরিধান করবে। না। আমি এখনই, এই মুহূর্ত্তেই বরবেশ ধারণ করব—বিরহের অস্থিমালা চিতান্ত আমি এই শুভলগ্নেই ত্যাগ করলুম, আমার প্রতি মুহূর্ত্তই শুভমুহূর্ত।

খুঁট কি বলেন নি, উপবাস করলে ভগ্নতপস্বীর মত শুকমুখ নিয়ে দেখা দিয়ে না। তারা চায়, লোকে আত্মক, তারা পুণ্যশীল। তুমি বেকবে প্রসাধন করে, ঠেলমিল্ল বস্তকে।

লোকে হাসবে, বলবে, এই যে লোকটা মজন্ম মত পাগলপারা খুঁজেছে তার লায়লীকে, ঘুর্ণিবার হয়ে প্রতি উটের মহ্মিলে, প্রতি সরাইয়ে, মজারে-কান্দাহারে খুঁজেছে তার শব্দনমকে দুদিন আগে—সে কিনা আজই হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

তাই হোক, সেই আমার কাম্য।

শব্দনম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

অভ্যস্ত সবাই হয়, আমিও হব, তাতে আর কী সন্দেহ?

ধর্মনিষ্ঠ অথচ বিস্তাশালী এক গোস্বামীকে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ এসে একদিন কঁাদতে কঁাদতে হুঃসংবাদ দিলেন, তাঁদের নায়েব বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে। কালই তাঁদের রাস্তায় বসতে হবে। গৃহিণীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে গোস্বামী আবার পুঁথিপাঠে মন দিলেন। তিনি কঁদে বললেন, 'ওগো, তুমি যে কিছুই ভাবছ না, আমাদের কী হবে।'

গোস্বামী পুঁথি বন্ধ করে, হেসে বললেন, 'মুখে, আজ থেকে বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর পরে তুমি এই নিয়ে আর কান্নাকাটি করবে না। তোমার যে অভ্যাস হতে ত্রিশ বৎসর লাগবে আমি সেটা তিন মুহূর্তেই সেরে নিয়েছি।'

আমি ওই গোস্বামীর মত হব।

তিন লহমায় গোস্বামী অভ্যস্ত হয়ে গেলেন—এর রহস্তটা কী?

রহস্ত আর কিছুই নয়। গোস্বামী শুধু একটু স্মরণ করে নিলেন, বিস্তা যেমন হঠাৎ যায়, তেমনি তার চেয়েও হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। আরও হয়তো অনেক তত্ত্বকথা ভেবে নিয়েছিলেন, যথা, বিস্তানাশ সর্বনাশ নয়, বিস্তাবিস্ত সবই মায়া—কিন্তু ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। প্রথম আগত প্রথম কারণই যথেষ্ট।

তার চেয়েও বড় কথা—শব্দনম আমার সাধারণ ধনজনের মত বিস্তা নয়। সে কী, সে-কথা এখনও বলতে পারব না। সাধনা করে তা উপলব্ধির ধন।

স্বীকার করছি, জানী গোস্বামীর মত তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। সব জেনে-জেনেও আমাকে অনেক কৌটা চোখের জল কেলতে হয়েছে—না-কেলতে পেরে কষ্ট হয়েছে তারও বেশী। পাগল হতে হতে ফিরে এসেছি, সে শুধু শব্দনমের কল্যাণে। পরীর প্রেমে মাহুষ পাগল হয়। পরী মানে কল্লনার জিনিস। কিংবা বলব, প্রত্যেক রমণীর ভিতরই কিছুটা পরী লুকিয়ে থাকে। সেটাকে ভালবাসলেই সর্বনাশ। পুরুষ শুধু পাগল হয়ে যায়। শব্দনমের পরীর খাব ছিল না। আমি পাগল হয়ে গেলে শব্দনমের বদনামের অন্ত থাকত না।

আবার বলছি, তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। ভালই হয়েছে। গোস্বামী হয়তো তিন লহমায় ত্রিশ বৎসরের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা এক ধাক্কায় সয়ে নেবার মত শক্তি ধরেন। আমার কি সে শক্তি আছে!

আমি সাধারণ বিরহ-বেদনার কথা বলছি না। পায়ের শব্দ শুনে সে বুঝি এসেছে ভাবা, ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বার বার নিরাশ হওয়া, কারও হাতে কোনও চিঠি দেখলেই সেটা শব্দনমের মনে করা, বাড়ি থেকে বেরুতে না পারা—হঠাৎ যদি সে এসে যায় সেই আশায়, আবার না-বেরুতে পেয়ে তার সন্ধান করতে পারছি নে বলে যন্ত্রণা ভোগ, যে আসে তার মুখেই বিবাদ দেখে হঠাৎ রেগে ওঠা এবং পরে তার জন্তু নিজেকে শান্তি দেওয়া—এসব তো সকলেরই জানা। যে জানে না, সে-লোকের সঙ্গে আমার যেন কখনও দেখা না হয়। সে স্থখী।

জানেনন্ বয়েৎ বলতে বলতে এমন একটি কান্দাহারী শব্দ ব্যবহার করলেন যেটি ইতিপূর্বে আমি মাত্র একবার শব্দনমেরই মুখে শুনেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব চৈতন্য যেন লোপ পেল। কে যেন আমার মাথায় ডাঙশ মারলে—প্রথমটায় লাগে নি, তার পর হঠাৎ অসহ বেদনা, তারপর অতি ধীরে ধীরে সেটা কমল। ডাঙশ যেন চেখে-চেখে আমার যন্ত্রণাবোধটা উপভোগ করলে। এসব তো সকলেরই হয়। এ আর নতুন করে কীই বা বলব?

জানেনন্ এখন কথা বলেন আরও কম। শব্দনমের কথা আমিই তুলে অল্পযোগ করলুম। এখন আমার সামনে তার কথা আর কেউ তোলে না—পাছে আমার লাগে, বোঝে না, তাতে আমি ব্যথা পাই আরও বেশী—তাই আমাকেই তো তুলতে হবে তার কথা।

আমার দুখানি হাত তাঁর কোলে নিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, শব্দনম আমাকে, দুঃখ দেবে কেন? আর দুঃখ যদি পেতেই হয়, তবে তার হাতেই যেন পাই। যে বন্দীখানায় সোক্রাৎকে (সোক্রাতেস) জ্বর খেতে হয়েছিল তার কর্তা ছিলেন তাঁরই এক শিষ্য এবং বিষপাত্র সোক্রাৎকে এগিয়ে দেওয়া ছিল তাঁরই কাজ। পাত্র আনবার পূর্বে তিনি কেঁদে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমাকেই করতে হবে এই কাজ?' সোক্রাৎ পরম সম্ভাষণ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আহা! সেই তো আনন্দ। না হলে যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে সে যখন জিহ্বাসাভরে পৈশাচিক আনন্দে জুর হাসি হেসে আমার দিকে বিষভাণ্ড এগিয়ে দেয় সেটা তো সত্যই পীড়াদায়ক।' এই বেদনার পেয়ালা ভরা আছে শব্দনমের আধি-বারিতে—'

আমার বুকে আবার ভাঙল। লেখানে যেন বিদ্যুৎ-বিভাগে ধসন্তালোক হয়ে ফুটে উঠল শব্দম। তার হুংথের মুহূর্তে আমাকে একদিন বলেছিল, ‘কত আঁখি-পল্লব নিংড়ে নিংড়ে বের করা আমার এই এক ফোঁটা আঁখিবারি।’ হায় রে কিস্ম্য! হুংথের দিনেই তুমি বদ-কিস্ম্যতের স্বতিশক্তি প্রথর করে দাও।

শুনছি, জানেমন্ বলে যাচ্ছেন, ‘সেই ভাল সেই ভাল।’ ধীরে ধীরে আকাশের দিকে ছুই বাহ প্রসারিত করে অজানার উদ্দেশে বললেন, ‘সেই ভাল, হে কঠোর, হে নির্মম! একদিন তুমি আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছিলে—আমি অহুযোগ করেছিলুম। তারপর শব্দমরূপে সেটা তুমি আমায় ফেরত দিলে শতগুণ জ্যোতির্ময় করে—আমি তোমার চরণে লুটিয়ে জন্ম-দাসের মত বার বার তোমার পদচূষন করি নি? আজ যদি তুমি আবার সেই জ্যোতি কেড়ে নিতে চাও তো নাও—আমি অহুযোগ করব না, ধন্যবাদও দেব না। কিন্তু এই হতভাগ্য পরদেশী কী করেছিল, আমাকে বল, তাকে তুমি—’

দেখি, তাঁর চোখ দুটি দিয়ে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

একবার দেখেছি, একবারের কথা শুনছি—এই তৃতীয়বার। এর পর আজ পর্যন্ত আর কখনও দেখি নি।

আমি আকুল হয়ে তাঁকে ছুই বাহ দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর চোখ মুছে দিতে দিতে মনে মনে শব্দমকে উদ্দেশ করে বললুম, ‘হিমি, বিরহ-ব্যথায় যে আঁখি-বারি ঝরে সেটা শুকিয়ে যায়—প্রিয়-মিলনের সময় সেটা দেখানো যায় না। দেখাতে হলে সেটা বুক করে বইতে হয়। তুমি যেদিন ফিরে আসবে সেদিন এই রক্তচিহ্ন দেখিয়ে তোমাকে বলব, ‘জানেমন্ তোমার জগত তাঁর বুকের ভিতর কী রকম রক্তরেখায় পদ্ম-আসন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, দেখ।’

আমি জানেমন্কে চূষন দিতে দিতে বললুম, ‘আপনি শান্ত হন। আপনি জানেন না, আমার হৃদয় এখন শান্ত।’

আমি জানতুম, জানেমন্ শব্দম উভয়ই—অন্তত কণেকে তার শোক ভুলে যান—ঋষি-কবিদের বাণী শুনতে পেলে। বললুম, ‘আপনি মোক্তাতের যে-কথা উল্লেখ করলেন, সেই বলেছেন, আমাদের কবি আব্দুর রহীমন্ খান-ই-খানান—

“রহীমন্! তুমি বলো না লইতে অনাদরে দেওয়া সূধা—

আদর করিয়া বিষ দিলে কেহ মরিয়া মিটাব সূধা।

রহীমন্! হমে না সূহায় অমি পিয়াওঁ মান বিন্।

জো বিষ দেয় বোলায় মান সহিত মরিব ভালো।”

আমাকে আরও কাছে টেনে এনে বললেন, ‘সুন্দর ! সুন্দর ! দাঁড়াও, আমি ফার্সীতে অনুবাদ করি ;—মুখে মুখেই বললেন,

“আয় রহীমন্, না গো মরা—” ’

। ৭ ॥

অনেকক্ষণ ঘেন ধ্যানে মগ্ন থেকে আমাকে শুধালেন, ‘তুমি পেয়েছ ? কী পেয়েছ ?’

‘সে কি আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে বুঝিয়ে বলব । এর সাধনা তো আয়তু্য, কিংবা হয়তো মৃত্যুর পরক্ষণেই বুঝব এতদিন শুধু বইয়ের মলাটখানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, বইটার নাম পড়েই ভেবেছি ওর বিষয়বস্তু আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তখন দেখব এতদিন কিছুই বুঝতে পারি নি । শব্দমই আমাকে একদিন বলেছিল, সামান্য একটু আলাদা জিনিস—

“গোড়া আর শেষ, এই সৃষ্টির

জানা আছে, বল কার ?

প্রাচীন এ পুঁথি, গোড়া আর শেষ

পাতা কটি ঝরা তার !”

হিরণ্ময় পাত্রেয় দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হৃদয়ে কেটে গিয়েছে সমস্ত জীবন—ওর ভিতরকার সত্যটি দেখতে পাই নি । বিকলবুদ্ধি শিশুর মত এতদিন চুপেছি চুপিকাঠি—এইবারে পেলুম মাতৃস্তনের অনাদি অতীত প্রবহমাণ স্বধা-ধারা । সেই যে শিশুহারা মা তার বাচ্চাকে কঁাদতে কঁাদতে খুঁজেছিল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি—চলার পথে যে ঝরে পড়েছিল তার মাতৃস্তনরস তাই দিয়েই তো দেবতার তৈরি করলেন, মিল্কিওয়ে—আকাশগঙ্গার ছায়াপথ ।

‘এ জীবনেই তো পৌঁছেই নি পাহাড়চূড়োয়, যেখান থেকে উপত্যকার পানে তাকিয়ে বলতে পারব, এই যে উপত্যকার কাঁটাবন থানাখন্দ, কান্দা-পাথর, সাপ-জোঁকে ক্ষতবিক্ষত চরণে এখানে এসে পৌঁছেছি—এই উপত্যকাই কত সুন্দর দেখায় গিরিবাসীদের কাছে, যারা কখনও উপত্যকার নামে নি—আমি কিছুটা উপরে এসেছি মাত্র, আর এর মধ্যেই কাঁটাবনকে নরখুন্স বলে মনে হচ্ছে, কান্দাভরা খালকে প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হচ্ছে । গিরিশিখরে পৌঁছেলে সমস্ত ভুবন মধুর বলে মনে হবে, এই আশা ধরি ।

জানেনন্ শ্রিতহাস্তে বললেন, ‘বুঝেছি, কিন্তু এইটুকুই পেলে কী করে ?’

আমি বললুম, ‘অতুত, সেও আশ্চর্য ! মনে আছে, মালখানেক আগে নথী

এসেছিল শব্দমের। ওর সঙ্গে দমকা হাওয়ার মত এল শব্দমের আত্মর গন্ধ। গোয়ালিয়র না কোথা থেকে শব্দম আনিয়েছিল যে এক অজানা আত্ম তারই সবটা দিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গীকে—মাত্র একদিন ওইটে মেখে এসেছিল আমার—আমাদের—না, আমাদের সকলের বাড়িতে আমাদের প্রথম বিয়ের দিন—’।

‘সে কী?’

অজানতে বলে ফেলেছি। ভালই করেছি। আরও আগেই বলা উচিত ছিল।

কী আনন্দ আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বৃদ্ধ যোগী শুনলেন আমাদের বিয়ের কাহিনী! হাসবেন, না, কাঁদবেন কিছুই যেন ঠিক করতে পারছেন না। থানাতে দোষা না মূর্গার বিরিয়ানী ছিল সেও তাঁর শোনা চাই, তোপলের স্বীধন নিয়ে আহাম্মকির কথা ভাল করে জানা চাই। এক কথা দশবার শুনেও তাঁর মন ভরে না। আর বার বার বললেন, ওই তো আমার শব্দম। কী যে বল, গওহর শাদ, কোথায় নুরজাহান!’

কতদিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তাঁর পরম মুখ-রোচক মজলিসের জলুস—আমাদের এই প্রথম বিয়ের কাহিনী।

শেষটায় শেষ প্রদ্ব শুধালেন, ‘আচ্ছা, বিয়ের পর তোমাতে ওতে যখন প্রথম একলা-একলি হলে তখন সে প্রসন্ন হাসি হাসলে, না কাঁদলে?’

আমার লজ্জা পাচ্ছিল, বললুম, ‘কাঁদলে।’

‘জানতুম, জানতুম। আমারই স্মরণে কেঁদেছিল।’ এবারে মুখে পরিতৃপ্তির উপর বিজয়-হাস্ত। বললেন, ‘এইটুকুনই জানতে চেয়েছিলুম। এইবারে বল, তোমার সেই আত্মর কথা।’

চেনা দিনের ভোলা গন্ধের আচমকা চড় খেয়েছিলুম, সেদিন। এর পূর্বে আমি জানতুম না, স্মৃতির অঙ্কুর বরে স্বগন্ধ আলোর চেয়েও সতেজ হয়ে মাহুবকে কতখানি অভিভূত করতে পারে। আমি অনেকখানি মুহূমান হয়ে ওই স্বাস-বস্তায় যেন ভেসে চলে গিয়েছিলুম। আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রীতি-সম্ভাষণ দান-প্রদান হয়েছিল—আমি কিছুই শুনতে পাই নি।

এইখানেই আরম্ভ।

শব্দম একদিন আমার শুধিয়েছিল, “যখন সব সাক্ষ্যের পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন ক্ষয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়”—এটা আমি জানি কি না? আমি উত্তর দেবার সুযোগ পাই নি। আমাদের যে কবির এদেশে আবার কথা

ছিল, তিনি ছন্দে বলেছেন

“দুঃখ, তব যজ্ঞপাত্র যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,

দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী

রোধ করে বাহিরের সাধনার দ্বার,

দেই ক্ষণে প্রাণ আপনার

নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সাধনা

বাহির করিয়া আনে ; অমৃতের কণা

গ’লে আসে অশ্রুজলে ;

সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে

যে আপন পরিপূর্ণতায়

আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায় ।”

সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-মধুরিমা আমার সর্বদেহ-মনে ব্যাপ্ত করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, পরীক্ষা পাসের জন্ত মৃথস্থ-করা বিত্তের একটা অংশ—সেটা তখন বুঝি নি, এখন স্বগন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা জলজল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল ।

রাজপুত্র দারা শীকুহ-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ তো আপনি পড়েছেন, কিন্তু সব উপনিষৎ অনুবাদ করেন নি বলে বলতে পারব না বৃহদারণ্যক তাতে আছে কিনা । তারই এক জায়গায় আমাদের দেশে এক দার্শনিক রাজা জনক গেছেন ঋষি ষাঙ্কবক্ষ্যের কাছে । ঋষিকে শুধালেন, “ষাঙ্কবক্ষ্য, মাহুঘের জ্যোতি কী—অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা, তার কাজকর্ম ঘোরাক্ষেপণ করা কিসের সাহায্যে হয়—কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ ?”

ষাঙ্কবক্ষ্য বললেন, “সূর্য ।”

জনক শুধালেন, “সূর্য অস্ত গেলে ?—অস্তমিত আদিত্যে ?”

“চন্দ্রমা ।”

“সূর্য চন্দ্র উভয়েই অস্ত গেলে—অস্তমিত আদিত্যে, ষাঙ্কবক্ষ্য চন্দ্রমস্তমিতে কিংজ্যোতিরৈবায়ং পুরুষঃ ?”

“অগ্নি ।”

“অগ্নিও যখন নির্ধাপিত হয় ?”

“বাক্—ধ্বনি । তাই যখন অন্ধকারে সে নিজের হাত পর্ষন্ত ভাল করে দেখতে পায় না, তখন যেখান থেকে কোন শব্দ আসে, মাহুঘ সেখানে উপনীত হয় ।”

এইবারে শেষ প্রশ্ন ।

জনক শুধালেন, “সূর্য চন্দ্র গেছে, আগুন নিবেছে, নৈঃশব্দ্য বিবাজমান—
তখন পুরুষের জ্যোতি কী ?” সংস্কৃতটি ভারি সুন্দর, পণ্ড ছন্দে যেন কবিতা ।
“অন্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমন্তুমিতে, শান্তেহর্ষো, শান্তায়াম্ বাচি,
কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?”

যাজ্ঞবল্ক্য শেষ উত্তর দিলেন, “আত্মা ।”

আমাদের কবির ভাষায় ‘অন্তরের অন্তরতম পরিপূর্ণ আনন্দকণা ।’ আরবী
ফারসী উভুঁতে যাকে আমরা বলি ‘রুহ’ । এ সব তো আপনি ভাল করেই
জানেন ।

আমার ধোঁকা লাগল অকৃত্রানে । যাজ্ঞবল্ক্য যখন চেনা জিনিস সূর্য থেকে
আরম্ভ করে জনককে অজানা আত্মাতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন ‘অগ্নি’কে জ্যোতি
বলার পর তিনি ‘গন্ধ’কে মাহুষের জ্যোতি বললেন না কেন ? গন্ধ তো ‘শব্দ’ের
চেয়ে অনেক বেশী দূরগামী । কোথায় রামগিরি আর কোথায় অলকা—
কোথায় নাগপুর আর কোথায় কৈলাস—সেই রামগিরিশিখরে দাঁড়িয়ে বিরহী
যক্ষ দক্ষিণগামী বাতাসকে আলিঙ্গন করেছিলেন । সেই বাতাসে হিমালয়ের
দেবদারু গাছের গন্ধ পেয়ে ভেবেছিলেন, হয়তো এই বাতাসই তাঁর অলকাবাসী
প্রিয়াক্ষীর সর্বাঙ্গ চূষন করে এসেছে ;

“হয়ত তোমারে সে পরশ করি’ আসে,
হে প্রিয়া মনে মনে ভাবিয়া তাই
সকল অঙ্গেতে সে বায়ু মাখি লয়ে
পরশ তব যেন তাহাতে পাই ।”

ফার্সী এবং সংস্কৃত ছন্দে প্রচুর মিল আছে ; জানেমন তাই আমাকে
একাধিকবার মূল সংস্কৃতটা আবৃত্তি করতে বললেন ।

ভিষ্মা সতঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুক্রমাণাং
যে তৎক্ষীরক্ৰুতিস্বরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃন্তাঃ ।
আলিক্যাস্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাজিবাভাঃ
পূর্ব স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ।

আমি ভেবেছিলুম, এই খেই ধরে কাব্যালোচনাই চলবে কিন্তু জানেমনই
বললেন, ‘গন্ধের কথা বলছিলে ।’

আমি বললুম, ‘জী । আর যক্ষের সুবাসাচ্ছুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে
দেওয়া যায়, কিন্তু আমি এমন গন্ধকাতর লোক দেখেছি, যে বেহায়ে দক্ষিণমুখে

হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের গন্ধ নিতে নিতে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বাতাসে বাংলা লাগবের নোনা গন্ধস্পর্শ। এটা কল্পনা নয়।

‘তা সে যা-ই হোক, ঋষি গন্ধকে জ্যোতিরূপে বাকের চেয়ে নূনতর মনে করেছেন, কারণ শব্দের সাহায্যে আমরা অঙ্ককারে যে দিগ্‌দর্শন পেয়ে উপস্থিতিহীন পৌছতে পারি স্ববাস দিয়ে অভ্যর্থনা পারি নে, কিংবা হয়তো স্বীকার করেও সংক্ষেপ করেছেন—যেমন স্পর্শের কথাও বলেন নি।

‘কিন্তু আসল কথা এই একটুখানি সৌরভেই আমি যদি মুহূর্ত, অভিভূত হয়ে যাই তবে তার পরের সোপান এবং সেটা তো সোপান নয়, সে তো মঞ্জিল, সে তো সাগরসঙ্গম, সে-ই তো আত্মন—সে তো দূরে নয়, কঠিন নয়। সে-ই তো এইমাত্র অনিবার্য জ্যোতি, সে-ই তো নূর, ব্রহ্ম। সেই আলোতেই আমি অহরহ শব্দনমকে দেখতে পাব। সূর্যচন্দ্র যখন অস্তমিত, অগ্নি যখন শান্ত তখন যদি শব্দনম সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে তবে আর এইটুকুতে নিরাশ হবার কিছু নেই। বিশ্বাস করা কঠিন, তখন সে জ্যোতি পেলুম আমার অন্তরেই।’

আমি চূপ করলুম। জানেমন্ বললেন, ‘এতে অবিশ্বাসের তো কিছুই নেই। আমি যেটুকু পেয়েছি, সেটুকু চোখের আলো হারানোর শোকে—এবং আপন অন্তর থেকেই, বহু সাধনার পর। তুমি পেয়ে গেলে অল্প বয়সেই—সে শুধু পিতৃপুরুষের আশীর্বাদের ফলে।’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘কিন্তু চিরস্থায়ী নয় আমার এ সম্পদ। মাঝে মাঝে—’

জানেমন্ আমাকে কাছে টেনে এনে আমার মাথা তাঁর কোলের উপর রেখে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, ‘আমারও তাই। আমাদের বন্ধু সূফী সাহেবেরও তাই। তার পর বল। আমার স্তনতে বড় ভাল লাগছে। শব্দনম ফিরে এলে তার সামনে আবার তুমি সব বলবে।’

কী আশ্চর্য্যতায়! যেন শব্দনম এক লহমার ভরে আমাদের জন্ত তৃষ্ণার জল আনবার জন্ত পাশের ঘরে গিয়েছে।

আন্তে আন্তে বললুম, ‘আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ তাকে অরুদ্ধতী তারা দেখাবার সুযোগ পাই নি বলে। এই যে আমি মজার-ই-শরীক এলুম গেলুম—রাজীবেলা একবারও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি—যে-কোনও তারা দেখতে পেলেই সব বেদনা আবার এক সঙ্গে এসে আমাকে মুহূর্তে কেলেবে বলে।

যেহাতে আমি প্রথম জ্যোতি পেলুম, তারই আলোকে আমি নির্ভয়ে অরুণতীর দিকে তাকালুম। তিনি আমার হাসিমুখে বললেন, “স্বর্গে আসতেই দেবতার আমার শুধালেন, ‘তুমি কোন্ পুণ্যলোকে যাবে?’ তাঁরা ভেবেছিলেন, যে-স্বামীর কোপন স্বভাব পদে পদে উভয়কে লালিত করেছে সেই কলহাস্পদ স্বামীর কাছে আমি যেতে চাইব না। কিন্তু আমি তাঁরই কাছে আছি। তুমি নিজের অসম্পূর্ণতার স্মরণে নিজেকে লালিত করো না। শব্দম আমারই মত তার বশিষ্ঠকে খুঁজে নেবে।”

সারা দিনমান কর্তব্যকার্য, নিত্যনৈমিত্তিক সব-কিছু করে যাই প্রসন্ন মনে, দাসী যে রকম মূনিব বাড়ির কাজকর্ম করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে তার আপন কুঁড়েঘরে, আপন শিশুটিকে যেখানে সে রেখে এসেছে—তার দিকে। সন্ধ্যায় স্বরিত গতিতে যায় সেই শিশুর পানে ধেয়ে—মাতৃস্তনের উচ্ছলিত-মুখ সুধারসপীড়িত ব্যাকুল বক্ষ নিয়ে—তার গুঁঠাধর-নিপীড়নে জননীর সর্বাঙ্গে শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্তি, তার আনন্দ-নির্বাণ।

আমিও দিবাবসানে ধেয়ে যাই আমাদের বাসরগৃহের নির্জন কোণে। এখানেই আমার জয়, আর এ ঘরেই আমার সর্বস্ব লয়; তাই বহুকাল ধরে এ-ঘরের কথা ভাবতে গেলেই আমার দেহমন বিকল হয়ে যেত। এখন যাই সেই ঘরে, ওই মায়ের চেয়েও তড়িৎ-স্বরিত বেগে।

বিশ্বকর্মা ঋখন তিলোসুত্না গড়তে বসেছিলেন তখন সিংহ দিয়েছিল কটি, রজা দিয়েছিল উরু, আর হরিণী যখন দিতে চাইলে তার চোখ, পদ্মকোরকও পেতে চাইলে সেই সম্মান, তখন নাকি বিশ্বকর্মা দুই বস্ত্রই প্রত্যাখ্যান করে, প্রভাতের শুকতারাকে দুই টুকরো করে গড়েছিলেন তিলোসুত্নার দুটি চোখ। শব্দম যখন কান্দাহারে ছিল—

জানেনম্ন বললেন, ‘বড় কষ্ট পেয়েছে সে তখন। অত যে কঠিন মেয়ে, সেও তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল। তারপর বল।’

আমি বললুম, ‘আমাকে তখন বিশ্বকর্মার মত ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ খুঁজে বেড়াতে হয় নি। তাকে স্মরণ করামাত্রই আন্তে আন্তে তার সমস্ত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। রাধার ধ্যান ছিল সহজ, কারণ তাঁর কালিয়া ছিলেন কালা, চোখ বন্ধ করা মাত্রই তাঁকে দেখতে পেতেন—আমার কালা যে গৌরী। কিন্তু বিশ্বকর্মার সঙ্গে আমি তুলনাস্পদ নই। কারণ তাঁর তিলোসুত্না গড়ার সময় তিনি স্ট্রিকর, চিত্রকর। আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ। তবে ইঁা, মূর্তি গড়ার সময় আমার সামনে বিলাতী ভাস্করের মত

জীবন্ত মডেল থাকত না—খাঁটি ভারতীয় ভাস্করের মত প্রতিমালক্ষণাভূষায়ী মূর্তিটি নির্মাণ করে সর্বশেষে তার সম্মিলিত পদমুগলের দুই পদনথকণার উপর ধীরে ধীরে রাখতুম আমার দুই কোটা চোখের জল। এই আমার বৃকের হিমিকাকণা—শব্দনম।

কিন্তু এবারে আর তা নয়। এবারে আমি মূর্তি গড়ি নে।

এবারে সে আমার মনের মাধুরী, ধ্যানের ধারণা, আত্মনের জ্যোতি।

এবারে আমার আত্মচৈতন্য লোপ পেয়ে কেমন যেন এক সর্বকলুষমুক্ত অথও সত্তাতে আমি পরিণত হয়ে যাই। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা সে নয়—অথচ সর্ব ইন্দ্রিয়ই সেখানে তন্মাত্র হয়ে আছে। কী করে বোঝাই! সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার বহু বৎসর পরেও তাকে যখন স্মরণে এনে তার ধ্বনি বিশ্লেষণ করা যায়—এ যেন তারও পরের কথা। রাগিণী, তান, লয়, রস সব ভুলে গিয়ে বাকী থাকে যে মাধুর্য—সে-ই শুদ্ধ মাধুর্য। অথচ বাস্তব জগতে সেটা হয় ক্ষীণ—এখানে যেন জেগে ওঠে বানের পর বান—গস্তীর, করুণ, নিস্তরু জ্যোতির্ময় ভূভুবঃস্বঃ।

ওই তো শব্দনম, ওই তো শব্দনম, ওই তো শব্দনম।

॥ ৮ ॥

শুধু দুটি কথা আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জেগে থাকে।

একটি উপনিষদের বাণী :

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি

জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইতে নিশ্চল।

কোহেবাত্তাৎ কঃ প্রাণাৎ

যদেব আকাশো আনন্দো ন জ্ঞাৎ।

আমার প্রথম আনন্দের দিনে হঠাৎ এটি আমার মনের ভিতরে এসেছিল—
বহু বৎসর অদর্শনের পর প্রিয়জন আচমকা এসে আবিভূত হলে যে রকম হয়।
তাকে কোথায় বসাব, কী দিয়ে আদর করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নি।
এই যে আকাশ-বাতাস, সে আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকলে, কে একটি মাত্র নিশ্বাস
নিতে পারত এর থেকে ?

সেই রাজে আমি আমাদের বাসরঘরে বাই। শব্দনম যেদিন চলে যায়,

সেদিন কেন জানি নে তার কুরান-শরীফখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

প্রত্যাদেশের সন্ধানে অনেকেই কুরান খুলে যেখানে খুশি সেখানে পড়ে। আমার কোনও প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নেই। আমি এমনি খুলেছিলুম।

‘ওয়া লাওলা ফদলুলাহি আলাইকুম্ ও রহমতহ ফী দুনিয়া ওয়ালা আখিরা—’

‘ভুলোক দু্যলোক যদি তাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ না থাকত তবে—’ তবে? সর্বকালের মানুষ সর্ব বিভীষিকা দেখেছে। তার নির্ধাস—মানুষের অসম্পূর্ণতা তখন রুদ্ধের বহি (গজব) আহ্বান করে আনত, সৃষ্টি লোপ পেত।

মনে পড়ল, ছেলেবেলাকার কথা। দাদারা ইস্কুলে, আমার সে বয়স হয় নি। দুপুরবেলা মা আমাকে চণ্ডা লাংপেড়ে ধুতি, তাঁরই হাতে-বোনা লেসের হাতওয়ালা কুর্তা, আর জরির টুপি পরিয়ে সামনে বসিয়ে কুরান পড়ত। এই জ্যোতি অহুচ্ছেদটিই মা’র বিশেষ প্রিয় ছিল—বহু বহু বিশ্বাসীর তাই। আমার স্মরণে ছিল শুধু দুটি শব্দ ‘ফদল’ আর ‘রহমত’—উচ্ছ্বসিত দাক্ষিণ্য ও করুণা : তখন শব্দ দুটির অর্থ বা অন্ত কোন-কিছু বুঝি নি। আজও কি সম্পূর্ণ বুঝেছি?

*

*

*

আরও সহজে বলি।

বয়স তখন দশ কি বারো। চটি বাংলা বইয়ে গল্পটি পড়েছিলুম, বড় হয়ে এ গল্পটি আর কোথাও চোখে পড়ে নি।

এক ইংরেজকে বন্দী করে নিয়ে যায় বেতুইন দল। দলপতি খানদানী শেখ তার মেয়ের উপর তার দেন বন্দীকে থাওয়াবার।

ভাবাহীন প্রণয় হয় দুজনাতে। তাই শেষটায় বল্লভের বন্দীদশা আর সে সহিতে পারল না।—শব্দনমের লায়লী তো ওই দেশেরই মেয়ে। একদিন পিতা যখন পণ্যবাহিনী আক্রমণ করতে বেরিয়েছেন তখন সে খাত্ত আর তেজী আরবী ঘোড়া এনে বল্লভের দিকে তাকালে। দুজনার পালানো অসম্ভব। যদি ধরা পড়ে তবে দুহিতাহরণকারীকে প্রাণ দিয়ে তার শোধ দিতে হবে—ওই একটিমাত্র আশঙ্কা ছিল বলে সে সঙ্গ নিয়ে দয়িতের প্রাণ বিপন্ন করতে চায় নি। যাবার সময় ইংরেজ শুধু দুটি শব্দ বলে গিয়েছিল—‘টম’ আর ‘লগুন’।

এক মাস পরে দলপতির অহুচরগণ খবর আনল, ইংরেজ বন্দরে পৌঁছতে পেরে জাহাজ ধরেছে।

সরলা কুমারী চেষ্টা করেছিল তাকে ভোলবার—বহুদিন ধরে—পারে নি।

পালিয়ে গেল লম্বুপায়ে। সেখানে প্রতি আহাজের প্রত্যেককে বলে,
'টম'—'লগুন', 'টম'—'লগুন'।

এক কাণ্ডের দয়া হল। এ-বন্দর ও-বন্দর করে করে তাকে লগুনে নামিয়ে
দিল। ইতিমধ্যে মেয়েটি ওই দুটি শব্দ ছাড়া আর-এক বর্ণ ইংরিজি শেখে নি—
সে কাউকে লজ্জা দিত না। ওর দিকে কেউ তাকালে কিংবা প্রশ্ন শুধালে ঘান
হাসি হেসে বলত, 'টম'—'লগুন'।

সেই বিশাল লগুনের জনসমুদ্র। তার মাঝখান দিয়ে চলেছে একাকিনী
বেহুইন-তরুণী। মুখে শুধু 'টম'—'লগুন'। কত শত টম আছে লগুনে, কে
জানে, কত কোণে, কিংবা অন্তত্বে, কিংবা ফের বিদেশে চলে গিয়েছে আমাদের
টম।

হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে আসছে টম। চোখোচুখি হল। দুজনা ছুটে গিয়ে
একে অগ্ৰকে আলিঙ্গন করলে—সেই সদর রাস্তার বুকের উপর।

ঠিক তেমনি একদিন আসবে না শব্দনম?

সে কি আমাকে বলে যায় নি, 'বাড়িতে থেকো। আমি কিরব।'?

* * * *

॥ তামাম্ নু শুন্ ॥

প্রেম

নিকোলাস লেস্‌কফ

রচিত

মৎসেন্‌স্ক জেলার

‘লেডি ম্যাক্‌বেথ’

শ্রীমান অবধুতের করকমলে
সৈয়দ মুজতবা আলী

অনুবাদের নিবেদন

নিকোলাই সেমোনোভিচ্ লেস্কফের 'প্রেম' (আসলে নাম 'ম্যুসেনস্ জেলার লেডি ম্যাক্বেং') গল্পটি আমার কাছে অনবদ্য এবং বিশ্বসাহিত্যে অভুলনীয় বলে মনে হয়। লেস্কফের জন্ম ১৮৩১-এ এবং মৃত্যু ১৮৯৫-এ। 'প্রেম' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। ঐ সময় তলস্তয় ও তুর্গেনিয়েফ তাঁদের খ্যাতির মধ্যগগনে। সে সময় লেখক হিসেবে নাম করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। আরেকটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। এর কয়েক বৎসর পরে যখন ফ্রান্সে মপাসাঁর ছোট গল্প মাসিকপত্রে বেরতে আরম্ভ করে তখন সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই—সেগুলোর অনুবাদ অগ্রাগ্র ইয়োরাপীয় ভাষায় হতে থাকে, এক রুশ ভাষা ছাড়া—যদিও রুশদেশই সে যুগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি নকল করত। তার কারণ রুশাকাশে তখন একাধিক অত্যুজ্জল গ্রন্থ উপ-গ্রহের সংযোগ।

এই উপগ্রহটি প্রায় যেন গ্রীক ট্রাজেডি। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, কিংবা বলতে পারেন প্রকৃতিদত্ত রজোগুণের কাম-তাড়নায় (কাতেরীনা) কিংবা নীচাশয়তায় (সেরুগেই) এরা যেন কোন্ এক অজানিত করাল অন্তাচলের পানে এগিয়ে চলেছে। নিদারুণ কঠিন অবস্থায় পড়ে এরা তখন কি-সব অমাহুষিক কাজ করে তারই উল্লেখ করতে গিয়ে স্বয়ং লেস্কফই বলেছেন, 'যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ-রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের হৃদয়ে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশি—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন-কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দন-ধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তথ্যটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মাহুষ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজে সঙ, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, আর-পাঁচজন মাহুষকে নিয়েও—তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা (এস্থলে সাইবেরিয়াগামী যাবজ্জীবন কঠোর কারাদণ্ডের কয়েদীর পাল) এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ-রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।'

এবং বীভৎস রসের সঙ্গে সঙ্গে এতে আছে অতি মধুর গীতিরস, রুশ নিদাঘ দিনাস্তের অপূর্ব বর্ণনা, প্রেমের আকৃতি-মিনতি, অভিমান, ক্ষণকলহ, মিলন-বিচ্ছেদ—এবং সর্বশেষে দয়িতের অঙ্গ সর্বস্ব ত্যাগ।

এখানে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সত্যের সন্ধান নিবেদন করি, এবং যুক্তি না দেখিয়ে সংক্ষেপেই করি, কাতেরীনা যত পাপাচারই করে থাকুক, তার একনিষ্ঠ প্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছে। তথাকথিত তত্ত্ব মানবসমাজেও এ-জাতীয় প্রেম বিরল। চেথফের ‘হুলালী’ পড়ে তলস্তয় পরবর্তী যুগে যা বলেছেন, হয়তো এখানেও তা-ই বলতেন।

মপাসাঁর ‘বেল্‌ আমি’-র সঙ্গে পাঠক এ নভেলিকার মিল দেখতে পাবেন। কিন্তু ‘বেল্‌ আমি’ প্রকাশিত হয় লেন্সকফের বইয়ের কুড়ি বৎসর পরে। মপাসাঁর বোঁবনে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত তুর্গেনিয়েফের—ক্লোবেরের বাড়িতে। হয়তো বা সে সময় তুর্গেনিয়েফ্‌ গল্পটি মুখে মুখে মপাসাঁকে বলে থাকতে পারেন—কারণ মপাসাঁ যখন প্লটের জগ্জ মা’কে চিঠি লিখতে পারেন, তখন তাঁর প্রতি সদ্যোদয়শীল গুরুদেব তুর্গেনিয়েফ্‌কে যে তিনি এ বিষয়ে অস্বরোধ করবেন তাতে আর বিচিৎ কি? মপাসাঁর চিঠিতেই রয়েছে, তিনি একবার তুর্গেনিয়েফ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, মাতাল ইংরেজ খালাসী যদি হঠাৎ গান ধরে তবে তারা কি গান গাইবে—“গড্‌ সেভ্‌ দি কুইন?” তুর্গেনিয়েফ্‌ বললেন, বয়স্ক গাইবে “রুল ব্রিটানিয়া” এবং সেইটি অস্ববাদ করে তাঁকে সাহায্য করেন।

এ পুস্তকে আদিরসের প্রাধান্য হয়তো বাঙালী পাঠকের কিঞ্চিৎ পীড়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু রুশ-সাহিত্যের মহাবীরাও এই ধরনেই লিখেছেন (তলস্তয়ের নেখলুদফ্‌-মাসলভা, এবং গর্কির তো কথাই নেই)। বস্তুত এ বই যদি লিখতেই হয় তবে এ-ছাড়া গতি নেই। ‘কুমারসম্ভব’ লিখতে হলে কালিদাসের মতই লিখতে হয়, ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ লিখতে হলে চুড়ের মত লিখতে হয়।

অস্ববাদ করতে হলে যে-কটি গুণের প্রয়োজন হয়, তার একটিও আমার নেই। তাই আমি আমার একাধিক মিত্র তথা শিষ্যকে এই নভেলিকাটি অস্ববাদ করার জন্য অস্বরোধ করেছি। তাঁরা করেননি বলেই (মাঝখান থেকে বইখানি আমাকে ভিন-ভিনবার কিনতে হয়েছে!) আমি এটাতে হাত দিয়েছিলুম। করতে গিয়ে বুঝতে পারলুম, অস্ববাদ-কর্ম কী কঠিন গর্ভবন্ত্রণা। নিজের আপন লেখা আপন পাঠা, কিন্তু পরেরটা বলি দিতে হয় শাস্ত্রলম্বত পদ্ধতিতে। তদুপরি যে সমস্তা আমাকে সবচেয়ে চিন্তায় কেলেছে সেটি এই : যদি সেটাকে মধুর বাঙলায় হুবহু আপন মাতৃভাষায় যে রকম বলি, শুনি, সে-রকম অস্ববাদ করি তবে বাঙালী পাঠক সেটি হোঁচট না খেয়ে খেয়ে আবার পড়ে যাবেন—কিন্তু তাতে রুশ-বৈশিষ্ট্য মারা যাবে। পঞ্চাশের সে বৈশিষ্ট্য রাখতে গেলে অস্ববাদ হচ্ছে যায়

আড়ষ্ট, পাঠক রস পায় না,—তা হলে আর কৃথা পরিত্রম করলুম কেন ? তবে মাঝে মাঝে ইকনু, সামোভার, আপেল গাছ, ভল্গা, নিজনি নভগরুদ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—প্রয়োজনীয় রুশ আবহাওয়া তৈরি করে। তবু বলি, অম্মবাদটি ষোগ্য ব্যক্তির করা উচিত ছিল।

সর্বশেষে নিবেদন, কয়েক মাস ধরে নিজাকৃচ্ছতায় ভুগি। তখন চিকিৎসক উপদেশ দেন, কোনো মৌলিক রচনায় হাত না দিয়ে যেন অম্মবাদ-কর্ম আরম্ভ করি—তাতে করে রোগশয্যার একধেয়েমি থেকে থানিকটে মুক্তি পাবো। রোগশয্যার অভ্যুহাত শুনে আমার অম্মবাগী পাঠক (এ নিবেদনটি একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশ্যে) যে অম্মবাদ পছন্দ করে বসবেন, এ আশা আমার করা অম্মচিত, কিন্তু কটু-কাটব্য করার সময় হয়তো সে-কথা ভেবে থানিকটে ক্ষমার চোখে দেখবেন। এবং অতি সর্বশেষ নিবেদন, অনিত্রারোগে অম্মবাদকর্ম অতিশয় উপকারী। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললুম। আমার মত যারা অনিত্রায় ভুগছেন তাঁরা উপকৃত হবেন। কিমধিকমিতি ॥

সৈয়দ মুক্তভবা আলী

পাত্রপাত্রী

রুশ উপস্থানে একই পাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রী ভিন্ন ভিন্ন

নামে ডাকে বলে নিয়ে তাদের নির্ঘণ্ট দেওয়া হল :

ইসমাইলফ্,

পরিবারের নাম

বরিস তিমোতেইয়েভিচ্ ইসমাইলফ্,

বরিস তিমোতেইয়েভিচ্

}

বাড়ির কর্তা

জিনোভিই বরিসিচ্,

পুত্র

কাতেরীনা ল্ভভ্‌না ইসমাইলভা, কেট্,

একেতারীনা ল্ভভ্‌না, ল্ভভ্‌না

}

বরিসের পুত্রবধূ, জিনোভিইয়ের স্ত্রী

সেরুগেই ফিলিপচ্, সেরেজ্‌কা,

সেরেজেস্‌কা, সেরেজেস্কা, সেরেজ্‌কা

}

পুত্রবধূর প্রণয়ী

আক্‌নীনিয়া

পাচিকা

ফেদর জাখারফ্ লিয়ামিন, ফেদিয়া

সম্পত্তির অংশীদার বালক

তিয়োনা, সোনেৎকা ও অগ্রান্ত

কয়েদী

মাঝে মাঝে আমাদের এই অঞ্চলে এমন সব নরনারীর আবির্ভাব হয় যে, তারপর যত দীর্ঘকালই কেটে যাক না কেন, তাদের কথা স্মরণে এলেই যেন অন্তরাআ পর্বন্ত শিউরে ওঠে। এবং, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী, কাতেরীনা লুভ্‌না ইসমাইলভা। এর জীবন এমনই বীভৎস নাটকীয় রূপ নিয়েছিল যে, আমাদের সমাজের পাঁচজন ভদ্রলোক কোন এক মন্তরাবাজের অনুকরণে একে নাম দিয়েছিল, ‘মুৎসেন্‌স্‌ জেলার লেডি ম্যাকবেথ’।

কাতেরীনা তেমন কিছু অপূর্ব রূপসী ছিল না, কিন্তু চেহারাটি ছিল সত্যি স্ত্রী। তখন তার বয়েস সবে চব্বিশ; মাঝারি রকমের খাড়াই, ভালো গড়ন আর গলাটি যেন মার্বেল পাথরে কৌদাই। ঘাড় থেকে বাহু নেমে এসেছে সুন্দর বাক নিয়ে, বুক আট্টসাঁট, নাকটি বাণীর মত শক্ত আর সোজা, শুভ্র উন্নত ললাট আর চুল এমনই মিশমিশে কালো যে আসলে ওটাকে কালোয় নীলে মেশানো বলা যেতে পারে। তার বিয়ে হয়েছিল ব্যবসায়ী ইসমাইলফের সঙ্গে। সে বিয়েটা প্রেম বা ঐ ধরনের অন্ত কোনো কারণে হয় নি—আসলে ইসমাইলফ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ঐ ষা, আর কাতেরীনা গরীবের ঘরের মেয়ে বলে বিশেষ বাহুবিচার করার উপায় তার ছিল না।

ইসমাইলফ পরিবার আমাদের শহরে গণ্যমান্যদের ভিতরই। তাদের ব্যবসা ছিল সবচেয়ে সেরা ময়দার, গম পেষার জন্ত বড় কল তারা ভাড়া নিয়েছিল, শহরের বাইরে ফলের বাগান থেকে তাদের বেশ দু’পয়সা আসতো এবং শহরের ভিতরে উত্তম বসত-বাড়ি। মোদা কথায়, তারা ধনী ব্যবসায়ীগুণীর ভিতরেরই একটি পরিবার। তার উপর পরিবারটিও মোটেই পুষ্টিতে ভর্তি নয়। শুণ্ডর তিমোতেইয়েভিচ্‌ ইসমাইলফ, আশীর মত বয়েস, বছকাল পূর্বে তার স্ত্রী মারা গেছে। তার ছেলে, কাতেরীনার স্বামী জিনোভিই বরিসিচ্‌ পঞ্চাশের চেয়েও বেশ কিছু বেশী—আর সর্বশেষে কাতেরীনা, ব্যস্‌। পাঁচ বছর হল কাতেরীনার বিয়ে হয়েছে কিন্তু এখনো ছেলেপুলে কিছু হয়নি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীও কোনো সন্তান রেখে যায়নি—জিনোভিইয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর ঘর করার পরও। তার মৃত্যুর পর সে কাতেরীনাকে বিয়ে করে। এবারে সে আশা করেছিল, বৃষ্টি ভগবানের আশীর্বাদ ঐ-বিয়ের উপর নেমে আসবে—বংশের সুখ্যাতি সম্পত্তি বাঁচাবার জন্ত সন্তান হবে, কিন্তু কপাল মন্দ, কাতেরীনার কাছ থেকেও কিছু পেল না।

এই নিয়ে জিনোভিইয়ের মনস্তাপের অন্ত ছিল না, এবং শুধু সে-ই না, বুড়ো

বরিসেরও। কাতেরীনারও মনে এই নিয়ে গভীর দুঃখ ছিল। আর কিছু না হোক—এই যে অন্তহীন একঘেয়ে জীবন তাকে যুগ্মমোহমান করে তুলছে তার থেকে সে নিষ্কৃতি পেত, ভগবান জানান কতখানি আনন্দ পেত সে, যদি নাওয়ানো খাওয়ানো জামা-কাপড় পরানোর জন্য একটি বাচ্চা থাকতো তার—নিষ্কৃতি পেত এই বন্ধ, উচু পাঁচিলওয়া, মায়মুখো কুকুরে ভর্তি বাড়িটার অসহ্য একঘেয়েমি থেকে। শুধু তাই নয়, ঐ এক খোঁটা শুনে শুনে তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—‘বিয়ে করতে গেলি কেন, তুই? একটা ভদ্রলোকের জীবন সর্বনাশ করলি তুই,—মাসী, বাজা পাঠি।’ বেন মারাত্মক পাপটা তারই, সে পাপ তার স্বামীর বিরুদ্ধে, স্বপ্তের বিরুদ্ধে, এমন কি তাদের কুলে সাধু ব্যবসায়ীগুণীর বিরুদ্ধে।

ধনৈর্ঘর্ষ, আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ এই বাড়িতে কাতেরীনার ছিল সবচেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। দেখাটেকা করতে সে যেত খুবই কম এবং যদি বা তার স্বামীর সঙ্গে তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের বাড়িতে যেত তাতেও কোনো আনন্দ ছিল না। ওরা সব প্রাচীন ধরনের কড়া লোক। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত, সে কি ভাবে বসে, তার আচরণ কি রকম, সে কি ভাবে আসন ত্যাগ করে; ওদিকে কাতেরীনা তেজী মেয়ে এবং দুঃখদৈন্তে শৈশব কেটেছে বলে সে অনাড়ম্বর ও মূক জীবনে অভ্যস্ত। পারলে সে এখুনি দুটো বালতি ছুঁহাতে নিয়ে ছুটে যায় জাহাজঘাটে। সেখানে শুধু শেমিজ গায়ে স্নান করতে। কিংবা বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ঐ ছোঁড়াটার গায়ে বাদামের খোসা ছুঁড়ে মারতে। কিন্তু হায়, এখানে সব-কিছু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভোর হওয়ার পূর্বেই তার স্বপ্তর আর স্বামী ঘুম থেকে উঠে জালা জালা চা খেয়ে ছুঁটার ভিতর কাজ-কারবারে বেরিয়ে যান, আর সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা-একা আলস্তে আলস্তে এ-ঘর ও-ঘর করে করে ঘুরে মরে। সবকিছু ছিমছাম, ফাঁকা। দেব-দেবীদের সামনে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলছে। সমস্ত বাড়িতে আর কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই, কারো কণ্ঠস্বরের লেশমাত্র নেই।

কাতেরীনা ফাঁকা এ-ঘর থেকে ফাঁকা ও-ঘরে যায়, তারপর আরেক দফা আরো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, তারপর একঘেয়েমির জন্য হাই তোলে। তারপর সরু সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠে উচুতে নিজেদের শোবার ঘরে। সেখানে খানিকক্ষণ অলস নয়নে তাকিয়ে থাকে নিচের দিকে যেখানে দড়ি বানাবার পাটখুতো ওজন করা হচ্ছে, কিংবা অতি উৎকৃষ্ট মিহিন ময়দা গুদোনে পোড়া হচ্ছে। আবার সে হাই তোলে—তাই করে বেন সে খানিকটে আরাম পায়। তারপর বস্টাখানেক, বস্টা ছুই ঘুমিয়ে ওঠার পর আবার আসবে সেই

একঘেরেমি—কুশদেশের খাটি একঘেরেমি, ব্যবসায়ী বাড়ির একঘেরেমি। লে-একটানা, বৈচিত্র্যহীন একঘেরেমি এমনই নিরঙ্ক যে তাই লোকে বলে, তখন কোনো গতিকে কোনো একটা বৈচিত্র্য আনার জন্য মানুষ সানন্দে গলার দড়ি দিয়ে দেখতে চায় তাতে করে কিছু একটা হয় কিনা। কাতেরীনার আবার বই পড়ারও বিশেষ শখ ছিল না; আর থাকলেই বা কি? বাড়িতে ছিল সর্বস্বত্ব একখানা বই—কিয়েফ শহরে সংকলিত ‘সন্তদের জীবনী’।

খনদোলতে ভরা শস্যের এই বাড়িতে কাতেরীনার পুরো পাঁচটি বছর কেটে গেল অসহ একঘেরেমিতে—মমতা-হীন স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু আকছারই বা হয়—এক্ষেত্রেও কেউ সেদিকে দৃষ্টিতেও জ্বকপ করলো না।

॥ ২ ॥

কাতেরীনার বিয়ের ছ’বছর পর যে-বাঁধের জলে ইসমাইলফদের গম-পেবার কল চলতো সেটা কেটে গেল। আর অদৃষ্ট ঘেন ওদের ভেংচি কাটবার জন্যই ঠিক ঐ সময়ে মিলের উপর পড়লো প্রচণ্ড কাকের চাপ। তখন ধরা পড়ল যে ভাঙনটা প্রকাণ্ড। জল পৌঁছেছে সড়কের নিচের ধাপে। জোড়াতালি দিয়ে কোনো গতিকে ভাঙনটাকে মেরামত করার সর্ব প্রচেষ্টা হল নিষ্ফল। জিনোভিই আশপাশের চতুর্দিক থেকে আপন লোকজন গম-কলে জড়ো করে সেখানে ঠায় বসে রইল দিনের পর দিন, রাত্তিরের পর রাত্তির। বুড়ো বাপ ওদিকে শহরের ব্যবসা-কারবার সামলালে। আর কাতেরীনার কাঁটে লাগলো আরো নিঃসঙ্গ একটানা জীবন। গোড়ার দিকে স্বামী না থাকায় তার জীবনের একঘেরেমি ঘেন চূড়ান্তে পৌঁছল, পরে আস্তে আস্তে তার মনে হল, এটা তবু ভালো—এতে করে ঘেন সে খানিকটে মুক্তি পেল। স্বামীর দিকে তার হৃদয়ের টান কখনো ছিল না। স্বামী না থাকায় তার উপর হাওয়াই-তাওয়াই করার মত লোক অন্তত একজন তো কমলো।

একদিন কাতেরীনা ছাত্তের উপরের ছোট্ট ঘরে জানলার পাশে বসে ক্রমাগত হাই তুলছিল। বিশেষ কিছু নিয়ে যে চিন্তা করছিল তা নয়। করে করে আপন হাই তোলা নিয়ে নিজেই ঘেন নিজের কাছে লক্ষ্য পেল। ওদিকে, বাইরের আকিনায় চমৎকার দিনটি ফুটে উঠেছে; কুহুম কুহুম গরম, রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দ-বয়। বাগানের সবুজ বেড়ার ভিতর দিয়ে কাতেরীনা দেখছিল, ছোট-ছোট চকল পাখীগুলো কি রকম এক ভাল থেকে আরেক ভালো ফুৎ ফুৎ

করে উড়ছিল।

কাতেরীনা ভাবছিল, ‘আচ্ছা, আমি সমস্ত দিন ধরে টানা হাই তুলি কেন ? কি জানি। তার চেয়ে বরঞ্চ বেরিয়ে আঙ্গিনায় গিয়ে বসি কিংবা বাগানে বেড়িয়ে আসি।’

কিংখাপের একটি পুরনো জামা পিঠে-কাঁধে ফেলে কাতেরীনা বেরিয়ে পড়ল। বাইরে উজ্জ্বল আলো আর বাতাস যেন নব জীবন দেবার জন্ত বইছে। ওদিকে গুদামঘরের কাছে উঁচু চকে সবাই প্রাণ-ভরা খুশীতে ঠা ঠা করে হাসছিল। ‘অত রগড় কিসের ?’ কাতেরীনা তার স্বত্ত্বরের কেরানীদের জিজ্ঞেস করলো।

‘অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে, মা-ঠাকরুণ,—একাতেরীনা লুভভ্‌না—আমরা একটা জ্যান্ত শূয়োরী ওজন করছিলুম।’

‘শূয়োরী ? সে আবার কি ?’

‘ঐ যে আক্সুনিনিয়া শূয়োরীটা। বাচ্চা ভাস্‌সীলিইকে বিইয়ে গির্জের পরবে আমাদের নেমস্তন্ন করলো না, তাকে’—উত্তর দিল হাসিভরা বেপরোয়া গলায় একটি ছোকরা। বেশ সাহসী সুন্দর চেহারা। মিশকালো চুল, অল্প অল্প দাড়ি সব গজাচ্ছে। সের্গেই তার নাম।

ঐ মুহূর্তেই দাঁড়ে কোলানো ময়দা মাপার ধামা থেকে উকি যেতে উঠলে রাঁধুনী আক্সুনিনিয়ার চর্বিতে ভর্তি চেহারা আর গোলাপী গাল।

‘বদমাইশ ব্যাটারা, শয়তান ব্যাটারা’—রাঁধুনী তখন গালাগালি জুড়েছে। লে তখন ধামা কোলানোর ডাঙাটা ধরে কোনো গতিকে পাল্লা থেকে বেরবার চেষ্টা করছে।

‘খাবার আগে তার ওজন ছিল প্রায় চার মণ। এখন যদি ভাল করে খড় খায় তবে আমাদের সব বাটখারা ফুরিয়ে যাবে।’—সেই সুন্দর ছোকরা বুকিয়ে বললে। তারপর পাল্লাটা উল্টে রাঁধুনীকে ফেলে দিলে এক কোণের কতকগুলো বস্তার উপর।

রাঁধুনী হাসতে হাসতে গালমন্দ করছিল আর কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করাতে মন দিল।

‘আচ্ছা, ভাবছি আমার ওজন কত হবে।’ হাসতে হাসতে দড়ি ধরে মালের দিকটায় উঠে কাতেরীনা শুধলো।

‘এক শ’ পনেরো পাউণ্ডের সামান্য কম।’ বাটখারা ফেলে সের্গেই বললে, ‘আশ্চর্য !’

‘এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?’

‘আপনার যে অত্থানি ওজন হবে আমি মোটেই ভাবতে পারিনি, কাতেরীনা লভ্ভনা। আমার কি মনে হয় জানেন ? আপনাকে হু’ হাতে তুলে সমস্ত দিন কারো বয়ে বেড়ানো উচিত। এবং সে তাতে করে ক্লান্ত তো হবেই না, বরঞ্চ শুধু আনন্দই পাবে।’

‘হুঃ। আমি তো আর পাঁচজনেরই মত মাটির মাছুষ। তুমিও ক্লান্ত হয়ে পড়বে।’—এ ধরনের কথাবার্তা বলতে কাতেরীনা অভ্যস্ত ছিল না বলে উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গেল এবং হঠাৎ তার এক অদম্য ইচ্ছা হল অফুরন্ত আনন্দ আর সরস কথাবার্তা বলে তার হৃদয়-মন ভরে নেয়।

সেব্গেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে উঠলো, ‘কক্থনো না, ভগবান শাক্ষী, আমি আপনাকে আমাদের পুণ্যভূমি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবো।’

সাদামাটা পাতলা-দুব্লা একজন চাষা ময়দা মাপতে মাপতে বললো, ‘ও হিসেব চলে না, সোনা। আমাদের কার কত ওজন তা দিয়ে কি হয় ? তুমি কি মনে করো আমাদের মাংস সব-কিছু করে ? আমাদের মাংসের ওজনের কোনো দাম নেই, বুঝলে দোস্ত। আমাদের ভিতর যে শক্তি আছে সেই শক্তিই সব-কিছু করে—আমাদের মাংস কিছুই করে না।’

আবার কাতেরীনা নিজেকে সংযত না করতে পেরে বলে ফেলল, ‘বাঃ ! আমার বয়েস যখন কম ছিল তখন আমার গায়ে ছিল বেশ জোর ; সব পুরুষই যে আমার সঙ্গে তখন পেরে উঠতো সে-কথাটা আদর্শেই মনের কোণে ঠাঁই দিয়ে না।’

স্বস্ত্রী ছোকরা অল্পরোধ জানিয়ে বললে, ‘খুব ভালো কথা। তাই যদি হয় তবে আপনার ছোট্ট হাতটি আমায় একটু ধরতে দিন তো !’

কাতেরীনা হকচকিয়ে গেল কিন্তু হাত তবু দিলে বাড়িয়ে।

‘লাগছে, লাগছে—ওঃ ! আংটিটা ছেড়ে দাও। ওটাতে লাগছে’—সেব্গেই কাতেরীনার হাত চেপে ধরতেই সে চিৎকার করে উঠলো আর অন্য হাত দিয়ে দিলে তার বুকে ধাক্কা। সেব্গেই সঙ্গে সঙ্গে তার কর্জীর হাত ছেড়ে দিয়ে ধাক্কার চোটে তাল সামলাতে না পেরে পাশের দিকে হু’পা সরে গেল।

সেই ছোটখাটো সাদামাটা চাষা অবাক হয়ে বললে, ‘হুম্ ! লাও ঠেলা। মেয়েদের কথা আর বলছো না যে ?’

সেব্গেই মাথার চুল ঝাঁকুনি মেরে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলো, ‘না, না। আমাদের ধরাধরিটা ঠিক মত হোক, তবে তো।’

কাতেরীনা বললে, 'তবে এসো।' ততক্ষণে তারও মনে হুজির হোরাচ লেগেছে। দুটি জুভোল করুই উপরের দিকে তুলে ধরে বললে, 'তবে এসো।'।

সেরুগেই তার তরুণী কর্জাকে ছ' হাতে জড়িয়ে ধরে তার হুঠাম বুক আপন লাল শার্টের উপর চেপে ধরলো। কাতেরীনা তার কাঁধ সরাবার পূর্বেই সেরুগেই তাকে শূন্যে তুলে ধরে ছ'হাতে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে আপন বুক চেপে ধরেছে। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে একটা উটো ধামার উপর বসিয়ে দিল।

আপন দেহের যে-শক্তি সম্বন্ধে কাতেরীনা দৃষ্ট করেছিল তার একরক্মিও সে কাজে লাগাতে পারেনি। এবারে সে লালে লাল হয়ে গিয়ে ধামায় বসে কিংখাপের জামাটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে গায়ে ঠিক মত বসালো। তারপর চূপচাপ গুদোমবাড়ি ছেড়ে রওনানা দিল। মেকদার মাফিক বতখানি দরকার ঠিক ততখানি দেমাকের সঙ্গে সেরুগেই গলা লাক করে মজুরদের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বললে, 'ওরে ও গাধার পাল! ময়দার স্রোত বন্ধ হতে দিস নি, হালের উপর এলিয়ে পড়ে আরাম করিস নি। যদি কিছু থাকে বাকি, মোরা তো যাবো না ফাঁকি।'।

ভাবখানা করলে যে একুনি যা হয়ে গেল সে বেন তার কোনো পরোয়াই করে না।

কাতেরীনার পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে যেতে যেতে রাঁধুনী তাকে বললে, 'ব্যাটাচ্ছেলে লেরেজ্কা মেয়েছেলের পিছনে কি রকম ভালকুস্তার মতই না লাগতে জানে! ঐ চোরটার নেই কি? শরীরের গঠন, চেহারা, মুখের ছবি—সব-কিছুই আছে। হুনিয়ার যে কোনো মেয়েই হোক, ঐ বদমায়েশটা এক লহমায় তাকে মাং করে দেবে, তারপর তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠেলে দেবে পানের রাস্তায়। আর কাউকে ভালোবেসে তার প্রতি অল্পগত থাকার কথা যদি ভোলেন, তবে ও রকম হাড়েটক বেইমানের জুড়ি পাবেন না।'।

আগে যেতে যেতে যুবতী কর্জা শুধালো, 'আচ্ছা, কি বলছিলুম, ঐ যে... তোমার ছেলেটি বেঁচে আছে তো?'

'বেঁচে আছে, মা ঠাকরণ, দিবা জলজ্যাস্ত বেঁচে আছে—ওর আর ভাবনা কিসের? ওদের বখন কেউ চায় না তখনই তারা প্রাণটাকে আঁকড়ে ধরে আরো জোর দিয়ে।'।

'বাক্সটাকে দিল কে?'

'কে জানে? বটে গেল—বলতে পারেন মোটাকুটি। জেমা বন্ধুবান্ধব থাকলে

‘গুরুম খায়! ষটে ষায় বইকি !’

‘ঐ ছোড়াটা আমাদের সঙ্গে কি অনেকদিন ধরে আছে ?’

‘কার কথা বলছেন ? সেবুগেই ?’

‘হ্যাঁ !’

‘মাসখানেক হবে। আগে সে কন্ট্রনক্দের ওখানে কাজ করতো। সেখানকার মুনিস ওকে খেদিয়ে দেন।’ তারপর গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো, ‘লোকে বলে সেখানে সে খুদ কতীর সঙ্গে প্রেম করেছিল...জাহান্নমে যাক বাটা। সাহসটা দেখুন তো।’

। ৩ ।

মধুর মধুর গরম, ছুধের মত সাদা প্রায়াক্কার নেমে এসেছে শহরের উপর। জলের বাঁধের মেরামতির কাজ থেকে জিনোভিই এখেনো ফেরেনি। সে রাজে স্বস্তরও বাড়িতে নেই। তার এক প্রাচীন দিনের বন্ধুর জন্মদিনের পরবে বুড়ো সেখানে গেছে। বলে গেছে রাজেও বাড়িতে থাকে না; কেউ যেন তার জন্ত অপেক্ষা না করে। আর কিছু করবার ছিল না বলে কাতেরীনা সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে শোবার ঘরের খোলা জানলার উপর হেলান দিয়ে বসে বাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে। রান্নাঘরে মজুরদের থাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা আঙ্গিনার উপর দিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আপন আপন শোবার জায়গায় যাচ্ছে। কেউ গোলাবাড়িতে, কেউ মরাইয়ে, কেউ মিঠে মিঠে গন্ধের থড়ের গাদার দিকে। রান্নাঘর থেকে বেরল সেবুগেই সর্বশেষে। সে প্রথম আঙ্গিনার চতুর্দিকে রোঁদ দিয়ে তদারকী করলে, কুকুরগুলোর চেন খুলে দিলে, শিব দিতে দিতে কাতেরীনার জানলার নিচে দিয়ে ঘাবার সময় উপরের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন জানালে।

জানলার পাশে বসে কাতেরীনা মুহূর্তে প্রত্যভিবাদন জানালো—বিরাট আঙ্গিনা খানিকক্ষণের ভিতরই নির্জন প্রান্তরের মত নিঃশব্দ হয়ে গেল।

মিনিট দুই যেতে না যেতে কাতেরীনার চাবি-বন্ধ ঘরের বাইরে কে যেন ডাকলো, ‘ঠাকরুণ !’

কাতেরীনা ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, ‘কে ?’

কেহানী উত্তর দিলে, ‘দয়া করে ভয় পাবেন না। আমি। আমি সেবুগেই।’

‘কি চাই তোমার, সেবুগেই ?’

‘আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি, কাতেরীনা লভ্ভনা ; একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার অমুগ্রহ ভিক্ষা করতে এগেছি—আমাকে কৃপা করে এক মিনিটের জন্ত ভিতরে আসতে দিন।’

কাতেরীনা চাবি ঘুরিয়ে দোর খুলে দিয়ে সেরুগেইকে ঘরে ঢুকতে দিল।

‘কি ব্যাপার, কি চাই?’ জানলার কাছে ফিরে গিয়ে কাতেরীনা শুধলো।

‘আমি আপনার কাছে এলুম জিজ্ঞেস করতে, আপনার কাছে চটি বই-টাই কিছু আছে? আমাকে যদি দয়া করে পড়তে দেন। এখানে কী দুর্বিষহ একঘেয়ে জীবন।’

কাতেরীনা উত্তর দিলে, ‘আমার কাছে কোনো প্রকারেরই বই নেই, সেরুগেই। আমি তো পড়ি নে।’

সেরুগেই ফরিয়াদ করলে, ‘কী একঘেয়ে জীবন!’

‘তোমার জীবন একঘেয়ে হবে কেন?’

‘অপরাধ যদি না নেন তবে নিবেদন করি, একঘেয়ে লাগবে না কেন? আমার এখন যৌবন কাল, অথচ আমরা এখানে আছি মঠের সন্ন্যাসীদের মত। আর ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, এই নির্জনতাই আমাকে পচে হেজে খতম হতে হবে, যতদিন না আমার কফিন-বাক্সের * ডালায় পেরেক ঠোকা হয়। মাঝে মাঝে আমি যে নৈরাশ্রের কোন্ চরমে পৌঁছই তা আর কি করে বোঝাই!’

‘বিয়ে করো না কেন?’

‘বিয়ে করবো? বলা বড় সোজা! এখানে আমি বিয়ে করবো কাকে? আমি তো বিশেষ কিছু জমিয়ে উঠতে পারি নে, আর বড়লোকের মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদিকে গরীব বলেই আমাদের শ্রেণীর মেয়ে মাত্রই লেখা-পড়ার ধার ধারে না—সে তো আপনি জানেন, কাতেরীনা লভ্ভনা। তারা কি কখনো সত্যি সত্যি বুঝতে পারে, প্রেম বলতে কি বোঝায়! শুধু তাই নয়, বড়লোকদের ভিতর এ-বিষয়ে কি ধারণা সেটাও

* বাঙ্গালী মুসলমান ‘কফন’ বা ‘কাফন’ বলতে শবাজ্জাদনের বস্ত্র বোঝে। (ইংরিজি ‘শ্রাউড’) শব্দটি ফার্সীর মাধ্যমে আরবী থেকে এসেছে। ইয়োরোপীয় ভাষায় ‘কফিন’ বলতে যে কাঠের বা পাথরের বাক্সে মৃতদেহ রেখে গোর দেওয়া হয় সেই বাক্স বোঝায়। উভয় শব্দই খুব সম্ভব গ্রীক ‘কফিনস’ থেকে এসেছে। ইংরিজি ‘কফার’—‘পোটিকা’—এই শব্দ থেকেই এসেছে।—অম্ববাদক।

একবার চিন্তা করুন তো। এই ধরুন আপনার কথা; আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সামান্যতম স্পর্শকাতরতা যার হৃদয়ে আছে তার কাছে আপনি মানুষের চিরস্তন উৎস। অথচ দেখুন দেখিনি তারা আপনাকে নিয়ে কি করেছে? ময়না পাখীটির মত খাঁচায় পূরে রেখেছে।’

কাতেরীনার মুখ থেকে ফস্কে গেল, ‘কথাটা সত্যি; আমি নিঃসঙ্গ।’

‘তাই একেয়ে লাগবে না তো কী লাগবে মাদাম—যে-ভাবে আপনি জীবন যাপন করছেন? আপনার অবস্থায় অন্তরা যা করে থাকে, আপনার যদি সে রকম ‘উপরি’ কেউ থাকতোও, তবুই বা কি হত? তার সঙ্গে দেখা করাও তো আপনার পক্ষে অসম্ভব।’

‘এই! তুমি...একটু সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। আমার একটি বাচ্চা থাকলেই, আমার তো মনে হয়, আমি সুখী হতুম।’

‘কিন্তু একটু চিন্তা করুন; আমাকে যদি অহুমতি দেন তবে বলি, বাচ্চা জন্মাবার জন্য তার পিছনে তো কোনো-কিছু-একটা চাই—বাচ্চা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। আপনি কি মনে করেন আমি জানি নে আমাদের ব্যবসায়ীদের বউ-বিরি কি ভাবে জীবন কাটায়—এত বছর আমার মুনিবদের মাঝখানে বাস করেও? আমাদের একটা গীত আছে, ‘আপন হৃদয়ে প্রেম না থাকলে, জীবন সে তো শুধু বিষম ছরাশা!’ আর সেই ছরাশা, সেই কামনা—আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাতেরীনা লুভ্‌ভ্‌না, আমার হৃদয় এমনই বেদনায় ভরে দিয়েছে যে, ইচ্ছে করে ইস্পাতের ছুরি দিয়ে হৃদয়টাকে বুকের মাঝখান থেকে কেটে বের করে আপনার কচি ছুটি পায়ের উপর রাখি। আমি তাহলেই শান্ত হব—শতগুণ শান্তি ফিরে পাবো।’

‘তোমার হৃদয় সম্বন্ধে কি যা-তা সব তুমি আমাকে বলছো? তার সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি এইবারে আস্তে আস্তে রওয়ানা দাও।’

‘না, দয়া করুন, ঠাকরুণ।’ সেবগেই ততক্ষণে কাতেরীনার দিকে এক পা এগিয়ে এসেছে, তার সমস্ত শরীর তখন কঁপে কঁপে ঢুলে ঢুলে উঠছে। ‘আমি জানি, হৃদয় দিয়ে অহুভব করছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনার জীবনও এ-পৃথিবীতে আমার জীবনের মতই অত সহজ সরল ভাবে বয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু এখন শুধুমাত্র একটি কথা—’ এ-কথাগুলো সে বলে গেল এক নিশ্বাসে—‘এখন, এই মুহূর্তে, সব-কিছু আপনার হাতে, আপনার তাঁবেতে।’

‘কি চাও তুমি? এ-সব কি হচ্ছে? এখানে আমার কাছে তুমি এসেছ কেন? আমি এখুনি জানলা দিয়ে লাফ দেব’—কাতেরীনা যখন এ-কথাগুলো

বলছিল তখন তার মনে হচ্ছিল, কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় ভয় তাকে অসহ্য বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে ; সে তখনো জানলার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে আছে । ‘ওগো, আমার তুলনাইনা, ও আমার জীবনসমা ! জানলা দিয়ে লাফ দেবার কি প্রয়োজন ?’—সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সেরুগেই এ-কথাগুলো কাতেরীনার কানে কানে মুহূর্তে বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানলা থেকে টেনে এনে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো ।

‘ও, ও ! আমাকে ছাড়’—মুহূর্ত কাতর কণ্ঠে কাতেরীনা বললে ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেরুগেইর নিবিড় চুখন বর্ষণে তার শক্তি যেন ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল । আপন অনিচ্ছায় তার দেহ কিন্তু সেরুগেইয়ের দেহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল ।

সেরুগেই তার কর্তাকে শূণ্যে তুলে নিয়ে দুই বাহুতে করে—যেন একটি ছোট্ট বাচ্চাকে তুলে ধরেছে—ঘরের অন্ধকার কোণে নিয়ে গেল ।

সমস্ত ঘরে নীরবতা—শুধু শিয়রের খাড়া তক্তাতে ঝোলানো কাতেরীনার স্বামীর পোশাকী ট্যাকঘড়িটি টিকটিক করে যাচ্ছে ; কিন্তু সে আর কি বাধা দেবে !

‘যাও ।’ আধঘণ্টা পরে কাতেরীনা সেরুগেইয়ের দিকে না তাকিয়েই আলু-থালু চুল ছোট্ট একটি আয়নার সামনে ঠিক করতে করতে বললো ।

‘এখন আর আমি যাবো কেন ? বিশ্ব-সংসার খুঁজলেও তো এখন আর কোনো কারণ পাওয়া যাবে না ।’ সেরুগেইয়ের কণ্ঠে এখন উল্লাসের স্বর ।

‘শুভ্রমশাই বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেবেন যে ।’

‘কি বললে, আমার পরাণের মণি ? এতদিন ধরে তুমি কি শুধু তাদেরই নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ যারা রমণীর কাছে পৌঁছতে হলে দরজা ভিন্ন অগ্নি কোনো পথ জানে না ? আমার ভিন্ন ব্যবস্থা । তোমার কাছে আসতে হলে, তোমার কাছ থেকে যেতে হলে আমার জগৎ বহু দরজা খোলা রয়েছে ।’ ব্যালকনির খুঁটি দেখিয়ে উত্তর দিলে তরুণ ।

। ৪ ।

জিনোভিই সাত দিন হল বাড়ি ফেরে নি, আর এই সময় সপ্তাহ ধরে তার স্ত্রী প্রতিটি রাতি সেরুগেইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছে সরস রতনে—শুভ্র প্রভাতের প্রথম আলোর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ।

এই সাত রাত ধরে জিনোভিই রবিসিচের বেঙ্কুয়ে শুভ্রমশাইয়ের ডাঁড়ার

থেকে নিয়ে আসা প্রচুর ওয়াইন পান করা হল, প্রচুর মিষ্ট-মিষ্টান্ন খাওয়া হল, তরুণী গৃহকর্তার মধুভরা চোঁট থেকে প্রচুর চুষন চুমুকে চুমুকে তোলা হল, তুলতুলে বালিশের উপর ঘন কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ নিয়ে খেলাভরে প্রচুর আদর-সোহাগ করা হল। কিন্তু হায়, কোনো পথই আশস্ত মন্থন নয়—মাঝে মাঝে হৌচট ঠোকরও খেতে হয়।

বরিস তিমোতেইচের চোখে সে-রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বুড়ো রাত্রির লম্বা রঙীন ঝোলা পরে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছিল; জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকালো, তার পর আরেকটা জানলার কাছে এসে দেখে, লাল শার্ট পরা সেই খাপস্বরং ছোকরা সেবুগেই তার পুত্রবধূর জানলার একটা খুঁটি বেয়ে অতিশয় নীরব নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে। বরিস তিমোতেইচ্ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়ে চেপে ধরলো রোমিয়ো নটবরের পা ছ'খানা। সে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় চেয়েছিল বুড়োকে একখানা খাটি বিরাসী সিন্ধা লাগায়—আকস্মিক উৎপাতে তারও মেজাজটা গিয়েছিল বিগড়ে—কিন্তু সেটা আর লাগালে না, ভাবলো, তাহলে একটা হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যাবে।

বরিস তিমোতেইচ্ জিজ্ঞেস করলে, 'বল্ ব্যাটা চোর, কোথায় গিয়েছিলি?' সেবুগেই উত্তর দিলে, 'লাও! শুধোচ্ছে, কোথায় গিয়েছিলুম আমি! যেখানেই গিয়ে থাকি নে কেন, সেখানে আমি আর এখন নেই! হল, বরিস তিমোতেইচ্ মহাশয়, প্রিয়বরেষু!'

'আমার ছেলের বউয়ের ঘরে তুই রাত কাটিয়েছিস?'

'ঐ কথাটাই যদি জিজ্ঞেস করলেন কর্তা-ঠাকুর, তাহলে আবার বলি, আমি জানি, আমি রাত্তিরটা কোথায় কাটিয়েছি; কিন্তু এইবেলা তোমাকে একটি খাটি তরুণী বলছি আমি, বরিস তিমোতেইচ্; যা হয়ে গিয়েছে সেটা তুমি আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। খামোখা কেন তোমাদের শিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবারের উপর এখন ফালতো কেলেঙ্কারি টেনে আনবে—অস্তুত সেটা তো ঠেকাতে পারো। এখন আমাকে সরল ভাষায় বলো, আমাকে কি করতে হবে। তুমি কি দান পেলে সন্তুষ্ট হবে?'

'তোকে আমি পাঁচ শ' বা চাবুক কশাবো, ব্যাটা পিচেশ।'

'দোষ আমারই—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!' সাহসী নাগর স্বীকৃত হল। 'এবারে বলো তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে; প্রাণ বা চায় সেই আনন্দ করে নাও—আমার রক্ত চেটে নাও।'

বরিস তখন সেবুগেইকে শানে তৈরী তার ছোট্ট একটি গুদোম ঘরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক চাবকাতে আরম্ভ করলো। যখন বুড়োর আর চাবুক মারার মত শক্তি একরকমিও রইল না তখনই থামলো। সেবুগেইয়ের গলা থেকে কিন্তু একবারের তরেও এতটুকু আতঁরব বেরোয়নি, তবে, হ্যাঁ, শাটের আঙ্গিনে সে যে দাঁত কিড়িমিড়ি করে কামড়ে ধরেছিল তার অর্ধেকখানা শেষ পর্যন্ত সে চিবিয়ে কুটি কুটি করে ফেলেছিল।

সেবুগেই মাটিতে পড়ে রইল। চাবুকে চাবুকে তার পিঠ তখন কামারের আঙুনে পোড়া কড়াইয়ের মত লাল হয়ে গেছে। সেটা শুকোবার সময় দিয়ে বুড়ো তার পাশে এক ঘটি জল রেখে গুদোমঘরের দোরে বিরাট একটা তালায় চাবি মারলে। তারপর ছেলেকে আনবার জন্ত লোক পাঠালে।

কিন্তু এই আজকের দিনেও* রাশার বড় রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় ছ' মাইল পথ আসা যাওয়া সাততাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠে না, ওদিকে আবার কাতেরীনা যে সময়টুকু না হবার নয় তার বেশী একটি মাত্র ঘণ্টাও সেবুগেই বিহনে কাটাতে পারে না। তার স্বপ্ত প্রবৃত্তি তখন অকস্মাৎ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ফলে সে এমনই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উঠেছে যে, তখন তার পথ রোধ করে কার সাধ্য! আতিপাতি খুঁজে সে বের করে ফেলেছে সেবুগেই কোথায়। সেখানে লোহার দরজার ভিতর দিয়ে সেবুগেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সবকিছু ঠিকঠাক করে ছুটলো চাবির সন্ধানে।

শব্তরের কাছে গিয়ে মিনতি জানালে, 'সেবুগেইকে ছেড়ে দাও, বাবা, লক্ষ্মীটি।'

বুড়োর মুখের রঙ স্বেচ্ছা সবুজ হয়ে গেল। এতখানি বেহায়ামির দুঃসাহস সে তার পাপিষ্ঠা পুত্রবধূর কাছে প্রত্যাশা করেনি—কারণ, পাপিষ্ঠা হোক আর বেহায়াই হোক, এতদিন সে ছিল বড় বাধ্য মেয়ে।

'এ কি আরম্ভ করলি তুই, তুই অমুক-তমুক?'—বুড়ো অলীল ভাষায় তার বেহায়াপনা নিয়ে কটুকটব্য আরম্ভ করলো।

'ওকে যেতে দাও, বাবা। আমি আমার বিবেক সাক্ষী রেখে শপথ করছি আমরা এখনো কোন পাপাচার করি নি।'

'পাপাচার করে নি! ওঃ! বলে কি?'—বুড়ো যেন আর কিছু না করতে পেরে শুধু দাঁত কিড়িমিড়ি দিতে লাগলো। 'এ ক' রাস্তির ধরে তোমরা উপরে

কি করে সময় কাটাচ্ছিলে? দুজনাতে মিলে তোমার স্বামীর বালিশের ফেসো ফুলিয়ে ফালিয়ে তার জন্ত জুংসই করে রাখছিলে।’—বুড়ো ব্যঙ্গ করে উঠলো।

কাতেরীনা কিন্তু নাছোড়বান্দা; সেই এক বুলি ক্রমাগত বলে যেতে লাগলো, ওকে ছেড়ে দাও,—ফের আবার—ওকে ছেড়ে দাও।

বুড়ো বরিস বললে, ‘এই যদি তোর বাসনা হয় তবে শুনে নে; তোর স্বামী ফেরার পর তোকে বাইরের ঐ আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে আমরা দুজনাতে আপন হাতে চাবুক মারবো—সতী সাধবী রমণী কি না তুই! আর ঐ ব্যাটাকে নিয়ে কি করা হবে শুনবি—ইতর বদমাইশটাকে কালই পাঠাবো জেলে!’

এই ছিল বরিস তিমোতেইচের সিদ্ধান্ত; শুধু এইটুকু বলার আছে যে সে-সিদ্ধান্ত কখনো কর্মে রূপান্তরিত হল না।

॥ ৫ ॥

সেই রাতে বুড়ো বরিস ব্যাঙের ছাতা আর গমের পরিজ্ঞ থেয়েছিল। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার বুক-জ্বালা আরম্ভ হল; হঠাৎ তলপেটে তার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। খানিকক্ষণ পর বমির চোটে যেন তার নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসতে লাগল এবং ভেরের দিকে সে ভবলীলা সংবরণ করলো; হুবহু যে-রকম গুদোমবাড়ির ইঁদুরগুলো মারা যায়। এদেরই ‘উপকারার্থে’ কাতেরীনা আপন হাতে এক রকমের মারাত্মক সাদা গুঁড়ো মাখিয়ে খাবার তৈরি করতো—এ গুঁড়োটা কাতেরীনার হেপাজতেই থাকতো।

কাতেরীনা তার আপন সেয়গেইকে বুড়োর গুদোমঘর থেকে মুক্ত করে নিয়ে সন্ধলের চোখের সামনে, কণামাত্র লজ্জা-শরম না মেনে, শব্বরের চাবকানো থেকে সেবে ওঠার জন্ত তাকে তার স্বামীর বিছানায় আরাম করে শুইয়ে দিল। ওদিকে কালবিলম্ব না করে শব্বরকে খুঁটধর্মের আচার-অহুষ্ঠান সহ গোর দেওয়া হল। অবশ্য লক্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, কারো মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয়নি; বরিস তিমোতেইচ যদি মরে গিয়ে থাকে তবে, ইঁহা, সে নিশ্চয়ই মারা গেছে ব্যাঙের ছাতা খেয়ে—আর, ওরকম কত লোক তো ব্যাঙের ছাতা খেয়ে আক-ছারই মারা যায়। ছেলের জন্ত অপেক্ষা না করেই বুড়ো বরিসকে সাত-তাড়াতাড়ি গোর দেওয়া হয়েছিল, কারণ বছরের ঐ সময়টায় ভাপসা গরম পড়ে* আর যে লোকটা খবর নিয়ে গিয়েছিল সে জিনোভিই বরিসিচকে ‘মিলে’

* ফলে যতদেহ খুব তাড়াতাড়ি পচতে আরম্ভ করে। —অলুবাদক।

পায়নি। বাট মাইল আবার দূরে সে সস্তা কিছু জল্লা জমির খবর পায় এবং সেটা দেখতে সে ঐ দিকে চলে গিয়েছিল। বাবার সময় সে আবার কাউকে পরিকার করে বলে যায়নি ঠিক কোন্ জায়গায় যাচ্ছে।

সব ব্যবস্থা করে নেবার পর কাতেরীনা একদম বে-লাগাম হয়ে গেল। ভার সে কোনো কালেই ছিল না, কিন্তু এখন তার মনের ভিতর কি খেলছে তার কোনো পাতাই কেউ পেল না। পুরো পাক্কা হিম্মতেরে সে চলা-ফেরা করতে লাগলো, বাড়ির সর্বপ্রকার কাজকর্মে ঠিকমত তদারকি করলো এবং সেবুগেইকে এক লহমার তরে চোখের আড়াল হতে দিত না। বাড়িতে যারা কাজ করতো তারা সবাই এসব দেখে তাজ্জব; কিন্তু কাতেরীনা দরাজ হাত দিয়ে প্রত্যেককে বশীভূত করার তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতো, সর্ববিশ্বয় তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যে যার আপন মনে অনুমান করলে, ‘কর্ত্তীঠাকুরাণী আর সেবুগেইয়ের ভিতর চলছে বেলোপনা—ঐ হল গিয়ে মোদ্ধা কথা। এখন তো ওটা তারই শিরঃপীড়া, আমাদের কি, আর জবাবদিহি তো করতে হবে একলা তাকেই।’

ইতিমধ্যে সেবুগেই তার স্বাস্থ্য, তার নমনীয় মাধুর্য পুনরায় ফিরে পেয়েছে আর বীরদের সেরা বীরের মত আবার কাতেরীনার উপরে শিকরে পাখীর মত চক্কর খেতে শুরু করেছে। আবার আরম্ভ হয়েছে তাদের আনন্দময় দিন-যামিনী! কিন্তু কালবেগ শুধু ওদের দুজনার তরেই তো আর এগিয়ে যাচ্ছিল না। ওদিকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্বামী হিসেবে বিড়খিত জিনোভিই বরিসিচ্-ক্রতবেগে আপন গৃহমুখে ধাবিত হয়েছে।

। ৬ ॥

আহারাদি শেষ করা হয়েছে। বাইরে তখনও দুর্দান্ত গরম আর চটপট যোদ্ধা-খুশি-সেদিকে-মোড়-নিতে ওস্তাদ মাছিগুলোর উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাতেরীনা তার শোবার ঘরের জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে তার উপরে ভিতরের দিকে একখানা ফ্ল্যানেলের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে বণিক সম্প্রদায়ের সমাদৃত উচু খাটে সেবুগেইকে নিয়ে বিশ্রামের জন্ত শুয়ে পড়েছে। কাতেরীনা নিজা জাগরণে আসা যাওয়া করছে, কিন্তু নিজাই হোক আর জাগরণই হোক, তার মনে হচ্ছিল যেন তার মুখ ঘামে ভেলে যাচ্ছে আর প্রত্যেকটি নিশ্বাস অত্যন্ত গরম আর অতিশয় কষ্টের সঙ্গে ভিতরে যাচ্ছে। শীত বৃষ্ণতে পারছিল ঘুম থেকে

উঠে বাইরের বাগানে বসে চা খাবার বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপ্রাণ শত চেষ্টাতেও সে কিছুতেই উঠে বসতে পারাছিল না। শেষটায় রাধুনী এসে দরজায় টোকা দিল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সে পাশ ফিরল, তারপর একটা হলো বেড়ালকে আদর করতে লাগল। কারণ ইতিমধ্যে একটা খাসা সুন্দর, পুরোবাড়ন্ত, ...র মত মোটামোটা, খাজনা উত্তলের পেয়াদার মত বিরাট একজোড়া গৌফওলা বাদামী রঙের বেড়াল এসে তার আর সেরুগেইয়ের মাঝখানে গা ঘষতে আরম্ভ করেছে। কাতেরীনা তার ঘন লোমের ভিতর আঙ্গুল চালিয়ে তাকে আদর করতে লাগল আর বেড়ালটাও তার ভোঁতা মুখ আর বোঁচা নাক দিয়ে কাতেরীনীর কঠোর-কোমল বুক চাপ দিচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোহাগের ঘব্বু ঘব্বু শব্দ ছেড়ে যেন গান গাইছিল—কাতেরীনীর প্রেম নিয়ে, অতি কোমল মোলায়েম স্বরে। কাতেরীনা অবাক হয়ে ভাবছিল, 'এই হোঁকা মোটকা বেড়ালটা ঘরে ঢুকলই বা কি করে আর এলই বা কেন?' কাতেরীনা আবার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, 'আমি খানিকটে সর জানলার চৌকাঠের উপর রেখেছিলুম; এই পাজী হলোটাকে যদি তাড়া লাগিয়ে খেদিয়ে না দিই তবে সে বেবাক সর চেটে মেরে দেবে।' বেড়ালটাকে পাকড়ে ধরে বাইরে ফেলে দেবার সে যতই চেষ্টা করতে লাগল ততই সে যেন ঠিক কুয়াশার মত তার আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে বায় বার গলে যেতে লাগলো। বোবায় ধরা দুঃস্বপ্নের ভিতরও কাতেরীনা মনে মনে তর্ক করতে লাগল, 'তা সে যাক্গে, কিন্তু এই হলো বেড়ালটা এখানে আদৌ এল কোথেকে? আমাদের শোবার ঘরে তো কস্মিনকালেও কোনো হলো বেড়াল ছিল না; তবু, দেখো, কি রকম একটা ইয়া লাশ এখানে ঢুকে পড়েছে।' আবার কাতেরীনা তাকে পাকড়াবার চেষ্টা করলো, আবার বেড়ালটা হাওয়া হয়ে গেল। মনে তার ধোঁকা লাগলো, 'বা রে! এটা তবে কি? দেখি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে—এটা কি আদপেই হলো বেড়াল না কি?' হঠাৎ এক দারুণ ভয়ের বিভীষিকা যেন তার সর্বাঙ্গ চেপে ধরে কুলে নিদ্রা আর নিদ্রালু ভাব খেদিয়ে দিল। কাতেরীনা ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে বেড়ালটার নামগন্ধও নেই। শুধু তার সুন্দর শরীর সেবুগেই পাশে শুয়ে তার বুকের মাঝখানে আপন গরম মুখটি গুঁজে দিয়েছে।

কাতেরীনা বিছানায় উঠে বসল; চুষনে চুষনে সে সেবুগেইকে আচ্ছন্ন করে দিল। তার আদর সোহাগ যেন শেষ হতেই চায় না। তারপর হাঁসের বুকের নরম পালকের আলুথালু বিছানাটাকে ছিমছাম করে দিয়ে বাগানে চা খেতে চলে

গেল। সূর্য তখন অন্তাচলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর উষ্ণগর্তা পৃথিবীর উপরে নেমে আসছে অপূর্বসুন্দর, সমোহনী সন্ধ্যা।

ফুলে ফুলে ঢাকা আপেল গাছের তলায় রাগ্-এর উপর বসলো কাতেরীনা চা খেতে। আক্সানিয়াকে বললে, 'বড় বেশি ঘুমোতে ঘুমোতে অবেলা হয়ে গেল।' তারপর বাসন পোছার কাপড় দিয়ে একটা পিরিচ পুছতে পুছতে রাঁধুনীকে শুধলো, 'আচ্ছা, বল তো, এসবের অর্থ কি আক্সানিয়া, সোনা?'

'কি? কিসের কি অর্থ, মা?'

'ওটা কিন্তু নিছক স্বপ্ন ছিল না। কোথাকার কোন্ এক হলো বেড়াল বার বার শুধু আমার গা বেয়ে উঠছিল। আর-পাঁচটা বেড়ালের মত হবছ জলজ্যান্ত বেড়াল। এর অর্থ কি?'

'এসব আপনি কি বলছেন?'

'সত্যি বলছি, একটা বেড়াল আমার গা বেয়ে উঠছিল।'

কি ভাবে বেড়ালটা তার গা বেয়ে উঠছিল সে-সব কথা তখন কাতেরীনা তাকে বললো।

'আপনি আবার ওটাকে আদর করতে গেলেন কেন?'

'তা, বাপু, আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন? আমি নিজেই জানি নে, ওটাকে আদর করলুম কেন?'

'সত্যি সত্যি, বড়ই তাজ্জব ব্যাপার এটা!'

'আমার নিজেরই বিশ্বাসের সীমা নেই।'

'এটাতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে কেউ না কেউ আপনার শত্রুতা না করে ছাড়বে না। কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক কি?'

'ঠিক ঠিক হবছ কি হবে সেটা কেউই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না,— ঠিক ঠিক, হবছ কেউই পারবে না, সোনা মা, শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, একটা না একটা কিছু ঘটবেই ঘটবে।'

কাতেরীনা বললে, 'আমি ঘুমে বার বার স্তরূপক্ষের ফালি চাঁদ দেখছিলুম, আর সেই বেড়ালটা।'

'ফালি চাঁদ?—তার অর্থ বাচ্চা হবে।'

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো।

'সেবুগেইকে কি তোমার কাছে এখানে নিচে পাঠিয়ে দেব, মা-মণি?— কলে-কোশলে ইঙ্গিত দিলে আক্সানিয়া। আসলে কাতেরীনার বিশ্বাসের পাত্রী

হওয়ার জন্তে তার প্রাণ যেন বেরিয়ে আসছিল।

‘হ্যাঁ, সেও তো বেশ কথা। ওকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে চা দেব’খন।’

‘আমিও তাই বলি—এখানে পাঠিয়ে দি।’ আকস্মিন্যাই প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করে দিল। তারপর পাতিহাঁসের মত হেলেড়লে বাগানের গেটের দিকে চললো।

কাতেরীনা সের্গেইকেও বেড়ালটার কথা বললে।

সের্গেই বললে, ‘কিছু না, শ্রেফ দিবাস্বপ্ন।’

‘কিন্তু সেরেজা, আমি এর আগে এরকম দিবাস্বপ্ন কখনো দেখি নি কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলো।’

‘আগে কখনো হয় নি, এই প্রথম হল, এ রকম জিনিস তো নিত্য নিত্য হচ্ছে। এমন দিনও ছিল যখন আমি শুধু তোমাকে আড়চোখে একটুখানি দেখে নেবার সাহস করতে পারতুম না, আর তোমার জন্তু আপন হাতে গুমরে মরতুম। আর এখন দেখো, সব-কিছু বদলে গিয়েছে। এই যে তোমার শ্বেতশুভ্র দেহ—এর সমস্তটি এখন আমার।’

সের্গেই কাতেরীনাকে বুকে ধরে আলিঙ্গন করলো, তারপর শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে কোঁতুকভাবে তাকে নরম কবলের উপর ফেলে দিল।

কাতেরীনা বললে, ‘ওগো, আমার মাথা ঘুরছে। সেরেজা, এই দিকে এস। আমার পাশে এসে বসো।’—সের্গেইকে ডাক দিয়ে কাতেরীনা অলস রত্নসার মৌন ইঙ্গিত দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুভ্র কুহুমদামে আচ্ছাদিত আপেল গাছের তলায় বেপরোয়া রসের নাগর হামা দিয়ে এসে কাতেরীনার পায়ের কাছে বসলো।

‘আমাকে পাবার জন্তু তুমি কাতর হয়েছিলে,—না? সেরেজা?’

‘তুমি যদি শুধু জানতে কতখানি কাতর হয়েছিলুম!’

‘সেটা কি রকম ছিল, আমাকে বুঝিয়ে বলো।’

‘সে আমি কি করে বুঝিয়ে বলবো? অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার মর্মবেদনায় তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া কি কেউ কখনো বোঝাতে পারে? আমার ছিল সেই।’

‘তা হলে, সেরেজা, তুমি যে নিজেকে তিলে তিলে মেরে ফেলছিলে সেটা আমি অল্পভব করলুম না কেন? লোকে তো বলে সেটা নাকি অল্পভব করা যায়।’

সের্গেই নীরব থেকে এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

‘তা হলে তুমি হরদম গান গাইছিলে কি করে, যদি আমার জন্ম এতখানি তিলে তিলে দধ্ব হয়ে মরছিলে? কিছু ভয় নেই! আমি সব জানি। তুমি যে উঁচু বারান্দায় গান গাইতে সে তো আমি শুনতে পেতুম।’—কাতেরীনা সেবুগেইকে আদর করতে করতে প্রেমের পর প্রেম শুধিয়ে যেতে লাগলো।

‘গান গেয়েছিলুম তো কি হয়েছিল? একটা মশা জীবনভর গান গায়—সেটা কি ফুঁতির তোড়ে?’—বিরস কণ্ঠে সেবুগেই উত্তর দিলে।

খানিকক্ষণের জন্ম দুজনারই চুপচাপ। সেবুগেইয়ের পূর্বরাগকীর্তন শুনে কাতেরীনীর হৃদয় পরিপূর্ণ ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। কাতেরীনীর বাসনা আরো কথা বলে কিন্তু সেবুগেই ভুরু কুঁচকে কেমন যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে।

ফুলে ফুলে ভরা আপেল গাছের শাখা-প্রশাখার পর্দার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ নীলাকাশ আর শান্ত প্রশান্ত পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা আবেশভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, ‘দেখো দেখো, সেরেজা,—এ যে স্বর্গপুরী, স্বর্গপুরীতে যেন মেলা বসেছে।’

কাতেরীনা শুয়েছিল চিং হয়ে—চাঁদের আলো আপেল গাছের ফুল আর পাতার ভিতর দিয়ে এসে কাতেরীনীর মুখ আর দেহের উপর বিচিত্র শুভ্র আলপনার কম্প্রমান শিহরণ জাগাচ্ছিল; বাতাস স্তব্ধ, শুধু সামান্যতম ক্ষীণ ম্লয় অর্ধহস্ত পত্রাবলীতে ঈষৎ কম্পন জাগিয়ে পূর্ণকুসুমিত তরু আর নব উদ্গত তৃণের মৃদু সৌরভ দূরদূরান্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাতাস যেন অলসাবেশে পরিপূর্ণ—যেন সে বাতাস এনে দেয় সর্ব কর্মে অরুচি, আত্মার অসংঘম, আর মনের ভিতর দুর্বোধ যত কামনারাজি।

কাতেরীনা কোনো সাড়া না পেয়ে আবার চুপ করে গেল, আর তাকিয়ে রইল ফিকে গোলাপি আপেলফুলগুচ্ছের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে। সেবুগেইও কথা বলছিল না কিন্তু তার চিন্তকে আকাশ বিমোহিত করেনি। আপন হাঁটু দুটো দু’হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল আপন বুট-জোড়ার দিকে।

আহা, যেন স্বর্গজ্যোতি দিয়ে তৈরি রাত্রিটি। শান্ত, লঘু, সৌরভভরা আর প্রাণদায়িনী ঈষৎ উষ্ণতা! দূরে বহুদূরে, উপত্যকার পিছনে, বাগানের বহু দূরে কে যেন ধরেছে সুরেলা গীত; ঘন চেরী-তরু-ভরা বাগানের বেড়ার কাছে গেয়ে উঠলো একটি পাখিয়া শিহরিত উচ্চকণ্ঠে; উঁচু খুঁটিতে ঝোলানো কুয়েইল পাখীটি উত্তেজিত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে সুরের প্রলাপ; ওদিকে আন্তার্যলের

দেয়ালের পিছনে বিরাট একটা অশ্ব তজ্রালু হেঁয়ব তুললো, আর বাগানের বাইরে গোচারণ মাঠের উপর দিয়ে একপাল কুকুর দ্রুতবেগে ছুটে চলে গিয়ে অর্ধভগ্ন প্রাচীন মনের ভাঙারের কালো আবছায়ায় বিলীন হয়ে গেল।

কহুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা একটুখানি উঠে বাগানের লম্বা লম্বা ঘাসের দিকে তাকালো—উজ্জ্বল চন্দ্রালোক ঘাসের উপর পড়ে ঝিলিমিলি লাগিয়েছে, তারই আভা গাছগুলোর ফুলে পাতায় নেচে নেচে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন কল্পলোকের অবর্ণনীয়, অতুজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ চন্দ্রচূর্ণ দীর্ঘ তৃণরাজিকে স্বর্ণমণ্ডিত করে দিয়েছে; এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন কম্পন, এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দন যে মনে হয় এরা বহুশিখার প্রজাপতি কিংবা যেন বৃক্ষনিম্নের তৃণরাজি চন্দ্ররশ্মির জাল-আবরণে বন্দী হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়।

কাতেরীনা তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বললে, ‘আহা, সেরেজা, কী মধুর, কী হৃদয়—সব সব!’

সের্গেই চতুর্দিকের দৃশ্যের দিকে তাকিলা-নয়নে একবার শুধু তাকালে।

‘তুমি এমন মন-মরা হয়ে আছ কেন, সেরেজা? না, আমার ভালোবাসার প্রতিও তোমার অবসাদ এসে গেছে?’

‘কি আবোল-তাবোল বকছো?’—সের্গেই নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে; তারপর নিচু হয়ে কাতেরীনাকে অলস ভাবে চুমো দিল।

কাতেরীনার হৃদয়ে হিংসা এসেছে; বললে, ‘তুমি প্রতারণা করছো সেরেজা; তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।’

সের্গেই শাস্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, ‘তোমার কথাগুলো আমার উদ্দেশ্যে বলেছ একথাই আমি স্বীকার করবো না।’

‘তা হলে তুমি আমাকে এভাবে চুমো খেলে কেন?’

সের্গেই তাকিলাভরে এর কোনো উত্তরই দিল না।

সের্গেইয়ের কৌকড়া চুল নিয়ে খেলা করতে করতে কাতেরীনা বলে যেতে লাগল, ‘স্বামী-স্ত্রীই তো শুধু একে অগ্নিকে এরকম চুমো খায়—যেন একে অগ্নির চৌঁট থেকে চৌঁনা মেরে ময়লা মুছে দেয়। তুমি আমাকে এমন চুমো খাও, যেন আপেল গাছ উপর থেকে আমাদের উপর সব-ফোটা ফুলের বর্ষণ লাগিয়ে দেয়।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম!’ চুপি চুপি কানে কানে গুঞ্জন করলে কাতেরীনা।—দয়িতকে ঘনতর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে সে

তখন হৃদয়াবেগে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কাতেরীনা বললে, 'সেরেজা, এবারে যা বলছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। আচ্ছা বলো তো, সবাই কেন একবাক্যে বলে, তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।'

'আমার সম্বন্ধে কুকুরের মত যেউ যেউ করে এসব মিথ্যা কথা বলে কে?'

'সবাই তো এই কথা বলে।'

'হয়তো যে সব হাড়ে হাড়ে অপদার্থগুলোকে আমি ত্যাগ করেছি, তারাই।'

'ওরে হাবা, ওসব অপদার্থগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার তোমার কী দরকার ছিল? যে মেয়ে সত্যি অপদার্থ তার সঙ্গে তুমি আদর্শেই প্রেম করতে যাবে কেন?'

'বলো, বলে যাও, বলা বড় সোজা। মাহুয কি স্থান্য বিচার বিবেচনা করে প্রেমে পড়ে? এর পিছনে কাজ করে একমাত্র প্রলোভন। ওদের কোনো একটার সঙ্গে বিধিভঙ্গ* করলে,—অতি সোজা, কোনো মতলব না, কিছু না, ব্যস হয়ে গেল। তারপর মেয়েটা বইল তোমার গলায় ঝুলে! গুলে খাওগে তারপর সেই প্রেম।'

'তা হলে, শোনো, সেরেজা! আমার পূর্বে কারা সব এসেছিল তাদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে, আর আমি ওদের সম্বন্ধে কোনো-কিছু জানতেও চাই নে। শুধু এইটুকু বলার আছে: তুমি নিজে আমাদের এই প্রেমের পথে আমাকে প্রলোভিত করে টেনে এনেছ, এবং তুমি নিজে খুব ভালো করেই জানো, আমি যে এতে পা দিয়েছি তার জন্ত তোমার ছলা-কোঁশল যতখানি দায়ী আমার নিজের কামনাও ততখানি—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, সেরেজা, তুমি যদি কোনোদিন বেইমানী করো, তুমি যদি অজ্ঞ কারোর জন্ত—তা সে যে-ই হোক না কেন আমাকে বর্জন করো, আমি তা হলে কশ্মিনকালেও—মাফ করো, আমার হৃদয়ের বন্ধু,—এ-দেহে প্রাণ থাকতে কশ্মিনকালেও তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাবো না।'

সেরেজাই চমকে উঠলো।

'এসব কি বলছো, কাতেরীনা লুভভ্‌না, আমার চোখের মণি! আমাদের অবস্থাটার দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। তুমি এতখুনি লক্ষ্য করেছ,

* যে দশটি বিধি (কমাওমেন্ট) ইহুদি ও খৃষ্টান মানে তার অন্ততম—
'ব্যভিচার করবে না'।

আমি কি রকম আনমনা হয়ে বসে ছিলাম কিন্তু তুমি একবারও শাস্ত হয়ে তীব্র না। এই আনমনা হওয়াটা আমি ঠেকাতে পারি কি না। তুমি তো জানোই না, আমার বুকের ভিতর কি রকম শক্ত শক্ত রক্তের টুকরো জমা হয়ে আছে।’

‘তোমার কি বেদনা, সেরেজা, তোমার বেদনা আমায় বলো!’

‘এর আবার বলার কি থাকতে পারে? প্রথমত দেখ, অল্পদিনের মধ্যেই, ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমার স্বামী এসে উদয় হবেন, আর তুমি বলবে—সেব্গেই ফিলেপিচ, দুর্ দুর্ বেরো এখান থেকে, আর যা তুই ঐ পেছনের আঙ্গিনায়, ছোকরারা যেখানে গান-টান গাইছে। আর সেখান থেকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, কাতেরীনা লুভভ্‌না শোবার ঘরে ছোট্ট পিড়িমাটি জ্বলছে, আর তিনি কি রকম পালকের তুলতুলে বিছানাটি দু’হাত দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জুঁসই করে তাঁর সাতপাকের সোয়ামীর সঙ্গে শুয়ে আরাম করতে যাচ্ছেন।’

‘অসম্ভব! ওরকম ধারা কখনই হবে না’—মোজাসে টানা টানা স্বরে কাতেরীনা কথাগুলো বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে কচি একখানি হাত নাড়িয়ে সেব্গেইয়ের কথাগুলো যেন সামনের থেকে সরিয়ে দিল।

‘কেন হবে না? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এ পরিস্থিতি থেকে বেরবার জন্যে তোমার তো কোনো পথই নেই। তা সত্ত্বেও, বুঝলে কাতেরীনা লুভভ্‌না, আমারও একটা আপন হৃদয় আছে, আর নিদারুণ যন্ত্রণাটা আমি অমূল্য করতে পারি।’

‘বাস্‌ বাস্‌, হয়েছে। তোমার যথেষ্ট বলা হয়ে গিয়েছে।’

সেব্গেইয়ের এই হিংসের অমূল্যতাটা কাতেরীনাকে বড়ই আনন্দ দিল। জোরে হেসে উঠে সে ফের সেব্গেইকে চুমোর পর চুমো খেতে লাগল।

অতি সাবধানে কাতেরীনার সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত বাহ্যপাশ থেকে নিজের মস্তকটি মুক্ত করতে করতে সেব্গেই কথার খেই ধরে বলে যেতে লাগলো, ‘দ্বিতীয়ত, সমাজে আমার যে হীনতম অবস্থা সেটাই আমাকে বহুবার বাধ্য করেছে ব্যাপারটা সব দিক দিয়ে বিবেচনা করতে। এই মনে করো, আমি যদি সমাজে তোমার ধাপের মানুষ হতুম, আমি যদি ‘ভদ্রলোক’ বা ব্যবসায়ী হতুম, তা হলে এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হতুম না—কাতেরীনা লুভভ্‌না। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতিটা—তুমি নিজেই বিবেচনা করে দেখো—তোমার কাছে দাঁড়ালে আমি কে? অল্প দিনের ভিতরই তোমার স্বামী যখন তোমার কচি সাদা হাতটি ধরে তোমাদের শোবার ঘরে তোমাকে নিয়ে যাবে, আমাকে তখন সেটা নীরব হৃদয়ে সঙ্গে নিতে হবে, এবং হয়তো সেই

কারণেই আমি নিজেকে বাকী জীবন ধরে ঘেমা করবো। কাতেরীনা লভভনা! বুঝলে—আমি তো সে দলের নই যারা যে কোনো একটা রমণীর সঙ্গে ক্ষুতি করতে পারলেই অন্য কোনো-কিছুর পরোয়া করে না। প্রেম সত্য সত্য কি, সে অল্পভূতি আমার আছে, আর সেটা যেন কালনাগিনীর মত আমার বুকের রক্ত স্বে স্বে খাচ্ছে।’

কাতেরীনা বাধা দিয়ে বললে, ‘কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে বার বার বুঝিয়ে বলছো কেন?’

‘কাতেরীনা লভভনা! না বলে করি কি, বোলো। কি করি বোলো। হয়তো বা এতদিনে সব কিছু তোমার স্বামীকে কাগজে কলমে ভালো করে বুঝিয়ে রিপোর্ট করা হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি দূরের কথা নয়, হয়তো বা আসছে কাল থেকেই এখানে আর সেবুগেইকে দেখতে পাওয়া যাবে না, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।’

‘না, না, ও নিয়ে তুমি একটি মাত্র কথা বোলো না, সেরেজা! এটা কন্সন-কালেও হতে পারে না। যা হোক তা হোক, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।’ চুষনে আলিঙ্গনে সোহাগ করে কাতেরীনা সেবুগেইকে প্রবোধ দিতে লাগল। ‘চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যদি একদিন করবার সময়ই আসে, তবে... হয় নিয়তি তাকে ওপারে নিয়ে যাবেন, নয় আমাকে, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে থাকবেই।’

‘সেটা তো সম্ভব নয়, কাতেরীনা লভভনা!’—বিষম কণ্ঠে সেবুগেই উত্তর দিল। তারপর মাথায় যেন হুংথের ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, ‘আমি যে এই প্রেম নিয়ে বেঁচে আছি তার জন্তে আমার নিজেরই হুংথ হয়। সমাজে আমি যে ধাপে আছি সেই ধাপের কাউকে ভালোবাসলে হয়তো আমি সন্তুষ্টই হতুম। এও কি কখনো সম্ভব যে, তুমি চিরকাল আমার সত্য প্রেম হয়ে থাকবে? আর এখন আমার প্রণয়িনী হয়ে থাকাও কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয়? আমি তো চাই পুত চিরন্তন দেউলের সামনে তোমার স্বামী হতে; তারপর তোমার তুলনায় তখন আমি নিজেকে হীন মনে করলেও আমি সমাজের সামনে বুক চেতিয়ে দেখাতে পারবো, আমার স্ত্রী আমাকে কতখানি সম্মানের চোখে দেখেন—কারণ আমি তাঁকে সম্মান করি—’

সেবুগেইয়ের কথাগুলো কাতেরীনার মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। তার ঈর্ষা, কাতেরীনাকে বিয়ে করার তার কামনা—এ কামনা মেয়েছেলে মাজেরই বড় প্রিয়, তা সে হোক না, বিয়ের পূর্বে তাদের অল্প দিনেরই পরিচয়। কাতেরীনা

এখন সেবুগেইয়ের জন্তে আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে প্রস্তুত, অতলে তলাতে তৈরি, কিংবা ভয়ঙ্কর কারাগারে অথবা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে। সেবুগেই তখন কাতেরীনা'কে তার প্রেমে এমনই মজিয়েছে যে, সে তার অন্তহীন আত্মসমর্পণ সেবুগেইয়ের পদপ্রান্তে করে ফেলেছে। আনন্দে সে তখন আত্মহারা, তার রক্তে রিনিঝিনি বাজছে,—আর কোনো কথা শোনবার সব শক্তি তার তখন নেই। তাড়াতাড়ি হাতের তেলো দিয়ে সে সেবুগেইয়ের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার মাথা আপন বৃকে চেপে ধরে বললে, ‘শোনো, এখন আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তোমাকেও কি করে ব্যবসায়ী করে তোলা যায়, আর তোমার সঙ্গে কি ভাবে যথারীতি সম্মানে বাস করা যায়। যতদিন না আমাদের অবস্থার চরম বোঝা-পড়ার সময় এসেছে—ততদিন কোনো-কিছু নিয়ে আমাকে আর বেদনা দিয়ে না।’

আবার আরম্ভ হল চুপন আর আদর-সোহাগ।

নিঃশব্দ নিশীথে, গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও গুদোমঘরের চালার ভিতর বুড়ো কেরানী শুনতে পাচ্ছিল ক্ষণে মুহু আলাপের গুঞ্জন, ক্ষণে চাপা হাসির ইঙ্গিত—যেন কতকগুলো ছবুঁত বালক কোনো নির্বীৰ্য বৃদ্ধকে নিয়ে নিদারুণতম ঘৃণ্য ব্যঙ্গ করার জন্তে ষড়যন্ত্র করছে—ক্ষণে আনন্দের উচ্চহাস্য কলরোল—যেন সরোবরের পরীয়া কাউকে নির্মম ভাবে স্ফুড়স্ফুড়ি দিচ্ছে। এ-সবের উৎস কাতেরীনা। তাঁদের আলোতে সে যেন সাঁতার কাটছে, নরম কঞ্চলের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে আর রসকেলি করছে তার স্বামীর ছোকরা কেরানীর সঙ্গে। কুসুমচ্ছাদিত আপেলবৃক্ষের কোমল ফুলদল তাদের উপর ক্ষণে ক্ষণে বর্ষিত হচ্ছিল—অবশেষে সে বর্ষণও ক্ষান্ত হল। ইতিমধ্যে নাতিদীর্ঘ নিদ্রাঘরজনী প্রবহমাণ—চন্দ্রমা উচ্চ ভাঙার গৃহের চূড়ান্তরালে লুকায়িত থেকে পাণ্ডু হতে পাণ্ডুরতর নয়নে ধরণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। হঠাৎ রান্নাঘরের ছাতের উপর দুটো বেড়ালের কানফাটানো দ্বৈতকণ্ঠ শোনা গেল। তারপর আরম্ভ হল খামচাখাম্‌চি, দাঁত মুখ থিঁচিয়ে তীক্ষ্ণ গোঙরানোর শব্দ এবং সর্বশেষে পা হড়কে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল ছাদের সঙ্গে ঠেকনা দেওয়া তক্তার ডাঁই পিছলে—গোটা দু’স্তিন বেড়াল।

‘চলো, শুতে যাই’—অতিশয় ক্লাস্তির আবেশে রাগ্‌ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো কাতেরীনা। শায়িত অবস্থায় সেই সামান্য যে শেমিজ আর সাদা সায়া তার পরনে ছিল সেই বেশেই গণ্যমান্ত সদাগর-বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে সে চললো। সেখানে তখন মরা-বাড়ির নিশ্চলতা আর নৈশক্য। সেবুগেই রাগ্‌

আর কাতেরীনার খেলা-ভরে ছুঁড়ে-ফেলে-দেওয়া রাউজ নিয়ে পিছনে পিছনে চললো।

॥ ৭ ॥

কাপড়-জামার শেষ রস্টিটুকু ছেড়ে ফেলে, মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে পালকের তুলতুলে বিছানাতে শুতে না শুতে কাতেরীনা স্বযুষ্টি-গহ্বরে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। দিনভর ক্রীড়াকৌতুক আর উল্লাসরস এতই আকর্ষণ পান করেছিল যে, সে এখন এমনই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হল যে তার পা যেন ঘুমিয়ে পড়ল, হাতও যেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমের ভিতর দিয়েও সে পরিষ্কার দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল এবং সেই আগের দিনের চেনা বেড়ালটা হুম্ করে তার বিছানায় পড়ল।

‘বেড়ালটার এখানে আগমনের ব্যাপারটা আসলে তবে কি?’—ক্লান্ত কাতেরীনা আপন মনে যুক্তি-তর্ক করতে লাগল। ‘আমি দোরের চাবি নিজেই লাগিয়েছি—বেশ ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করেই—আর জানলাটাও বন্ধ।—তবু দেখি সেটা আবার এসে জুটেছে। দাঁড়াও, আমি ওটাকে এই মুহূর্তেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।’ কাতেরীনা উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার হাত-পা যেন তার বেশ নেই; ইতিমধ্যে বেড়ালটা তার শরীরের উপর দিয়ে সর্বত্র হাঁটাইটি লাগিয়ে দিয়েছে। এবং তার গলার গরু গরু এমনই আশ্চর্য রকমের যে, সে যেন মাহুকের গলায় কথা কইছিল। কাতেরীনায় মনে হচ্ছিল যেন এক পাল ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে পিপড়ে তার সর্বশরীরের উপর দিয়ে ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

কাতেরীনা মনস্থির করে বললে, ‘নাঃ, কালই আমাদের বিছানার উপর মঙ্গল জল ছিটোতে হবে—এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই,—যেভাবে বেড়ালটা ভূতের মত আমার পিছনে লেগেছে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা তাজ্জব ধরনের বেড়াল।’

ওদিকে বেড়ালটার সোহাগের গরু গরু একদম তার কান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বোঁচা নাকটা তার শরীরের উপর চেপে দিয়ে বেড়ালটা বলে উঠলো, ‘আচ্ছা, আমি কোন্ ধরনের বেড়াল সেই কথাটা ভাবছো—না? কিন্তু এ সম্বন্ধে তুমি এলে কিসের থেকে? সত্যি, তুমি কী অসম্ভব চালাক মেয়ে, কাতেরীনা লুভলুনা; ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছ আমি আদর্শই বেড়াল নই, কারণ আমি আসলে আর কেউ না, আমি হচ্ছি সেই বিখ্যাত সম্মানিত সদাগর বয়স

তিমোতেইচ্। অবশ্য এটা হক্ কথা যে, ঠিক এই মুহূর্তেই আমি খুব বহাল তবীয়তে নেই—কারণ আমার ছেলের বউ আমাকে যে-সব খাশা খানা খাইয়ে আমার সেবা করেছে তারই চোটে আমার নাড়িভূঁড়ি কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। তাই হয়েছে কি’—বেড়ালটা মোহাগের গরু গরু করে যেতে লাগল—‘আমি বড্ড কুকড়ে-সুকড়ে গিয়ে এখন শুধু হলো বেড়াল হয়ে, যারা আমাকে সত্যি সত্যি জানে আমি কে, তাদের সামনেই আত্মপ্রকাশ করতে পারি। তা যেন হল; আচ্ছা, আপনি এখন আপন বাড়িতে কি রকম আছেন, কি করছেন, কাতেরীনা লুভভ্না? আগুবােকোর সব ক’টি বিধি* আপনি কি ভক্তিতে পালন করে যাচ্ছেন? আমি স্থিতিস্থিত উদ্দেশ্য নিয়েই গোরস্তান থেকে এখানে এসেছি স্বন্দুমাত্র দেখতে আপনি আর সের্গেই ফিলিপচ্ আপনার স্বামীর বিছানাটাতে কি রকম গুঁম লাগাচ্ছেন। কিন্তু এখন তো আমি আর কিছু দেখতে পারি নে। আপনি থামোখা অত ভরাচ্ছেন কেন; ব্যাপারটা হয়েছে কি, আপনি যে আমায় ফিস্টিটা খাইয়ে জানু তরুর্ করে দিয়েছিলেন তারই ঠেলায় আমার আদরের পুতুল চোখ দুটি কোটর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার চোখ দুটোর দিকে সোজাঅজি তাকাও, পরাণ আমার,—ভয় পেয়ো না, মাইরি!’

কাতেরীনা সত্য সত্যই তাকিয়েছিল—আর সঙ্গে সঙ্গে তারদ্বরে চিৎকার করে উঠলো। হলো বেড়ালটা ফের তার আর সের্গেইয়ের মাঝখানে শুয়ে পড়েছে, আর তার মাথাটার জায়গায় বরিস্ তিমোতেইচের মাথা। ঠিক তারই মাথার মত বিরাট আকারের মাথা। আর দুটি কোটরে চোখের বদলে আগুনের দুটো চাকা ঘুরছে আর পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে আর ঘুরছে—যদিকে যেমন খুশি!

সের্গেই জেগে উঠলো, কাতেরীনাকে শাস্ত করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু নিজাদেবী কাতেরীনাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন—ভালোই, এক হিসেবে ভালোই।

বিস্ফারিত নয়নে কাতেরীনা শুয়ে আছে; হঠাৎ তার কানে এল কে যেন গেট বেয়ে উঠে বাড়ির ভিতরের আঙ্গিনার সামনে পৌঁছে গেছে। সে লোক যেই হোক, কুকুরগুলো তার দিকে ধাওয়া করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তারা শাস্ত হয়ে গেল—হয়তো বা তারা নবাগতের পা চাটতে আরম্ভ করেছে। তারপর

* অন্ততম বিধি ‘ব্যভিচার করবে না’।

আরো এক মিনিট গেল। ক্লিক করে নিচের লোহার খিল খুলে গেল এবং দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

‘হয় আমি শব্দগুলো কল্পনায় শুনছি, অথবা আমার জিনোভিই বরিসিচ্ ফিরে এসেছেন—এবং দরজা খুলেছেন ফালতো চাবিটি দিয়ে’—চট করে চিন্তাটা কাতেরীনার মাথায় খেলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সের্গেইকে কহুই দিয়ে শুতো দিল।

‘কান পেতে শোনো, সেরেজা,’ বলে কাতেরীনা কহুইয়ের উপর ভর করে উঠে কান দুটো খাড়া করলে।

সত্যি কে যেন ধীর পদক্ষেপে, সাবধানে শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে সরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের চাবিমারা শোবার ঘরের দিকে আসছে।

স্বল্পমাত্র শেমিজপরা অবস্থাতেই এক লাফ দিয়ে কাতেরীনা খাট ছেড়ে ব্যালকনির জানলা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সের্গেইও খালি পায়ে লাফ দিয়ে ব্যালকনিতে এসে নামবার জন্ত তারই খুঁটিতে পা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো—ঐ খুঁটি বেয়েই সে একাধিকবার তার প্রভুপত্নীর শোবার ঘর থেকে নিচে নেমেছে।

কাতেরীনা তার কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, ‘না, না ; দরকার নেই, দরকার নেই। তুমি এইখানে শুয়ে থাকো...এখান থেকে নোড়ো না।’ তারপর সের্গেইয়ের জুতো, কোট-পাতলুন তার পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে লাফ মেরে কক্ষের তলায় ঢুকে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সের্গেই কাতেরীনার আদেশ পালন করলো ; খুঁটি বেয়ে নিচে না নেমে ছোট্ট ব্যালকনিটির কাঠের ছাতার নিচে আরাম করে লুকিয়ে রইল।

ইতিমধ্যে কাতেরীনা শুনতে পেয়েছে, তার স্বামী কিভাবে দরজার কাছে এল, এবং দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। এমন কি সে তার হিংসাত্মক বৃকের দ্রুত স্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পেল। কিন্তু কাতেরীনার হৃদয়ে করুণার উদয় হল না। বরঞ্চ তাকে যেন ছেয়ে ফেলল পিশাচের অট্টহাস্য।

মনে মনে সে তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললো, ‘যাও, গত কাল খোজো গে’—মুহূ হেসে সে যতদূর সম্ভব তালে তালে নিষ্পাপ শিশুটির মত দম ফেলতে লাগলো।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এই লীলা চললো ; অবশেষে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর ঘুমনোর শব্দ শোনার জন্ত অপেক্ষা করাটা জিনোভিইয়ের কাছে ক্লান্তিজনক হয়ে দাঁড়াল। সে তখন দরজায় টোকা দিল।

‘কে?’ কাতেরীনা সাড়া দিলে কিন্তু একদম সঙ্গে সঙ্গে না, এবং গলাটা ঘেন নিদ্রায় জড়ানো।

জিনোভিই উত্তর দিল, ‘তোমাদেরই একজন।’

‘তুমি নাকি, জিনোভিই বরিসিচ্?’

‘হ্যাঁ, আমি। ঘেন আমার গলা শুনতে পারছেন না।’

কাতেরীনা সেই যে শুধু শেমিঙ্ক পরে শুয়েছিল সেই ভাবেই লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল, তারপর ফের লাফ দিয়ে গরম বিছানায় ঢুকলো।

কম্বল দিয়ে গা জড়াতে জড়াতে বললো, ‘ঠিক ভোরের আগে কেমন ঘেন শীতটা জমে আসে।’

জিনোভিই বরিসিচ্ ঘরে ঢুকে চতুর্দিকে তাকালো, তারপর ইকনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলো, মোমবাতি জালিয়ে আবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো। স্ত্রীকে শুধলো, ‘কি রকম আছে—সব ঠিক চলছে?’

কাতেরীনা উত্তর দিলে, ‘নালিশ করার মত তেমন কিছু নয়।’ তারপর উঠে বসে একটা টিলে স্থতীর ব্লাউজ পরতে লাগল।

শুধলে, ‘তোমার জন্ম একটা সামোভারে* আঁচ দেব কি?’

‘তোমায় কিছু করতে হবে না; আক্সানিয়াকে ডাকো—সে তৈরি করুক।’

কাতেরীনা চটি পরে ছুটে বেরলো এবং ফিরলো আধঘন্টাটাক পরে। এরই ভিতরে সে ছোট্ট সামোভারটিতে কাঠ-কয়লার আগুন ধরিয়ে নিয়েছে এবং অতিশয় সম্ভরণে বিদ্যাবাগে একবার ছুটে গেছে ছোট্ট ব্যালকনিটির নিচে সের্গেইয়ের কাছে।

‘এইখানে থাকো’—ফিস ফিস করে কাতেরীনা সের্গেইকে বললে।

সের্গেইও ফিস ফিস করে প্রশ্ন শুধলে, ‘এখানে বসে থেকে কি লাভ হবে?’

‘ওঃ! তোমার মাথায় কি বস্তিভর মগজ নেই! আমি যতক্ষণ না অগ্ন্য ব্যবস্থা করি তুমি এইখানে থাকো।’

কাতেরীনা স্বয়ং তাকে আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সের্গেই বাইরের ছোট্ট ব্যালকনিতে বসে ভিতরে যা-কিছু হচ্ছিল সবই শুনতে

* ধাতুর পাত্র। এর নিচের তলায় কাঠ-কয়লার আগুন জালানো হয়। উপরের খোপে জল। ট্যাপ্ খুলে চায়ের জন্ম ফুটন্ত জল বের করা হয়। রাশানরা এটা টেবিলের উপর রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা খায়। ‘দেশেবিদেশে’ পৃ. ৩৩, ২৩১ ও অন্তর্জ্ঞ প্রভৃতি।

পারছিল। কাতেরীনা যে দরজা বন্ধ করে স্বামীর কাছে ফিরে এল সেটাও শুনতে পেল। ঘরের ভিতরকার টু শব্দটিও পরিষ্কার তার কানে আসছিল।

জিনোভিই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, 'এতক্ষণ ধরে কোথায় আলসেমি করে সময় কাটালে ?'

শাস্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'আমি সামোভার তৈরি করছিলুম।'

কিছুক্ষণ ধরে আর কোনো কথাবার্তা হল না। বাইরের থেকে সেবুগেই পরিষ্কার শুনতে পেল, জিনোভিই তার লম্বা কোটটা হ্যান্ডারে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর সে চতুর্দিকে জল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, জোরসে নাক সাফ করে হাত মুখ ধুলো। এইবারে সে একথানা তোয়ালে চাইলে—সেটাও শোনা গেল। আবার কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

স্বামী শুধলে, 'আচ্ছা, বলো তো তোমরা ঠিক কি ভাবে আমার বাপকে গোর দিলে ?'

'ঠিক যে ভাবে হয়ে থাকে'—উত্তর দিল তার স্ত্রী। 'তিনি মারা গেলেন, সবাই মিলে তাকে গোর দিল।'

'কিন্তু সন্ধ্যার কাছেই এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে !'

'ভগবান জানেন শুধু।'—কাতেরীনা উত্তর দিয়ে হুঁ-ঠাং করে পেয়ালাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

জিনোভিই বিষণ্ণ মুখে ঘরের ভিতর পাইচারি করতে লাগলো।

তারপর স্ত্রীকে আবার শুধলো, 'আর এখানে তুমি সময় কাটালে কি করে ?'

'এখানে আমাদের আমোদ-আহ্লাদ কি, সে তো সবাই জানে—আমি আর কি বলবো ; আমরা বল নাচে যাই নে, থিয়েটারও দেখি নে।'

'আমার তো মনে হল তোমার স্বামীকে দেখে তুমি বিশেষ কোনো আমোদ-আহ্লাদ অনুভব করো নি—আমোদ-আহ্লাদের কথাটাই যদি উঠলো—।' আড় নয়নে তাকিয়ে জিনোভিই বললে। এইবারে সে অবতরণিকায় পা দিয়েছে।

'তোমাতে আমাতে তো পশু'দিন বিয়ে হয় নি যে দেখা হওয়া মাত্রই প্রেমে পাগল হয়ে একে অস্ত্রের দিকে ধাওয়া করবো। বাড়ির কাজকর্মে ছুটোছুটি করতে করতে আমার পা দু'খানি কয়ে গেল—আর সে-সব তোমারই স্বথের জন্ত। কি করে যে আশা করো তোমাকে দেখামাত্র আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাব ?'

কাতেরীনা সামোভার আনবার জন্ত ছুটে বেরিয়ে গেল* আর ধাওয়া করলো

* কাঠ-কয়লার ধূঁয়ার শেষ বেশটুকু না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সামোভার ঘরের ভিতর আনা হয় না।

সেবুগেইয়ের দিকে। আমার টান দিয়ে বললে, 'হাই তোলা বন্ধ করো! চোখ দুটো খোলা রাখো, সেরেজা!'

আন্ধের জল যে কোন্ দিকে কতখানি গড়াবে সে সম্বন্ধে সেবুগেই কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি, তাই সজাগ হয়ে রইল সে।

কাতেরীনা ফিরে এল। দেখে, জিনোভিই খাটের উপর হাঁটু গেড়ে পুঁতির কেসনুজ তার ভ্রমণের ঘড়িটা শিয়রের খাড়া তক্তার সঙ্গে ঝোলাচ্ছে।

হঠাৎ সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে—কেমন যেন একটু বাঁকা-বাঁকা ভাবে 'আচ্ছা, বল তো কাতেরীনা, তুমি তো ছিলে একেবারে একা; তবে এটা কি করে হল যে, তুমি জোড়া বিছানা সাজিয়ে রেখেছো?'

শাস্তনয়নে তার দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা বললে, 'কেন, আমি তো সর্বক্ষণ তোমার জন্ত অপেক্ষা করছিলাম।'

'কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্ত। আচ্ছা, এইবার দেখো, একটা জিনিস; এটা তোমার পালকের বিছানায় প্রবেশপথ পেল কি করে?—জিনোভিই বরিসিচ্ বিছানার চাদরের উপর থেকে উলে বোনা সরু একটি বেণ্ট তুলে নিয়ে এক প্রান্ত উপরের দিকে ধরে তার স্ত্রীর চোখের সামনে দোলাতে লাগল। আসলে এটা সেবুগেইয়ের।

কাতেরীনা সামান্যতম বিধা না করে বললো, 'আমি ওটা বাগানে কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্কার্ট বাঁধার জন্ত কাজে লাগিয়েছি।'

'বটে!' কথাগুলোয় বদখদ জোর দিয়ে জিনোভিই বললে, 'তোমার ঐ যে স্কার্ট, সে সম্বন্ধে আমরাও আরো দু'একটা কথা জানতে পেরেছি।'

'ঠিক কি শুনতে পেয়েছ?'

'ও! তোমার সব পুণ্য কর্ম!'

'সে-রকম কিছু হয় নি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা; পরে সে সব দেখা যাবে, পরে সব-কিছু দেখা যাবে', খালি পেয়লাটা ঠেলা মেয়ে তার স্ত্রীর সামনে ঝেলে দিয়ে জিনোভিই উত্তর দিল।

কাতেরীনা এ-কথার উত্তরে কোনো সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিনোভিই তুরু কপালে তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার তাবৎ কীর্তিকলাপ আমরা প্রশস্ত দিবালোকে টেনে বের করবো, বুঝলে কাতেরীনা লভভনা?'

কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ভয়ে যারা ইঁহুরের গর্ত খোঁজে তোমার কাতেরীনা সে দলের নয়। সে অত সহজে ভয় পায় না।'

‘কি বললে ? কি বললে ?’ জিনোভিই গলা চড়িয়ে চৈচিয়ে উঠলো।

‘যাগগে ও-সব...আমি আমার ফেরির পসরা দু’বার হাঁকি নে।’ স্ত্রী উত্তর দিলে।

‘বটে ! সাবধান ! একটু সাবধান হও দিকিনি—বড্ড বেশি বকবু বকবু করতে শিখে গেছ তুমি, যবে থেকে একলা-একলি থাকছো—কি জানি কি করে ?’

কাতেরীনা চোপা দিয়ে বললে, ‘বকবু বকবু করতে আমার যদি প্রাণ চায় তবে তার বিরুদ্ধে কোনো মহামূল্যবান কারণ আছে কি ?’

‘দেখো, এখনো নিজের উপর নজর রাখো।’

‘আমার নিজের উপর নজর রাখবার মত কিছুই নেই। কোথাকার কে লম্বা জিভ নাড়িয়ে তোমাকে যা-তা শুনিয়েছে, আর আমাকে বসে বসে হরেক বকমের গালি-গালাজ শুনতে হবে নাকি ? এ আবার কি এক নতুন তামাশা আরম্ভ হল !’

‘লম্বা জিভ হোক আর নাই হোক, তোমার ঢলাঢলির কেছা এখানে বিস্তর লোকই জেনে গিয়েছে।’

কাতেরীনা এবারে সত্যি সত্যি ক্ষেপে গিয়ে চৈচিয়ে উঠলো, ‘কী ঢলাঢলি আমার ?’

‘আমি জানি কান্টা।’

‘তাই নাকি ? যদি জানোই তবে চালাও : সাফ সাফ খুলে বলো।’

জিনোভিই কোনো উত্তর না দিয়ে খালি পেয়লাটা আবার ঠেলা মেরে তার স্ত্রীর সামনে ফেললো।

স্বামীকে যেন খোঁচা দেবার জন্তে একটা চামচ তার স্বামীর পিরিচে খটাং করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘেন্নার স্বরে বললে, ‘আসলে পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তেমন কিছু বলবার মত নেই। না হলে বলো না, বলো, বলো আমাকে, কার সম্বন্ধে তারা তোমাকে বলেছে ? কে সে আমার প্রেমিক যাকে আমি তোমার চেয়ে বেশী পছন্দ করি ?’

‘জানতে পাবে—অত তাড়া কিসের ?’

‘বলো না ! তবে কি কেউ কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে সেবুগেইয়ের সম্বন্ধে মিথ্যে মিথ্যে লাগিয়েছে ? তাই কি না ?’

‘আমরা সব বের করবো, আমরা সব বের করবো, বাহারে বাবী কাতেরীনা লুতভ্না। তোমার উপর আমাদের যে অধিকার সেটা কেউ কেড়ে নেয় নি,

কেউ নিতে পারবেও না...তুমি শায়ের হয়ে নিজের থেকেই নিজের সম্বন্ধে সব কিছু বলবে—’

‘আথ্ ! আমার অসহ হয়ে উঠেছে।’ দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে কাতেরীনা চিংকার করে উঠলো,—রাগে তার মুখের রঙ সাদা বিছানার চাদরের মত হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পরে সের্গেইয়ের আস্তিন ধরে ঘরের ভিতর তাকে টেনে এনে কাতেরীনা বললে, ‘এই তো, এখানে সে। ওকে আর আমাকে জিজ্ঞেস করো, যখন এত সব তোমার জানাই আছে। হয়তো যতখানি জেনে তৃপ্ত হও তার চেয়েও বেশী জানতে পাবে।’

আসলে জিনোভিই বরিসিচের মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। সে প্রথমটায় সের্গেইয়ের দিকে তাকালে—সে তখন দোরের খুঁটিয়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর তাকালো তার স্ত্রীর দিকে—সে ততক্ষণে খাটের বাজুতে বসে বুকের উপর এক হাত দিয়ে আরেক হাতের কনুই ধরে আছে ; সমস্ত ব্যাপারটা যে কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সম্বন্ধে জিনোভিই কোনো অনুমানই করতে পারছিল না।

‘এখানে তুমি কি করছিস রে বিচ্ছু ?’ চেয়ার থেকে না উঠেই কোনো গতিকি সে বললে।

বেহায়ার মত কাতেরীনাই উত্তর দিলে, ‘তুমি যা-সব খুব ভালো করে জানো সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞেস করো না ? তুমি ভেবেছিলে আমাকে ঠাণ্ডাবার ভয় দেখাবে—’ কাতেরীনা বলে যেতে লাগলো ; তার চোখে কুমলব মিটমিট করছে, ‘কিন্তু সেটা আর কখনই হয়ে উঠবে না। আর আমি ? আমার যা করার সে আমি তোমার ঐ প্রতিজ্ঞাগুলো শোনার পূর্বেই স্থির করে রেখেছি, আর এখন সেগুলো তোমার উপর খাটাবো।’

জিনোভিই সের্গেইয়ের দিকে চোঁচিয়ে উঠলো, ‘কি করছিস এখানে ? বেরো।’

কাতেরীনা তাকে চোপা দিয়ে বললে, ‘বেশ, বেশ, তারপর ?’

ঝটপট দোরটা নিখুঁত ভাবে বন্ধ করে চাবিটা সে পকেটে রাখলো, তারপর দিলে ব্লাউজসর্বস্বা বিছানায় ফের গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

কেরানীকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে, ‘এখানে তবে এসো সের্জেচ্কা*’

* সের্গেইয়ের আদরের ডাকনাম সেরেজা ; এখানে স্বামীকে অপমান করে আরেক কাঠি আদর করে ডাকছে সের্জেচ্কা—‘কচি সেরেজা’, ‘সেরেজা হুলাল’।

এসো, এখানে এসো, আমার প্রাণের ছল্লাল।’

সের্গেই মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বাবরী চুল পিছনে ফেরালো ; তারপর সাহসীর মত বাড়ির কর্তার পাশে এসে বসলো।

‘হে ভগবান, হে প্রভু! এসব কি হচ্ছে? তোরা কি করছিস—ওরে কাকেরের বাচ্চা!’—জিনোভিইয়ের মুখ বেগনি হয়ে গিয়েছে, আরাম-কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘বটে? তোমার পছন্দ হচ্ছে না? একবার তাকিয়ে দেখো না, ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমার বাজপাখীটির চোখ কী রকম জলজল করে, দেখো না, কী সুন্দরই না সে!’

কাতেরীনা অট্টহাস্য করে উঠলো এবং স্বামীর সামনে সের্গেইকে আবেগভরে চুষন দিতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার গালে একটা চড় পড়ে যেন সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল আর জিনোভিই লাফ দিয়ে ধাওয়া করলো ব্যালকনির খোলা জানলার দিকে।

॥ ৮ ॥

‘আহ্‌হা! তাহলে এই ব্যবস্থাই হল! বেশ বন্ধু! তোমাকে আমার অনেক ধন্যবাদ জানাই! শুধু এইটের জন্তই আমি অপেক্ষা করছিলুম—’ উচু গলায় বলে উঠলো কাতেরীনা, ‘বেশ বেশ, তাহলে পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমারই মজি-মারফিক সব-কিছু হবে, তোমার মজি আর চলবে না।’

এক ধাক্কায় সের্গেইকে পাশ থেকে ঠেলে দিয়ে, বিহ্বাবেগে সে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল তার স্বামীর ঘাড়ে; জিনোভিইও লাফ দিয়েছিল ব্যালকনির জানলার দিকে কিন্তু তার পূর্বেই কাতেরীনা তার সরু আঙুল জিনোভিইয়ের গলায় প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে চেপে ধরে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝের উপর—একগুচ্ছ কাটা তাজা শন মাছষ যে রকম অবহেলে ফেলে।

শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে বেগে পড়ার ফলে তার মাথা সজোরে ঠোঁটের খেল মেঝের উপর—আর মাথা গেল ঘুলিয়ে। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি তার চরমে পৌঁছে গিয়ে অপ্রকাশ হতে পারে—তার সম্ভাবনা সে মোটেই আন্দাজ করতে পারে নি। তার উপর তার জীব জীবনে এই প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে সে বৃষ্ণ গেল যে, তার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়ার জন্ত হেন কর্ম নেই

যে তার স্ত্রী করবে না, এবং তার বর্তমান অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটময়। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিল বলে সে আর আর্তনাদ করে ওঠে নি—ভালো করেই সে বুঝে গিয়েছিল যে তার আর্তনাদ কারো কানে পৌঁছবে না, বরঞ্চ তাতে করে তার পরিণাম আরো দ্রুতগতিতে পৌঁছে যাবে। নীরবে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অবশেষে তার দৃষ্টি স্ত্রীর উপর ফেললো। সে দৃষ্টিতে ছিল জিঘাংসা, অভিসম্পাত আর তীব্রতম ঘৃণা। ওদিকে তার স্ত্রী সজোরে তার গলা যেন নিংড়ে ফেলছিল।

জিনোভিই আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো না। তার মুষ্টিবন্ধ প্রসারিত দুই বাহু আচমকা আচমকা থিঁচুনি দিয়ে উঠছিল। তার এক বাহু তখনো সম্পূর্ণ মুক্ত; অন্য বাহু কাতেরীনা তার হাঁটু দিয়ে মাটির সঙ্গে জোরে চেপে ধরেছে।

‘ধরো জোরসে ওকে।’ বিন্দুমাত্র উত্তেজনার রেশ না দেখিয়ে সে সের্গেইকে ফিসফিস করে আদেশ দিল। তারপর ফের স্বামীর দিকে মনোনিবেশ করল।

সের্গেই তার মূনিবের উপর বসে তার দুই হাঁটু দিয়ে মূনিবের দুই বাহু চেপে ধরলো। তারপর যেই সে কাতেরীনার হাতের নিচে জিনোভিইয়ের টুঁটি চেপে ধরতে গেছে অমনি সে নিজেই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। যে লোকটা তার এমন অত্যাচার সর্বনাশ করেছে, তার উপর চোখ পড়তে, রক্ত দিয়ে রক্তের প্রতিশোধ নেবার দুর্বীর কামনা জিনোভিইয়ের অবশিষ্ট সর্ব শক্তি উত্তেজিত করে দিল। ভয়াবহ বিক্রম প্রয়োগ করে সে সের্গেইয়ের হাঁটুর চাপ থেকে দুই হাত মুক্ত করে, সের্গেইয়ের মিশকালো বাবরী বজ্রমুষ্টিতে ধরে নিয়ে তার গলায় কামড় মেরে বসিয়ে দিল—হুবহু হিংস্র পশুর মত—তার দাঁত। কিন্তু এ আক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিনোভিই গৌঁ গৌঁ করে কাতরভাবে আরম্ভ করলো; মাথা একপাশে হেলে পড়ল।

নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে, বিবর্ণ কাতেরীনা তার স্বামী ও প্রেমিকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; তার ডান হাতে হাঁচে ঢালাই ভারী একটা মোমবাতিদান—তার ভারী দিকটা নিচের দিকে ঝুলছে। জিনোভিইয়ের রগ আর গাল বেয়ে একটি অতি সূক্ষ্ম স্রোতের মত বয়ে নামছিল চুনি রঙের লাল রক্ত।

‘পাত্রী সাহেবকে ডেকে পাঠাও—’ স্তিমিত কণ্ঠে গোঙরে গোঙরে কোনো গতিক জিনোভিই এ ক’টি কথা উচ্চারণ করলো—তার বৃকের উপর সোয়ার সের্গেইয়ের থেকে সে ঘেম্মার সঙ্গে যতখানি পারে তার মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছে। ‘আমার অন্তিম অন্তর্ধান করতে চাই—’ এ ক’টি কথা বেরলো আরো কীণধরে।

সে তখন কণে কণে শিউরে উঠছে আর চোখ বাঁকা করে দেখছে, তার চুলের নিচে যেখানটায় গরম রক্ত জমাট বাঁধছে।

‘তুমি যে রকম আছ, সেই বেশ চলবে।’ কাতেরীনা ফিস ফিস করলে, তারপর সের্গেইকে বললে, ‘বাস, ওকে নিয়ে আর আমাদের কামেলা বাড়াবার প্রয়োজন নেই : টুটিটা কবে চেপে ধরো।’

জিনোভিইয়ের গলা বড়বড় করে উঠলো।

কাতেরীনা উবু হয়ে তার দু’হাত দিয়ে সের্গেইয়ের দু’হাতে ভর দিয়ে জিনোভিইয়ের টুটি আরো চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা জিনোভিইয়ের বৃকের উপর কান পেতে শুনতে লাগল। পাঁচ মিনিট পর উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, ‘বাস, তার যা প্রাপ্য সে তাই পেয়েছে।’

সের্গেইও উঠে দাঁড়িয়ে গভীর নিশ্বাস নিল। জিনোভিই খতম হয়ে গেছে—তার শ্বাস-নালী খেঁলে গিয়েছে, তার কপালের রগ ফেটে গিয়েছে। তার মাথার বাঁদিকের নিচে রক্তের ছোট একটা খ্যাবড়া কিন্তু এতক্ষণে জমাট রক্ত আর চুলে সঁটে গিয়েছে বলে জখম থেকে আর রক্ত বইছিল না।

সের্গেই বরিস্কে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ারে বয়ে নিয়ে গেল—এ কুটুরিটা ঠিক সেই পাথরের ছোট ভাঁড়ার ঘরের নিচে যেখানে মাত্র কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয় বরিস তিমোতেইচ্ এই সের্গেইকে তালাবদ্ধ করার রেখেছিলেন। তারপর ফের কাতেরীনাদের শোবার ঘরে ফিরে এল। ইতিমধ্যে কাতেরীনা হাতের আস্তিন আর পরনের স্কার্ট গুটিয়ে নিয়ে সাবান আর ঘরপৌছার শ্রাকড়া দিয়ে শোবার ঘরের মেঝের উপরকার জিনোভিইয়ের রক্তের দাগ অতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাফ করতে লাগল। সামোভারের বিষ-মাখানো যে জল দিয়ে চা বানিয়ে জিনোভিই তার স্বাধিকার-চেতন, ক্ষুদ্র পুণ্যাঙ্গাটিকে গরম করে তুলছিল, সে জল তখনো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তারই রূপায় রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত হল।

সামোভারের সঙ্গে কাপ ধোবার যে জাম-বাটি থাকে সেইটে এবং সাবান-মাখানো শ্রাকড়া তুলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে কাতেরীনা সের্গেইকে বললে, ‘এসো, আমাকে আলো দেখাবে।’ দরজার কাছে এসে বললে, ‘আলো নিচু করে ধরো’—টুকরো টুকরো তক্তা জোড়া দিয়ে তৈরি যে মেঝে এবং সিঁড়ির উপর দিয়ে সের্গেই জিনোভিইয়ের মৃতদেহ টেনে টেনে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ার পর্ষন্ত নিয়ে গিয়েছিল, কাতেরীনা সেই তক্তার প্রত্যেকটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলো।

রঙকরা তক্তাগুলোর উপরে মাত্র দুটি জায়গায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল—
আকারে কালোজামের চেয়েও বড় নয়। ভেজা গ্যাকড়া দিয়ে কাতেরীনা সেগুলো
ঘষা মার্জাই দাগগুলো লোপ পেল।

‘এইবারে ঠিক হয়েছে—যেমন কর্ম তেমন ফল—আপন বউয়ের পিছনে
ওরকম গুপ্তচরের মত তত্বে তত্বে লেগে থেকো না—তার ঘাড়ে লাফ দেবার
জ্ঞান ৬৭ পেতে থেকো না।’—কাতেরীনা বলতে বলতে শিরদাঁড়া সোজা করে
উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে শানবানো যে ছোট্ট কুটুরিতে সের্গেই বন্দী ছিল
সে দিকে তাকাল।

সের্গেই বললে, ‘সব-কিছু খতম হল’—নিজের গলা শুনে সে শিউরে
উঠলো।

শোবার ঘরে যখন তারা ফিরে এল তখন সরু গোলাপী রেখার মত পূর্বাকাশ
হিন্ন করে উষার উদয় হচ্ছে—ফুলেঢাকা আপেল গাছের উপর দিয়ে আলতো
ভাবে চলে পড়ে, দেয়ালের উঁচু বেড়ার রেলিঙের ভিতর দিয়ে কাতেরীনার
শোবার ঘরে উষা উঁকি মারলেন।

ঘরের বাইরে উঠোনের উপর দিয়ে যাচ্ছে বুড়ো কেরানী কাঁধের উপর ভেড়ার
লোমের কোটটা চড়িয়ে, হাই তুলতে তুলতে, আর ডান হাতের তিন আঙুল
দিয়ে গায়ের উপর ক্রুশের প্রতীক আঁকতে আঁকতে বুড়ো চলেছে রান্নাঘরের
দিকে।

কাতেরীনা সাবধানে খড়খড়ির ফিতে টেনে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে
সের্গেইকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, যেন সে তার অন্তরের আত্মসন্তাটি
পর্যন্ত দেখে নিয়ে সেই সন্তাটিকে চিনতে চায়।

সের্গেইয়ের কাঁধের উপর তার খেতগুত্র হাত দু’খানা রেখে বললে, ‘কি
গো, এইবারে তুমি তো সদাগরদের একজন হতে চললে।’

উত্তরে সের্গেই একটি শব্দ মাত্র করল না।

তার ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হচ্ছিল, কোন যেন এক পীড়া তার দেহে কাঁপন
ধরিয়ে দিয়েছে। আর কাতেরীনার কিছুই হয় নি, শুধু তার ঠোঁট দুটিতে যেন
শীত-শীত করছিল।

লোহার ভাঙা আর ভারি শাবল ব্যবহার করার ফলে দু-এক দিনের ভিতরই
সের্গেইয়ের হাতে মোটা মোটা ফোঁকা দেখা দিল; তাতে কি এসে যায়—
জিনোভিই বরিসিচকে এমনই পরিপাটিরূপে তারই মাটির তলার কুটুরিতে পুঁতে
ফেলা হল যে, তার বিধবা কিংবা বিধবার প্রেমিকের সাহায্য ছাড়া শেষ

বিচারের দিন পৰ্বন্ত কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

। ৯ ॥

সের্গেই লাল একথানা স্বাক্ষর জড়িয়ে চলাফেরা করে। ইতিমধ্যে সের্গেইয়ের গলায় বরিস যে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল তার দাগ শুকোবার পূর্বেই কাতেরীনার স্বামীর অস্থিহীনতা আশঙ্কাজনক জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। বরিস সম্বন্ধে আর সকলের চেয়ে বেশী কথা বলতো সের্গেই নিজে। বিকেলের দিকে কোনো কোনো দিন ছোকরাদের সঙ্গে বৈষ্ণিতে বসে সে বলে উঠতো, ‘সত্যি, বলো তো, ভায়ারা, আমাদের কর্তা এখনো ফিরে এলেন না যে?’

তারাত্তন অবাক হয়ে ভাবতো ব্যাপারটা কি।

এমন সময় মিল থেকে খবর এল, অনেক দিন হল কর্তা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছেন। যে কোচম্যান গাড়িটা চালিয়েছিল সে বললে, জিনোভিইকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছিল এবং কেমন যেন বেখাপ্পা ভাবেই সে তাকে বিদায় দিয়েছিল; শহরের মঠের কাছে পৌঁছে সে তার কার্পেট-ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে চলে যায়। এ কাহিনী শুনে তাদের মনের ধাঁধা আরো যেন বেড়ে গেল।

জিনোভিই বরিসিচ্ অন্তর্ধান করেছে; ব্যস্, এ সম্বন্ধে আর কারো কিছু বলার নেই। তাকে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হল, কিন্তু তার ফলে কিছুই প্রকাশ পেল না; সে যেন হাওয়ার সঙ্গে গলে গিয়ে মিশে গিয়েছে। কোচম্যানটাকে অবশ্য গ্রোফতার করা হয়েছিল; তার কাছ থেকে মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, জিনোভিই তাকে মঠের কাছে ছেড়ে দিয়ে একা চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা মোটেই পরিষ্কার হল না; ওদিকে বিধবা কাতেরীনা সের্গেইয়ের সঙ্গে শান্তভাবে বেপরোয়া জীবন যাপন করতে লাগল। মাঝে মাঝে গুজব রটতো, জিনোভিইকে কখনো এখানে দেখা গিয়েছে, কখনো ওখানে দেখা গিয়েছে—কিন্তু শেষ পৰ্বন্ত সে আর বাঁড়ি ফিরে এল না। কাতেরীনা আর সকলের চেয়ে ভালো করেই জানতো, জিনোভিই আর কখনো ফিরে আসবে না, ফিরে আসতে পারে না।

এক মাস গেল, দু’মাস গেল, তিন মাস গেল—কাতেরীনা পেটের বাচ্চার ভার বেশ টের পেতে লাগল।

একদিন সে বললে, ‘সেরেজেশ্কা, এবারে আমাদের ধন-দৌলত নিরাপদ হল।

‘আমি তোমাকে একটি বংশধর দেব।’ সঙ্গে সঙ্গে শহরের কর্মকর্তাগণের কাছে দরখাস্ত করে জানালো : তার এবং তার বিষয়-সম্পত্তি—অমুক, তমুক—এবং সে বুঝতে পেরেছে, সন্দেহ নেই, সে অন্তঃসন্ধা ; ইতিমধ্যে ইস্মাইলফ পরিবারের ব্যবসা-কারবার এক কদম এগোচ্ছে না ; তাকে যেন তাবৎ লেনদেনের উপর সর্ব কতৃৎ এবং স্থাবর সম্পত্তির সর্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার দেওয়া হয়।

এত বড় একটা কারবার সম্পূর্ণ উচ্ছন্ন যাবে—এ তো কল্পনাভীত। কাতেরীনা তার স্বামীর আইনসজ্ঞত স্ত্রী, মোটা রকমের কিংবা সন্দেহজনক দেনাও নেই ; সুতরাং স্পষ্টই বোঝা গেল দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। মঞ্জুর হলোও।

অতএব কাতেরীনা জীবন যাপন করতে লাগল—মহারাগীর মত চলন-বলন হল এবং তার দেখাদেখি অল্প পাঁচ জন আটপৌরে সেরেগাকে পোশাকী সের্গেই ফিলিপচ, কেষ্ঠাকে শ্রীকৃষ্ণ নামে সম্মানিত করতে লাগল। এমন সময় বলা-নেই-কওয়া-নেই আসমান থেকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। লিভেন শহর থেকে আমাদের মেয়রের কাছে এই মর্মে চিঠি এল যে, বরিস্ তিমোতেইচ্ যে মূলধন নিয়ে কাজ-কারবার করছিল সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল না : তার অধিকাংশ এসেছিল তার এক নাবালক ভাগ্নের কাছ থেকে—তার নাম ফেদোর জাখারফ্ লিয়ামিন্ ; এবং আইনত একটা ফয়সালা না করে কারবারটা একা কাতেরীনার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। নোটশটা এলে পর মেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কাতেরীনার সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তারপর এক সপ্তাহ যেতে না যেতে হঠাৎ লিভেন থেকে এসে উপস্থিত হলেন ছোট্টখাটো একটি বৃদ্ধা মহিলা—সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলে।

মহিলাটি বললেন, ‘আমি স্বর্গত বরিস্ তিমোতেইভিচের সম্পর্কে বোন হই আর ইটি আমার ভাইপো ফেদোর লিয়ামিন্।’

কাতেরীনা তাদের অভ্যর্থনা জানালে।

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সের্গেই এদের আগমন এবং নবাগতদের প্রতি কাতেরীনার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন দেখে পাত্রীদের সাদা জোব্বার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বাড়ির কর্তা কাতেরীনা সের্গেইকে জিজ্ঞেস করলে, ‘একি ? তোমার কি হয়েছে ?’ সে আঙ্গিনা ছেড়ে অতিথিদের পিছনে পিছনে হৃৎস্বর পর্যন্ত এসে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

‘কিস্থ না, কিস্থটি না।’ হৃৎস্বর ছেড়ে সদর দরজার কাছে এসে সের্গেই উত্তর দিয়ে বললে, ‘আমার মনে হচ্ছিল এই লিভেন-গুস্তী বাজি হারার পড়তা,

জ্যেতার নয়।' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গিয়ে পিছনের সদর দরজা বন্ধ করে দিল।

* * *

সে রাত্রে সামোভার ঘিরে বসে সের্গেই কাতেরীনাকে শুধলে, 'তাহলে আমরা এখন করি কি? তোমার আমার—আমাদের দুজনার—সব-কিছু যে ছাইভস্ম হয়ে গেল।'

'ছাইভস্ম কেন, সেরেজা?'

'নয় তো কি? এখন তো সব-কিছু ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আমাদের হিশ্তর যা পড়বে তা দিয়ে আমরা চালাবো কি করে?'

'কেন, সেরেজা? তোমার কি ভয় হচ্ছে, তুমি যথেষ্ট পাবে না?'

'আমি নিজের হিশ্তর কথা ভাবছি নে। আমার শুধু সন্দেহ হচ্ছে, আমরা কি আর সুখী হতে পারবো?'

'এ দুর্ভাবনা তোমার মনে কেন উদয় হল? আমরা সুখী হতে পারবো না কেন?'

সের্গেই উত্তর দিল, 'তার কারণ, তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, সে প্রেম চায় তোমাকে সমাজের উচ্চস্থানের মহিলারূপে দেখতে; আগে যে রকম নগণ্য জীবন যাপন করতে, সে রকম নয়। আর এখন সব-কিছু গুলট-পালট হয়ে গিয়েছে; আমাদের আমদানী কমে যাওয়ার ফলে এখন আমাদের আরো টানাটানি করে চালাতে হবে।'

'তাতে করে আমার জীবনে তো কোনো হেরফের হবে না, সেরেজা।'

'ঠিক সেই কথাই তো হচ্ছে, কাতেরীনা লুভ্‌না; তোমার কাছে সব-কিছু পছন্দ-সই বলে মনে হতে পারে, আমার কিন্তু কন্সনিকালেও তা মনে হবে না—এবং তার একমাত্র কারণ তোমাকে আমি মাত্রাধিক শ্রদ্ধা করি। তার উপর দেখো, সমস্তটা ঘটবে যত সব হিংস্রটে ছোটলোকদের চোখের সামনে—সে-সব দেখে আমার বেদনার আর অন্ত থাকবে না। তুমি অবশ্য যা-খুশী তাই করতে পারো কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ পরিস্থিতিতে আমি কক্থনো সুখী হতে পারবো না।'

আর সের্গেই বার বার একটানা ঐ একই রাগিনী কাতেরীনার সন্মুখে গাইতে লাগল; ঐ ফেদোর লিয়ামিন্‌ ছোঁড়াটার জন্তে তার সর্বনাশ হয়েছে। সে যে আশা করেছিল, একদিন সে বণিকগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে কাতেরীনা লুভ্‌নাকে বসাবে সে আশা পূরণের সম্ভাবনা থেকে সে বঞ্চিত হল।

যুরিয়ে কিরিয়ে যে করেই হোক এ ধরনের আলাপ সের্গেই শেষ পর্যন্ত এই সমাধানেই নিয়ে আসতো যে, স্বামীর অন্তর্ধানের ন' মাসের ভিতর যদি কাতেরীনা তার পেটের বাচ্চাটিকে প্রসব করে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হয়, তবে তাদের স্বথের আর সীমা পরিসীমা থাকে না—কিন্তু মাঝখানে এই ফেদোর ছোঁড়াটা উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের সর্বনাশ করেছে।

॥ ১০ ॥

অকস্মাৎ সের্গেই ফেদোর লিয়ামিন্ এবং তার মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে সর্ব আলোচনা বন্ধ করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেদোরের চিন্তা কাতেরীনার সর্ব হৃদয়-মন যেন গ্রাস করে বসল। হুশিয়ারি আশঙ্কা তাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে তুললো যে, সে যেন তার জাল ছিন্ন করে কিছুতেই বেঝতে পারছিল না। এমন কি সের্গেইকে আদর-সোহাগ করা পর্যন্ত তার আর রুচছিল না। ঘুমন্ত অবস্থায়ই হোক, কিংবা ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম করার সময়েই হোক, অথবা তার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করার সময়ই হোক—উদয়াস্ত তার মনে মাত্র একটি চিন্তা : ‘এ যে একেবারে ডাहा অবিচার। বাস্তবিকই—এ আবার কি? কোথেকে পুচকে একটা ছোঁড়া এসে জুটলো, আর আমি আমার সর্বস্ব থেকে বঞ্চিত হব? আমি এতখানি যত্নগা সইলুম, পর্বতপ্রমাণ পাপের বোঝা আমার আত্মসত্তার উপর চাপালুম, আর কোনো হান্ধামা-হুজ্জৎ না পুইয়ে, খড়ের কুটোটি পর্যন্ত কুড়িয়ে না তুলে হঠাৎ এই ছোঁড়াটা এসে আমার তাবৎ-সর্বস্ব কেড়ে নেবে?...তাও না হয় বুঝতুম, দাবীদার ভারি ক্লি বয়েসের কেউ যদি হত—তা নয়, একটা নাবালক কোথাকার,—পুচকে ছোঁড়া।’

*

*

*

বাইরে প্রথম শীতের আমেজ লেগেছে। জিনোভিই বরিসিচের কোনো খবরই কোন দিক থেকে এল না—আর আসবেই বা কি করে? কাতেরীনা ক্রমেই মোটা হয়ে উঠেছিল আর সমস্তকণ ভাবনা-ভরা মন নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। গুদিকে শহরের লম্বা রসনা তাকে নিয়ে,—তার কি করে এটা হল, তার কি করে সেটা হল তাই নিয়ে হুবোসাম জল্পনা-কল্পনা গুজোব-গুল্ নিয়ে মেতে উঠেছিল : যেমন,—এই যে ছুঁড়ি কাতেরীনাটা এ্যাঙ্গিন ধরে ছিল বাজা পাঠিটা আর দিনকে দিন শুকোতে শুকোতে হয়ে যাচ্ছিল পুঁই ডাঁটাটির মতন,

এখন, হঠাৎ তার সামনের দিকটা ওরকম ধার! ফেঁপে উঠতে লাগল কেন ? এবং এদিকে সম্পত্তির ছোকরা মালিক ফেদিয়া লিয়ামিন্ খরগোসের চামড়ার হাফা কোটটি পরে বাড়ির আঙ্গিনায় থেলাধুলো করে আর ছোট-ছোট গর্তে জমে-যাওয়া বরফ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে ভেঙে দিন কাটাচ্ছিল।

রাঁধুনী আকুনীনিয়া আঙ্গিনার উপর দিয়ে তার পিছনে ছুটে যেতে যেতে চিংকার করে করে ডাকছে, 'এ কি হচ্ছে ফেদোর ইগ্নাতিচ ? খানদানী সদাগরের ছেলে তুমি,—এ কি হচ্ছে সব ? গর্তের জলে-কাদায় মাথামাথি করা কি শেঠজীর ছেলের সাজে ?'

কাতেরীনা আর তার বন্ধুদের সব-কিছু ওলোট-পালোট করে সম্পত্তির হিশ্তদারটি নিরীহ ছাগল-ছানার মত বাড়িময় তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, তার চেয়েও নিরীহ অকাতর নিজায় ঘুমোয় মাত্রাধিক স্নেহময়ী দিদিমার পাশে। জাগরণে বা স্বপ্নে কখনো তার মনে এক মুহূর্তের তরেও উদয় হয় নি সে কারো পাকা ধানে মই দিয়েছে কিংবা কারো স্বখে এতটুকু ব্যাঘাত-ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে।

বড় বেশি ছুটোছুটির ফলে অবশেষে ফেদিয়ার জল-বসন্ত হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথা। বেচারীকে তখন বাধ্য হয়ে শয্যাগ্রহণ করতে হল। গোড়ার দিকে জড়িমড়ি দিয়ে তার চিকিৎসা করা হল, শেষটায় ডাক্তার ডাকতে হল।

ডাক্তার ভিজিট দিতে শুরু করলেন। তাঁর প্রেসক্রিপশন্ মত ওষুধ ফেদিয়াকে প্রতি ঘণ্টায় খাওয়ানো হল—কখনো দিদিমা খাওয়াতেন, কখনো বা তাঁর অস্থুরোধে কাতেরীনা।

দিদিমা কাতেরীনাকে বলতেন, 'মা লক্ষী সোনামণি কাতেরীনা আমার ! বাচ্চাটিকে একটু দেখ-ভালু করো মা আমার। আমি জানি, শরীরের ভারে তোমার নিজেরই বড় বেশি চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে, আর মা বগীর কৃপার জন্য তুমিও অপেক্ষা করছো—তবু, বাচ্চাটির দিকে একটু নজর রেখো, লক্ষীটি !'

কাতেরীনা অসম্মত হয় নি। বুড়ি যখনই গির্জার সন্ধ্যারতিতে যেত, কিংবা অহোরাত্র উপাসনায় 'রোগশয্যায় যন্ত্রণায় কাতর বাচ্চা ফেদিয়ার' জন্য প্রার্থনা করতে অথবা ভোরবেলাকার প্রথম পূজার প্রসাদ ফেদিয়ার জন্য আনতে যেতে হত, কাতেরীনা তখন অস্থস্থ বাচ্চাটির পাশে বসত, জল খাওয়াতো, সময়মত ওষুধ খাইয়ে দিত।

এই করে করে তাই যখন শীতের উপবাস আরম্ভের পরব উপলক্ষে বুড়ি সন্ধ্যারতি আর অহোরাত্র উপাসনা করার জন্ত গির্জায় গেল তখন যাবার পূর্বে 'আদয়ে'র কাতেরীনা'কে অহরোধ করে গেল সে যেন ফেদিয়ার যত্নঅন্তি করে। ততদিনে ছেলেটি অবশ্য আরোগ্যলাভ করে উঠছিল।

কাতেরীনা ফেদিয়ার ঘরে ঢুকে দেখে সে কাঠবেড়ালীর চামড়ার তৈরি কোট পরে বিছানায় বসে 'সন্তদের জীবনকাহিনী' পড়ছে।

গদিগুলা কুর্সীতে আরাম করে বসে কাতেরীনা শুধলো, 'কি পড়েছো, ফেদিয়া?'

'আমি সন্তদের জীবনকাহিনী পড়ছি, কাকীমা।'*

'ভালো লাগছে?'

'ভারী চমৎকার, কাকীমা।'

ফেদিয়া যখন কথা বলছিল তখন কতুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা তার দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখছিল। অকস্মাৎ তার অন্তস্তলে শৃঙ্খলাবদ্ধ রান্সসের পাল যেন মুক্ত হয়ে আবার তার সেই পুরনো চিন্তাগুলো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলল : এই ছোকরাটা তার কী সর্বনাশই না করেছে, এবং সে অন্তর্ধান করলে তার জীবন কত না আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কাতেরীনা চিন্তা-মাগরে ডুব দিয়ে ভাবতে লাগলো, 'এখন আর কীই বা হতে পারে?' ছেলেটা এমনিতেই অসুস্থ, তাকে ওষুধ খেতে হচ্ছে...আর অসুস্থের সময় কত অঘটনই না ঘটতে পারে। লোকে আর কি বলবে? ডাক্তার ভুল ওষুধ দিয়েছিল!'

'তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ফেদিয়া?'

'হ্যাঁ, কাকীমা। তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।' তারপর চামচে ভরা ওষুধ গিলে বললে, 'সন্তদের এই জীবনকাহিনী কী অদ্ভুত সুন্দর, কাকীমা।'

কাতেরীনা বললে, 'আরো পড়ো, বেশ করে পড়ো।' কাতেরীনা তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটার চতুর্দিকে তাকাতে গিয়ে তার দৃষ্টি নঝা-কাটা ঘষা কাঁচের জানলাগুলোর উপর গিয়ে পড়লো। তখন বললো, 'এগুলোর খড়খড়ি বন্ধ করিয়ে নিতে হবে।' দাঁড়িয়ে উঠে কাতেরীনা পাশের ঘরে গেল, সেখান থেকে বসবার ঘর হয়ে উপরের তলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসলো।

* আসলে 'বোদি', কিন্তু রাশানরা আমাদের মত ঘোঁথ পরিবারে বাস করে না বলে একে অন্তর্কে সন্মোদনের সময় আমাদের মত বাছবিচার করে না।

পাঁচ মিনিটের ভিতর সের্গেই তার কাছে এল। পরনে ফুলবাবুটির মত সীলের চামড়ার অন্তরদার পুস্তিনের পোশাক।

কাতেরীনা শুধলো, ‘জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করা হয়েছে?’

কাটখোট্টা সংক্ষেপে সের্গেই ‘হ্যাঁ’ বলে, কাঁচি দিয়ে মোমবাতির পোড়া পলতেটুকু কেটে ফেলে স্টোভটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা জিজ্ঞেস করলো, ‘আজ রাতে গির্জার উপাসনা অনেকক্ষণ অবধি চলবে—না?’

সের্গেই উত্তর দিল, ‘কালকের পরবটা বড় রকমের; উপাসনা দীর্ঘ হবে।’ আবার সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা দাঁড়িয়ে উঠে বললো, ‘আমাকে নিচে ফেদিয়ার কাছে যেতে হবে; সে সেখানে একেবারে একলা।’

ভুরু নিচু করে কাতেরীনার দিকে সোজা তাকিয়ে সের্গেই শুধলো, ‘একেবারে একলা?’

‘একেবারে একলা।’ কাতেরীনা ফিস ফিস করে উত্তর দিয়ে শুধলো, ‘কেন? তাতে কি হয়েছে?’

দুজনের চোখে চোখে যেন বিদ্যুতে বিদ্যুতে ধারাবাহি জলে উঠলো; কিন্তু দুজনার ভিতর শব্দমাত্র বিনিময় হল না।

কাতেরীনা নিচের তলায় গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর প্রত্যেকটি খালি খর ভালো করে তদারক করে নিল। সর্বত্র শান্ত,—নিঃশব্দ নৈস্তক্য। ইকনগুলোর নিচে মঙ্গলপ্রদীপ নিষ্কম্প জ্যোতি বিচ্ছুরিত করছে। কাতেরীনার ছায়া তার সমুখ দিকে যেন দ্রুততর গতিতে এগিয়ে গিয়ে প্রাচীর-গায়ে প্রসারিত হচ্ছে। খড়খড়ি তুলে দেওয়ার ফলে জানলার উপর জমে-যাওয়া বরফ গলে গিয়ে চোখের জলের মত ঝরে পড়ছে। বিছানার উপর বালিশে ভর করে বসে ফেদিয়া তখনো পড়ছিল। কাতেরীনাকে দেখে সে শুধু বললে, ‘কাকীমা, এ-বইখানা নাও, লক্ষ্মীটি, আর ইকনের তাক থেকে ঐ বইখানা দাও তো।’

কাতেরীনা তার অস্বরোধ পালন করে বইখানা তাকে দিল।

‘ফেদিয়া, এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ভালো হয় না?’

‘না, কাকীমা, আমি দিদিমণির জন্ত অপেক্ষা করবো।’

‘দিদিমণির জন্ত অপেক্ষা করবে কেন?’

‘আমার জন্ত অহোরাত্র-উপাসনার নৈবেদ্য আনার কথা দিয়েছে দিদিমণি।’

কাতেরীনার মুখ হঠাৎ একদম পাংশু হয়ে গেল। জ্বপিণ্ডের নিচে সে এই প্রথম তার সন্তানের স্পন্দন অনুভব করলো। সমস্ত বুক তার হিম হয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে আপন ঠাণ্ডা হাত দু'খানা গরম করার জন্য ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল।

শোবার ঘরে নিজেকে ঢুকে দেখল সের্গেই স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে। ফিস ফিস করে তাকে বললো, 'ঐখানে।'

প্রায় অশ্রুট কঠে সের্গেই শুধলো, 'কি?' তার গলাতে কি যেন আটকে গেল।

'সে একেবারে একলা।'

সের্গেই ভুরু কঁচকালো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কাতেরীনা হঠাৎ দোরের দিকে রওয়ানা দিয়ে বললে, 'চলো।'

সের্গেই তাড়াতাড়ি জুতো খুলে ফেলে শুধলো, 'সঙ্গে কি নেব?'

কাতেরীনা অতি অশ্রুট কঠে বললে, 'কিছু না।' তারপর নীরবে সের্গেইয়ের হাত ধরে তাকে পিছনে পিছনে নিয়ে চললো।

। ১১ ।

এই নিয়ে তিন বারের বার কাতেরীনা যখন অসুস্থ বালকের ঘরে ঢুকলো তখন সে হঠাৎ ভয়ে কঁপে ওঠাতে বইখানা তার কোলে পড়ে গেল।

'কি হল, ফেদিয়া?'

বিছানার এক কোণে জড়সড় হয়ে ফেদিয়া ভীত স্রিত হাশ্বে বললে, 'ও, হঠাৎ যেন কিসের ভয় পেলুম, কাকীমা।'

'কিসের ভয় পেলে?'

'তোমার সঙ্গে কে ছিল, কাকীমা?'

'কোথায়? আমার সঙ্গে তো কেউ ছিল না, লক্ষ্মীটি।'

'কেউ ছিল না?'

ফেদিয়া খাটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা হয়ে, তার কাকীমা যে দোর দিয়ে ঢুকেছিল সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন খানিকটে আশ্বস্ত হল।

বললে, 'বোধ হয় আমার নিছক কল্পনাই হবে।'

কাতেরীনা খাটের খাড়া তক্তায় কমুইয়ের উপর ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ফেদিয়া তার কাকীর দিকে তাকিয়ে বললে, তার মনে হচ্ছে, কেন জানি নে,

তাকে বড্ড ক্যাঁকাশে দেখাচ্ছে।

উত্তরে কাতেরীনা ইচ্ছে করে কেশে দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন প্রতীক্ষা করলে। সেখান থেকে এল—কাঠের মেঝে থেকে সামান্যতম মচমচ শব্দ।

‘আমার নামে যে কুলগুজর নাম—তঁার জীবনকথা আমি পড়ছি, কাকীমা! বীরযোদ্ধা শহীদ হয়ে কি রকম পরমেশ্বরের কাছে প্রিয়রূপে গণ্য হলেন।’

কাতেরীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাইপো সোহাগ করে বললে, ‘তুমি বসবে, কাকীমা? আমি তাহলে তোমাকে কাহিনীটা পড়ে শোনাই।’

কাতেরীনা উত্তর দিল, ‘একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি। বসবার ঘরের মঙ্গল-প্রদীপটি ঠিক জ্বলছে কি না দেখে আসি।’ সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে যে ফিস ফিস করে কথা আরম্ভ হল সেটা অতিশয় নীরবের চেয়েও ক্ষীণ, কিন্তু চতুর্দিকে যে গভীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করছিল তার ভিতর সেটা ফেদিয়ার তীক্ষ্ণ কর্ণে এসে পৌঁছিল।

কামার জলভরা কণ্ঠে ছেলেটি টেচিয়ে উঠল, ‘কাকীমা, ওখানে কি হচ্ছে? কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো?’ এক মুহূর্ত পরে আরো অশ্রু-ভরা কণ্ঠে আবার টেচিয়ে বললে, ‘কাকীমা! এদিকে এস—আমার বড্ড ভয় করছে।’ এবার সে যেন কাতেরীনার কণ্ঠে ‘ঠিক আছে’ শুনতে পেল এবং ভাবলো সেটা তারই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

দ্রুত পদক্ষেপে কাতেরীনা এসে এমন ভাবে দাঁড়ালো যে, তার শরীর ফেদিয়া আর বাইরে যাবার দরজার মাঝখানে। বেশ কড়া গলায় বললে, ‘তুমি খালি খালি কিসের ভয় পাচ্ছে? ঠিক তার পরই বললে, ‘এইবারে তুমি শুয়ে পড়ো।’

‘আমার যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না, কাকীমা!’

‘না, না। তুমি এবারে ঘুমোও, ফেদিয়া—আমার কথা শোনো, শুয়ে পড়ো...সত্যি, রাত হয়েছে।’

‘কিন্তু কেন এসব, কাকীমা। আমার যে মোটেই শুতে ইচ্ছে করছে না।’

‘না, তুমি শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।’ কাতেরীনার স্বর আবার বদলে গিয়েছে, অল্প অল্প কাঁপছে। তারপর বাহু দুখানা তুলে ছেলটাকে দুই কান দিয়ে চেপে ধরে খাটের শিয়রের দিকে শুইয়ে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফেদিয়া আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো; সে দেখতে পেয়েছে সেবুগেইকে—ক্যাঁকাশে মুখ, আর খালি পায়ে সে ঘরে ঢুকছে।

আসে, ভয়ের বিভীষিকায় ছেলেটা তালু পর্যন্ত মুখ খুলে ফেলেছে। কাতেরীনা সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলো। কড়া গলায় বললো, ‘শিগগির করো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো—চেপে ধরো ছেলেটাকে, ধস্তাধস্তি না করে।’

সের্গেই ছেলেটার হু হাত পা চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা এক ঝটকায় বড় একটা পালকের বালিশ নিয়ে বলির পাঠা সেই ছোট্ট বালকের কচি মুখটি ঢেকে দিয়ে, বালিশের উপর ঝাপটে পড়ে তার শক্ত নরম স্তনের উপর চাপ দিতে লাগলো।

কবরের ভিতর যে স্তব্ধতা—প্রায় চার মিনিট ধরে সেটা ঘরে বিরাজ করলো।

অতি মুহূর্তে কাতেরীনা বললে, ‘ওর হয়ে গিয়েছে।’

কিন্তু—কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে সব-কিছু গোছগাছ করাতে লাগতে না লাগতে, বহু লুকনো পাপের রক্তভূমি, নিস্তব্ধ বাড়িটার দেয়ালগুলো মশক তীর মুষ্টাঘাতের পর মুষ্টাঘাতে টলমল করে উঠলো ; জানলাগুলো খড়খড়িয়ে উঠলো, ঘরের মেঝে দুলতে লাগলো, মঙ্গল-প্রদীপ ঝোলানোর সফ শিকল হলে হলে দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের উপর অদ্ভুত ছায়াছবির দৌড়াদৌড়ি লাগিয়ে দিল।

সের্গেই আতঙ্কে শিউরে উঠে উর্ব্বাসে লাগাল ছুট। কাতেরীনাও ছুটলো তাকে ধরবার জন্য। ওদিকে হট্টগোল তোলপাড় যেন তাদের পিছনে আসছে। যেন কোনো অপার্থিব শক্তি এই পাপালয়কে তার ভিত্তিতল পর্যন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

কাতেরীনার ভয় হচ্ছিল, পাছে সের্গেই আসের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে তার আর্ত চেহারা দিয়ে সব-কিছু ফাঁস করে দেয় ; সে কিন্তু ছুটলো সিঁড়ির দিকে উপরের তলায় যাবে বলে।

সের্গেই মাত্র কয়েকটি ধাপ উঠতেই অন্ধকারে একটা আধখোলা দরজার সঙ্গে খেল সরাসরি প্রচণ্ড এক ধাক্কা। আর্তনাদ করে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচের দিকে—কুসংস্কার-ভরা আতঙ্কে সে তখন সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে গিয়েছে।

গড় গড় করে তার গলা দিয়ে শুধু বেরুচ্ছে, ‘জিনোভিই বরিসিচ্ ! জিনোভিই বরিসিচ্ !’ আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচের দিকে পা উপরের দিকে করে হড়মড়িয়ে পড়ার সময় কাতেরীনাকেও ফেলে দিয়ে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গে।

কাতেরীনা শুধলো, ‘কোথায় ?’

সৈ (৫য়)—২১

সেইগেই আঁতকঠে চিংকার করে উঠলো, 'ঐ যে, ঐ তো ঐখানে সে একটা লোহার পর্দার উপর বসে বসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ঐ তো, ঐ—আবার এদেছে সে। শোনো, সে গর্জন করছে—গর্জন করছে সে আবার।'।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, অসংখ্য হস্ত রাত্তার দিকে মূখ-করা জানলাগুলোর উপর প্রচণ্ড ঘা দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

কাতেরীনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'ওরে হাবা। ওঠ, উঠে পড়, হাবা কোথাকার!' কথা ক'টি বলা শেষ করতে না করতে সে তীরের মতন ছুটে গেল ফেদ্রিয়ার কাছে। মরা ছেলেটার মাথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে বালিশের উপর এমনই ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল যে মনে হয় সে ঘুমচ্ছে। তারপর শত শত মুষ্টি যে দরজাটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছিল সেইটে দৃঢ়হস্তে খুলে দিল।

সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য। দলে দলে লোক রোয়াকের উপর ওঠবার চেষ্টা করছে। তাদের মাথার উপর দিয়ে কাতেরীনা দেখতে পেল সারি সারি অপরিচিত লোক উঁচু পাঁচিল টপকে বাড়ির আঙ্গিনায় নামছে—আর বাইরের রাস্তা উত্তেজিত কণ্ঠের কথা-বলাবলিতে গম্ গম্ করছে।

কোনো কিছু ভালো করে বোঝবার পূর্বে রোয়াকের দল কাতেরীনাকে উল্টে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভিতরে।

॥ ১২ ॥

এই প্রচণ্ড উত্তেজনা, তুল-কালাম কাণ্ড এল কি করে?

বছরের বারোটা প্রধান পর্বের যে কোনোটার আগের রাতে কাতেরীনা লুভভনাদের শহরের হাজার হাজার লোক শহরের সব-ক'টা গির্জা ভরে দিত। শহরটা যদিও মফস্বলের, তবু তার ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পোৎপাদন নগণ্য নয়। ফলে যে সব গির্জায় ভোরবেলাকার 'ঈশ্বরের-সংযোগ' উপাসনা করা হত সেখানে এমনই প্রচণ্ড ভিড় জমতো যে, বলতে গেলে পোকামাকড়টিও সেখানে নড়াচড়া করার মত জায়গা পেত না। এসব গির্জায় সমবেত ধর্মসঙ্গীত গাইতো শহরের বণিক সম্প্রদায়ের তরুণের দল। তাদের মূল-গায়ন, আপন গুস্তাদও সেখানে নিযুক্ত থাকতো।

আমাদের শহরবাসীরা প্রভুর গির্জার প্রতি অম্লরক্ত উৎসাহী ভক্ত—তাই তাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা সঙ্গীত ও অত্যাশ্চর্য কলার সমজ্জার। গির্জার

বৈভব-উজ্জ্বল চাকচিক্য এবং অর্গেন সহ বহু কণ্ঠে গীত সঙ্গীত তাদের জীবনের একটি উচ্চতম পবিত্রতম বিমলানন্দ। যে গির্জায় যেদিন ঐক্যসঙ্গীত হত সেখানে আধখানা শহর ভিড় লেগে যেতো, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তরুণ দলের, কেরানী-কুল, ছোকরার দল, ফুলবাবুর পাল, কল-কারখানার ছোট-বড় হুজুরি-কারিগর, এমন কি মিল-কারখানার মালিকরাও তাঁদের ভামিনীগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হতেন। সবাই ভিড় লাগাতো একই গির্জায় : সবাই চাইতো যে করেই হোক অর্গেনের সঙ্গে হুর মিলিয়ে অষ্ট-কণ্ঠ-সঙ্গীত, কিংবা কোনো ওস্তাদ যখন সপ্তমে উঠে কঠিন কারুকার্য করেন সেগুলো শুনতে—তা সে নরকের অগ্নিকুণ্ডের গরম দিনেই হোক, আর পাথর-ফাটা কনকনে শীতেই হোক ; গির্জার ঢাকা আঙ্গিনাতেই হোক, আর জানলার নিচে দাঁড়িয়েই হোক।

ইসমাইলফদের পাড়ার গির্জায় হবে সর্বমঙ্গলময়ী কুমারী মা-মেরির স্মরণে পূর্বব। তাই তার আগের রাতে যখন ইসমাইলফ পরিবারে ফেদিয়াকে নিয়ে পূর্ববর্ণিত নাটক অহুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন তাবৎ শহরের তরুণদল ঐ গির্জায় জড়ো হয়েছিল। গির্জা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বেশ সোরগোল তুলে তারা সে সঙ্ক্যার বিখ্যাত তার-সপ্তক-গায়কের গুণ নিয়ে, এবং গুঁরই মত সমান বিখ্যাত খাদ-গায়কের দৈব পদস্থলন নিয়ে আলোচনা করছিল।

কিন্তু সবাই যে কণ্ঠসঙ্গীত-আলোচনায় মেতে উঠেছিল তা নয় ; দলের মধ্যে আর পাঁচজন আর পাঁচটা বিষয়ে অমুরাগী।

এদের মধ্যে ছিল একটি ছোকরা কলকজার হুজুরি। তাকে সম্প্রতি এখানকার একটি স্টীম-মিলের মালিক পেতেসর্বুর্গ* থেকে আমদানী করেছেন। ইসমাইলফদের বাড়ির কাছে আসতে সে বলে উঠলো, ‘সবাই বলছে, মেয়েটা তাদের কেরানী সের্গেইকে নিয়ে রসকেলিতে অষ্টগ্রন্থের মেতে আছে।’

ভেড়ার চামড়ার অন্তরদার নীল সূতী কোটপরা একজন বললে, ‘ঘাঃ! সে তো সবাই জানে। আর সেই কথাই যখন উঠলো—আজ রাতে সে গির্জায় পর্যন্ত আসেনি।’

‘গির্জায়? কী যে বলছো? বদমাইশ মাগীটা পাপের কাদামাটি এমনই সর্বান্নে মেখেছে যে, সে এখন না ভরায় ভগবানকে, না ভরায় আপন বিবেককে, না ভরায় ভদ্রজনের দৃষ্টিকে।’

কলকজার ছোকরাটি বললে, ‘ঐ হোথা দেখ, ওদের বাড়িতে আলো

* বর্তমান লেনিনগ্রাদ।

জলছে।' আঙুল তুলে সে দেখালে, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে আসছে আলোর রেখা।

একাধিক গলা তাকে টুইয়ে দিয়ে বললে, 'ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ না, এবারে তারা কোন্ তালে আছে।'

দুই বন্ধুর কাঁধের উপর ভর করে কলকজার ছোকরাটি ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভালো করে তাকাতে না তাকাতেই গলা ফাটিয়ে চিংকার করে উঠলো, 'ভাইরা সব, ওরা কার যেন দম বন্ধ করে তাকে মারছে—বন্ধুরা সব, দম বন্ধ করে কাউকে মারছে!'

সঙ্গে সঙ্গে সে মরীয়া হয়ে দু হাত দিয়ে খড়খড়ির উপর থাবড়াতে লাগলো। তার দেখাদেখি আরো জনা দশেক লাফ দিয়ে জানলার উপর উঠে হাতের মুঠো দিয়ে খড়খড়ির উপর হাতুড়ি পেটা করতে আরম্ভ করে দিল।

প্রতি মুহূর্তে ভিড় বাড়তে লাগল, এবং এই করেই ইসমাইলফ্দের বাড়ি পূর্বোন্নিখিত ভাবে আক্রান্ত হল।

* * *

ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কলকজার লোকটি শাক্য দিলে, 'আমি নিজে দেখেছি; আমি স্বচক্ষে দেখেছি; বাচ্চাটাকে চিং করে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে দুজনাতে মিলে তার দম বন্ধ করে মারছিল।'

সের্গেইকে সেই রাত্রেই পুলিশ-থানায় নিয়ে যাওয়া হল; দুজন প্রহরী কাতেরীনাকে তার শোবার-ঘরে নজরবন্দী করে রাখল।

* * *

ইসমাইলফ্দের বাড়িতে অসহ শীত ছেয়ে পড়েছে। ঘর গরম করার চৌভাঙলো জ্বালানো হয়নি, সদর দরজা সর্বক্ষণ খোলা, কারণ দঙ্গলের পর দঙ্গল কোঁতুলীর দল একটার পর আরেকটা বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকছে। সবাই গিয়ে দেখছে কফিনের ভিতর শুয়ে ফেদিয়া—আরেকটা ডালা-বন্ধ পুরো মথমলের পর্দা দিয়ে ঢাকা বড় কফিন*। ফেদিয়ার কপালের যেখানটায় ডাক্তার ময়না তদন্তের জন্ত কেটেছিলেন সেখানকার লাল দাগটি ঢাকবার জন্ত তার উপর রাখা হয়েছিল সাটিনের ফুল পাতা দিয়ে তৈরি একটি মালা। তদন্তে প্রকাশ পায়

* পরে বলা হয়েছে, এটাতে ছিল কাতেরীনার স্বামীর মৃতদেহ। এটা পচে গিয়েছিল বলে কফিনের ডালা বন্ধ করে তার উপর ভারী পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছিল—যাতে করে দুর্গন্ধ না বেরয়।

যে, ফেদিয়া দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মারা যায়। সের্গেইকে ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে নিয়ে যাওয়ার পর, পাত্রী ভয়াবহ শেষ বিচারের দিন এবং যারা কৃত পাপের জন্য অহুশোচনা করে না তাদের কি হবে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে না বলতেই সে হাউ হাউ করে চোখের জলে ভেঙে পড়লো। সমস্ত প্রাণ খুলে দিয়ে সে যে ফেদিয়ার খুনী এ-কথাই যে স্বীকার করলো তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা জানালো জিনোভিই বরিসিচের মরা লাশও যেন খুঁড়ে তোলা হয়— স্বীকার করলো যে, পাত্রী-কৃত শেষ-অন্ত্যেষ্টির পুণ্যফল থেকে জিনোভিইকে বঞ্চিত করে সে তাকে মাটিতে পুঁতেছিল।

তখনো তার লাশ সম্পূর্ণ পচে যায় নি ; সেটাকে খুঁড়ে তুলে একটা বিরাট সাইজের কফিনে রাখা হল। সর্বসাধারণকে জ্ঞাসে আতঙ্কিত করে সে তার দুটি পাপের সহকর্মীগরূপে যুবতী গৃহকর্তার নাম উল্লেখ করলো।

সর্ব প্রশ্নের উত্তরে কাতেরীনা লভভ্‌নার মাত্র একটি উত্তর :—‘আমি কিছু জানি নে ; আমি এ-সব ব্যাপারের কিছু জানি নে।’

সের্গেইকে কাতেরীনার সামনে মুখোমুখি করে তাকে দিয়ে কাতেরীনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ানো হল। তার সব স্বীকৃতি শুনে কাতেরীনা নীরব বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো—সে দৃষ্টিতে কিন্তু কোনো রোষের চিহ্ন ছিল না। তাক্ষিল্যের সঙ্গে বললে, ‘সে যখন সব-কিছু বলার জন্য এতই উৎসুক তখন আমার কোনো-কিছু অস্বীকার করে আর কি হবে ? আমি তাঁদের খুন করেছি।’

সবাই শুধোলে, ‘কিন্তু কেন, কিসের জন্য ?’

কাতেরীনা সের্গেইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, ‘ওর জন্য।’

সের্গেই মাথা হেঁট করলো।

আসামী দুজনকে জেলে পোরা হল। এই বীভৎস কাণ্ডটা জনসাধারণের ভিতর এমনই কোতূহল, ঘৃণা আর ক্রোধের সঞ্চার করেছিল যে, ঝটপট তার ফয়সালা হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে সের্গেই এবং তৃতীয় বণিক সজ্জের জনৈক বণিকের বিধবা কাতেরীনা লভভ্‌নাকে কোর্জদারী আদালতের রায় শোনানো হল : তাদের আপন শহরের খোলা হাটে প্রথম তাদের চাবুক মারা হবে এবং তারপর সাইবেরিয়াতে কঠিন শ্রম কারাদণ্ডে উভয়ের নির্বাসন। মার্চ মাসের এক ভোরবেলাকার নিদারুণ হিমের নীচে চাবুকদার কাতেরীনার অনাচ্ছাদিত দুঃখবল পৃষ্ঠে আদালতের স্থির করা সংখ্যা শুনে শুনে চাবুকের ঘা মেঝে মেঝে, নীল-লাল রঙের উঁচু ফুলে-গুঁঠা দগড়ার দাগ

তুললে। তারপর সের্গেই পিঠে কাঁধে তার হিষ্টে পেল। সর্বশেষে তার হৃদয়ের মুখের উপর জলন্ত লোহা দিয়ে তিনটি রেখা কেটে ভ্রাতৃহত্যা 'কেন'-এর লাহন অঙ্কন করে দিল।*

এসব ঘটনা ঘটার সময় আগা-গোড়া দেখা গেল, যে কোনো কারণেই হোক সের্গেই কিন্তু কাতেরীনার চেয়ে জনসাধারণের বেশী সহানুভূতি পেল। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ দণ্ডমঞ্চ থেকে নামবার সময় সে বার বার হৌচট থেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, পক্ষান্তরে কাতেরীনা নেমে এল দৃঢ় পদক্ষেপে—তার একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল যাতে করে তার খসখসে শেমিজ আর কয়েদীদের কর্কশ কোটটা তার পিঠে সঁটে না যায়।**

এমন কি জেল-হাসপাতালে যখন তাকে তার সন্তোজাত শিশুকে দেখানো হল সে মাত্র এইটুকু বললে, 'আঃ, কে ওটাকে চায়?' কন্ঠিনকালেও গোঙরানো কাতরানোর একটি মাত্র শব্দ না করে, কন্ঠিনকালেও কারো বিরুদ্ধে কণামাত্র অভিযোগ না জানিয়ে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শক্ত তক্তার উপর বৃকের ভার রেখে কঁকড়ে পড়ে রইল।

॥ ১৩ ॥

সের্গেই ও কাতেরীনা অগ্রাগ্র কয়েদীর সঙ্গে দল বেঁধে সাইবেরিয়ার উদ্দেশে বেরুলো বসন্ত ঋতুতে। পঞ্জিকায় সেটা বসন্ত ঋতু বলে লেখা আছে বটে, কিন্তু আসলে তখন সেই প্রবাদটাই সত্য যে, 'সূর্য আলোক দেন যথেষ্ট, কিন্তু গরমি দেন অতি অল্পই'।

* বাইবেলের প্রথম অধ্যায় 'সৃষ্টি পর্বে' বর্ণিত আছে, আদমের পুত্র কেন্ তার ভ্রাতা আবেলকে হত্যা করে; যেহেতু মানুষ মাত্রই একে অস্ত্রের ভ্রাতা তাই খুনির কপালে ছাঁকা দিয়ে তিনটি চিরস্থায়ী লাহন অঙ্কনের বর্বর প্রথা ইয়োতোপের প্রায় সর্বদেশেই ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি প্রচলিত ছিল।

** অনুবাদকের মনে হয়, তার ভয় ছিল, কর্কশ উলের স্মৃতি পিঠের ধায়ে ঢুকে গেলে ত্তকোবার সময় সমস্ত পিঠের চামড়া অসমান হয়ে গিয়ে তার পিঠের মস্তণ সৌন্দর্য নষ্ট করবে। কিন্তু অতি অবশ্য মনে রাখা উচিত, সে শুধু তার বলভের ভোগের জন্য। আপন সৌন্দর্য নিয়ে কাতেরীনার নিজস্ব কোনো দস্ত ছিল না—কাহিনীতে তার কোনো চিহ্ন নেই।

কাতেরীনার বাচ্চাটাকে বরিস তিমোতেইয়েভিচের সেই বুড়ি মামাতো বোনের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত দেওয়া হল। কারণ সে দত্তিতা রমণীর নিহত স্বামীর আইনসম্মত সন্তান রূপে স্বীকৃত হল বলে এখন সে ইসমাইলফ্ এবং ফেদিয়ার তাবৎ সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী। এ ব্যবস্থাতে কাতেরীনা যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল এবং বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল পরিপূর্ণ তাম্বিল্যভরে। বহু অবাধ প্রণয়াবেগবিহ্বল রমণীর মত তার প্রেমও আপন দয়িতে অবিচল হয়ে রইল—দয়িতের সন্তানে সঞ্চারিত হল না।

আর শুধু বাচ্চাটার ব্যাপারেই নয়, সত্য বলতে কি, কাতেরীনার জীবনে এখন আর কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই, আলো নেই অন্ধকারও নেই ; না আছে অমঙ্গল না আছে মঙ্গল, দুঃখ নেই সুখও নেই, সে কিছুই বুঝতে পারে না, কাউকে ভালবাসে না—নিজেকে পর্যন্ত না। অস্থির হয়ে সে শুধু প্রতীক্ষা করছিল একটি জিনিসের : কয়েদীর দল রওয়ানা হবে কবে, কারণ তার হৃদয়ে তখন একমাত্র আশা, দলের ভিতর সে সের্গেইকে আবার দেখতে পাবে। আপন শিশুটির কথা ততদিনে সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

তার আশা তাকে ফাঁকি দিল না। মুখে 'কেন্'-এর লাজ্জন আঁকা, সর্বাক্কে ভারী শিকল বয়ে সের্গেইও রওয়ানা দিল তারই সঙ্গে একই ছোট দলটোতে।

যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, মানুষ সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সর্ব অবস্থাতেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র আনন্দের সন্ধান সাধ্যমত করে থাকে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন, কণা মাত্র প্রয়োজন, কাতেরীনার ছিল না। সে সের্গেইকে আবার দেখতে পাচ্ছে, এবং তার সঙ্গ পাওয়ার ফলে এই যে রাস্তা তাকে কঠিন কারাগারের নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছে সে-রাস্তাও তার কাছে আনন্দ-কুসুম পুষ্পাচ্ছাদিত বলে মনে হতে লাগল।

কাতেরীনা তার ছিটের তৈরি ব্যাগে করে মূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়েছিল অল্পই, এবং যোক টাকাকড়ি নিয়েছিল তার চেয়েও কম। এবং সে-সবও খৰ্চা হয়ে গেল নিজ্‌নি নফ্‌গরদ্* পৌছবার বহু পূর্বেই পাহারাওলাদের ঘৃষ দিতে দিতে—যাতে করে সে রাস্তায় সের্গেইয়ের পাশে পাশে যেতে পারে, যাতে করে পথমধ্যে রাজি-যাপন আশ্রয়ের হিমশীতল এক কোণে, গভীর অন্ধকারে সে তার সের্গেইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক আলিঙ্গন করতে পারে।

ওদিকে কিন্তু কাতেরীনার 'কেন্'-মার্কা যারা বহুতের হৃদয়ে কি জানি কি

* বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মাক্সিম্ গর্কির নামে বর্তমান 'গর্কি'।

করে তার প্রতি স্নেহ-প্রেম স্তব্ধ করে গিয়েছে। কথা সে বলতো কমই, আর বললে মনে হত যেন আঁকশি দিয়ে কথাগুলো অতি কষ্টে টেনে টেনে বের করছে, আর এ-সব গোপন মিলনের মূল্য দিত সে অত্যন্তই—যার জন্ত কাতেরীনা কে তার খাশ-পানীয়, আর তার আপন অত্যাশঙ্ক প্রয়োজনের জন্ত যে-ক'টি সামান্য দু'চার পয়সা তার তখনো ছিল, সব-কিছু বিলিয়ে দিতে হত। এমন কি সের্গেই একাধিকবার বলতেও কষ্ট করলো না, 'ঐ যে অঙ্ককার কোণে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিচের 'ধুলো সরাবার' জন্ত তুমি পাহারাগুলাদের পয়সা দিচ্ছো সেগুলো আমাকে দিলেই পারো।'

মিনতিভরা কণ্ঠে কাতেরীনা বললে, 'আমি তো কুলে পঁচিশটি কপেক্ দিয়েছি, সেরেজেজা।'

'আর পঁচিশটি কপেক্ কি পয়সা নয়? পঁচিশটি কপেক্ কি রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায়? অতগুলো কপেক্ ক'বার পেয়েছ তুমি? ওদিকে ক'বার অতগুলো তুমি দিয়ে দিয়েছ, কে জানে।'

'কিন্তু ঐ করেই তো আমরা একে অন্ধকে দেখতে পাই।'

'বটে? সেটা কি সহজ? ওতে করে আমরা কি আনন্দ পাই—এত সব নরক-যন্ত্রণার পর? আমার তো ইচ্ছে করে আমার জীবনটাকে পর্যন্ত অভিসম্পাত করি, আর এ ধরনের মিলনের উপর তো কথাই নেই।'

'কিন্তু সেরেজা, তোমাকে দেখতে পেলে আমার তো অন্ধ কোনো কিছুতেই এসে যায় না।'

'এসব বোর আহাম্মুকি।'—এই হল সের্গেইয়ের উত্তর।

এসব উত্তরে কাতেরীনা কখনো আপন ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রক্ত বের করতো, আর কখনো বা নিশাকালীন মিলনের অঙ্ককারে অশ্রুবর্ষণে অনভ্যস্ত তার সে দুটি চোখও তিস্ততার তীব্র বেদনায় ভরে যেত, কিন্তু সে সব-কিছু বরদাস্ত করে গেল, নীরবে যা ঘটায় ঘটতে দিল, এবং নিজেকে নিজে ফাঁকি দিতে কষ্ট করলো না।

উভয়ের মধ্যে এই নূতন এক সম্পর্ক নিয়ে তারা নিজ্‌নি নফগরদ্ পৌঁছল। এখানে পৌঁছে তারা আরেক দল কয়েদীর সঙ্গে যোগ দিল—তারা এসেছে মস্কো অঞ্চল থেকে, যাবে ঐ একই সাইবেরিয়ায়।

নবাগত এই বিরাট বাহিনীর হরেক রকম চিড়িয়ার মাঝখানে, মেয়েদের দলে ছিল দুটি মেয়ে যারা সত্যি মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটির নাম তিয়োনা, ইয়ারোল্লাভ্‌লের এক সিপাইয়ের স্ত্রী। এরকম চমৎকার কামবিলাসিনী মোহিনী

আর হয় না। সে লম্বা, আর আছে একমাথা চুলের ঘন কুন্ডল বেণী, মদিরালস হরিদ্রাভ নয়ন, তার উপর নেমে এসে ছায়া দিচ্ছে নিবিড় আখিপল্লবের রহস্যময় অবগুষ্ঠন। অল্পটি সতেরো বছরের নিখুঁত খোদাই করা তরুণী। গায়ের বর্ণটি মোলায়েম গোলাপী, মুখটি ছোট্ট, কচি তাজা দুটি গালের উপর দুটি টোল, আর কয়েদীদের মাথা-বাঁধবার ছিটের রুমালের নিচে থেকে কপালে নেমে এসে এখানে ওখানে নাচছে ঢেউখেলানো সোনালি চুল। দলের সবাই তাকে সোনেংকা নামে ডাকতো।

হুন্দরী রমণী তিয়োনার স্বভাবটি ছিল শান্ত, মদিরালস। দলের সবাই তাকে ভালো করেই চিনত, এবং তাকে জয় করতে সক্ষম হয়ে কোনো পুরুষই অত্যধিক উল্লাসভরে নৃত্য করতো না, কিংবা সে যখন তার তাবৎ রূপাভিলাষীদের মস্তকে সমমূল্যের বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিত তখন অত্যধিক শোকেও কেউ মোহমান হত না।

পুরুষ-কয়েদীর দল মস্তুরার ধরে সমন্বরে বলতো, ‘মেয়েদের ভিতর আমাদের তিয়োনা পিসি সব চেয়ে দরদী দিল্ ধরেন; কারো বুকে তিনি কস্মিনকালেও আঘাত দিতে পারেন না!’

সোনেংকা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া।

তার সম্বন্ধে তারা বলতো, ‘যেন বান্ মাছ—পাক দেবে, মোচড় খাবে, কিন্তু কখনো শক্ত মূঠোয় ধরতে পারবে না।’

সোনেংকার রুচি ছিল; চট করে যা-তা সে তো নিতই না, বরঞ্চ বলা যেতে পারে, বাড়াবাড়িই করতো। সে চাইতো কাম যেন তার সামনে ধরা হয় সাজসজ্জায়,—যেন সাদামাটা তরি-তরকারি তার সামনে না ধরে সেটা যেন তৈরি হয় তীক্ষ্ণ স্বাদের ঝাল-টকের সস্ দিয়ে,—কামে যেন থাকে হৃদয়দহন, আত্ম-ত্যাগ। আর তিয়োনা ছিল থাটি, নির্ভেজাল রুশ সরলতার নির্ঘাস। আর সে সরলতায় ভরা থাকতো এমনই অগ্নসের আবেশ যে, কোনো পুরুষকে, ‘কেন জালাচ্ছো, ছেড়ে দাও আমাকে’ বলবার মত উৎসাহ তার ছিল না। সে শুধু জানতো, সে জ্বালিঙ্গের রমণী। এ জাতীয় রমণীকে বড়ই আদর করে ডাকাত-ডাকু, কয়েদীর দল আর পেতের্সবুর্গের সোশাল-ডেমোক্রাটিক গুপ্তী।

এই দুই রমণী সহ মস্কো থেকে আগত কয়েদীর দল যখন সের্গেই-কাতেরীনার দলের সঙ্গে মিলিত হল তখন এ দুটি রমণী নিয়ে এল কাতেরীনার জীবনে ট্রাজেডি।

দুই দলে সম্মিলিত হয়ে নিজ্জি থেকে কাজান রওয়ানা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সের্গেই কোনো প্রকারের ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় না করে উঠে পড়ে লেগে গেল সৈনিক বধু তিয়োনার প্রণয়লাভের জন্ত এবং স্পষ্টই বোঝা গেল কোনো প্রকারের অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক তার সামনে উপস্থিত হয়নি। অলসাবেশা তিয়োনা সের্গেইকে অযথা হতাশায় মন-মরা হতে দিল না—সে তার হৃদয়বশত কদাচ কোনো পুরুষকেই হতাশায় মন-মরা হতে দিত না। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাজির আশ্রয়স্থলে সন্ধ্যার সময় কাতেরীনা ঘুম দিয়ে তার সের্জেচ্চার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল; এখন সে নিজ্জাহীন চোখে প্রতীক্ষা করছিল, যে কোনো মুহূর্তে প্রহরী এসে আস্তে আস্তে তাকে নাড়া দিয়ে কানে কানে বলবে, ‘ছুটে যাও! ঝটপট সেরে নিয়ো।’ দরজা খুলে গেল, আর কে যেন, কোন্ এক রমণী তীরবেগে করিভর পানে ধাওয়া করলো; দরজা আবার খুলে গেল, আবার আরেক রমণী তিলার্ধ নষ্ট না করে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠে প্রহরীর পিছনে অন্তর্ধান করলো; অবশেষে কে যেন এসে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা কর্কশ কোটে আস্তে আস্তে টান দিল। তৎক্ষণাৎ সে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো—তক্তাখানা কত না কয়েদীর গাত্র-ঘর্ষণে চিক্কণ-মন্হণ হয়ে গিয়েছে—কোটটা কাঁধের উপর ফেলে আস্তে আস্তে প্রহরীর গায়ে ধাক্কা দিল তাকে গম্ভ্যবাহুল দেখিয়ে দেবার জন্ত নিয়ে যেতে।

করিভরের মাত্র একটি জায়গায় অগভীর পিরিচের উপর ঢালাই মোমে প্রদীপের নিম্প্রভ পলতেটি ক্ষীণ আলো দিচ্ছে। কাতেরীনা চলতে চলতে দু-তিনটি যুগল-মিলনের সঙ্গে ঠোকর খেল—গা মিলিয়ে দিয়ে তারা যতদূর সম্ভব অদৃশ্য হবার চেষ্টা করছিল। পুরুষদের ওয়ার্ড পেরিয়ে যাবার সময় কাতেরীনা স্তনতে পেল তাদের দরজায় কাটা ছোট জানলার ভিতর দিয়ে চাপা হাসির শব্দ আসছিল।

পাহারাওলা বিড় বিড় করে কাতেরীনাকে বললে, ‘হাসাহাসির রকমটা দেখছ ?’ তারপর তার কাঁধে ধরে একটা কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল।

হাংড়াতে গিয়ে কাতেরীনার একটা হাত পড়লো কর্কশ কোট আর দাড়ির উপর, দ্বিতীয় হাতটা স্পর্শ করলো কোন্ এক রমণীর গরম মূথের উপর।

সের্গেই নিচু গলায় শুধলে, ‘কে?’

‘কি, কি করছো তুমি এখানে? তোমার সঙ্গে এ কে?’

অঙ্ককারে কাতেরীনা সজোরে তার সপত্নীর মাথা বাঁধার রুমালখানা ছিনিয়ে নিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে এড়িয়ে দিল ছুট। করিডরে ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সে বায়ুবগে অস্তর্ধান করলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে উচ্চকণ্ঠে ফেটে উঠলো একশ' অট্টহাস্য!

কাতেরীনা ফিস্ফিসিয়ে বললে, 'বদমাইশ', আর সের্গেইয়ের নবীন নাগরীর মাথা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রুমালের কোণ দিয়ে মারলো তার মূখে ঝাপটা। সের্গেই তার দিকে হাত তুলতে ঝাচ্ছিল, কিন্তু সেও ইতিমধ্যে ছায়ার মত লঘুপদে করিডর দিয়ে ছুটে গিয়ে ধরেছে তার কুর্খীর হাতল। পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে যে অট্টহাস্য তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল সেটা আবার এমনি কলরবে ধ্বনিত হল যে, যে-পাহারাওয়ালারা পিরিচের গালামোমের কাঁপা-কাঁপা বাতিটার সামনে বসে-সময় কাটাবার জন্য আপন বৃত্তজুতার ডগাটাকে লক্ষ্য করে মুখ থেকে থুথুর তীর ছুঁড়ছিল সে পর্যন্ত মাথা তুলে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, 'চোপ্ ব্যাটারা!'

কাতেরীনা চুপচাপ শুয়ে পড়ে ভোর অবধি সামান্যতম নড়াচড়া না করে সেই রকমই পড়ে রইল। সে চাইছিল নিজেকে বলে, 'আমি তাকে আর ভালোবাসি নে'—আর অনুভব করছিল তাকে সে ভালোবাসে আরো গভীর ভাবে, আরো বেশী আবেগভরা উচ্ছ্বাসে। বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই একই ছবি: তার ডান হাত অগ্নটার মাথার নিচে থেকে থেকে কাঁপছে, তার বাঁ হাত চেপে ধরেছে অগ্নটার কামাগ্নিতে জ্বলন্ত স্বচ্ছদয়।

হতভাগিনী কাদতে আরম্ভ করলো। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সর্ব দেহ-মন দিয়ে কামনা করতে লাগলো, ঐ সেই হাতটি যেন থাকে তার মাথার নিচে, সেই হাতটি যেন চেপে ধরে তার কাঁধ—হায়, সে কাঁধ এখন মৃগী রুগীর মত থেকে থেকে কাঁকুনি দিয়ে উঠছে।

সেপাইয়ের বউ তিয়োনা তাকে ভোরবেলা জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি অসুস্থ আমার রুমালখানা ফেরত দিতে পারো!'

'ও! তুমিই ছিলে তবে?'

'লক্ষ্মীটি, দাও না ফেরত!'

'কিন্তু তুমি আমাদের মাঝখানে আসছো কেন?'

'কেন, আমি কি করছি? তুমি কি ভেবেছো আমাদের ভিতর গভীর প্রণয়, না কি? না এমন কিছু সত্যি একটা মারাত্মক ব্যাপার যে ব্যার জন্য তুমি রেগে টং হবে!'

কাতেরীনা একটুখানি চিন্তা করে বালিশের তলা থেকে আগের রাজের ছিনিয়ে নেওয়া ক্রমালখানা বের করে তিয়োনার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালো।

তার হৃদয় হাক্কা হয়ে গেল।

আপন মনে বললে, 'ছিঃ! আমি কি এই রঙ-করা পিপেটাকে হিংসে করবো? চুলোয় যাক্ গে ওটা। তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতেই আমার ঘেন্না ধরে।'

পরের দিন পথে যেতে যেতে সের্গেই তাকে বলতে লাগলো, 'শোনো, কাতেরীনা লুভত্‌না, তোমাকে আমি কি বলতে চাই। দয়া করে তুমি তোমার মাথার ভিতর এই তত্ত্ব-কথাটি ভালো করে চুকিয়ে নাও তো যে, প্রথমত আমি তোমার জিনোভিই বরিসিচ্‌ নই, দ্বিতীয়ত তুমি এখন আর কোনো গেরেখারী সদাগরের বউ নও; স্তবরাং মেহেরবানী করে এখন আর বড়মানবীর চাল মারবেন না। আমার ব্যাপারে আস্ত একটা পাঠির মত যত্নতত্ত্ব চুঁ মারলে সেটা আমি বরদাস্ত করবো না।'

এর উত্তরে কাতেরীনা কিছু বললো না এবং তারপর এক সপ্তাহ ধরে সে সের্গেইয়ের পাশে পাশে হাঁটলো বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র দৃষ্টি বা বাক্য-বিনিময় হল না। তাকেই করা হয়েছে আঘাত, তাই সে নিজের মর্মান্দা বাঁচিয়ে তার এই—সের্গেইয়ের সঙ্গে তার এই—সর্বপ্রথম কলহ মিটিয়ে সমঝাওতা আনার জন্ত তার দিকে এগিয়ে যেতে চাইল না।

এদিকে যখন সের্গেইয়ের প্রতি কাতেরীনার রাগ, ততদিনে সের্গেই কুন্দধবলা তদ্বঙ্গী সোনেংকার দিকে হরিণের মত কাতর নয়নে তাকাতে আরম্ভ করেছে এবং নর্মভরে তার হৃদয়-দুয়ারে প্রথম করাঘাত আরম্ভ করে দিয়েছে। কখনো সে তার সামনে নম্রতাভরে মাথা নিচু করে বলে, 'আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিবাদন' আর কখনো বা তার দিকে তাকিয়ে মধুর শ্মিত হাস্ত করে, আর পাশাপাশি এলে চল করে তাকে হাত দিয়ে ঘিরে দেয় মোহাগের চাপ। কাতেরীনা সব-কিছুই লক্ষ্য করলো, আর তার বুকের ভিতরটা যেন আরো সিঁদ্ব হতে লাগলো।

মাটির দিকে না তাকিয়ে যেন ধাক্কা খেতে খেতে এগুতে এগুতে কাতেরীনা তোলাপাড় করতে লাগলো, 'কি জানি, তবে কি ওর সঙ্গে মিটিয়ে ফেলব? কি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী বাধা দিতে লাগলো তার আত্মসম্মান—এগিয়ে গিয়ে মিটমাট করে ফেলতে। ইতিমধ্যে সের্গেই আরো নাছোড়বান্দা হয়ে

সেঁটে রইল সোনেংকার পিছনে ; এবং সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, নাগালের বাইরের যে-সোনেংকা এতদিন পাক দিতেন মোচড় খেতেন কিন্তু ধরা দিতেন না, এইবারে তিনি, যে কোন কারণেই হোক, হঠাৎ যেন পোষ মেনে নিচ্ছেন ।

কথায় কথায় তিয়োনা একদিন কাতেরীনাকে বললে, ‘তুমি আমাকে নিয়ে নালিশ করেছিলে না ? কিন্তু আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি । আমারটা ছিল আজ-আছে-কাল-নেই ধরনের দৈবাৎ ঘটে যাওয়ার একটা ব্যাপার ; এসেছিল, চলে গেল, মিলিয়ে গেল ; কিন্তু সাবধান, এই সোনেংকাটার উপর নজর রেখো ।’

কাতেরীনা মনস্থির করে আপন মনে বললে, ‘জাহান্নমে যাক আমার এই আত্মসম্মান ; আজই আমি তার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলব ।’ এবং তারপর ঐ একটিমাত্র চিন্তা নিয়ে পড়ে রইল, মিটমাট করে ফেলার জন্ত সবচেয়ে ভাল কৌশলটা কি হবে ?

কিন্তু কিছু করতে হল না ; সের্গেই নিজেই তাকে এই ধাঁধা থেকে বের করার পথ তৈরি করে দিল ।

পরের আশ্রয়ে পৌঁছতেই সের্গেই কাতেরীনাকে ডেকে বললে, ‘লভ্ভনা, আজ রাত্রে এক মিনিটের তরে আমার কাছে এসো তো ; তোমার সঙ্গে কথা আছে ।’

কাতেরীনা চুপ করে রইল ।

‘কি হল ? আমার উপর এখনো রেগে আছ নাকি ? কথা বলবে না ?’

কাতেরীনা এবারেও কোনো সাড়া দিল না ।

কিন্তু পবের ঘাটির কাছে আসার সময় শুধু সের্গেই না, সবাই লক্ষ্য করলে যে, কাতেরীনা সর্দার পাহারাওয়ার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করছে, শেষটায় ভিক্ষায় পাওয়া* তার সতেরোটি কপেক্ সে সর্দারের হাতে গুঁজে দিল । মিনতিভরা কণ্ঠে তাকে বললে, ‘আরো দশটা জমাতে পারলেই তোমাকে দেব ।’

সর্দার পয়সা ক’টি আন্তিনের ভাঁজে লুকলো । বললে, ‘ঠিক আছে ।’

* আজকাল কি হয় অহুবাদকের জানা নেই, কিন্তু ১৯১৭-এর সমাজ বিবর্তের পূর্বের একাধিক লেখক এই মর্যম্পর্শী ভিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন । রুষ্টি বরফে ছাঁচোট হুমড়ি খেতে খেতে যখন এই সব হতভাগার দল সাইবেরিয়ায় আয়ত্ন্য নিবাসনের দিকে এগুতো তখন বহু পরহুংকাতর গৃহী এমন কি ভিখারী আতুররাও এদের ভিক্ষে দিত । অনেক সময় অবাচিত ভাবে ।

লেনদেন শেষ হয়ে গেলে সের্গেই 'খোৎ' করে খুশী প্রকাশ করে সোনেংকার দিকে চোখের ইশারা মারলে।

খাটির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে কাতেরীনা কে জড়িয়ে ধরে আর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'ওগো, কাতেরীনা, লক্ষ্মীটি',—'শুনছিস হোঁড়ারা, এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন মেয়ে তো সারা সংসারেও পাওয়া যায় না।'।

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো—আনন্দে সে তখন হাঁফাচ্ছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল; একলক্ষ সে বেরিয়ে এল বললে কমই বলা হয়; তার সর্বাঙ্গ তখন ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছে আর অন্ধকারে তার হাত সের্গেইয়ের সন্ধানে এখানে ওখানে খুঁজছে।

তাকে আলিঙ্গন করে আপন বুকে চেপে যেন দম বের করে সের্গেই বললে, 'আমার কেটু।'

চোখের জলের ভিতর দিয়ে কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ওগো, আমার সর্বনাশের নিধি।' তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে যেন বুলে রইল।

পাহারাওলা করিডরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি পাইচারি করতে করতে মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিল; বৃটজুতোর ডগায় থুথুর তীর হোঁড়া অভ্যাস করে ফের পাইচারি আরম্ভ করছিল; ক্লান্তিতে জীর্ণ কয়েদীরা দরজার ভিতরে নাক ডাকিয়ে যাচ্ছে; ঘর গরম করার স্টোভের নিচে কোথায় যেন একটা ইঁদুর কুট কুট করে কঞ্চল কাটছে; কিঁকির দল একে অন্তের সঙ্গে সঙ্গে পান্না দিয়ে প্রাণপণ চিংকার করে যাচ্ছে—কাতেরীনা তখনো সপ্তম স্বর্গে।

কিন্তু হৃদয়াবেগ ভাবোচ্ছ্বাস স্তিমিত হল এবং রসকবছীন অনিবার্য বাক্যলাপ আরম্ভ হল।

করিডরের এক কোণে মেঝের উপর বসে সের্গেই নালিশ জানালে, 'আমি কী মারাত্মক যন্ত্রণায়ই না কষ্ট পাচ্ছি; পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু অবধি হাড়গুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় পাগল করে তুলছে।'।

সের্গেইয়ের লম্বা কোটের ভিতর মোহাগভরে মাথা গুঁজে কাতেরীনা শুধলো, 'তা হলে কি করা যায়, সেরেজেস্কা?'

'যদি না...কি জানি, হয়তো বা ওদের বলতে হবে, কাজানে পৌঁছলে আমাকে সেখানকার হাসপাতালে জায়গা করে দিতে। তাই করবো নাকি?'

'সে কি? কী যে বলছো, সেরেজা!'

'এ ছাড়া অল্প কি গতি আছে বলো; যন্ত্রণায় আমার যে প্রাণ যায়।'।

‘কিন্তু তা হলে তারা তো আমাকে আগে আগে খেদিয়ে নিয়ে যাবে, আর তুমি পড়ে রইবে পিছনে !’

‘ঠিক কথা, কিন্তু আমি করি কি ? আমি তোমাকে বললুম তো, পায়ের শিকলি ঘষে ঘষে আমাকে যে মেরে ফেললে । শিকলিগুলো যেন ঘষতে ঘষতে আমার হাড়গুলোর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে । হয়তো বা কয়েকদিনের জুয়া মেয়েদের লম্বা পশমের মোজা পরলে কিছু-একটা হয় ।’

‘লম্বা মোজা ? আমার কাছে এখনো আনকোরা একজোড়া তো রয়েছে, সেরেজা !’

‘তা হলে তো আর কথাই নেই ।’

একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে কাতেরীনা ছুট দিয়ে ঢুকলো তার কুঠুরিতে । শোবার তক্তার নিচের থেকে হাংড়ে হাংড়ে বের করলো তার ব্যাগটা । ফের ছুট দিল সের্গেইয়ের কাছে । সঙ্গে নিয়ে এসেছে নীল রঙের পুরু পশমের একজোড়া লম্বা মোজা ; দুপাশে রঙিন সিঙ্কের মিহিন নকশা জল জল করছে—বল্কফ্ শহরের তৈরি মোজা, এ মোজা তৈরি করেই সে শহর তার গ্যাঘা খ্যাতি পেয়েছে ।

কাতেরীনার শেষ মোজা জোড়াটি নিয়ে যেতে যেতে সের্গেই জোর দিয়ে বললে, ‘এগুলো পরলে আর ভাবনা কি !’

কাতেরীনার কী আনন্দ ! ফিরে এসে কঠিন তক্তায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল । স্তনতেই পেল না, সে ফিরে আসার পর সোনেৎকা করিডরে বেরিয়ে গেল আর সেখানে সমস্ত রাত কাটিয়ে চুপে চুপে ভোরের ঠিক অল্প একটু আগে কখন ফিরে এল ।

এ সমস্ত ঘটল কাজান পৌছবার দু ঘাটি পূর্বে ।

॥ ১৫ ॥

ঘাটির বন্ধ গুমোট ঘরের দেউড়ি থেকে বেকবামাত্রই কয়েকদীর রুদ্র অভ্যর্থনা জানালো শীতে জর্জর বৃষ্টি-বরফে মেশা অকরণ দিবস । কাতেরীনা বেরিয়েছিল বৃকে ষথেষ্ট সাহস বেঁধে কিন্তু আপন সারিতে যোগ দেওয়া মাত্রই তার সর্বান্ন কাঁপতে লাগলো, মূখের রঙ সবুজে পরিবর্তিত হয়ে গেল । তার চোখের সামনে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল ; তার প্রত্যেকটি হাড়ের জোড়া যেন তাকে ছুঁচের মত খোঁচাতে আরম্ভ করলো, যেন তার দুটি হাঁটু ভেঙে গেছে ।—ঐ তার

সামনে সোনেংকা দেমাক করে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে পায়ের নীল পশমের মোজা—
তার উপরের সিন্ধের মিহিন কাজ—কাতেরীনা কত না ভালো করেই চেনে!

কাতেরীনা চলতে লাগল—যেন তার সর্বাস্থের কোনো জায়গায় জীবন-রসের
বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। শুধু তার চোখ ছোটো পূর্ণ জীবন্ত, চোখের কোটর
থেকে বেরিয়ে এসে যেন ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সের্গেইয়ের দিকে—সে
দৃষ্টি তাকে ছাড়ল না, এক পলকের তরেও না।

জিরোবার পরের ঘাটিতে পৌঁছানো মাত্রই কাতেরীনা শাস্ত পদক্ষেপে
সের্গেইয়ের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললে, ‘পিশাচ!’ সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ
সোজা তার চোখে থুথু ফেললে।

সের্গেই লাফ দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আর সবাই
তাকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখলো।

শুধু বললে, ‘দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।’—আর হাত দিয়ে মুখ মুছলো।

আর-সবাই ব্যঙ্গ করে বললে, ‘অতো রোয়াব কিসের, সেও তোমার
মোকাবেলা করতে ডরায় না।’ আর-সকলের ঠাট্টা-হাসির মাঝখানে সোনেংকার
কলহাস্ত শোনালো বড়ই ফুটিতে ভরা।

সোনেংকার সাহায্যে যে গোটা ষড়যন্ত্রটা গড়ে উঠেছিল সেটা এখন তার
সম্পূর্ণ পছন্দমতই বিকশিত হচ্ছিল।

সের্গেই কাতেরীনাকে শাসালে, ‘এত সহজে এর শেষ হবে না।’

জলঝড়ের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লাস্ত অবসন্ন, ছিন্নভিন্ন হৃদয়
নিয়ে কাতেরীনা সে রাত্রিতে কয়েদীদের শক্ত বেঞ্চে হেঁড়া তক্তার ভিতর মোটেই
টের পেল না, কখন ছোটো কয়েদী মেয়েদের ওয়ার্ডে ঢুকলো।

ওরা ঢোকা মাত্রই সোনেংকা তার বেশি থেকে গা তুলে নীরবে কাতেরীনাকে
দেখিয়ে দিয়ে, ফের শুয়ে পড়ে কয়েদীদের লম্বা কোট দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নিল।

সেই মুহূর্তেই কে যেন কাতেরীনার লম্বা কোট তার গা থেকে তুলে নিয়ে
মুখের উপর ছুঁড়ে ঢেকে দিল আর তার পিঠের স্বক মাত্র খসখসে শেমিজের
উপর মোটা ডবল দড়ির শেষ প্রান্ত দিয়ে নির্মম চাষাড়ে বলপ্রয়োগ করে বেধড়ক
চাবকাতে লাগলো।

কাতেরীনা চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু মুখে-মাথায় জড়ানো কোটের ভিতর
দিয়ে তার কণ্ঠস্বর বেরতে পারলো না। সে উঠে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু
তাতেও ঐ একই অবস্থা—এক তাগড়া কয়েদী তার কাঁধের উপর বসে তার বাহু
দুখানা জোরে চেপে ধরে রেখেছিল।

‘পঞ্চাশ!’ শেষ পর্যন্ত গুনে শেষ হল। কারোরই বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না, এটা সের্গেইয়ের গলা। দুই নিশাচর দোর দিয়ে অস্তর্ধান করলো।

কাতেরীনা কোট থেকে মাথা ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে উঠলো; সেখানে কেউ নেই, কিন্তু অদূরে লম্বা কোটের নিচে কে যেন হাসছে, নির্ভয় ব্যঙ্গের ঘেমা ঈর্ষার হাসি। কাতেরীনা সোনেৎকার হাসি চিনতে পারলো।

এ অপমান যে সর্ব-সীমানা পেরিয়ে গেল। আর সীমাহীন ঘৃণা যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে কাতেরীনার অস্তরের অন্তস্তলকে যেন সিদ্ধ করতে লাগলো। মতিচ্ছন্ন পাগলের মত সে সমুখপানে ধেয়ে গেল, মতিচ্ছন্নের মত টলে পড়লো তিয়োনার বুকের উপর—পড়ার সময় সে তাকে তুলে ধরলো।

কাতেরীনা ঢলে পড়ল তিয়োনার বুকের উপর। এই পূর্ণ উরসই কিছুদিন পূর্বে তারই বিশ্বাসঘাতক প্রেমিককে আনন্দ দিয়েছে পাপাত্মার কাম্য হয় মাধুর্য দিয়ে। তারই উপর সে কৈদে ভেঙে পড়ল তার অসহ বেদনার শোক নিয়ে। তারই সরলা কোমলা সপত্নাকে সে জড়িয়ে ধরলো, শিশু ধৈর্যকম মা’কে জড়িয়ে ধরে। এখন তারা দুজনাই এক সমান; দুজনাকে একই মূল্যে নামানো হয়েছে, দুজনাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দু’জনাই এক সমান...তিয়ানা—যার দিকে তার পয়লা খেয়াল গেল তার কাছেই যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, আর কাতেরীনা—সে তার হৃদয়-নাট্যের শেষ দৃশ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু সত্য বলতে কি, এখন আর কোনো অবমাননা তার কাছে অবমাননা বলে মনে হয় না। তার চোখের জল শেষ করে সে এখন শক্ত হয়ে গিয়েছে, যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছে, আর এখন সে কাঠের পুতুলের মত শাস্ত হয়ে রোল কলে যাবার জন্ত তৈরি হতে লাগলো।

ড্রাম বেজে উঠলো; ড্রাম্-ড্রামাদম্-ড্রামাদম্-ড্রাম্। শিকলে বাঁধা, শিকলহীন উভয় শ্রেণীর নিরানন্দ নিম্প্রভ কয়েদীর দল যেন অদৃশ্য হস্তের ধাক্কা খেতে খেতে ঝাঁটির চক্রে বেরিয়ে এল। সের্গেই আ.ছ সেখানে, আর আছে তিয়ানা, সোনেৎকা, কাতেরীনা, আছে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দণ্ডিত আদর্শবাদী এক কয়েদী—এক ইহুদির সঙ্গে শিকলে বাঁধা, একই শিকলে বাঁধা এক পোল আর তাতার।

প্রথম তারা একসঙ্গে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল; পরে চলনসই রকমের শৃঙ্খলায় সারি বেঁধে তারা রওয়ানা দিল।

এরকম নিরানন্দ দৃশ্য বড়ই বিরল; পাঁচজনের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন,

উজ্জলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে যাদের কণামাত্র আশার ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই—এরা কয়েকজন লোক কাঁচা রাস্তার হিমশীতল কালো কাদায় ডুবতে ডুবতে যেন এগিয়ে চলেছে। তাদের চতুর্দিকের সব-কিছু এমনি বিসদৃশ যে, আতঙ্কে মাহুকের গা শিউরে ওঠে; অন্তহীন কাদামাটি, শিশার মত বিবর্ণ আকাশ, সর্বশেষ-পত্রবর্জিত নগ্ন সিল্ক উইলো গাছ—আর তাদের লম্বা লম্বা শাখায় বসে আছে উন্মোখা পালকস্বক দাঁড়কাকের দল। বাতাস কখনো গুমরে গুমরে ওঠে, তার কণ্ঠস্বর কখনো বা ক্রুদ্ধ, আর কখনো ছাড়ে তীব্র ক্রন্দন রব, আর কখনো বা ভীষণ হুসার।

এই বীভৎস দৃশ্য দৃশ্যের পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে নরকের সেই গর্জন, যে-গর্জন মাহুকের আত্মাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সে-গর্জনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাইবেলের মহাপুরুষ আইয়ুবের অভিসম্পাত—‘ধ্বংস হোক সেই দিন যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি’, আর তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রীর উপদেশ : ‘তোমার ভগবানকে অভিশাপ জানিয়ে মরে যাও।’

যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের মনে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশী—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দনধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মাহুখ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ রকম অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজতে যায় সড়, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, অগ্নি পাঁচজন মাহুখকে নিয়েও, তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।

*

*

*

কাতেরীনা-নিগ্রহের পরের দিন ভোরবেলা কয়েদীর দল যখন গ্রামের ভিতরকার খাঁটি ছেড়ে সবেমাত্র রাস্তায় নেমেছে তখন সেরুগেই ইতর কণ্ঠে কাতেরীনা কে শুধলো, ‘ওগো আমার পটের বীবী, সদাগরের ঘরগী—সন্মানিতা মহাশয়া সর্বাঙ্গীণ কুশলে স্বাস্থ্য উপভোগ করছেন তো?’

কথা ক’টা শেষ করেই সে তৎক্ষণাৎ সোনেংকার দিকে ফিরে তাকে তার লম্বা কোটের এক পাশ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে তার তীব্র কণ্ঠ তীব্রতর করে গেয়ে উঠলো :

‘সোনালি চুলের কোমল মাথাটি দেখিছ জানালা দিয়া,
কুগ্রহ মোর,* ঘুমোও নি তুমি? আবার ভাঙিবে হিয়া—!
বুকের ভিতর জড়ায়ে রাখিব মম গুণ্ঠনে, প্রিয়া!’

গানটা গাইতে গাইতে সের্গেই সোনেংকাকে জড়িয়ে ধরে তামাম কয়েদীর পালের চোখের সম্মুখে তাকে সশব্দে চুষন করলো।

কাতেরীনা এসব দেখল, অথচ সত্যই যেন দেখতে পেল না। এমন অবস্থায় সে তখন পৌঁচেছে যেন প্রাণহীন। একটা পুতুল হেঁটে চলেছে আর সবাই তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করেছে; তাকে দেখাচ্ছে, সের্গেই কি রকম অশ্লীলভাবে সোনেংকার সঙ্গে চলাচলি লাগিয়েছে। সে তখন সকলের সর্বপ্রকার বাঙ্গ-বিদ্ৰপের বলির পাঠ।

যেন পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কাতেরীনা এগোচ্ছে। এ-অবস্থায়ও কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিলে তিয়োনা মাঝখানে পড়তো; বলতো, ‘ছেড়ে দে না ওকে, পিচেশের দল, দেখছি নে, ওর যে হয়ে এসেছে।’

এক ছোকরা কয়েদী যেন বাকপটু হয়ে বললে, ‘ওর ছোট্ট পা দু’খানি বোধ হয় ভিজ্জে গিয়েছে।’

সের্গেই পাল্লা দিয়ে বললে, ‘এ তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত যে, আমাদের সম্ভ্রান্ত বণিক সম্প্রদায়ের মহিলাগণকে সাতিশয় স্বকোমল ভাবে লালনপালন করা হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর যদি একজোড়া গরম বীবীয়ানীর মোজা থাকতো তাহলে হাঙ্গামা কমে যেত।’

কাতেরীনা যেন গভীর নিদ্রা থেকে সাড়া দিল, জেগে উঠলো।

গুঁতোতে গুঁতোতে তাকে যেন সহের সীমানার ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে—‘বাসেতে লুকনো জঘন্ঠ সাপ তুমি! ঠাট্টা করে হাসো আমাকে নিয়ে—ইতর বদমায়েশ—হাসো, আরো হাসো!’

‘কি বলছেন আপনি, সদাগরের পটের বীবী! আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করার কোনো মূল্যবই আমার নেই। আসলে সোনেংকা হেথায় যখন সত্যি এত সুন্দর মোজা বিক্রি করছে, তখন ভাবলুম—কেন, দোষ করেছে নাকি?’

* যে রাত্রে সের্গেই ফাঁকি দিয়ে কাতেরীনার কাছ থেকে মোজা জোড়াটি আদায় করে, তখন কাতেরীনা তাকে ‘আমার সর্বনাশের নিধি’ বলে সোহাগ করেছিল। এখানে সেটা ‘কুগ্রহ মোর’। কাতেরীনাকে সেই সোহাগ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্তই সের্গেই বিশেষ করে এই গানটাই ধরলো।

আমাদের সদাগরের বেগম সায়েবা হয়তো একজোড়া কিনলেও কিনতে পারেন।’

প্রচুর হাস্যধ্বনি উঠলো। দম দেওয়া কলের মত কাতেরীনা সামনের দিকে পা ফেললো।

আবহাওয়া ক্রমাগত আরো খারাপ হচ্ছে। এতদিন যে ধূসর মেঘ আকাশ ঢেকে রেখেছিল এখন তার থেকে নেমে এল স্তরে স্তরে ভেজা-বরফের পাজ। মাটি ছোঁয়া মাত্রই এরা গলে গিয়ে রাস্তার কাদার গর্তকে করে দেয় আরো গভীর,— সেটাকে ঠেলে ঠেলে পা চালানো করে দেয় আরো অসহ্য কঠিন কঠোর। অবশেষে সম্মুখে দেখা দিল শিসার রঙের একটা রেখা। সে রেখার অগ্ন তীর চোখে ধরা পড়ে না। এই রেখাটি ভল্গা নদী। অল্প অল্প জোর হাওয়া ভল্গার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বড় বড় কাটা কাটা ঢেউ সামনে পিছনে থেদিয়ে নিয়ে চলেছে।

সর্বাঙ্গ জবজবে ভেজা, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কয়েদীর দল আস্তে আস্তে ঘাটে পৌঁছে থেয়ার বিরাট কাঠের ভেলার জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলো।

কালো ভেলার কাঠ থেকে জল ঝরছে। পাড়ে এসে ভিড়তে প্রহরীরা কয়েদীদের ভেলাতে ওঠবার ব্যবস্থা করতে লাগলো।

সর্বত্র ভেজা বরফের পোচ মাথা ভেলা ঘাট ছেড়ে উন্নত নদীর ঢেউয়ের উপর দোলা খেতে লাগলো। ভেলা ছাড়ার সময় কয়েদীদের একজন বললে, ‘কারা সব বলাবলি করছিল, ভেলাতে কার কাছে যেন বিক্রির জন্ত ভদ্রকা শরাব আছে।’

সের্গেই বললে, ‘সত্যি বলতে কি, সামান্য কোনো মাল দিয়ে গলার নালিটা ভেজাবার এই সুযোগটা হারানো বড্ডই পরিতাপের বিষয় হবে।’ সোনেংকার ফুঁতির জন্ত সে তখন কাতেরীনাকে বিক্রপের খোঁচা দিয়ে উৎপীড়ন করতে শুরু করেছে—‘আপনি কি বলেন, আমাদের সদাগরের পটের বীবি? পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে এক পাস্তুর ভদ্রকা দিয়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করলে কি রকম হয়? আহা, কিপ্‌টেমি করবেন না। স্মরণ করো, প্রিয়তমা, আমাদের অতীতের প্রেমের কথা! আমি আর তুমি—ওগো, আমার জীবনের আনন্দময়ী, তোমাতে আমাতে দুজনাতে কত না দীর্ঘ শরৎ-হেমন্তের রাত কাটিয়েছি পাশাপাশি বসে, তোমাতে আমাতে কত না আনন্দে সময় কাটিয়েছি কত না হেলা-ফেলায়; কেবলমাত্র তোমাতে আমাতে দুজনাতে মিলে তোমার প্রিয় আত্মীয়-আত্মজনকে ওপারের চিরশান্তিতে পাঠিয়েছি—একটিমাত্র পাত্রীপুরুতের কণামাত্র সাহায্য না নিয়ে।’

শীতে কাতেরীনার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল। সে-শীত তার জবজবে ভেজা কাপড়-জামা ভেদ করে তার অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত পৌঁচছিল...তার উপর আরো কি যেন কি একটা তার সর্বসত্তা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। তার মাথা জলছিল...

সত্যই যেন তার ভিতরে আগুন ধরানো হয়েছে...তার চোখের মণি অস্বাভাবিক রকমে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে, এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ জ্যোতি এসে সে মণির এখানে ওখানে নাচছে, আর তার দৃষ্টি ডেউয়ের দোলার দিকে নিশ্চল নিবন্ধ।

সোনেংকার গলা ছোট্ট একটি কপোর ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'মাইরি বলছি, এক ফোঁটা ভদ্রকা পেলে আমি বেঁচে যেতুম ; এ শীতটা যে আমি কিছুতেই সহ্যে পারছি নে।'

সের্গেই ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল, 'আস্থন না, আমার সদাগরের বেগম, আমাদের একটু খাইয়েই দিন না।'

ভৎসনা-ভরা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে তিয়োনা বললে, 'ছিঃ ! তুমি আবার কেন ? বিবেক বলে কি তোমার কোনো বস্তু নেই ?'

ছোকরা কয়েদী গর্দিউশ্কা তার সাহায্যে নেমে বললো, 'সত্যি, এসব ভালো হচ্ছে না।'

'ওর সম্বন্ধে তোমার বিবেকে না বাধলেও, অস্ত্র আর পাঁচজনের সামনে তোমার হায়া-শরম থাকা উচিত।'

সের্গেই তিয়োনার দিকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'তুই মাগী বিশ্বতোষক ! তুই আর তোর বিবেক ! তুই কি সত্যি ভাবিস ওর জন্তে আমাকে আমার বিবেক খোঁচাবে ? কে জানে, আমি আদর্শেই তাকে কখনো ভালোবেসেছিলুম কি না, আর এখন—এখন তো সোনেংকার ছেঁড়া চটিজুতোটি পর্যন্ত ঐ চামড়া-ছোলা বেড়ালটার জঘন্য মুখের চেয়ে আমার ঢের বেশী ভালো লাগে। কিছু বলছো না যে ? শোনো, আমি কি বলি। সে বরঞ্চ ঐ ঝাঁকামুখে গর্দিউশ্কাটার সঙ্গে পীরিত করুক ; কিংবা—' এবারে সে সম্ভর্ণপে চতুর্দিক দেখে নিয়ে হিজড়েপানা, ফেল্টের জোকা-পর্য, মাথায়-ঝুঁটিদার-মিলিটারী-টুপিওলা, কয়েদীদের ঘোড়-সওয়ার অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তার চেয়েও ভালো হয় যদি দলের ঐ বড় অপিসারের সঙ্গে জুটে যায়—আর কিছু না হোক ঐ জোকার নিচে সে যুক্তিতে ভিজবে না।'

আবার সোনেংকার গলা ছোট্ট একটি ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'আর, তখন সবাই তাকে অপিসারের বীবী বলে ডাকবে।'

কোড়ন দিয়ে সের্গেই বললে, 'একদম খাঁটি কথা...আর এক জোড়া মোজার জন্ত তার কাছ থেকে পয়সা যোগাড় করাটা হবে ছেলে-খেলা।'

কাভেরীনা আত্মপক্ষ সমর্থন করল না ; সে আরো স্থির অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডেউগুলোর দিকে, শুধু তার ঠোঁট ছুটি নড়ছে। সের্গেইয়ের

জঘন্না কুবাকোর ভিতর দিয়ে তার কান্নে আসছিল নদীর উত্তাল তরঙ্গের জ্বলন্ত-বিজড়নের বিক্ষোভিত ধ্বনি, যন্ত্রণাসূচক আর্তরব। হঠাৎ একটা ঢেউ বিরাট হাই তুলে ভেঙে পড়ার সময় তার মাঝখানে কাতেরীনার সামনে দেখা দিল বরিস্ তিমোতেইয়েভিচের বিবর্ণ মুখ, আরেকটার মাঝখান থেকে উঁকি মেয়ে তাকালো তার স্বামী, তারপর সে ফেদিয়াকে কোলে নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ছলতে লাগলো—ফেদিয়ার অবস্থা মাথা ঢলে পড়েছে। কাতেরীনা তার দেবতার উদ্দেশে কোনো প্রার্থনা স্বরণে আনবার চেষ্টা করে ঠোট নাড়ালো, কিন্তু ক্ষীণস্বরে বেরিয়ে এল, ‘তোমাতে আমাতে দুজনাতে কত না দীর্ঘ শরৎ-হেমন্তের রাত কাটিয়েছি পাশাপাশি বসে, তোমাতে আমাতে কত না আনন্দে সময় কাটিয়েছি কত না হেলাফেলায় ; এই বিরাট বিশ্ব থেকে তোমাতে আমাতে মানুষ ওপারে পাঠিয়েছি নিষ্ঠুর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে।’

কাতেরীনা লুভন্না কাঁপছিল। তার দৃষ্টি এদিক ওদিক ছুটোছুটি ছেড়ে ক্রমেই একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ হয়ে আসছিল। সে দৃষ্টি পাগলিনীর মত। দু-একবার তার হাত দু’খানি মহাশূত্রের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে উঠে আবার পড়ে গেল। আরেক মিনিটকাল অতীত হল—হঠাৎ তার সমস্ত শরীর সামনে পিছনে ছলতে আরম্ভ করলো ; একবার এক মুহূর্তের তরেও তার দৃষ্টি কালো একটা ঢেউয়ের থেকে না সরিয়ে সে সামনের দিকে নিচু হয়ে সোনেংকার পা দু’খানি চেপে ধরে এক ঝটকায় ভেলার পাশ ডিঙিয়ে তাকে স্কন্ধ নিয়ে ঝাঁপ দিল নদীর তরঙ্গে।

বিশ্বয়ে সবাই যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

একটা ঢেউয়ের চূড়ায় কাতেরীনা লুভন্না দেখা দিয়ে আবার তলিয়ে গেল ; আরেকটা ঢেউ সোনেংকাকে তুলে ধরলো।

‘নৌকোর আঁকশিটা ! নৌকোর আঁকশিটা ছুড়ে দাও !’—ভেলা থেকে সমস্বরে চিৎকার উঠলো।

লম্বা দড়িতে বাঁধা নৌকার ভারী আঁকশিটা শূত্রে ঘোরপাক খেয়ে জলের উপর পড়ল। সোনেংকা আবার জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ভেলার পিছনকার স্রোতের টানে জলের নিচে অদৃশ্য অবস্থায় ক্রান্তবেগে পিছিয়ে পড়ে সোনেংকা দু সেকেন্ড পরে আবার উপরের দিকে তার দু’বাহু উৎক্ষেপ করলো ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা আরেকটা ঢেউয়ের উপরে প্রায় কোমর পর্যন্ত জলের উপর তুলে সোনেংকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—দুট বর্ষা ঘেরকম ক্ষুদ্র মৎস্ত-শাবকের ক্ষীণ প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তাকে ভেদ করে চেপে ধরে।

দু’জনার কেউই আর উপরে উঠলো না।

ଦୁ-ହାରୀ

নূর-ই-চশ্ম

শ্রীমান মৈয়দ জগলুল আলীর

করকমলে—

দু-হারা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বরোদার বিখ্যাত মহারাজা সয়াজী রাওয়ের কাছে আমি চাকরি নিয়ে যাই। শহরের আকার ও লোকসংখ্যা গুজরাতের অন্যান্য শহরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু স্বাধীন রাজ্য বলে ছোটখাটো মিউজিয়াম, তোষাখানা, চিড়িয়াখানা, রাজপ্রাসাদ, পালপরেবে গাওনা-বাজনা এবং আর পাঁচটা জিনিস ছিল বলে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পাশের ধনী শহর আহমদাবাদের তুলনায় এর আপন বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজ আর আমার ঠিক মনে নেই, মহারাজা নিজে মদ না খেলেও তাঁর ক'টি ছেলে দিবারাত্র বোতল সেবা করে করে বাপ-মায়ের চোখের সামনে মারা যান। তাঁদের মদ খাওয়া বন্ধ করার জন্ত কিছুদিনের তরে তিনি তাবৎ বরোদা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ড্রাই করে দেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফলোদয় হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাকি ছিলেন একমাত্র ধৈর্যশীল রাও। একেও সাদা চোখে বড় একটা দেখা যেত না।

মহারাজার বড় ছেলের ছেলে—তিনিই তখন যুবরাজ—প্রতাপসিং রাওও প্রচুর মত্তপান করতেন—এ নিয়ে বৃদ্ধা মহারাজার বড়ই দুঃখ ছিল—কিন্তু নাতি তখনো দু'কান কাটা হয়ে যান নি। রাজা হওয়ার পর তিনিও সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে গেলেন এবং ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আকাট মুখ' ইয়ারবজীর প্ররোচনায় ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন! তিনি গদীচ্যুত হওয়ার পর তাঁর ছেলে ফতেহ্ সিং রাও মহারাজা উপাধি পান—এবং বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত বলে অনেকেই তাঁকে চেনেন। শুনেছি, মানুষ হিসেবে চমৎকার।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা।

বৃদ্ধা মহারাজার মত্তের প্রতি অনীহা ছিল বলে বরোদা শহরে সংঘর্মের পরিচয় পাওয়া যেত—বিশেষ করে যখন অন্যান্য নেটিভ স্টেটে মত্তপানটাই সবচেয়ে বড় রাজকার্য বলে বিবেচনা করা হত, ও প্রজারাও যখন রাজাদর্শ অম্লকরণে পরাভূত ছিল না।

কিন্তু বৃদ্ধা মহারাজা বিস্তর বিলাতক্ষের্তা যোগাড় করেছিলেন বলে প্রায়ই কারো না কারো বাড়িতে পার্টি বসত। দু-এক জায়গায় যে মদ নিয়ে বাড়াবাড়ি হত না, সে কথা বলতে পারি নে। তবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো গৃহকর্তার আপন সংঘর্মের উপর।

এরই দু-একটা পার্টিতে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভুল বললুম, পরিচয় হয়। কারণ এ রকম স্বল্পভাষী লোক আমি জীবনে কমই দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি চুপ করে বসে থাকতেন এক পাশে, এবং অতিশয় মনোযোগ সহকারে ধীরে ধীরে গেলাসের পর গেলাস নামিয়ে যেতেন। কিন্তু বানচাল হওয়া দূরে থাক, তাঁর চোখের পাতাটিও কখনো নড়তে দেখি নি। আমি জানতুম, ইনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছর দশেক পূর্বে ডক্টরেট পাশ করে বরোদায় ফিরে এসে উচ্চতর পদে বহাল হন। আমিও বন্ থেকে বছর তিনেক পূর্বে পাশ করে আসি ও তিনি যে-সব গুরুর কাছে পড়াশোনা করেছিলেন আমিও তাঁদের কয়েক-জনের কাছে বিতর্জান করার চেষ্টা করি। আমি তাই আশা করেছিলুম তিনি অস্তুত আমার সঙ্গে দু-চারিটি কথা বলবেন—বন্ বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর সহপাঠী, তাঁর আমার উভয়ের গুরু, রাইন নদী, শহরের চতুর্দিকের বন-নদী-পাহাড়ের পিকনিক নিয়ে তিনি পুরানো দিনের স্মৃতি ঝালাবেন, নিদেন দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। আমি দু-তিনবার চেষ্টা দিয়ে দেখলুম, আমার পক্ষে তিনি বন্ থেকে পাশ না করে উত্তর মেরু থেকে পাশ করে থাকলে একই ফল হত। সাপের খোলসের মত তিনি বন্ শহরের স্মৃতি কোন্ আন্তাকুড়ে নিবিকার চিন্তে ফেলে এসেছেন। আমি আর তাঁকে ঘাঁটালুম না।

এর পর কার্খোপলক্ষে আমি এক-আধবার তাঁর দফতরে যাই। এক্ষেত্রেও তদ্বং। নিতাস্ত প্রয়োজন হলে বলেন ইয়েস, নইলে জিভে ক্লোরোফরম মেখে নিয়ে নিশ্চুপ।

বাড়ি ফিরে এসে তাঁর ধীসিস্থানা ঘোগাড় করে নিয়ে পড়লুম। অত্যাংকুষ্ট জর্মনে লেখা। নিশ্চয়ই কোনো জর্মনের সাহায্য নিয়ে। তা সে আমরা সবাই নিয়েছি এবং এখনো সর্ব অজর্মনই নিশ্চয়ই নেয়, কিন্তু ইনি পেয়েছিলেন সত্যাকারের জউরির সাহায্য। তবে তিনি এখন কতখানি জর্মন বলতে এবং বুঝতে পড়তে পারেন তার হাদিস পেলুম না। কারণ বরোদায় আসে অতি অল্প জর্মন, তারাও আবার ইংরিজি শেখার জগ্না তৎপর। তরুপরি তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে দেখা হলে এবং সে যদি জর্মন না জানে তবে তার অজানা ভাষায় কথা বলাটা বেয়া-দবিও বটে। এতাবং হয়তো তাই শ্রীযুত কাণের সামনে জর্মন বলার কোনো অনিবার্ধ পরিস্থিতি উপস্থিত হয় নি।

এর পরে আরো দু' বৎসর কেটে গেছে ঐ একই ভাবে। তবে ইতিমধ্যে আমার সর্বজ্ঞ বন্ধু পার্সী অধ্যাপক সোহরাব ওয়াডিয়া আমাকে বললেন, আপন অন্তরঙ্গ জাতভাইদের সঙ্গে নিভূতে তিনি নাকি জিতটাতে লুক্সেমবুর্গ ডেল ডেল

দেন এবং তখন তাঁর কথাবার্তা নাকি flows smoothly like oil, বসনার উপর অগ্নিতর তাঁর সংঘম অবিশ্বাস্য।

এই দু' বছর কাটার পর আমার হাতে ফোকটে কিঞ্চিৎ অর্থ জমে যায়। দয়াময় জানেন সেটা আমার দোষ নয়। সে যুগে বরোদায় খরচ করতে চাইলেও খরচ করার উপায় ছিল না। ওদিকে জার্মানিতে হিটলারের নাচন-কুদন দেখে অস্তিত্ব আমার মনে কোনো সন্দেহইল না, তাঁর ওয়াল্টস্ নাচ এবারে জার্মানির গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরেও গড়াবে। এবং সেটা আকছারই গড়ায় প্রতিবেশী ফ্রান্সের আঙ্গিনায়। দুই দেশেই আমার বিস্তার বন্ধ। এইবেলা তাহলে তাদের শেষ দর্শনে যাই। ১৯১৮ সালে জার্মানরা আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে ও রণাঙ্গনে গ্যাসও চালায়। এবারে শুরুই হবে ওসব দিয়ে—অনেক দূরপাল্লার বোমারু এবং জঙ্গী বিমান নিয়ে, তীব্রতর বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে। ধুনুয়ার শেষ হলে আমার ক'জন বন্ধু যে আস্ত চামড়া নিয়ে বেরিয়ে আসবেন বলা কঠিন।

১৯৩৮-এর গরমিকালে ভেনিস মিলান হয়ে বন্ শহরে পৌঁছলুম। জাহাজে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পাই নি। প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে যায় এক ফ্রেঞ্চ ইণ্ডোচায়নার তরুণীর সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী। 'অপূর্ব' বললুম ভেবেচিন্তেই। আমার নিজের বিশ্বাস—এবং আমার সে-বিশ্বাসে আমার এক বিশ্বপর্ঘটক বন্ধু সোৎসাহে সাথ দেন—দোআসলা রমণীরা সৌন্দর্যে সব সময়ই খাঁটিকে হার মানায়। পার্টিশনের পরের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু তার পূর্বে কলকাতার ইলিয়ট রোড, ম্যাকলাউড স্ট্রিটের যে অংশে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুন্দরীদের হাট বসতো—থারাপ অর্থে নেবেন না—সে রকমটা আমি প্যারিস ভিয়েনা কোথাও দেখি নি।

কিন্তু এ তো গেল আর্যে আর্যে সংমিশ্রণ। কিন্তু ইণ্ডোচায়নায় ফ্রেঞ্চ আর্য রক্ত ও চীনা মঙ্গোলিয়ান রক্তে সংমিশ্রণ। এ জিনিস আমার কাছে 'অপূর্ব' বলে মনে হয়েছিল। শুধু আমার কাছে নয়, অন্ত্র অনেকেরই কাছে। কিন্তু হলে কি হয়, পানির দেবতা বদর পীর আমার প্রতি বড়ই মেহেরবাণী ধরেন—সপত্নদের কেউই একবর্ণ ফরাসী বলতে পারেন না। আমি যে অত্যন্তম ফরাসী বলতে পারি তাও নয়। কিন্তু কথায় আছে, 'শয়তানও বিপদে পড়লে মাছি ধরে ধরে খায়।' তরুণী যাবেন কোথায়! জাহাজে অবশ্য দু-একটি পাড় টুরিস্ট ছিলেন যারা ফরাসী জানেন, কিন্তু পাড় টুরিস্ট হতে সময় লাগে—বসলটা ততদিন কিছু চূপ করে দাঁড়িয়ে যাত্রাগান দেখে না—পাড় টুরিস্ট হয় বুড়ো-হাবড়া। ওদিকে লজ্জাযিত আছে, 'বৃদ্ধার আলিঙ্গন অপেক্ষা তরুণীর পদাঘাত জেয়।'।

প্রবাদটা উঠে দিক থেকেও আকছারই খাটে। আমার তখন তরুণ বয়স, তহপরি আমি বাঙলা দেশের লোক—গায়ে বেশ কিছুটা চীনা-মকোল রক্ত আছে। তরুণীর সেটা ভারী পছন্দ হয়েছে—বলতেও কষ্ট করলেন না।

আমার তখন এমনই অবস্থা যে ওঁর সঙ্গে পৃথিবীর অল্প প্রান্ত অবধি যেতে পারি। অবশ্য জানি, পৃথিবীটা গোল—আবার মোকামে ফিরে আসবো নিশ্চয়ই, এই বা ভরসা।

ভেনিস পৌঁছে জানা গেল, এ জাহাজ পৃথিবীর অল্প প্রান্ত অবধি যায় না। ইনি শুধু মাকু মারেন ইতালি ও বোসাইয়ের মধ্যখানে। আমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছিল গভীর, কিন্তু ব্যাডমিণ্টনের শাটল কক্ হতে যতখানি প্রেমের প্রয়োজন ততখানি তখনো হয়ে ওঠে নি। আসলে সব কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল সফরটা তেরো দিনের ছিল বলে। তেরো সংখ্যাটা অপয়া। বারো কিংবা চোদ্দ দিনের হলে হয়তো একটা হেস্টনেস্ট হয়ে যেত। ভেনিস বন্দরে সজল নয়নে আমরা একে অন্তের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আমার যেসব সপত্নী (আজকের দিনের ভাষায় পুংসতীন) ফরাসী জানতো না বলে বিফল মনোরথ হয়েছিল তাদের মুখে পরিতৃপ্তির স্মিতহাস্য ফুটে উঠেছিল। বিচ্ছেদাগর মশাই নাকি মাহুঘের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে উল্লাস বোধ করতেন; জানি নে তিনি কখনো এমন হাসি দেখেছেন কি না যেটা দেখলে মাহুঘের মাথায় খুন চাপে।

ব্রেমার পাস, অষ্ট্রিয়া হয়ে জার্মানিতে ঢুকলুম। বন্ শহরে পৌঁছলুম সন্ধ্যার সময়।

বন্ প্রাচীন দিনের গলি-ঘুঁচির শহর। একে আমি আপন হাতের উন্টো পিঠের চেয়েও ভাল করে চিনি। মালপত্র হোটেলের নামিয়ে বেরিয়ে পড়লুম প্রাচীন দিনের সন্ধ্যানে।

ওই তো সামনে হান্সেন্ রেস্টোরাঁ। দেখি তো, আমার দোস্ত বুড়ো গুয়েটার হান্স্ এখনো টিকে আছে কি না। যেই না ঢোকা, হান্সের সঙ্গে প্রায় হেড্-অন্ কলিশন। বুড়ো হান্স্ বাজিকর। দু-হাতে সে একসঙ্গে পাঁচ প্লেট—দু-হাতে চার প্লেট, পঞ্চমটা এই চারটির মধ্যখানে, উপরে—সুপ রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে তার চিরপ্রচলিত পদ্ধতিতে নিয়ে আসছিল। কোনোগতিকে সামলে নিয়ে ছকার দিলে, ‘ওই রে, আবার এসেছে সেই কালো শয়তানটা!’ আমি বললুম, ‘তোমার জান নিতে।’ ‘হিটলার তোমার জান নেবে—তুই ইহুদি!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সেই লোকটার কথা ভাবলুম, যে ছুঃখ করে বলেছিল, ‘হায় মা, টাক তো দিলি, কিন্তু “ক”-এর সঙ্গে “আ”কারটা দিতে ভুলে গেলি।’ আমি বললুম, ‘ইহুদির কালো চুল দিলি, মা, কিন্তু তার পকেটের রেস্তাটা দিতে

ভুলে গেলি।’ হান্সকে শুধালুম, ‘তোমার ডিউটি কটা অবধি?’ ‘নটা।’
‘তাহলে “কাইজার কালে” এসো নটায়।’ ‘কেন? আমেরিকায় পয়সাওলা কাকা
মারা গেছে নাকি?’ ‘না, কোলারে।’ ‘সে আবার কোথায়?’ ‘ভারতবর্ষে
সেনার খনি।’ ‘ওঃ! তাহলে একটা গোল্ড-ডিগার সঙ্গে নিয়ে আসবো।’

‘গোল্ড-ডিগার’ মানে যে-সব খাবহুং মেয়ে প্রেমের অভিনয় করে আপনার
মনি-ব্যাগটি ফাঁকা করতে সাহায্য করে। আপনারই উপকারার্থে। পোকা
লাগার ভয়ে সেটাতে বাতাস খেলাতে চায়।

গোরস্তানে ঢুকলে আমরা চেনা লোকের গোরের সন্ধান করি; অচেনা
লাইব্রেরিতে ঢুকলে চেনা লেখকের বই আছে কিনা তারই সন্ধান করি প্রথম।
বন্ শহর নতনত্ব অত্যন্ত অপছন্দ করে; তৎসঙ্গেও হু-চারটে নতন রেস্টোরাঁ
কাফে জন্ম নিয়েছে। সেগুলো তদারক করার কণামাত্র কোঁতুহল অহুভব করলুম
না। কে বলে মাহুশ নতনত্ব চায়?

কুকুর যে রকম পথ হারিয়ে ফেললে আপন গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাড়ি ফেরে,
আমিও ঠিক তেমনি সাত দিন ধরে আজ ভেহুসবের্গ, কাল গোডেনসবের্গ, পরশু
জৌবেনগেবের্গে, পরের দিন রাইনে লঞ্চ-বিহার করে করে আপন প্রাচীন দিনের
গন্ধ খুঁজে খুঁজে কাটালুম; আর শহরের ভিতরকার গলি-ঘুঁচির রেস্টোরাঁ-বারের
তো কথাই নেই।

অষ্টম দিনে ড্যামলডর্ফে আমার প্রাচীন দিনের সতীর্থ পাউলকে ট্রাঙ্ক করলুম।
প্রথমটায় সে একচোট গালাগালি দিলে আমি কেন আগে জানাই নি। আমি
বললুম, ‘কেন? বেতার তো আমার টুরের খবর প্রতিদিন বুলেটিনে ঝাড়ছে।’

শুধালে, ‘কোন্ বেতার? দক্ষিণ মেরুর?’

‘না, কন্সান্ট্রেশন ক্যাম্পের।’

‘এই! চুপ চুপ!’

‘না রে না, ভয় পাস নি। তোদের ফ্যুরারের সঙ্গে আমাদের এখন খুব
দোস্তী। তিনি গোপনে আমাদের হু-একজন বেসরকারী নেতাকে শুধিয়েছেন,
তিনি যদি ব্রিটন আক্রমণ করেন তবে ভারতীয়েরা তার মোকা নিয়ে ইংরেজের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কি না।’

‘থাক্ থাক্। আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে।’

আমি বললুম, ‘হাইল হিটলার।’

রিসীভার রাখার এক মিনিট যেতে না যেতে টেলিফোন বাজলো। রিসীভার
তুললুম। অপর প্রান্ত থেকে অহুরোধ এল বামাকর্থে, ‘আমি কি ডক্টর স্নায়েরের

সঙ্গে কথা বলতে পারি ?’

‘কথা বলছি।’

‘আমি ট্রান্সকল দফতর থেকে কথা বলছি। খানিকক্ষণ আগে আপনি ড্যাসলডফে ট্রান্সকল করেছিলেন না ?’

সর্বনাশ! পাউলের ভয় তাহলে অমূলক নয়। নিশ্চয়ই নাৎসি স্পাই। আমাদের কথাবার্তা ট্যাপ করেছে। ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, ‘হ্যাঁ।’

‘আপনি ইণ্ডিয়ান ?’

‘কি করে—’

‘না, না, মাফ করবেন—আপনার জার্মান উচ্চারণ খুবই খাঁটি, কিন্তু কি জানেন, আমি ট্রান্সকল একসূচক্কে কাজ করি বলে নানান দেশের নানান ভাষা নানান উচ্চারণের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শুধু কণ্ঠস্বর নিয়ে সব-কিছু বুঝতে হয় বলে অল্প দিনের ভিতরেই এ জিনিসটা আমাদের আয়ত্ত হয়ে যায়।’

আশ্চর্য নয়। মাহুশ তার মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য বিদেশী ভাষা বলার সময় আপন অজ্ঞানতে প্রকাশ করে ফেলে আর ওকীবহাল ব্যক্তি সেটা ধরে ফেলতে পারেন। শুনেছি লণ্ডনের কোন্ এক আর্ট একাডেমির অধ্যাপক যে কোনো ছবি দেখেই বলে দিতে পারতেন, কোন্ দেশের লোক এটা এঁকেছে। একই মডেল দেখে দেড়শটি ছেলে স্কেচ করেছে; তিনি দ্বিবা বলতে পারতেন, কোনটা ইংরেজের, কোনটা চীনার, আর কোনটা ভারতীয়ের। এবং যদিও মডেলের মেয়েটি ইংরেজ তবু সব চাইতে ভাল এঁকেছে ইণ্ডিয়ান। মনকে এরই স্বরণে সাস্তনা দিলুম, তবে বোধ হয় আমার জার্মান উচ্চারণ জার্মানদের চেয়েও ভাল।

অনেক ইতিউতি করে নারীকণ্ঠ বললে, ‘আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বার বার ক্ষমা চাইছি, আমি কি পাঁচ মিনিটের জন্তু আপনার দর্শন পেতে পারি ? আমার একটু দরকার আছে। সেটা কিন্তু জরুরী নয়; আপনার যেদিন যখন সুবিধে হয়।’

তাড়াতাড়ি বললুম, ‘পাঁচ মিনিট কেন—পাঁচ ঘণ্টা নিন। আমি এখানে ছুটিতে। দিন ক্ষণ আপনিই ঠিক করুন।’

‘কাল হবে ? আমার ডিউটি বিকেল পাঁচটা অবধি। আপনার হোটেলের পাশেই তো ক্যাফে “হুফ্‌স্লাগ্”। সেখানে সাড়ে পাঁচটায় ? আমি আপনাকে ঠিক চিনে নেব। বনু শহরে আপনিই হয়তো একমাত্র ইণ্ডিয়ান।’

পরদিন ক্যাফের মুখেই একটি মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, ‘গুটনট্যাং! হের সায়েন্স! !’

আমি বললুম, 'গুট্‌নটাক্স, ফ্রাইন—'

এস্থলে প্রথম পরিচয়ে আপন নাম বলা হয়। ফ্রাইন (কুমারী, মিস্) কি একটা অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। কিন্তু নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে এস্থলে ছ'বার প্রশ্ন করা—বিশেষ করে মহিলাকে—আদব-দ্রবস্ত নয়।

দেহের গঠনটি ভারী সুন্দর, আটসাঁট, দোহারী। প্রলম্বিত বাহু দুখানি এমনি সুডোল যে, মনে হয় যেন দু'গুচ্ছ রজনীগন্ধা। রাস্তার উজ্জল আলোতে দেখছিলুম বলে লক্ষ্য করলুম কনুইয়ের কাছে মণি-খনির মত দুটি টোল। গোটা দেহটি যেন রসে রসে ভরা। শুধু দেহটি দেখলে যে কেউ বলবে, মধুভরা পূর্ণ যুবতী।

কিন্তু মুখটির দিকে তাকানো মাত্র যে-কোনো মানুষের মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলে যাবে। ব্লাউজের গলার বোতাম থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল পর্যন্ত—মনে হল এ যেন অগ্নি বয়সের ভিন্ন নারী। মুখের চামড়ায় এক কণা লাভণ্য এক কাঁচা মৃগতার তেল নেই। গলার চামড়া পর্যন্ত বেশ-কিছুটা খুলে পড়েছে। সিকি পরিমাণ চুলে পাক ধরেছে। আর চোখ দুটি—সেগুলোর যেন দর্শনশক্তিও হারিয়ে গিয়েছে—জ্যোতিহীন, প্রাণহীন। এর বয়স কত হবে?—শুধু যদি মুখ থেকেই বিচার করতে হয়? আর সে কী বিষয় মুখ! বয়স বিচারের সময় সেই বিষয়টাই 'তো হবে প্রধান সাক্ষী—জ্যোতিব্রষ্ট চক্ষুতারকার চেয়েও কণ্ঠদেশের লোলচর্মের চেয়েও।

ইতিমধ্যে আমরা কাফেতে ঢুকে আসন নিয়েছি। মহিলাটি—না যুবতীটি, কি বলবো? (সেই যে কালিদাসের গল্পে বুড়ো স্বামীর ধড়ের সঙ্গে জোয়ান ভাইয়ের কাটা মৃগু জুড়ে দিয়েছিল এক নারী)—ইতিমধ্যে দাস্তানা খুলে নিয়েছেন। মুখের সঙ্গে মিলিয়ে বেরলো হাত দুখানা—রসে ফাটো-ফাটো দেহের সঙ্গে মিলিয়ে নয়—নির্জীব, কৌকড়ানো চামড়া; ইংরিজিতে বলে কোজ ফীট, কাকের পা। অতি কণ্ঠে নিজেই সামলেছিলুম।

বললেন, 'আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি।' অর্থাৎ তিনি বিল শোধ করবেন। অগ্নি সময় হলে এ বারতা আমার কর্ণকুহরে নন্দন-কাননের স্বর্ণোজ্জল মধুসিক্তন করতো। কিন্তু এই বিষয় মুখের সামনে আমার গলা দিয়ে যে কিছুই নামবে না। বললুম, 'আমি এখন এখানে পড়তুম—'

বাধা দিয়ে শুধোলেন, 'আপনিও পড়েছেন নাকি?'

এই 'ও'টার অর্থ কি?

আমি বললুম, 'তখন তো কোনো অবিবাহিত রমণীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাদের মধ্যে বেওয়াজ ছিল না।'

তার কণ্ঠটি ছিল এমনতেই ক্রীণ—এখন শোনালো মুম্বু প্রায়। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ব্যত্যয় সব সময়ই দুটো একটা থাকে। কিন্তু দয়া করে আপনি এসব গায়ে মাখবেন না। আমি আপনার অগ্নিয় কোনো কাজ করতে চাই নে।'

কাফেতে এ সময়ে জার্মানদের ইয়া ইয়া লাশ ভামিনীদের ভিড়। ওয়েস্টেস এক কোণে একটি খালি টেবিল দেখিয়ে দিল। বুঝলুম, মহিলাটি পূর্বাহ্নেই টেবিলটি রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, 'আপনি কি খেতে ভালবাসেন? চা নিশ্চয়ই। কিন্তু এদেশে যে চা বিক্রী হয় সে তো অখাদ্য। তবে আমার কাছে ভাল চা আছে। আমি লণ্ডন থেকে সেটা আনাছি।' ব্যাগ থেকে বের করে একটি ছোট্ট পুলিন্দা তিনি ওয়েস্টেসের হাতে তুলে দিলেন। সে কিছু বললো না বলে বুঝলুম, এ ব্যবস্থায় সে অভ্যস্ত।

আমাদের অর্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও ভাল ভাল কেক, স্ত্রান্ড্‌উইজ্, টার্ট উপস্থিত হল। বুঝলুম, এগুলো পূর্বের থেকেই অর্ডার দেওয়া ছিল।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের দেশের খুব বেশী ছাত্র জার্মানিতে পড়তে আসে না—কি বলেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্পই। তাও বেশীর ভাগ শিখতে আসে সায়েন্স আর টেকনিকাল বিদ্যা।'

একটু হেসে বললেন, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনি হিউম্যানিটিজের। আর বনু তো তারই জন্তু বিখ্যাত। তবে এখানে এসেছেন অল্প ভারতীয়ই। আপনারা যারা এসেছিলেন, ভারতে তাঁদের কোনো সম্ভাব আছে কি, যার মাধ্যমে একে অগ্নের সঙ্গে আপনারা যুক্ত থাকতে পারেন?'

আমি বললুম, 'না। এমন কি আমি এঁদের মাত্র দু-একজনকে চিনি। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—' বলে আমি চায়ে চুমুক দিলুম। তিনি বললেন, 'ডিক্রাগড থেকে দ্বারকা, কুলু থেকে কণ্ঠাকুমারী।' আমি তো অবাক! আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি অত ভীটেল জানলেন কোথা থেকে? এখানকার শিক্ষিত লোককে পর্বস্ত ইণ্ডার (ভারতীয়) আর ইণ্ডিয়ানার (রেড ইণ্ডিয়ান) এ দুয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে বলতে হয়।'

'এবং তার পরও কেউ কেউ আপনাকে শুধায়, আপনি ৎসেন্টাল আফ্রিকানার (সেন্ট্রাল আফ্রিকান) না জুড্ ইটালিয়ানার (সাউথ ইটালিয়ান)?'

‘আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘আপনি অন্তত জানলেন কি করে?’

‘পরে বলবো। কিন্তু আপনি ভারতে বন্-এর ছাত্রদের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন?’

‘ভারতের বুদ্ধিজীবীর প্রধান অংশ থাকেন কলকাতায়। সেখানে থাকলেও খানিকটা বোগহুত্র থাকে। আমি থাকি ছোট্ট বরোদায়—’

অক্ষুট শব্দ শুনে আমি গুঁর মুখের দিকে তাকালুম। দেখি, তাঁর পাংক্ত মুখে যে হু-ফোঁটা রক্ত ছিল তাও অন্তর্ধান করেছে। ভয় পেয়ে শুধালুম, ‘কি হল আপনার?’

টোক গিলে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, ‘ও কিছু না। আমি অনিভ্রায় ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েছি। এখানে বহু লোকের ভিড়। সব বন্ধ। আমি আমার অফিস-ঘরের জানলা শীত গ্রীষ্ম সব সময় খোলা রাখি।’

আমি বললুম, ‘তা হলে খোলায় চলুন।’ তারপর শুধালুম, ‘আপনার সহকর্মী অল্প মেয়েরা কিছু বলে না?’

প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেন নি। পরে বললেন, ‘ও। আমি এককালে টেলিফোন গাল্‌ই ছিলুম। এখন তারই বড় অফিসে কাজ করি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ। কিন্তু আগেরটাই ছিল ভালো।’

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমি বললুম, ‘আমার মনে হচ্ছে আপনি বেশী হাঁটাইটা করতে পারবেন না। তার চেয়ে চলুন, ওই যে প্রাচীন যুগের একথানা ঘোড়ার গাড়ি এখনো অবশিষ্ট আছে, তাই চড়ে রাইনের পাড়ে গিয়ে বসি।’

মাথা নেড়ে সাই দিলেন।

আন্তে আন্তে শুধোলেন, ‘গেলট্রনার যে স্বথের জর্মন অহুবাদ করেন সেইটের উপর নির্ভর করে যে একটি ইংরেজি অহুবাদ ভারতবর্ষ থেকে বেরোবার কথা ছিল, তার কি হল?’

আমি এবারে সত্যিই অবাক হলুম। গেলট্রনারের অহুবাদ অনবত্ত। গত একশ বছরে স্বথের সম্বন্ধে ইয়োরোপ তথা ভারতে যত গবেষণা হয়েছে গেলট্রনারের কাছে তার একটিও অজানা ছিল না, এবং অহুবাদ করার সময় যেখানে যেটির দরকার হয়েছে সেখানে সেইটে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ মহিলাটি যে অভিশয় সমীচীন ও সময়োপযোগী প্রস্তাবটির কথা বললেন সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতুম না। বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম, ‘কিন্তু আপনি এ সবের খবর পেলেন কোথায়?’

তিনি চুপ করে রইলেন। গাড়ি মন্থর গতিতে বেটোফেনের প্রতিমূর্তির

পাশ দিয়ে, ম্যান্‌স্টার গির্জা পেরিয়ে, হুনিভার্সিটি হয়ে রাইনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ি থেকে নেমে তাকিয়ে দেখি, মহিলার মুখ তখনো ফ্যাকাশে। প্রস্তাব করলুম, ‘ওই ক্যাফেটার খোলা বারান্দায় গিয়ে বসি, আর আপনি কিছু একটা কড়া খান।’ ওয়েটারকে বললুম কন্ডাক্ট নিয়ে আসতে।

দুই টোঁক কন্ডাক্ট খেয়ে যেন বল পেলেন। বললেন, ‘আমি এখনো অবসরমত কিছু কিছু ইংলিঞ্জির চর্চা করি। বছর বারো পূর্বে যখন আরম্ভ করি তখন পূর্ণোত্তমেরই করেছিলুম।’

তারপর আবার অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন। রাইনের জলের উপর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দু-একখানা মোটর বোট আসা-যাওয়া করছে মাত্র। বাতাস নিস্তব্ধ। এমনিতেই রাইনের সন্ধ্যা আমাদের বিষন্ন করে তোলে, আজ যেন রাইনের জলে চোখের জল ছলছল করছে।

মহিলাটি বললেন, ‘কাল থেকে ভাবছি, কি করে কথাটি পাড়ি।’

যে কোনো কারণেই হোক মহিলাটি যে বেদনাতুর হয়ে আছেন সে-কথা আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। বললুম, ‘আপনি দয়া করে কোনো সঙ্কোচ করবেন না। আমাধারা যদি কোন-কিছু করা সম্ভব হয়, কিংবা সুকুমাত্র আমাকে কিছু বলতে পেরে আপনার মন হালকা হয়—’

মানুষকে ক্রমাগত সান্ত্বনার বাক্য দিয়ে প্রত্যয় দিতে থাকলেই যে সে মনস্থির করতে পারে তা নয়; বরঞ্চ কথা বন্ধ করে দিলে সে আপন মনে ভাববার এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সুযোগ পায়। আমি বন্-বয়েল শহরের মাঝখানে রাইনের উপরের পাথরের মোটা মোটা ধামের তুলে-ধরা বিস্তীর্ণ স্পানওলা স্পন্দর সেতুটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। লোহার পুল কেমন যেন নদীর সঙ্গে খাপ খায় না—পাথর যেন জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, উভয়েরই রঙ এক।

হুনিয়াতে হেন তালা আবিষ্কৃত হয় নি যেটা কলেক্টরশলে, কখনো বা পশুবল প্রয়োগ করে, কখনো বা মোলায়েম আদরসোহাগ করে খোলা যায় না; ওদিকে আবার গেন্ডাপো, গুগপু এ সব-কটা পদ্ধতি এবং আরো মেলা নয়া নয়া কৌশল খাটিয়েও বহু মানুষের মনের তালা খুলতে পারে নি। এবং হঠাৎ অকারণে কেন যে সেটা খুলে যায় তার হৃদিস কন্‌ফেশনের পাজীসায়ের থেকে আরম্ভ করে আমাদের ঘোঁবনকালের টেগার্ট পাথওও সম্ভান পায় নি।

মহিলা ভিজ্জেন করলেন, ‘আচ্ছা বলুন তো, দময়ন্তী নিজাভর্গের পর দেখলেন নলরাজ নেই; তারপর তাঁর ইহজীবনে যদি নলের সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ না হত

তবে তিনি নল সম্বন্ধে বা আপন অদৃষ্ট সম্বন্ধে কি ভাবতেন ?

নলোপাখ্যানের উল্লেখে আমি আশ্চর্য হলাম না ! বেঁ রমণী গেলটনারের বেদান্তবাদের সঙ্গে স্থপরিচিতা, নলরাজ তো তাঁর নিত্যালাপী আত্মীয় !

আমি একটু ভেবে বললাম, ‘রসরাজও তো বৃন্দাবনে শ্রীমতীর কাছে ফিরে যান নি । তবু তো তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যয় ত্যাগ করেন নি । মহাত্মা উদ্ধব যখন বৃন্দাবন দর্শন করে মথুরা ফিরে এলেন তখন রসরাজ সব শুনে বলেছিলেন, “বিরহাগ্নি যদি তাঁর এতই প্রবল হয় তবে তিনি জলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যান নি কেন ?” কী বেদদয়ী প্রশ্ন ! কিন্তু শ্রীরাধা সেটা জানতেন বলে উদ্ধবকে বলতে বলে দিয়েছিলেন, তার অবিরাম অশ্রুধারা সেই অগ্নি বার বার নির্বাণিত করছে — “তমু জরি জাত জো ন অহুয়া চরত্ উধো”—যদুপতি শেষ প্রশ্ন শুধান, “আমার বিরহে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় নি কেন ?” এর উত্তরও উদ্ধব শিখে নিয়েছিলেন, “আপনি একদিন না একদিন বৃন্দাবনে ফিরবেন এই প্রত্যয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে ।”

দময়ন্তী নিশ্চয়ই প্রত্যয় ছাড়েন নি ।

মহিলা বললেন, ‘তুলনাটা কি ঠিক হলো ? শ্রীরাধা তো মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পেতেন, তিনি কংস বধ করেছেন, তিনি কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপনার্থ দৌত্য করেছেন, জনসমাজের বৃহত্তর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন—এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পেতেন—’

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘এবং ঋক্মিণীকে—সে কুমারী আবার শিশুপালের বাগদস্তা বধু—বিয়ে করেছেন, তার পর সত্যভামাকে, সর্বশেষে ভান্সুকী—’

আমি নিজের থেকে থেকে গেলে পর মহিলাটি বললেন, ‘শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ আপনাই তুলেছিলেন ; আমি তুলি নি ।’

আমি বললাম, ‘আপনি দময়ন্তীর কথা তুলেছিলেন—ভগবান করুন, আপনার নল যেন—’

তিনি মাথা নাড়তে আমি চুপ করে গেলুম ।

বললেন, ‘আপনি গোডেসবের্গ চেনেন ?’

আমি বললাম, ‘বা রে, সেখানে তো আমি এক বছর বাস করেছি ।’

‘প্রক্লেসর কিফেল সেখানে বাস করতেন ; আমরা ছিলাম তাঁর প্রতিবেশী । আমি প্রতিদিন বন শহরে আসতুম চাকরি করতে । হঠাৎ একদিন দেখি তার পয়ের স্টপেজ হোথু-ক্রয়েৎস একজন বিদেশী উঠলেন । মুখখানা বিবল । সেদিন আর কিছু লক্ষ্য করি নি । কাইজার প্রাৎসের স্টপেজে উনিও নামলেন । আমি

বইয়ের দোকান রোয়াশাইটে কাজ করতুম। আপন অজান্তেই লক্ষ্য করলুম বিদেশী যুনিভার্সিটিতে ঢুকলেন।

তিন-চার মাস প্রায় রোজই একই ট্রামে যেতুম, ভদ্রলোকের প্রতি আমার কোনো কৌতূহল ছিল না কিন্তু লক্ষ্য করলুম, বিদেশীর বিয়ল ভাব আর কাটলো না।

তারপর একদিন তিনি আমাদের দোকানে এসে ঢুকলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। ভাবলুম এ আবার কোন্ দেশের লোক? এত লাজুক কেন?

ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় এক জার্মান ইণ্ডলজিস্টের বইয়ের ইংরিজি অম্ববাদ চাইলেন। আমি একটু আশ্চর্য হলুম: জার্মানিতে বসে জার্মানের লেখা বই পড়লেই হয়। বললুম, “এটা লগুন থেকে আনাতে হবে।” তারপর কিন্তু-কিন্তু করে বললুম, “মূল জার্মানটা পড়লেই তো ভাল হয়।”

তিনি বললেন, “আমার আছে, কিন্তু বুঝতে বড় অসুবিধা হয়।” সঙ্গে সঙ্গে বইখানা পোর্টফোলিয়ো থেকে বের করে কাউন্টারের উপর রাখলেন।

আমি তখনো ইণ্ডলজির কিছুই জানতুম না—নামটাম টুকে নিয়ে তাঁকে দু-চারখানা ভাল অভিধান, সরল জার্মান বই, ব্যাকরণ দেখালুম। আমি ইংরিজি জানতুম বলে তাঁর ঠিক কোন্ কোন্টা কাজে লাগবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত সংপরামর্শ দিলুম। আমি যেটা দেখাই সেটাই তিনি কিনে ফেলেন। শেষটায় আমিই হেসে বললুম, “এগুলো শেষ করুন। এর পরের ধাপের বই আমি বেছে রাখবো।” টাকা দিয়ে বইগুলো নিয়ে যখন চলে গেছেন তখন দেখি তাঁর ইণ্ডলজির বইখানা কাউন্টারে ফেলে গেছেন। তা যান, কাল ট্রামে দিয়ে দিলেই হবে।

ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এই আমার প্রথম পাঠ। এবং এখানো সে বইখানা মাঝে মাঝে পড়ি। ভিণ্টারনিংসের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। এ বই দিয়ে আরম্ভ না করলে হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমার কৌতূহল অত্নুরেই মাঝা যেত।

ভিণ্টারনিংস লেখেন অতি সরল জার্মান; তাই আশ্চর্য হলুম যে বইয়ের মালিক এতদিনেও এতখানি জার্মান শিখে উঠতে পারেন নি কেন?

আমি চেপে গেলুম যে, ঠিক এই বইখানাই ভিণ্টারনিংস শান্তিনিকেতনে আমাদের পড়িয়েছিলেন।

আর পাঁচজন জার্মানের তুলনায় বিদেশীদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল কম। বইয়ের দোকানে কাজ করলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জাত-বেজাতের বই পড়া হয়ে যায়।

আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হয়ে গিয়েছিল—অনেকখানি—ওই করে।

কিন্তু এই লোকটির প্রতি কেমন যেন আমার একটু দয়া হল। তবু এটা ঠিক, আমি নিশ্চয়ই গায়ে পড়ে তাঁকে সাহায্য করতে যেতুম না। তবে এ-কথাও ঠিক, ভিক্টরিনিংসের বেদ অল্পক্ষেদে উষ্ম আবাহন এবং জুয়াড়ির মনস্তাপ দুটোই আমার কল্পনাকে এক অপূর্ব উত্তেজনায় আলোড়িত করেছিল। উষ্মস্তম্ভ লিরিক, রহস্তময়, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হল যে, ওই একই সময়ে অতিশয় নিদারুণ বাস্তব জুয়োখেলা ও জুয়াড়িভীষনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা একই সঙ্কল্পনে স্থান পেয়েছে। আমার বাবা ছিলেন গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। ইস্কুলে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে যা গ্রীক শেখে সেটা ম্যাট্রিক পাশের পরই তুলে যায়। আমার পিতা সেটা হতে দেন নি। এখন আমার ইচ্ছে হল সংস্কৃত শেখার। তাই তাঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করলুম। আমি তাঁর জন্ম ভিক্টরিনিংসের জার্মান থেকে ইংরিজি অম্মবাদ করে দিতুম, আর তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন।’

আমার মনে সর্বক্ষণ নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল, কিন্তু মহিলাকে বাধা দিলুম না।

ততক্ষণে কাফেতে উল্লাস, হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। জার্মান জনগণের বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। ঘড়ি ঘড়ি খবর আসছে, নাৎসি বিজয়-সেনানী কি ভাবে অস্ট্রিয়ার শহরের পর শহর দখল করে যাচ্ছে, তারা কি ভাবে সর্বত্র উদ্ভাষ অভিনন্দিত হচ্ছে।

আমি একটু মুচকি হেসে বললুম, ‘ভালুকও মাঝুষকে আলিঙ্গন করে শুনেছি, কিন্তু সে আলিঙ্গন—যাক্ গে।’

মহিলাটি একটু চমকে উঠলেন। বললেন, ‘এসব মস্তব্য আপনি সাবধানে করবেন। কি করে জানলেন, আমি নাৎসি নই?’

আমি হেসে বললুম, ‘জলবস্তুরলম্—আপনি তো সংস্কৃত জানেন। তার মানে যে-জন বেদ পড়েছে, সে-ই জানে বেদের আৰ্যধর্মের সঙ্গে নাৎসিদের এই “আর্যামি”র বড়কাটাইয়ের সূচ্যত্র পরিমাণ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আপনি চিন্তাবিক্ষেপ হতে দেবেন না। তার পরের কথা বলুন।’

একটু চিন্তা করে বললেন, ‘প্রথমে সাহচর্য, তারপর বন্ধুত্ব, সর্বশেষে প্রণয় হল আমাদের হুজনাতে।’

এবারে অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ‘তিন বছরের প্রশয়—তারপর দশ বছর ধরে আমি তাঁর কোনো খবর পাই নি। এই দশ বছর আমার একা একা

কেটেছে। এই দীর্ঘ তেরো বছরের কথা আপনাকে বলতে গেলে ক'মাস ক' বছর লাগবার কথা তার সামান্ততম অহুমান আমার নেই।

এই শেষের দশ বৎসর কি করে কেটেছে, এখন কি করে কাটছে সেটা বোঝাবার চেষ্টাও আমি করবো না। আর সেটা শোনাবার জন্যও আমি আপনার দর্শন কামনা করি নি। এই যে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা পেরিয়ে এলুম, এখানে পড়বার সময় ঠিক একশ বছর আগে, আমাদের সবচেয়ে সেরা লিরিক কবি হাইনে একটি চার লাইনের কবিতা লেখেন :

“প্রথমে আশাহত হয়েছি
ভেবেছিলাম হবে না বেদনা ;
তবু তো কোনো মতে সয়েছি
কি ক'রে যে সে-কথা শুখিয়ে না।”

তীব্র বেদনার তীব্র প্রকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন হাইনে বার বার, কিন্তু হার মেনে উপরের চতুর্দশটি রচন। একশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে লক্ষ লক্ষ নয়নারী সেগুলো পড়ছে—

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘আমাদের পোয়েট টেগোর তাঁর প্রথম বোঁবনে এক জর্মন মহিলার কাছ থেকে অল্প জর্মন শেখার পরই তাঁর গুটিদশেক কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেন। আপনি যেটি বললেন সেই চতুর্দশটিও তাতে আছে।’

‘প্রথম বোঁবনে তিনি কি শোক পেয়েছিলেন?’

‘তাঁর প্রাণাধিকা ভ্রাতৃত্ব আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সে-কথা আরেকদিন হবে। আমি নিজে কাপুরুষতম এসকেপিষ্ট ; তাই হুংথের কথা এড়িয়ে চলি। তার চেয়ে আপনাদের সেই তিন বছরের আনন্দের কথা বলুন।’

‘প্রথম বছর কেটেছে স্বপ্নের মত। স্বপ্ন যেমন চেনা-অচেনার মিশে যায়, হঠাৎ চেনা জিনিস, চেনা মানুষ মনে হয় অচেনা, আবার অচেনা জন চেনা, এ যেন তাই। তাঁকে যখন মনে হয়েছে এঁর সব কিছু আমার চেনা হয়ে গিয়েছে তখন হঠাৎ মনে হয়েছে যেন ইনি আমার সম্পূর্ণ অজানা জন। আবার কেমন যেন এক প্রহেলিকার সামনে অন্ধকারে ব্যাকুল হয়ে হাতড়াচ্ছি—মধ্যরাত্রে হঠাৎ তাঁর ঘুমন্ত হাত পড়ল আমার গায়ের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আমার চৈতন্ত্যে তখন বিশ্বব্যাপী মাত্র একটি অল্পভূতি—এই লোকটির মাঝেই আমার অস্তিত্ব, আমার অন্ত কোনো সত্তা নেই। গোডেসবর্গের পিছনে নির্জনে গভীর পাইন বনে সকাল থেকে পরের দিন তোরা

অবধি কাটিয়েছি একটানা, রাইনের ওপারে বরফ ভেঙে ভেঙে উঠেছি মার্গারেটেন হোহ অবধি, ফ্যান্সি বলে স্লাম্পনের পর স্লাম্পন থেমে আমি অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছি ডান্স-হলের সামনের ঘাসের উপর—তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বাড়িতে।’

কেন জানি নে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলুম, ‘উনি কখনো বে-একুতয়ার হতেন না?’

বললেন, ‘আশ্চর্য, আপনি যে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন! না, কখনো না। এখানকার পাঁড়দের সঙ্গে সমানে পাঞ্জা দিয়ে তাঁকে খেতে দেখেছি বছবার, চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়তো না। অথচ তিনি একাধিক বার আমাকে বলেছেন, তাঁর জানা মতে তাঁর সাত পুরুষের কেউ কখনো মদ খায় নি।’

কিন্তু প্রথম বছরের চেয়েও—অন্ততঃ আমার পক্ষে—মধুরতর আর গৌরবময় শেষের দুই বছর।

এক বৎসর ক্লাস আর সেমিনার করার পর অধ্যাপকের আদেশে তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর ডক্টরেট থীসিসের প্রথম খসড়া—অবশ্য ইংরিজিতে। মোটামুটি তিনি কি লিখবেন সে সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন।’

থেমে গিয়ে তিনি অত্যন্ত করুণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘ছি ছি। আপনি আমাকে এখনো চিনলেন না!’

‘চিনেছি বলেই চাইছি। এখন যা বলব, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, কাউকে বলবেন না।’

আমি তাঁর হাতে—সেই শুষ্ক, জরাজীর্ণ হাতে চাপ দিলুম।

‘প্রথম পরিচ্ছেদের কাঁচা খসড়া পড়ে আমি অবাক। একেবারে কিছুই হয় নি বললে অত্যাুক্তি হয়, কিন্তু এতে যে কোনো বাধাই নেই, বক্তব্য কোন্ দিকে যাচ্ছে তার কোনো নির্দেশ নেই—আছে গাদা গাদা ফ্যাক্টস, এবং তার মধ্যেও কোনো সিস্টেম নেই।’

কারণ ইতিমধ্যে আমি যে খুব বেশী সংস্কৃত শিখেছি তা নয়, তবে আপনি তো জানেন, জার্মান, ফরাসী এবং ইংরেজী, মাত্র এই তিনটি ভাষাতেই ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এত বই লেখা হয়ে গিয়েছে যে সেগুলো মন দিয়ে বার বার পড়লে, নোট টুকে মুখস্থ করলে কার সাধ্য বলে আপনি সংস্কৃত জানেন না! যেদিন তিনি আমার প্রথম তাঁর থীসিসের সাবজেক্ট—‘গুপ্তযুগের কালচারাল লাইফ’—বলেন সেদিন থেকেই আমি ঐ বিষয়ের উপর যা পাওয়া যায় তাই পড়তে আরম্ভ

করেছি, নোট টুকেছি, মুখস্থ না করেও যতখানি সম্ভব মনে রাখবার চেষ্টা করেছি। আর সংস্কৃত তো সঙ্গে সঙ্গে চলছেই। আপনি তো আমাদের সিস্টেম জানেন। তাই তিন মাস যেতে না যেতেই আমি ব্যাপিড্, রীডিং সিস্টেমে খানিকটা বুঝে কিছুটা না বুঝে কালিদাসের সব লেখা—এমন কি কালিদাসের নামে প্রচলিত অল্প জিনিসও পড়ে ফেলেছি। তবে আমার ব্যাকরণ জ্ঞান এখনো কাঁচা, যদিও গ্রীকের সাহায্যে শব্দতত্ত্বে আমার কিছুটা দখল আছে।

ওঁর ইংরিজিটা যে আমি জার্মানে অনুবাদ করবো সেটা তো ধরেই নেওয়া হয়েছিল। তারই অছিলা নিয়ে আমি সমস্তটা টেলে সেজে লিখলুম। পাছে তাঁর আত্মসম্মানে লাগে তাই বললুম, “তুমি এ-কাঠামোর উপর আরো ফ্যাক্টের কাদামাটি চাপাও, রঙ বোলাও।”

ইতিমধ্যে আমার বইয়ের দোকান আমাকে পাঠালো লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজে—আমাদের বইয়ের বাজার প্রসার করতে। তিনিও তাঁর প্রফেসরের কাছ থেকে ছুটি নিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে মাল-মশলার সন্ধানে যাবার জন্য।

সে সুযোগের অবহেলা আমি না করে আমাদের প্রকাশিত আর বিয়ল আউট অব প্রিন্ট কিছু কিছু বই নিয়ে দেখা করতে গেলুম লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজের ইণ্ডোলজি-অধ্যাপকদের সঙ্গে। তাঁরা আমায় ভারি খাতির করলেন, কেউ কেউ চায়ে ডিনারে নিমন্ত্রণও করলেন। আমি ঘুরে ফিরে শুধু গুপ্ত যুগের কালচারাল লাইফের দিকে কথার মোড় কেরাই। ওঁরা অকুপণ হৃদয়ে আপন আপন গবেষণার ফল বলে যেতে লাগলেন। একদিন এক অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে ছিলেন আরো দুজন ইণ্ডোলজির অধ্যাপক। আমি গুপ্ত যুগ টুইয়ে দিতেই লেগে গেল তিন পণ্ডিতে লড়াই। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই পরিষ্কার হয়ে গেল তিন জনার তিন খীসিস। একজন বললেন : গুপ্ত কেন, তার পরবর্তী যুগেরও সর্ব নাট্যের কাঠামো গ্রীক নাট্য থেকে নেওয়া। দ্বিতীয় জনের বক্তব্য : গুপ্ত যুগের চোন্দ্র আনা কৃষ্টির মূলে দ্রাবিড়। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের চোরাবালির ভিতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে গুপ্ত যুগে এসে নির্মল ত্বাহর্য হুদে পরিণত হয়েছে। আর তৃতীয় জনের মতে গুপ্ত যুগের বেশীর ভাগ পরবর্তী যুগের—গুপ্ত যুগের নামে পাচার হচ্ছে। যে রকম ওমর খৈয়ামের দু’শ বছর পরে রচনা বিস্তর চতুস্পদী তাঁর সঙ্কলনে ঢুকে গেছে।

ভোরের প্রথম বাস্ ধরে আমরা যে ঘর বাসার ফিরেছিলুম।

তার পূর্বে আমি সবিনয়ে শুধিয়েছিলুম, আমি তাঁদের বক্তব্যের কিছু কিছু

ব্যবহার করতে পারি কি না। তিনিজন একবাক্যে বলেছিলেন, “আলবৎ, নিশ্চয়, অতি অবশ্যই। এসব তো কমন নলেজ। তাই দয়া করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো না। আমাদের বদনাম হবে যে আমরা কমন নলেজ গবেষণা বলে পাচার করি।” একেই বলে প্রকৃত বিনয়।

বাসে বাসেই আমি যতখানি স্বরণে আনতে পারি শট্‌হাও টুকতে আরম্ভ করি। বাড়ি ফিরে বিছানা না নিয়ে যখন কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি তখন বন্ধু বিছানায় বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বেড্‌-টীর জুত ঘণ্টা বাজালেন।

অক্সফোর্ড কেমব্রিজও অধ্যাপকদের সাহায্য পেলুম।

তারপর বনে ফিরে এসে সেই সব বস্তু গুছিয়ে, খসড়া বানিয়ে ফেম্মার কপি টাইপ করে, তাঁর প্রোফেসরের মেরামতির পর সে অল্পঘায়া আবার টাইপ করে পরিপূর্ণ থীসিস তৈরী হল।’

আমি বললুম, ‘অর্থাৎ—’

তিনি ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ‘না, না, না। আপনি ভুল ইনফারেন্স করছেন। সংস্কৃত ভাষাটি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। হেন ব্যাকরণ নেই যার প্রত্যেকটি সূত্র, নিপাতন, আর্ষপ্রয়োগ তাঁর কর্তৃত্ব ছিল না। কঠিন কঠিন টেকস্ট ছবার না পড়েই তিনি অর্থ বের করে দিতে পারতেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিনি তাঁর অধ্যাপককে এই দুরূহ ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তাঁর থীসিসে যে অসংখ্য বস্তু মূল সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে তার অল্পবাদে তো কোনো ভুল পাবেনই না, আর সেগুলোই করেছে তাঁর বইখানাকে রিচ ইন্ টেকস্চার—সমৃদ্ধশালী। তাঁর কৃতিত্ব অনগ্রসারধারণ—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘আমি আপনার প্রত্যেকটি কথা মেনে নিচ্ছি।’

রমণীটি বড়ই সরলা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘বাঁচালেন। এসব কথা আমি এ জীবনে কাউকে বলি নি। এবং আরেকটা কথা, শুঁকে তো ভাইভাও দিতে হয়েছিল।’

আমি বললুম, ‘নিশ্চয়ই।’ ভাইভাতে কোন ক্লাস, আর রিটনে (অর্থাৎ) থীসিসে কোন ক্লাস পেয়েছিলেন সেটা আর শুধালুম না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

হঠাৎ মহিলাটি চমকে উঠে বললেন, ‘ছি ছি। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে; ওদিকে আপনার ডিনারের কথা আমি একবারও ভুলি নি। কোথায় যাবেন বলুন?’

আমি কিছু-কিছু করছি দেখে বললেন, ‘আমার ক্যাটে যাবেন? এখানেই,

বোনী দূরে না। গোডেসবের্গের সে-বাড়িতে আমি আর বাই না।’

আমি ইতিমধ্যে একাধিক বার লক্ষ্য করেছি যে মহিলাটি এখনো তাঁর ক্লাস্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁকে বাড়িতে শুইয়ে দেওয়াই ভালো।

মোড় নিতেই দেখি সেই প্রাচীন দিনের শেষ ঘোড়ার গাড়িখানা যেন আমাদের জন্তাই দাঁড়িয়ে। মহিলাটি যে-আমলের কথা বলছিলেন তখন এরও ছিল ভরা ঘোঁবন। আমি বললুম, ‘কি হে যাবে নাকি?’

টপ্‌হাট তুলে বাও করে বললে, ‘নিশ্চয়ই, শ্রর।’ ঘোড়াকে বললে, ‘চল্‌ বার্বা রস্‌লা—গোডেসবের্গ।’

আমি চৈচিয়ে বললুম, ‘না হে না—’

বললে, ‘সরি, শ্রর! এই বছর পাঁচেক পূর্বেও তো আপনাকে ফ্যান্সি ডান্স থেকে ভোরবেলা হোথায় নিয়ে গিয়েছিলুম! হা হ্‌হা, হা হ্‌হা, আপনি তখন ভারী জলি ছিলেন, শ্রর, নামবার সময় ঝপ করে আমার হাটটি কেড়ে নিয়ে হাওয়া। হা হ্‌হা—পরে আমার ওল্ড উম্মান বলে কি না আমি হাট বন্ধক দিয়ে বিয়ার খেয়েছি। হা হা হা হা! চল্‌, বার্বা রস্‌লা—’

মহিলাটি হেসে উঠলেন। তাঁর চেনা দিনের ভোলা দিনের দমকা বাতাস যেন হঠাৎ গলিটাকে ভরে দিয়ে সব শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল রাইন বাগে। শহরের গলির ভিতর নির্বাসিতা স্মৃশান্‌ দিবান্বপ্নে যে রকম তার গায়ের নদীটিকে শহরের গলি দিয়ে বয়ে যেতে দেখেছিল।*

তখনও আমার বয়েস ছিল কম, জ্ঞানভূম না, আমার কপালে ভাগ্যবিধাতা লিখে রেখেছেন এমনই দুর্দৈব যে তখন আমার অন্ধ কারাগারে না বইবে চেনা দিনের ভোলা দিনের বাতাস, না বইবে স্মৃশানের গ্রামের নদী—স্মৃতির আবর্জনা উড়িয়ে নিতে ভাসিয়ে দিতে।

গাড়ি-ভাড়টা দেবার পর্যন্ত মোকা পেলুম না।

গেট খুলে বাড়িতে ঢোকার সময় শুনি, কোচম্যান বলছে, ‘চ বার্বা রস্‌লা, —দেখলি তো, তখনি তো তোকে বলি নি অস্ত্র সোয়ায়ি নিস্‌ নি। আজ আর না। চ, বাড়ি বাই।’ আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে ‘য়েতে বেরাতে যখন খুশী ঐ সামনের গলিতে ঢুকে পয়লা বাড়ির সামনে বলবেন, “ভালিং বার্বা রস্‌লা!” সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পাবেন তৈরী। সম্রাট বার্বা রস্‌লার মত আপনার

* “সকল গলির মোড়ে যখন দিনের আলো ঝরে

ময়না দাঁড়ে গাহে এমন গাইছে বছর ধরে।”

বার্‌বা রসলাও দেখবেন ক্রুসেড লড়তে হোলি ল্যাণ্ডে যেতে তৈরী।’

জর্মন কেন, প্রায় সব জাতের লোকই কোনো বিশেষ দেশ ভ্রমণ করে এলে বা সে দেশ নিয়ে চর্চা করলে আপন বাড়ি ভর্তি করে ফেলে সে দেশের ভালোমন্দ মাঝারি রাবিশ-জাঙ্ক-বিল্জ-কীচ্‌ দিয়ে। এঁর বাড়িতে পরিপূর্ণ ব্যত্যয় না হলেও একথা কেউ বলতে পারবে না যে ইনি সারাজীবন শুধু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াই করেছেন। মাত্র একখানি ছবি—অজস্কার। রাহুল-জননী পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তথাগতের (তিনি ছবিতে নেই) সামনে। আর লেখা-পড়ার টেবিলের উপর সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলের একটি মূর্তি। ইনি এটি যোগাড় করলেন কোথা থেকে? ওটা মূলে মূর্তি কি না জানি নে—হয়তো বা রিলীফ। আমি দেখেছি ছবিতে—বহু বৎসর হল।

কিন্তু অত বড় বড় ঘরওলা স্ল্যাট তিনি পোষেন কি করে?

আমার অহুমান তুল নয়। স্ল্যাটে ঢুকে আমাকে আসন নিতে অহুরোধ করে তিনি সোফায় শুয়ে পড়লেন। একটু মাফ-চাওয়ার স্বরে বললেন, ‘আপনাদের দার্শনিক সর্বপল্লী মহাশয় নাকি লেখাপড়া পর্যন্ত খাটে শুয়ে শুয়ে করেন।’

ফোটোগ্রাফে মহারানী ভিক্টোরিয়ার বৃদ্ধ বয়সের যে ছবি দেখি ছবছ ঠিক সেই পোশাক পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যখণ্ড যেন ঘরে এসে ঢুকলেন। মহিলা আলাপ করিয়ে-দিয়ে বললেন, ‘আমার আইমা। ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসেন। তাঁর ছেলে-নাতিরা ভালো ভালো ব্যবসা করেন। আইমা কিন্তু আমার সঙ্গেই থাকতে ভালোবাসেন।’

আমি বার বার বললুম, ‘আমি নিরামিষাণী নই, আমার আহাৰাদির জন্য তুলকালাম করে রাইনের জলে আগুন লাগাতে হবে না, আমি সব খাই, টিনের খাণ্ডেও অরুচি নেই।’

মহিলা বললেন, ‘জানেন কি, হিটলার কড়া নিরামিষাণী?’

আমি বললুম, ‘তা হলে নিরামিষ ভোজনের বিপক্ষে আরেকটা কড়া যুক্তি-পেলুম! আর আপনি?’

স্বস্তির স্বরে বললেন, ‘আইমা যা দেয়, তাই খাই।’

আমি বললুম, ‘আপনি তাহলে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী!’

‘অস্তুত হিটলারের মত জৈন গৃহীও নই।’

ইনি সব জানেন।

আমাকে চেয়ারটা কাছে টেনে আনবার অহুরোধ করে বললেন, ‘আজ্জা-

‘আপনি নিওরসিস, সাইকসিস, মনমেনিয়া, ইদে ফিক্স—এসব কথাগুলোর অর্থ জানেন ?’

আমি বললুম, ‘ধারা এসব নিয়ে কারবার করেন, তাঁরাই কি জানেন ? এই যে আমরা নিত্য নিত্য ধর্ম, নীতি, মরালিটি, রিয়ালিজম, আইডিয়ালিজম শব্দ ব্যবহার করি, এগুলোর ঠিক ঠিক অর্থ জানি ? তবে আপনি যেগুলো বললেন, তার ভিতর একটা জিনিস সব কটারই আছে : কোনো একটা চিন্তা সর্ব চৈতন্ত্যকে এমনই গ্রাস করে ফেলে যে মানুষ তার থেকে অহোরাত্র চেষ্টা করেও নিষ্কৃতি পায় না।’

‘দুঃস্বপ্ন যে রকম বলেছিলেন, তিনি শকুন্তলার চিন্তা মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না, অপমানিত জন যে রকম আপ্রাণ চেষ্টা করেও অপমানের স্মৃতি মন থেকে তাড়াতে পারে না—বার বার সেটা ফিরে আসে।’ তারপর বললেন, ‘কিন্তু আশ্চর্য, কালিদাস অপমানের সঙ্গে বিরহবেদনার তুলনা দিলেন কেন ? শকুন্তলা তো দুঃস্বপ্নকে কোনো পীড়া দেন নি—অপমান দূরে থাক !’

আমি বললুম, ‘শত্রু কাছে এসে দহন করে ; মিত্র দূরে গিয়ে দহন করে। দুজনেই দুঃখ দেয়—শত্রু মিত্রে কি প্রভেদ ?’

শত্রুদ্বৈত সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যাহো।

উভয়োর্দুঃখ দায়িত্ব কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ ?

দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্নকে অপমানিত করলে তাঁর যে বেদনা-বোধ হত, শকুন্তলার বিরহও তাঁকে সেই পীড়াই দিচ্ছিল। তাই বোধ হয় কালিদাস উভয়কে পাশাপাশি বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন পূর্বে বলেছেন, ‘তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন কাছাকাছি এসে গেছে। একই মন্ত্রে দুজনকে আশ্রয় জানাবেন।’

ঘরের আলো যদিও সূক্ষ্ম মলমলের ভিতর দিয়ে রক্তাক্ত গোলাপী আভার মত মোলায়েম, তবু শ্রীমতী দুঃহাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিলেন।

এবারে উঠে বসে আমাকে বললেন, ‘আপনাকে সর্বক্ষণ আমার আপন কথা বলে উৎপীড়িত করার ইচ্ছা আমার নেই—বিশেষ করে বাড়িতে টেনে এনে।’

আর এখন বার বার মনে হচ্ছে কী লাভ ? নিউরটিক ইত্যাদি যে শব্দগুলো বললুম, তার কটা আমার বেলা প্রযোজ্য আমি জানি নে। কিন্তু এ-কথা দৃঢ়নিশ্চয় জানি, আমি নরমাল নই। কখনো মনে হয়, আমার এই অহুত্বটি সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আবার হঠাৎ মাঝরাতে জেগে উঠে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মতিভ্রম। একটা ইদে ফিক্স—ফিক্সাই আইডিয়া থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাই নে, এবং নিজের কোনো সিদ্ধান্তকে আর অবিচল চিন্তে গ্রহণ করতে

পারি নে। তাই দয়া করে আপনি এই নিউরটিক, মনমেনিয়াকের কোনো কথা গারে মাথবেন না।’

আমি বললুম, ‘তথ্যস্তু (এবং সংস্কৃতেই বলেছিলুম)। কিন্তু আপনি কি যেন জানবার জন্ত আমাকে ফোন করেছিলেন?’

‘আরেকদিন হবে। আপনি এখানে আর কত দিন আছেন?’

‘অন্তত দেড় মাস। কয়েকদিনের জন্ত ডাসলডর্ফ যাবো, সেই যে বন্ধু পাউলকে ট্রান্সকল করেছিলুম, তার ওখানে! আপনিও চলুন না।’

বললেন, ‘মন্দ নয়; পরে দেখা যাবে।’

ইতিমধ্যে আইমা একটা বরফে ভর্তি অত্যাশ্চর্য রূপালি বালতিতে করে এক বোতল শ্যাম্পেন আর এক বোতল মোজেল নিয়ে এসেছেন।

আমি বললুম ‘সর্বনাশ!’ আইমা কি যেন একটা বললেন। শুধু ‘মাটিল্ডে’ শব্দটি বুঝতে পারলুম। তাহলে এর ক্রিস্টান নাম ঐ।

তিনি বললেন, ‘হোথ্ ডয়েচ্-স্—হাই জার্মান—ব্র্যানেন্ আউসগ্রাথে দিয়ে উচ্চারণ করার ফ্যাশান আইমার কুমারী বয়সে চালু হয় নি বলে আমরা এখনো আলজাসের ডায়লেক্ট বলি। আর বোতলগুলো যদিও অত পুরনো নয়, তবু আমার পিতার আমলের। শ্যাম্পেন নাকি পুরনো হলে খারাপ হয়ে যায়। ভালো না লাগলে মোজেলটা খাবেন।’

আমি নিজেকে থাই আর না-ই থাই, এর মনে যদি একটু রঙ লাগে তবে আমি খুশী।

শুধালুম, ‘আপনি কি এখনো ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা রেখেছেন? আপনার বিশেষ ইণ্টারেস্ট কিসে?’

‘বিষয়টা কঠিন নয়। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বৈদিক যুগে জ্ঞী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। এমন কি হোমবজ্জেও জ্ঞী-পুরুষে সমান অধিকার—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘ইণ্ডলজি আমার সাবজেক্ট নয়। আপনি সবিস্তার না বললে মোষের সামনে বীণা বাজানোর মত হবে।’

তিনি বললেন, ‘সে কি, আপনি তো ইণ্ডিয়ান!’

আমি বললুম, ‘আপনাদের ইহুদিদের মত আমারও লয়েলটি দ্বি-ধা। আমাকে আমার পারিবারিক মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে বোগ রাখতে হয় আর যে দেশে পুরুষাভ্যুত্থানে আছি তার অতীত গোঁরবেগ আমার হিন্দু আছে। তবে আমাদের দেশের মেজরিটি আপনাদের নাৎসিদের মত নয়। আমাদের মুসলমান

কবি কাজীকে হিন্দু। মাথায় তুলে নাচে, আর সেদিন নাৎসিদের একথানা বইয়ে পড়ছিলাম, ইহুদি হাইনে সবকে বলেছে, “১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে অপরিচিত।” উচ্চাঙ্গের বসিকতা বলতে হবে। যে লোককে ১৮১৭।২০ থেকে তাবৎ জার্মানি ও পরবর্তী যুগের রসগ্রাহী বিশ্বজন চেনে তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ ‘অপরিচিত’ হয়ে গেলেন, যেদিন হিটলার চ্যান্সেলর হলেন।’

তারপর তাড়াতাড়ি বললুম, ‘কিন্তু এসব থাক। আপনার কথা বলুন।’

‘বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। স্মার্ত যুগেই সেটা কমতে আরম্ভ করলো। করে করে শেষ পর্যন্ত সতীদাহ পর্যন্ত।’

তারপর তিনি যে রকম সবিস্তর ধাপে ধাপে নামতে লাগলেন তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। স্মৃতির আমি জানি সামান্যই—কজন হিন্দুই জানে, স্মার্ত পণ্ডিত ভিন্ন? মহাদি যে-সব শাস্ত্রকারদের নাম তিনি বললেন, তার বারো আনাই আমার অজানা। এবং যেটা আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো সেটা এই যে, সর্বদাই তিনি চেঁচা করছিলেন প্রত্যেক বিধানের পিছনে কি অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে সেটা খুঁজে বার করার। অন্ততম মূল স্মৃতিস্বরূপ তিনি গোড়াতেই বলেছিলেন, ‘কার্ল মার্কস বলেছেন, “যুগান্তকারী সামাজিক বিবর্তনের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ”—কিন্তু সেটা আমি একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করি নে; সার্টেনলি, যদিও সেটা দি মোল্ট্‌ ইমপোর্টেন্ট কারণ।’ এই স্মৃতি তিনি বার বার অতি স্বকোশলে প্রয়োগ করছিলেন।

সে রাত্রে তিনি যা বলেছিলেন তার সিকিভাগ লিখতে গেলে আমাকে একথানা পূর্ণাঙ্গ থীসিস বানাতে হয়।

শেষ করলেন এই বলে, ‘গুনেছি, আপনাদের মডার্ণ মেয়েরা এখন নাকি তাদের সর্ব পরাধীনতা, দুরবস্থার জন্ত স্মৃতিকারদের—অর্থাৎ পুরুষদের দোষ দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ ওঁদের নয়। মেয়েদেরও আছে। সে-কথা আরেকদিন হবে। আইমা নোটিশ দিয়েছেন।’

ইতিমধ্যে আমি একটি গেলাস চেয়ে নিয়ে সেইটে মোজোলে ভরে আইমার জন্ত রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বুড়ী প্রাচীন দিনের পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে উঠে ছ’হাতে ছ’দিকের স্কাট সামান্য তুলে কার্টিস করলেন। বললেন, ‘না বাছা, অতখানি না।’ বসার ঘরে এসে মাটিলুডের গেলাসে প্রায় সবখানি ঢেলে দিয়ে ‘স্বাস্থ্য পান’ করলেন।

আমি মাটিলুডেকে বললুম, ‘আপনি না বলছিলেন, আপনি নিঃস্বরটিক? কিন্তু এতক্ষণ ধরে আপনি যে শাস্ত্র-চর্চা করলেন তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত তো যুক্তিসঙ্গত প্রতিজ্ঞা, প্রত্যক্ষ ও স্মার্তসঙ্গত অহমানের দৃঢ়ভূমির উপর নির্মাণ

করলেন। এমন কি নিগরসিলের পুনরাবৃত্তি প্রায়দ থেকেও আপনার ধারাবাহিক প্রামাণ্যবিশ্বাস সম্পূর্ণ মুক্ত।’

মাটিল্ডে ম্যান হাসি হেসে বললেন, ‘নিগরসিস, অহুভূতির রোগ। তার হুংভূমি আমাদের হুংপিণ্ডে, স্থতিশাস্ত্র মস্তিষ্ক রাজ্যের নাগরিক।’

তারপর ভেবে বললেন, ‘সেখানেও যে হুংপিণ্ডের নিপীড়ন একেবারে পৌছয় না তা নয়। সেখানেও কিছুটা ‘ইদে ফিক্স’ এসে গিয়ে মস্তিষ্কে নতুন কিছু করতে দেয় না। অর্থাৎ আমি সেই “স্থতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতি” থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো নতুন কিছুর সন্ধানে লাগতে পারি নে। এই বিষয়ে অত্যন্ত কাঁচা বই বেরলেও, ওটাতে যে কোন তথ্য নেই জেনে শুনেও সেইটেই পড়ি। দেখি তার বক্তব্য কোথায় কোথায় আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্লিক করছে, আর কোথায় কোথায় করছে না। এতে করে কোন্ নবীন জ্ঞান সঞ্চয় হয়, কোন্ চরম মোক্ষপ্রাপ্তি!—আর ওদিকে পড়ে রইল জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভুবনের নবাবিস্কৃত থনির নব নব মণি-ভাণ্ডার—অবহেলা অনাদরে। ঠাকুরমাকে এনে দিলুম বড়দিনের নতুন স্কার্ট, জ্যাকেট, বনেট, জুতো। ঠাকুরমা মুখ গুঁজে রইলেন তাঁর স্ত্রী-ধনের সারাদটোগা সিন্দকের ভিতর! সেনিলিটি, ভীষ্মরতি, ইদে ফিক্স!

চলুন—আইমার প্রতি স্ববিচার করতে। এমনিতেই না, সেখানে অতি অবশ্য এসব কথা তুলবেন না।’

আইমার কায়ার বর্ণনা দেব না। স্থূল পাঠক, তোমার আশী বছরের পাকা-পাটিকা ঠাকুরমা যদি থাকেন তবে তুমি অনায়াসে বুঝে যাবে, এঁরা মিন-নোটিশে, দ্বিপ্রহর রাত্রেও কী ভাষ্যমতীর ভোজবাজি দেখাতে পারেন।

এখানে ‘ভোজ’ আমি ভোজন অর্থেই নিচ্ছি। বিক্রমাদিত্য-মহিষীর ইন্দ্রজালও অবশ্য তাতে রয়েছে। আর আমাদের জনপদ কাহিনীতেও আছে, ভোজরাজহুহিতা কালিদাসকে ভোজ দিয়ে পরিতুষ্ট করতেন।

যে মাসে রাত একটায় রাইনল্যাণ্ডেও বেশ শীত পড়ে। বেরুবার সময় মাটিল্ডে জোর করে আমার স্কন্ধে তাঁর হালকা ম্যানটুলটি চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

বার্‌বা রস্‌নার কথা যে আমার মনে ছিল না তা নয়। কিন্তু আমার হোটেল কাছেই।

ভেতুসর্বকন্ডেক-এ নেমেই সামনে পড়ে কাসলের বোটানিক্যাল গার্ডেনের চক্রাকার পরিখা। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখি অসংখ্য কুমুদিনী সৌরভজাল বিস্তার করেছে। চতুর্দিক নিবন্ধুম নীরব। আমাদের গ্রামাঞ্চলের চেয়েও নীরব—কারণ সেখানে বেগুনাবিশ কুহর, বনের শেয়াল, দস্তী মোরগা—কেউ না

কেউ নিস্তরতা ভাঙবেই। দূরে কাইজার গ্লাংসে দু-চারখানা মোটরের আনাগোনা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এরা নিরীহ নিদ্রালু ঘুম ভাঙানোর জন্যই যে মোটরে হর্ন থাকে সেটা এখনো জানতে পারে নি।

বুকের ভিতরটা কি রকম মূচড়ে মূচড়ে উঠছে। আমি কবি নই, আর্টিস্ট নই—আমার হৃদয় স্পর্শকাতর নয়, কিন্তু অকালে বিনাদোষে হতবোবনা, কিংবা আমার ছোট বোনের সখী তরুণী মাধুরীর ধানকাপড়, কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিধবা মল্লিকা একমাত্র রূপ সন্তানকে জলে বিসর্জন দিয়ে মকর-বাহিনীর কাছ থেকে লক্ষস্বাস্থ্য সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় কঙ্কণ-বলয়হীন হাত দুখানি বাড়িয়ে যখন দেখে—দেখে সব মিথ্যা, সব বঞ্চনা—এসব দেখলে কিংবা কবি দেখালে আমার মত মূঢ় জড়ভরতও চট করে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেতে পারে না।

আমি কি ভালোবাসি নি?—আমার মত অপদার্থ ক্ষণতরে ভালোবাসা পেয়েও ছিল—পথের ভুলে অপদার্থের প্রাণের কূলে বসন্তপবন হঠাৎ কখন এসে যায়, আর ষাবার সময় ছেড়ে যায় তার অঞ্চল থেকে গ্রীষ্মের খরতাপ, রৌদ্রদাহ, তৃষ্ণাবাণ। ইচ্ছা করেই। কিন্তু সে কথা থাক। খুঁটের বদনাম ছিল, তিনি মৃগপ, তিনি নর্তকীকে সাহচর্য দেন। তিনি সব দেখেই বলেছিলেন, ‘কাউকে বিচার করতে যেয়ো না।’ পয়গম্বর বলেছেন, ‘তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে’—অর্থাৎ তুমি নিজে। তবে কে তোমার প্রতি অবিচার করেছে সে অহুস্কানে আপন জানু পানি করো কেন?

এঁর ভিতরকার জলন্ত বহির্শিখা এঁর মুখ আর হাত দুখানিই পুড়িয়ে ফেলল কেন? ঐ দুটিই মানুষের ভিতরকার মানুষকে প্রকাশ দেয়—স্বথ-দ্ব্যর্থ, আশা-নৈরাশ্র, তার জন্ম-মৃত্যু। বিশেষ করে মানুষের হাত দুখানি প্রকাশ করে তার পরিবারের ঐতিহ্যগত স্পর্শকাতরতা, চিন্তাশীলতা কিংবা সে দুটি রসে রসে ভরা। মূঢ় জনের হাত দুখানি কচ্ছপের খোলের মত।

ইনি কি জানতেন, যখন তাঁর বন্ধুর থীসিস তিনি টাইপ করে দিচ্ছিলেন যে, প্রত্যেকটি হরপে ঠোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর আপন কফিন-বাক্সের ডালায় স্বহস্তে একটি একটি পেরেক পুঁতছেন?

স্বামী-সোহাগিনী কালোটা পাগলিনীর মত ছুটে এলেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে প্যারিসে, তারপর গেলেন তাঁর ভাণ্ডার প্রবল প্রতাপাধিত অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাটের কাছে—পায়ে পড়লেন তাঁদের, ‘তোমরাই আমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলে মেকসিকোর সম্রাট করে। আমাকে সামান্য একমুঠো সৈন্য

দাও। আমি তাঁকে বাচাতে পারবো।’

ওদিকে স্বামী মাকসিমীলিয়ান গ্রহর গুনছেন কার্লোটার প্রত্যাবর্তন কিংবা অবধারিত মৃত্যুর জ্ঞাত। দ্বিতীয়টাই হল। থোয়ারেসের আদেশে তাঁকে দাঁড়াতে হল বন্দুকধারী সৈন্যদের সামনে। এমপেরর মাকসিমীলিয়ান ক্ষাত্রধর্মের শেষ আভিজাত্যের প্রতীক—মৃত্যুবেদীতে দাঁড়াবার পূর্বে বন্দুকধারীদের প্রত্যেককে তিনি একটি একটি করে সোনার মোহর দিলেন।

সব খবর কার্লোটা পেলেন, প্যারিস ভিয়েনায় ছুটোছুটির মাঝখানে। তাঁর মাথার ভিতর কি যেন একটা ঘটে গেল। তাঁর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত ছাতি যার দিকে কেউই তাকাতে পারতো না। পারলে তাঁর সম্মুখ থেকে পালাত।

তারপর দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে তিনি কথা বলতেন ওপারের লোকের সঙ্গে। আর বার বার ফিরে আসতেন ঐ এক কথায় : তাঁর স্বামীকে বলতেন, ‘মাক্সুল, মাক্সুল, সব দোষ আমারই। আমারই সব দোষ।’

আমি বিমূঢ়ের মত কিছুতেই ভেবে পাই নে মানুষের দোষ কোথায়, তার পাপই বা কি পুণ্যই বা কি ?

কী সদাশিব, শাস্ত্র এই বনু শহর। কিন্তু তাই কি ? চেষ্টানাট গাছের ঘন পাতা থেকে ঝরে পড়ল আমার হাতের উপর এক ফোঁটা হিমিকাক্ষ। কার এ অশ্রু ? আমি জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে খুব কম মেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো—আদৌ আসতো কি না জানি নে—তাই ছাত্রেরা প্রণয় জমাতো বনু-বালাদের সঙ্গে। তারপর টার্ম শেষ হতেই অনেকেই চলে যেত ভিন্ন যুনিভার্সিটিতে। তাই এ-প্রেমের নাম সেমেন্টার-লীবে বা এক টার্মের প্রণয়। কারো কারো প্রেম অবশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই আপন আপন অধ্যয়ন সমাপন করে উড়ে চলে যেত এদিক ওদিক। আর পড়ে রইত বনু-বালাদল তাদের অশ্রুজল নিয়ে।

বনের আপন তরুণ দলও এ পরিস্থিতির সঙ্গে সুপরিচিত।

আমার একটি ঘটনা মনে পড়লো। আমার এক বাঙ্কবীকে রাজিবেলা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘরমুখো বওয়ানা হয়ে কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় গুনতে পেলুম বাঙ্কবী একতলার দিকে ডাকছে তার ঘুমন্ত ভাইকে নিচের সদর দরজা খুলে দেবার জ্ঞাত। আমার উল্টো দিক থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে একটি তরুণ। সে ভেবেছে মেয়েটি বুঝি আমাকে ডাকছে, আর আমি লাড়া না দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে পাশ করার সময় মিনতি-ভরা মুহূর্তে বললে,

সৈ (৫য়)—২৪

‘এত কঠিন হৃদয় হবেন না, হুজার হার (ইয়াং জেন্টলম্যান)।’

সে রাতে বনের গলিঘুঁচি বেয়ে বেয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলুম। মনটা বড় অশান্ত। ভোরের দিকে হঠাৎ রোঁদের একজন পুলিশ আমার সামনে দাঁড়িয়ে বুটের হিলে হিলে ক্লিক করে সেলুট দিল। আমি বললুম, ‘গুট্‌ন আব্‌ট।’

পুলিস বলল, ‘গুড মর্নিং বলাই কালোপযোগী হবে। ভোর হতে চলেছে।’

তারপর গলা নামিয়ে বললে, ‘এই নিয়ে আপনাকে তিনবার জেপ করলুম। ইস্ট ভাস লোস্? এনিথিং বং?’

এ শহরের পুলিশও দরদী। আমি বললুম, ‘না, অনেক ধন্যবাদ।’

বললে, ‘এ রকম ছন্দের মত একা একা রাতভর ঘোরাঘুরি করে কি লাভ? চলো, ঐ বেঞ্চিটায় বসে আমার সঙ্গে একটা সিগারেট খাবে।’

আমি নিজের প্যাকেট বের করলুম। আমার সিগারেট নিতে খুব সহজে রাজী হল না।

বললে, ‘তুমি ভ্যাগাবণ্ড নও, রাস্তাও হারাও নি, এবং চুরিতে যদি হাতখড়ি হয়ে থাকে তবে সে অতি সম্প্রতি। আমি তোমাকে কিছুটা চিনি। কয়েক বছর আগে যখন এখানে ছাত্র ছিলে তখন আমার বীটেই তোমার বাসা ছিল। তারপর কিছুদিন তোমাকে না দেখতে পেয়ে বুঝলুম আর পাঁচটা ফেংলেন্স টম্যাটোর মত (জার্মনরা কেন টোম্যাটোকে faithless বলে, জানি নে) পাশ করে দেশে চলে গেছে। কিন্তু জানো, তোমাকে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিশ্বাস করবে না, তুমিই পয়লা বিদেশী যে পরীক্ষা পাশ করার পর চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। কিছু মনে করো না, আমি বড় খোলাখুলি কথা বলি। ই্যা, তোমার সেই প্র্যাটিনাম ব্লু বাস্‌বৌ গেল কোথায়? তোমাদের দু’জনার চুল ছিল এই শহরের দুই এক্সট্রিম। সবাই তাকাতো।’

আমি বললুম, ‘ও! মার্গেনে? সে বিয়ে করে ফ্রিজিয়ান দ্বীপে চলে গেছে।’

‘তাই বুঝি ছন্দের মত—?’

আমি ধীরে ধীরে বললুম, ‘না, আজ একটা মেয়ের জীবনকাহিনী শুনে বড় দুঃখ হল। মন শান্ত হচ্ছিল না।’

বললে, ‘সরি।’

সিগারেট শেষ করে শুপো উঠে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, ‘তোমার পার্সনাল ব্যাপারে আমি চুঁ মারতে চাই নে সে তো স্বভঃসিদ্ধ। তাই শুধু বলি এই বন্ শহরে ক্রাইম এতই কম হয় যে, ছুটের দমন অপেক্ষা শিটের পালন

করতে হয় আমাদের—অর্থাৎ পুলিশের—বেশী। আতের সাহায্য করতে গিয়ে কিন্তু আমি বার বার দেখেছি, সত্যকার সাহায্য করা অতি কঠিন, প্রায় অসম্ভব। জর্মনে একটা কথা আছে : মমতায় ভরা এই যে মায়ের শরীর, যে তার বাচ্চার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সে কি পারে তার মৃত্যু শিশুকে তার মরণে সাহায্য করতে ? এইটুকু হৃদয়ের বাচ্চাকেও মরতে হয় আপন মরণ। যে অজানা পথে যেতে ত্রিশ বছরের জোয়ানও ভয় পায়, আট বছরের শিশুকেও সেই পথে পা দিতে হয়।

কে কার সাহায্য করতে পারে ?

পারেন শুধু মা মেরি।

আবার দেখা হবে, যুগ্ম হার, শুধু শুধু মন খারাপ না করে হোটলে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আর দরকার হলে পুলিশের পুংসির খবর নিয়ো।’

বড় হুশিয়ার পড়লুম। আমার ছাত্রজীবনের ল্যাণ্ড-লেডি এখন থাকেন ব্যুকেবুর্গ নামক ছোট্ট শহরে। তার পাশে একটা গ্যারিসন। তিনি এসেছিলেন বলে, এবং আমার খবর জানতেন বলে আমাকে ফোন করলেন, বললেন জরুরী খবর আছে। তাঁকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলুম তাঁর প্রিয় ‘আম্ রাইন’ রেস্টোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বিষয় প্রকাশ করার পূর্বেই তিনি বললেন, ‘নাৎসিদের গোয়েন্দাগিরি চরমে পৌঁছেছে। এঁদের অনেকেই দূর থেকে শুদ্ধমাত্র ঠোঁটের নড়া থেকে কথা বুঝে নিতে পারে। তাই বাইরেই জরুরী গোপন কথাটা সেরে নি।

‘খবরের কাগজে নামগন্ধ নেই, লার্ক-হুক জানে না, কিন্তু আমরা গ্যারিসনের কাছে থাকি, আমাদের কাছে ট্রুপ মুভমেন্ট লুকানো অসম্ভব। পরশ রাতে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য গেছে চেক্-সুড্ এটেন্ সীমান্তে। লড়াই যদি আচমকা লেগে যায়, তবে আপনি ইণ্ডিয়ান, অতএব ব্রিটিশ, অতএব শত্রু। নজরবন্দী হয়ে থাকবেন। দেশ থেকে টাকা আসবে না। দুঃস্বস্তির চরম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাই দেখেছি।’

তাঁর সহপাঠ্য—না বললেও আমি বুঝলুম—ইংরেজ লড়াই হারলে যে তার নিজস্ব আবিষ্কার করা ভাষায় বলে ‘বাহাদুরিকে সাথ হটনা’ (‘বীরস্বের সঙ্গে পলায়ন!’—শোলায় পাথর বাটি, ডুববেও ভাসবেও) সেইটি আমার অবলম্বন করা।

বললুম, ‘চলুন, ভিতরে গিয়ে খেতে খেতে চিন্তা করি।’

এ-রেন্ডোরার সঙ্গে ল্যাণ্ড-লেডির নিদেন চল্লিশ বছরের পরিচয়। মালিক, ওয়েস্ট্রেস, সবাই উদ্ধাহ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

হঠাৎ যদি এখন আমাকে জর্মনি ত্যাগ করতে হয়, তবে তার পূর্বে মাটিল্ডেকে তাঁর শেষ প্রাণ শুধোবার একটা সুযোগ দিতে হয়।

টেলিফোনে তাঁকে লাঞ্ছের নিমন্ত্রণ জানালুম আর টাপে-টোপে বোঝালুম, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

কিরে আসতে ফ্রাউ এশ্ ফিস ফিস করে বললেন, ‘কাউন্টারের পিছনে ঐ ওয়েস্ট্রেসটিকে লক্ষ্য করুন। বোকারী পড়েছিল এক পিচেশের পাল্লায়। একটা গরীব ডাক্তারীর ছাত্র করে ওর সঙ্গে প্রণয়। মেয়েটি পুরো ছ’ বছর ওর থরচা যোগায়। কথা ছিল শেষ পরীক্ষার পর সে তাকে বিয়ে করবে। পরীক্ষা পাসের তিন দিন পরে বদমাইশটা এক খানদানী, ধনী মেডিকেল স্টুডেন্টকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করেছে।’

মেজাজটা তেতো হয়ে গেল। আমি যে-সব ঘটনা শুনতে চাই নে সেগুলিই যেন গেস্টাপো ডালকুস্তার মত আমার পিছনে লেগেছে।

এশ্ বললেন, ‘কিন্তু ধন্নি মেয়ে! রেন্ডোরার এই যে মালিক, সে মেয়েটাকে বড় স্নেহ করে। সে তো রেগে তার উকিল ভাইকে ফোন করে বললে, “লাগাও দু-দুটো মোকদ্দমা—একটা ফৌজদারী, একটা দেওয়ানী। ব্যাটাকে আমি জেলে পচাবো, আর ব্যাটার ডাক্তারি লাইসেন্স দিয়ে টয়লেট পেপার বানাবো।” কিন্তু ঐ যে বললুম, ধন্নি মেয়ে, কিছুতেই রাজী হল না কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তুলতে। কী আকাট, কী আকাট মেয়েগুলো!’

আমি কিছু না বলে বিরাট এক পীস কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মাটিল্ডের জগৎ পথ চেয়ে রইলুম। দেখা পাওয়া মাত্র বাইরে গিয়ে তাকে সব কথা বললুম।

মাটিল্ডে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে বললেন, ‘আমি অনেক কিছু আজ সকাল বেলা একসঙ্গে গিয়েই জানতে পেরেছি। আমরা সব-কিছুই জানতে পাই। এমন কি, বার্লিনস্থ ফ্রান্সের রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে পর্যন্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছেন।

আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।’

খাওয়ার পর হোফ্ গার্ডেনে বেড়াতে বেড়াতে স্থির হল, কাল সকালের গাড়িতে আমি প্যারিস চলে যাব। ফাঁড়াটা কেটে গেলে আমি ফের বন্ চলে আসবো। নইলে—সে তখন দেখা যাবে।

ফ্রাউ এশকে আমরা ম্যানসটার গির্জা অবধি পৌঁছে দিলুম। আচার-নিষ্ঠা রমণী পথে আমার মঙ্গলের জন্ত একটা বাড়তি মোমবাতি কিনলেন—মা-মেরির পদপ্রান্তে জ্বালাবেন বলে।

মাটিলুডেকে একস্কেজে পৌঁছে দিয়ে বললুম, 'আপনার সঙ্গে ডিনার খাবো। ক'টায় আসবো?'

'পাঁচটার পরে যে-কোনো সময়।'

হিটলারের উপর পিত্তিটা চটে গেল। একটা নিরীহ বঙ্গসন্তানকে তার ছুটিটা আয়ামসে কাটাতে দেয় না। কিন্তু গোস্‌মাটা অবিমিশ্র নয়। একটা অস্ট্রিয়ান ভ্যাগাবণ্ড, যুদ্ধে ছিল মাত্র করপরেল, সে কিনা আমাদের হুশমন মহামান্ন ইংলণ্ডের—যাঁর রাজ্যে স্বর্ঘ্য অন্ত যায় না, (অবশ্য ফরাসীরা বলে, 'ইংরেজকে ভারতীয়দের সঙ্গে অঙ্ককারে ছেড়ে দিতে স্বয়ং "বঁ দিয়ো"—করুণাময় সৃষ্টিকর্তাও—সাহস পান না')—এবং তাঁর সর্ব কনজারভেটিভ গুটিকে প্রায় চার বছর ধরে তুর্কী নাচন নাচাচ্ছে, এ-সুসমাচারটি কানে এলেই মনে হয়, ইটিকে লিপিবদ্ধ করার জন্ত নয়া নয়া মথি মার্কের প্রয়োজন!

অপর্যাহের এই মধুর আলোতে কার না শরীর অলস আবেশে ভরে যায়। কাইজার প্রাণের ফোয়ারার উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনু লাগছে। পাশে, সেই ১৯৩০ থেকে পরিচয়ের বুডো উইলি দিশী-বিদেশী থবরের কাগজ বেচছে। জার্মান কায়দায় সে 'দি টাইমস'-কে 'টে টিমেন' উচ্চারণ করতো বলে আমরা কোতুক অমুভব করতুম। কাছে এসে কানে কানে বললে, 'সব বিদেশী কাগজ বাজেয়াপ্ত। একটা বাজে কাগজ কি করে এসে গেছে, সঙ্কলের দৃষ্টি এড়িয়ে। আমার মেয়ে পড়ে বললো, প্যারিস লগুনে ধুন্দুমার।' বলে পুট করে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিল কাগজখানা।

নাঃ! এখন পড়ে কি হবে? তার চেয়ে তাকিয়ে থাকবো চেসনাট সারির দিকে, নাকে আসবে বোটানিকসের সুগন্ধ, কানে আসবে পপেলসডফের অভিনিউর কান্ডাবান্দের খেলাধুলার শব্দ, কিংবা কারো খোলা জানালা দিয়ে পিয়ানো প্রাকটিস। কিংবা—

পা দুটো লম্বা করে একটা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে দিবি ঘুমিয়ে নিয়েছি।

সামনে মাটিলুডে। অফিস থেকে বাড়ি আসা-যাওয়ার পথ তাঁর এইটেই। বললেন, 'কি স্বপ্ন দেখছিলেন?'

আমি বললুম, 'সেই যে চীনা দার্শনিক বলেছিলেন, "স্বপ্নে দেখলুম আমি

প্রজ্ঞাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। জেগে উঠে চিন্তায় পড়লুম, এই যে আমি ভাবছি আমি মানুষ, সে কি তবে প্রজ্ঞাপতির স্বপ্ন? প্রজ্ঞাপতি স্বপ্ন দেখছে, সে মানুষ হয়ে সোনালী রোদে রূপালি বর্নার কাছে বসে চা খাচ্ছে।”

মাটিল্ডে বললেন, ‘স্বপ্নে যদি কিছু একটা হবেই, তবে প্রজ্ঞাপতিটা লক্ষীছাড়া মানুষ হতে যাবে কেন? বরঞ্চ রূপালি বর্ণা হলেই পারে। কত না পাহাড়, কত না সবুজ মাঠ, কত না পাইন বন পেরিয়ে সে হবে প্রশস্ত নদী, তার বুকের উপর দিয়ে ভেসে যাবে নলরাজের রাজহংস, ভরা পালে উড়ে যাবে ময়ূরপঙ্খী, তার বুকে কখনো উঠবে ঝড়ঝঞ্ঝা, কখনো প্রতিবিম্বিত হবে পূর্ণ চন্দ্র। সর্বশেষে সে পাবে তার চরম মোক্ষ পরমা শান্তি-সমুদ্রের সঙ্গে আপন সত্তা মিলিয়ে দিয়ে।’

আমি বললুম, ‘অস্বস্ত মানুস এই স্বপ্নই দেখেছে: “নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গ” — আসলে সেটা কবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন।’

‘উত্তর মেঘ ও যক্ষের স্বপ্ন।’

কিছু উত্তর না দিয়ে মনে মনে বললুম, ‘হায় সৃষ্টিকর্তা, প্রেমের ঠাকুর! কোথায় না এ-রমণী এ-সব কথা বলবে তার দয়িতের সঙ্গে, আর কোথায় সে এ-সব বলছে আমার মত কলাগাছকে। ওমর খৈয়াম তাই পৃথিবীর উপর থুথু ফেলতে চেয়েছিলেন।’

মাটিল্ডে কি খবর জানতে চান, সেটা আমি মোটামুটি অঙ্কমান করতে পেরেছি, কিন্তু হায়, আমি তো তাঁকে এমন কিছু বলতে পারবো না, যা শুনে তাঁর বেদনাতার লাঘব হবে। তাই তিনি সেটা না শুধালেই আমি শান্তি পাই। কিন্তু আমি যদি তাঁকে শুধোবার সুযোগ না দি, তবে কি সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না? কাল যাচ্ছি প্যারিস। যদি সত্যি লড়াই লেগে যায়, তবে আমাদের দুজনাতে পুনরায় দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা হৃদয়পরাহত।

যা হয় হবে, আমিই তাঁকে সে সুযোগ দেব।

ব্যালকনিতে লম্বমান হয়েছি ছ’খানা ডেক্ চেয়ারে। বললুম, ‘দুজনার ভালোবাসা যদি কোনো কমন ইন্টারেস্টের চতুর্দিকে গড়ে ওঠে, তবে সেটা হয় বড় প্রাণবন্ত, মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী। ব্রাউনিং আর মিসেস ব্রাউনিং দুজনা একে অন্নের মধ্যে মিশে যেতেন কবিতায় কবিতায়। এমন কি, শুদ্ধ বিজ্ঞানও দুজন মানুষকে একই রসের বস্তায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনার কথা যখনই ভাবি, তখনই মনে পড়ে প্রফেসর ও মাদাম ক্যুরির কথা।’

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, ‘আপনার এ-কথাটি কালিদাসও বলে গেছেন। “গৃহিণী, সচিব ইত্যাদি”—অতথানি আশা আমি

কখনো করি নি। এবং আমি আমাদের প্রণয়ের প্রথম দিন থেকেই জানতুম, ডিগ্রী পাওয়ার পরই তিনি চলে যাবেন আপন দেশে—না, দাঁড়ান, জানলুম কিছুদিন পরে। সংস্কৃত পড়বার সময় তিনি মহাভারত থেকেও কিছুটা বেছে নেন। তাতে ছিল কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান। আপনি ভাববেন না, তিনি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ উপাখ্যানটিই আমার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তা হলে হয়তো তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু কি জানি, কে জানে—’

হঠাৎ যেন দিশে পেয়ে বললেন, ‘দেখুন, কাল আপনাকে যে-কথাটা বলে-ছিলুম, সেটা আবার, আরো জোর দিয়ে বালি, আমি নিওরটিক, আমার মন যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, তখন মনে হয়, সেইটেই ঠিক। আবার পরে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।’

হঠাৎ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, ‘শুধু এই দশ বছরের যজ্ঞা মিথ্যা নয়।’

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখি, হু-হাতের ফাঁক দিয়ে বয়ে বেরুচ্ছে চোখের জল। কত বৎসরের চাপা কান্না, কে জানে? এর পূর্বেও তিনি তাঁর বেদনার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু চোখ দুটি ছলছল করতেও দেখি নি। আর এ যে-ধারা নেমে এসেছে, এ তো কোনো পরিণত বয়স্ক রমণীর কান্না নয়, এ যে অবুঝ শিশুর কান্নার মত। ইনি যখন শাস্ত্রালোচনা করেন তখন মনে হয়, ইনি আমার পিতার বয়সী, দৈনন্দিন আচরণে মনে হয়, ইনি আমার বড়দিদির বয়সী। আর এখন? এখন দেখি তিনি কাঁদছেন আমাদের পরিবারের সবচেয়ে ছোট, আমার অভিমানিনী ছোট বোনের মত। সে কোনো যুক্তি-তর্ক শোনে না, কোনো সাধনা মানে না। যেন সে এই বিশ্ব-সংসারে একেবারে একা—তার সঙ্গী শুধু তার চোখের জল।

কি আছে বলার, কি যায় লেখা?

কিন্তু তাঁর আত্মসংযম অসাধারণ। বছরের পর বছর চোখের জল চেপে রাখার ফলে শুকিয়ে গেছে তাঁর মুখ আর হাত হুঁথানা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁর জীবনে এই তাঁর প্রথম ভেঙে পড়া।

তাঁর কান্নার ভিতর দিয়ে তিনি শুধু একটি অল্পযোগ প্রকাশ করেছিলেন। ডিগ্রী লাভের কয়েক দিন পরই তাঁর বন্ধু দেশে ফিরে যান। বন্ স্টেশনে তিনি তাঁকে বিদায় দেন।

তারপর তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি না, একখানা পোস্টকার্ড না, একটি ছত্র মাত্র না। নববর্ষে, জন্মদিনেও না। সেই যে বন্ স্টেশন থেকে তিনি

বিলীন হলেন, তারপর তিনি বেঁচে আছেন কি না, সে কথাও মাটিল্ডে জানেন না। মাটিল্ডে তাঁকে দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন।

আমি জানতুম, এইবারে আমার অগ্নি-পরীক্ষা আসবে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমি স্থির করেছিলুম, আমি প্যারিস পালিয়ে গিয়ে সেটা এড়াবো না।

এপার ওপার—যে পারই হোক, হয়ে যাক।

যে-প্রশ্ন তিনি বার বার শুধোতে গিয়ে আশা-আকাজ্জার স্বন্দে শুধোতে পারেন নি, আমি নিজের থেকেই তার উত্তর দিলুম।

ধীরে ধীরে বললুম, 'আমি ডাঃ কাণেকে চিনি। চিনি বললে ভুল বলা হবে। সামাজিক অস্থিঠানে লৌকিকতার দু-চারটি কথা হয়েছে মাত্র।'

এবারে আমারও কড়া একটা কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তারই ছল করে ঘরের ভিতরে চলে গেলুম। ইনি এটা সয়ে নিন।

ফিরে এলে মাটিল্ডে শুধোলেন, 'বরোদা তো ছোট শহর; উনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনিও বনের ছাত্র ছিলেন। সে নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয় নি?'

'না, আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু উনি কোনো কোঁতুহলই দেখালেন না। তবে আপনি নিশ্চয় জানেন, উনি কথা বলেন অত্যন্ত কম।'

মাটিল্ডে এক ঝটকায় খাড়া হয়ে বসলেন। প্রথমটায় বিশ্বাসে যেন বাক্য-হার। 'কি বললেন আপনি! পাণ্ডুরঙ কথা বলেন কম! আমার সঙ্গে তো অনর্গল কথা বলতেন!'

মনে পড়ল আমার বন্ধু মোহর্যাব ওয়াভিয়ার মস্তব্য। পাণ্ডুরঙ শব্দর কাণে সম্বন্ধে। বললুম, 'যখন দেখলুম তাঁর কোঁতুহল অত্যন্ত কম, তখন আমিও তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর নিই নি। তৎসঙ্গেও তাঁর কথা উঠলে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, আপন জনের মাঝখানে—ঐ যে আপনি বললেন—উনি অনর্গল কথা বলেন।'

মনে হল, মাটিল্ডে যেন খানিকটা সাঙ্ঘনা পেলেন। তাতে আশ্চর্য হবার কি? কবি রুমৌর দিকে তাঁর গুরু রাস্তায় তাঁকে ক্রশ করার সময় একবার মাত্র একটুখানি স্মিতহাস্য করেছিলেন। সেইটুকুর অহুপ্রেরণায়ই তিনি রচলেন তাঁর মহাকাব্য।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটুকু বলার সময় এসেছে।

আমি বললুম, 'মাটিল্ডে, ডাঃ কাণের কি করা উচিত ছিল না-ছিল সে জানেন বিধি। হয়তো আপনাকে ষাবার পূর্বে সব-কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেলে ভালো হত, হয়তো না করে ভালোই করেছেন। আপনি যদি নিগরটিকই হয়ে গিয়ে থাকেন

—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—তা হলে উনি ঘাই করতেন না কেন, আপনি ভাবতেন, তার উন্টোটা করলেই ভালো হত।

কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা এই : কাণে বরোদার রাজ-প্রাসাদের গোপন-বিভাগে কাজ করেন। সেখানকার আইন অনেকটা ফরেন অফিসের মত। জানেন তো, বিদেশিনীকে বিয়ে করাও ওদের মানা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে-অনুমতিও তারা দেয়—ওদের সিনিকাল বিশ্বাস, বরঞ্চ মানুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে জিনিস গোপন রাখতে পারে, প্রণয়িনীর কাছ থেকে কিছুতেই নয় ; এই তো সেদিন গ্যোয়েবলসের মত প্রতাপশালী মন্ত্রীও এই ধরনের ব্যাপারে হিটলার কতৃক লালিত হয়েছেন। নেটিভ স্টেট মাত্রই চক্রান্তের চাণক্যালয়—আর রাজপ্রাসাদ! সেখানে পরম্পরবিরোধী একাধিক গোপন বিভাগ একে অত্রের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ চক্রান্ত-কর্মে মত্ত। আপনার সঙ্গে পত্রালাপ ধরা পড়তোই এক দিন না এক দিন, এবং তাঁর শত্রুপক্ষ যে সেটা কিভাবে কাজে লাগাতো তার কল্পনাও আমি করতে পারি নে। কাণেকে বৃহৎ সংসার পুষতে হয়—তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম।’

দাঁড়িয়ে বললুম, ‘এইবারে উঠি। কাল প্রভাতে প্যারিস গমন। হিটলার আমার সব প্রোগ্রাম তছনছ করে দিয়েছেন। সবাইকে আজ রাতেই চিঠি লিখে জানাতে হবে। তার উপর প্যাকিং রয়েছে।’

মাটিল্ডে যেন চিরকালের মত দাঁড়ালেন। আমার কাঁধের উপর হাত রেখে প্রায়াক্ষরে আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হল, আমি যেন তাঁর চোখে একটুখানি জ্যোতি দেখতে পেয়েছিলুম। সত্য জানেন অন্তর্ধামী।

কিন্তু মিথ্যে বলেছিলুম আমি মাটিল্ডেকে। অন্তর্ধামী যেন ক্ষমা করেন। আমি কাণের সাফাই গাই নি। আমি চেয়েছিলুম, মাটিল্ডের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া তাঁর বল্লভ যেন ধূলিতলে লুপ্তিত না হয়। মাটিল্ডের জীবন তারই উপর নির্ভর করছে।

প্যারিসে পৌঁছনো মাত্রই শুনি, চেক সীমান্ত সমস্তার সমাধান হয়ে গিয়েছে। হিটলার সৈন্ত অপসারণ করেছেন। আমি আমার জাহাজের প্রিয়ার অহুসন্ধানে বেরলুম না। কারণ, বনে থাকতেই তাঁর রোদনভরা প্রথম চিঠি পাই, ‘আমি এখানে বাঁচবো কি করে? এ যে বড় হৃদয়হীন জায়গা। তুমি এখানে চলে এসো না, ডার্লিং।’

ভ্যাগিস্ আমি ঘাই নি। দু’ দিন পরে দুসরা চিঠি ‘কাল সহকর্মীদের সঙ্গে

গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। তেরি ইনটারেসটিং! মনে হচ্ছে, এখানে তিন বছর কাটাতে পারবো।’ সাদা চিঠির কাগজে সাদা কালিতে লেখা প্রিয় আর প্রাঞ্জল বাণীটি বুঝতে আমার লহমা-ভর সময়ও লাগে নি। বস্তুত প্রথম চিঠি থেকেই সেটা আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। যে বলে, ‘প্যারিস হৃদয়হীন’, সে নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছনো মাত্রই পড়ি-মরি হয়ে, উদ্যম হিয়া নিয়ে হিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছিল। ধৃত্ত আমি, এহেন উদারহৃদয়্যার সঙ্গে আমার হাদিক পরিচয় হয়েছিল। ইনি কাণে গোজের নন; নিঃশব্দে, নীরবে মহাশূণ্ণে লীন হন না। প্যারিস ধৃত্ত। মার্কিন প্রবাদ আছে, পুণ্যশীল মার্কিন মাত্রই মৃত্যুর পর জন্ম নেয় প্যারিসে।

আম্মো বেকার দিন কাটাই নি, কারণ, আমার যে কোনো কাজ নেই। করে করে তিন দিনের জায়গায় কেটে গেল দু’ মাস। সর্বনাশ! প্যারিস বড়ই সহৃদয়, কিন্তু দরাজ-দিল নয়। কিপটেমি শিখতে হলে প্যারিসের খাঁটি বাসিন্দাদের সঙ্গে এক ‘সপ্তাহ বাসই যথেষ্ট। শেষটায় ক্য দ্য সমরারের ইণ্ডিয়ান-ক্লাবে জাতভাইদের সর্বনাশ করে তাদের তহবিল তছরূপ করে বিজয়গর্বে বন্ ফিরে এলুম। একদা নেপোলিয়ন যে-রকম প্যারিস থেকে বেরিয়ে হেলায় কলোন-বন্ জয় করেছিলেন।

মাটিল্ডেকে আমার উপর বেশী চাপ দিতে হল না। আমি স্তূড়স্তূড় করে তাঁর স্ল্যাটেই ঢুকলুম।

রবিবারে একসঙ্গে গির্জায় গেলুম।

আইমা দেখি কাণের কাছ থেকে বেশ দু-চারটে ইণ্ডিয়ান ডিশ বানাতে শিখে নিয়েছিলেন। আর মাত্র তিন দিন বাকী। ভেনিস বন্দরে জাহাজ ধরে বোম্বাই পাড়ি দেব। ট্রাভেল আপিসে ভেনিস অবধি ট্রেনের টিকিট কেটে বাড়ি ফিরে দেখি ধুন্দুমার। গলা-কাটা মূর্গীর মত দুই রমণী এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন।

সম্পূর্ণ অবিশ্রান্ত! কাণে রাজপ্রাসাদের ঠিকানা দিয়ে মাটিল্ডেকে কেবল করেছেন, ভারতীয় ডাক্তারের উপদেশে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত তাঁর ছেলেকে ইয়োরোপ পাঠাচ্ছেন। মাটিল্ডে তার দেখ-ভালু করতে পারবেন কি না যেন কেবল করে জানান।

মাটিল্ডের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি কেবলের জবাব তো দিয়েছেনই, এখন বসে গেছেন আরেকটা কেবলের মুশাবিদা করতে। আর আমাকে প্রশ্ন, ছেলেটার বয়স কত, কি ব্যামো হতে পারে, সে নিরামিষাশী কি

না, এবং সব চেয়ে বড় প্রশ্ন সে নামবে কোন্ বন্দরে ? তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে চান, নইলে তাকে দেখবে কে ? মুশাবিহা বন্ধ করে কোন করেন কখনো বা ট্রাভেল আফিসকে কখনো বা তাঁর দপ্তরকে পাওনা ছুটির মঞ্জুরীর জন্য । হঠাৎ সব কিছু বন্ধ করে লেগে যান প্যাক করতে—হয় যাবেন মার্গেই, নয় রোম । সেখান থেকে ইটালিয়ান যে কোনো বন্দরে পৌঁছনো যায় ঘণ্টা কয়েকের ভিতর । নইলে এখান থেকে খবর পেয়ে তিনি ইটালিয়ান বন্দরে পৌঁছতে না পৌঁছতে জাহাজ হয়তো ভিড়ে যাবে সেখানে । ট্রাভেল দফতর অস্তর দেয়, তিনি মানেন না । ইতিমধ্যে তারা পিয়ন মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছে, বোম্বাই-ভূমধ্যসাগরের তাবৎ জাহাজ কোম্পানির টাইমটেবল । আমি সেগুলো অধ্যয়ন করতে লেগে গেলুম গভীর মনোযোগ সহকারে ।

তাঁর দ্বিতীয় কেবুল যাওয়ার পর মাটিল্ডের মনে জাগলো আরেক ঝুড়ি বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্ন । তৃতীয় মুশাবিদায় তিনি বসে যান ।

হাত নিঙড়াতে নিঙড়াতে পায়চারি করেন আর বলেন, ‘মাইন গট, মাইন গট’—‘হে ভগবান, হে ভগবান !’

হঠাৎ ছুটে এলেন আমার কাছে । মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে । আর্তকণ্ঠে শুধালেন, ‘হঠাৎ যদি যুদ্ধ লেগে যায়, তবে কি হবে ?’ আমি শাস্ত কণ্ঠে বললুম, ‘নিরপেক্ষ সুইটজারল্যান্ডে চলে যাবেন । সেখানে চিকিৎসার কোনো ক্রটি হবে না ।’ যক্ষ্মা হলে যে সেখানেই যেতে হবে সে কথা আর তুললুম না । শুধু বললুম, ‘বরোদার কেবুল মহারাজার অজানতে আসতে পারে না ; আপনি তাঁর সাহায্য পাবেন । জার্মান পররাষ্ট্র দফতর বরোদার মহারাজকে প্রচুর সম্মান করে ।’ তিনি আশ্বস্ত হলেন ।

গভীর রাত অবধি পাশের ঘরে তাঁর মুহূ পায়চারি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম ।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন, তিনি মনস্থির করেছেন, আমার সঙ্গে পনের দিন ভেনিস যাবেন ।

ফেনে উঠেই তিনি হঠাৎ অত্যন্ত শাস্ত হয়ে গেলেন । ভেনিস না পৌঁছনো পর্বন্ত এখন আর কিছু করার নেই ।

গভীর রাত্রে স্লীপিং কোচের স্কীণালোকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি কী প্রশান্ত মমতাময় তাঁর মুখচ্ছবি ! খানিকক্ষণ পরই ইটালিতে ঢুকবো—যে দেশের মাদোন্না-মাতৃমূর্তি সর্ব বিধে সমাদৃত হয় । আমার মনে হল আমার এই মাটিল্ডের মুখে যে মাদোন্নার ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে এ ক’দিন ধরে প্রহরে প্রহরে, সে তো যে কোনো গীর্জার বেদীকে উজ্জ্বল করে দিতে পারে । এ

রমণী গর্ভে সন্তান না ধরেও মা-জননী মাদোন্নাদের ভিতর শাশ্বত আসন পেল।

কেন পাবে না? জাতকে আছে, একদা নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় এক ভিখারিণী নগরপ্রান্তে খজুর বৃক্ষের অন্তরালে শিশুসন্তান প্রসব করে পৈশাচিক ক্ষুধার উৎপীড়নে গ্রাস করতে যাচ্ছিল তাকে। তারই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বক্ষ্যা শ্রেষ্ঠিনী, সন্তান কামনা করে মহাকালের মন্দিরে পূজা দিতে। মাতৃস্নেহাতুরা অমনুয় করে নবজাতককে কিনতে চাইলেন। পিশাচিনী অট্টহাস্য করে উত্তর দেয়, তার ক্ষুধা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করতে পারবে না। বরনারী বললেন, 'তবে তিষ্ঠ; এই যে আমার বক্ষ্যাবক্ষের স্বপুট স্তন, অকর্মণ্য নিষ্ফল এ স্তন কোনো শিশুকে দুগ্ধ যোগাতে পারে নি—এটা আমি খজুরপত্র দ্বারা কর্তন করে তোমাকে দেব। তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে।' পাগলিনী আবার অট্টহাস্যে বললে, 'তুমি জানো না, আপন হাতে আপন মাংস কর্তন করতে কী অসহ-বেদনা, তাই বলছি।' রমণী বাক্যব্যয় না করে কর্তন আরম্ভ করতে না করতেই দরদর বেগে নির্গত হল সেই বক্ষ্যা স্তন থেকে রক্তের বদলে অফুরন্ত মাতৃদুগ্ধ। ভিখারিণী শিশু উভয়েই সে দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হল। অলৌকিক অবিশ্বাস এ ঘটনার কথা শুনে তথাগতের শিষ্যরা তিনজনকেই নিয়ে এলেন তাঁর সামনে। অমিতাভ সানন্দে বললেন, 'মাতৃস্নেহ অলৌকিক ক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম।'

বাঁধতা মাটিল্ডের মুখে দিব্য জ্যোতি দেখা দেবে না কেন?

ভেনিস বন্দরে জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাটিল্ডে আমার হাত ধরে বার বার অগ্ররোধ করলেন, আমি যেন বোম্বাই পৌঁছেই কেবল করি, ছেলেটি কবে কোন জাহাজে ইয়োরোপ পৌঁচছে। তাঁর চোখে জল, কিন্তু তাতে আনন্দের রেশও ছিল।

বোম্বাই পৌঁছে খবর নিয়ে জানলুম, ছেলেটি চলে গেছে। মাটিল্ডেকে পাকা খবর জানিয়ে দিলুম।

বরোদায় পৌঁছবার মাসখানেক পরে বন্ধু ওয়াডিয়া—তাকে এসব কিছুই বলি নি—কথায় কথায় বললেন, কাণের ছেলেটি কখন যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে কেউ টের পায় নি। খাটের উপর একথানা চিরকুট পাওয়া যায়। অস্বস্থ শরীর নিয়ে সে চিরজীবন কারো বোঝা হয়ে থাকতে চায় নি।

আমার মূখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় নি। হা, হতভাগ্য! তুমি জানতেও পারলে না, স্বয়ং মা মেরি তোমার জন্ম বন্দরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

আর মাটিল্ডে!

প্রেমের প্রথম ভাগ

সর্বপ্রথমই করজোড়ে নিবেদন, এ অধম মরালিটি ইমমরালিটি কোনো কিছুই প্রচারের জন্ত এই ‘ফরাসী হাণ্ডবুক ফর বিগিনার্স ইন লভ্’ লিখতে বসে নি। অবশ্য স্বীকার করি, আমি প্রাচীনপন্থী কিন্তু সঙ্কে সঙ্কে বলে নিই—যাতে করে আমার প্রতি অবিচার না হয়—মডার্ন কবিতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ট্রাম-বাস পোড়ানো, পেট-কাটা ব্লাউজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে না আছে আমার কোনো অভিযোগ, না চাই আমি দেশের জনসাধারণকে—তন্মধ্যে আমি নিজেও আছি—খৃষ্ট-বুদ্ধ রূপে দেখতে। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস। জনসাধারণে রটে গেছে, আমি নাকি ঐ বস্তুর শত্রু। এটা আমার প্রতি বেদরদ জুলুম। প্রথমত, জনপ্রিয় কোনো জিনিস, অভ্যাস বা আদর্শের শত্রু হতে আমি কিছুতেই সম্মত হই নে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে পথে যে সব থানাখন্দ পড়ে, সেগুলোর প্রতি লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি তো ওঁদের সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। বস্তুত আমি নিজেই একথানা লিখব বলে স্থির করেছি। তবে নিশ্চয়ই জানি অধুনা যেগুলি জনপ্রিয় তার চেয়ে আমার বই অনেক নিরেস হবে; তরসা এই, দালদাই বাজারে বেশি বিক্রি হয়, আমারটার কাটাতি সেই কারণেই হবে অধিকতর।

তবে আমার এ ‘ফরাসী হাণ্ডবুক’ লেখার সময় ইতিহাসের শরণ নেব অল্পই। যদিও আমার মনে হয়, পেট-কাটা বা টপ-লেসের নিন্দায় যখন হরিশ মুখুজ্যেরা কলরব করে ওঠেন তখন আধুনিকাদের উচিত একটুখানি ইতিহাসের পাতা উন্টোনো, কিংবা ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শনভূমি মিউজিয়মে গমন। জাতকে আছে, একটি জেদী রমণী বসন্তোৎসবে যাবার সময় একটি বিশেষ রকমের দুর্লভ ফুল কামনা করে তার স্বামীকে রাজার বাগানে চুরি করতে পাঠায়। ধরা পড়ে বেচারী যখন শূলে চড়েছে তখন সে তার নিষ্ঠুর অকালমৃত্যুর জন্ত রোদন করে নি। সে উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ করছিল এই বলে, ‘আমি মরছি তার জন্ত আমার দুঃখ নেই, প্রিয়ে; আমার ক্ষোভ, তুমি তোমার প্রিয় পুষ্পপ্রসাদন করে যে বসন্তোৎসবে যেতে পারলে না তার জন্ত।’

তা হলে সপ্রমাণ হল, তথাগতের যুগেও রমণী ফ্যাশানের জন্ত এমন ফুলও কামনা করতেন, যেটা শুধু রাজবাড়িতেই পাওয়া যেত, এবং সেটা যোগাড় করার দুঃসাহসিক অভিযানের ফলস্বরূপ তিনি বিধবা হতেও রাজী ছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, সে-যুগের স্বামীসম্প্রদায় অতিশয় দার-নিষ্ঠ ছিলেন। প্রিয়ার

মনোরঞ্জনার্থে হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই দৃষ্টান্ত কি এ-যুগের যুবক-সম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় পন্থা অবলম্বনে উৎসাহ করবে না ?

অবশ্য পাঠক বলতে পারেন এ ধরনের ঘটনা সাতিশয় বিরল।

সাতিশয় বিরলই যদি হবে তবে আমাদের কবিগুরু ঐ ধরনের উদাহরণই জাতক থেকে নেবেন কেন ?—

‘—বালক কিশোর,

উত্তীয় তাহার নাম, বার্থ প্রেমে মোর

উন্নত অধীর। সে আমার অহুনয়ে

তব চুরি-অপবাদ নিজস্ব লয়ে

দিয়েছে আপন প্রাণ।’

এবং যেন এ-কবিতাতেই প্রোপাগান্ডা কর্ম নিঃশেষ হল না বলে কবি বৃদ্ধ-বয়সে ঐ বিষয় নিয়ে আরো মনোরঞ্জক, আরো চিত্তচাক্ষু্যকর গীতি-নৃত্য-নাট্য ‘শ্রামা’ রচনা করলেন।

এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, আমার যতদূর মনে পড়ছে মূল জাতকে গল্পটি একটু অগ্ররকমের। আমার স্মৃতিশক্তি হয়তো আমাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু আমার যেন মনে পড়ছে, উত্তীয়কে কোন কিছু না বলেই তাকে শ্রামা নগরপালের কাছে পাঠায়। তাকে আগের থেকেই শ্রামা বলে রেখেছিল, কিংবা উত্তীয়েরই হাত দিয়ে চিঠি লিখে তাকে জানায়, পত্রবাহককে শূলে চড়াও ; বজ্রসেনকে মুক্তি দাও। এবং বোধ হয় ঘুঘের টাকাও কিছু ছিল, আর সেটাও উত্তীয় তার আপন ভাণ্ডার থেকেই দিয়েছিল—তবৎ ঘটনার কোনো কিছু না জেনেন্তেনেই। আবার মাফ চাইছি, ভুল হতে পারে, শ্রামা বোধ হয় উত্তীয়কে বলে ‘তুমি এই চিঠি ও অর্থ—’ সেটা শ্রামার কিংবা উত্তীয়ের—‘নগরপালকে দিয়ে এলে আমি একান্ত তোমারই হব।’*

পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি শ্রামা বা পুস্পবিলাসিনীর কার্যকলাপ

* রবীন্দ্রনাথ জাতক, ইতিহাস ও অগ্রান্ত কিংবদন্তীমূলক যে সকল কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কি কি পরিবর্তন করেছেন, সে সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা করে কেউ ডক্টরেট নেন না কেন ?

সম্মতির চোখে দেখছি। আধুনিকাদের অধঃপাতগমনের অহেতুক অভিযোগ কানে এলে আমার এসব দৃষ্টান্ত মনে আসে, এই মাত্র।

তবে এ নিয়ে ভাববার আছে।

যে কালে মুকুব্বীরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দিতেন, সে সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মুকুব্বীদের ভিতর ভালো বর পাওয়ার জন্ত যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত না তা নয়। বস্তুত যে কনের সঙ্গে লোভনীয় বরের বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে নাকি উড়ো চিঠি পর্যন্ত যেত তৃতীয় কল্পাপক্ষ থেকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংগ্রামে আবার নীতি কি! এবং কিছুমাত্র নতুন তথ্য নয় যে, কুরু-পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সে নিয়ে বিশ্বের আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এ যুগে, বিশেষ করে কলকাতা এবং অগ্ন্যাগ্ন বড় শহরে অনেক মেয়েকেই বাধ্য হয়ে বরের সন্ধানে বেরুতে হয়। এবং বররাও বেরোন কন্টার সন্ধানে। ফলে বিস্তশালী, রূপবতী বা উচ্চশিক্ষিতা যার যেমন অভিরুচি—কনের জন্ত ছোকরাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায়, এবং উন্টোটাও হয়। বোধ হয় স্থলেখক সুবোধ ঘোষের গল্পেই পড়েছি, তিনটি মেয়ে তিনটি ফুলের তোড়া নিয়ে পাল্লা দেন এক শাসালো বরকে স্টেশনে সৌ-অফ করতে গিয়ে।

এসব বিয়ে যে দেখা মাত্রই দুম্ করে স্থির হয় না সে-কথা বলা বাহুল্য। কিঞ্চিৎ পূর্বরাগ, প্রেম বা প্রেমের অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো স্থলে এটাকে কোর্টশিপও বলা হয়। আমাদের দেশে একদা গান্ধর্ব-বিবাহের প্রচলন ছিল। সে বিবাহ হত বিবাহের পূর্বকার প্রণয়ের ভিত্তিতে।

কিন্তু এদেশে এখনো প্রণয়ের কোনো কোড্ নির্মিত হয় নি, অর্থাৎ যুবক-যুবতীতে কতখানি প্রণয় হওয়ার পর ছেলে কিংবা মেয়ে আশা করতে পারে যে এবারে অস্ত্র পক্ষ তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত, এবং তখন যদি সে হঠাৎ তাকে ত্যাগ করে অস্ত্র কাউকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে তবে সমাজে তার নিন্দা হয়। ইয়োরোপে মোটামুটি দুটো ধাপ আছে। হুঁজনাতে প্রণয় হওয়ার ফলে যদি ছেলেটা মেয়েটিকে ফরাসীতে ‘আমি’, জার্মানে ‘ক্লেয়গিন্’ (‘গাল’ফ্রেণ্ডের চেয়ে এটাকে ঘনিষ্ঠতর বলে ধরা হয়) বলে উল্লেখ করে তার তখনো মোটামুটি বিয়ের দায়িত্ব আসে না। এটা প্রথম ধাপ। কিন্তু ফরাসীতে ‘কিয়ঁসে’—জার্মানে ঐ একই শব্দ বা ‘ফেরলবট্’ ব্যবহৃত হয়—পর্ষায়ে পৌঁছলে সেটাকে দ্বিতীয় ধাপ বলা হয়। এবং সে সময় যদি যুবক তাকে এনগেজমেন্ট আংটি দেয় (অর্থাৎ মেয়েটি তখন ‘বাগদস্তা’ হল যদিও অর্ধটা কিছু ভিন্ন) তবে সেটা বিয়ের প্রতিশ্রুতি

বলেই ধরা হয়। তারপর সে বিয়ে করতে না চাইলে অনেক স্থলে মেয়েটি আদালতে প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা করে খেসারতি চাইতে পারে। সমাজে বদনাম তো হয়ই। মহাভারতে দ্রৌপদী বাগদত্তা ছিলেন বলে পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিয়ে করলে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষ তাঁর নিন্দা করে।

এদেশে প্রণয়ের কোনো স্তরেই বোধহয় এরকম আংটি দেবার রেওয়াজ প্রচলিত হয় নি। তবে প্রণয় ঘনীভূত হওয়ার পর (কতটা ঘনীভূত এবং তার চিহ্ন কি, সেটা বলা কঠিন) যদি কোনো পক্ষ অকারণে ‘রণে ভঙ্গ’ দেয়, তবে তার যে বদনাম হয় সেটা স্থনিশ্চিত। ইয়োয়োরোপেও যে-মেয়ে অকারণে একাধিক প্রণয়ীকে পর পর ত্যাগ করে সে ‘জিল্ট’ এই বদনামটি পায়।

নিছক প্রেমের জ্ঞাত প্রেম—বিয়ে করার উদ্দেশ্য কারোরই নেই—এটা বোধ হয় এদেশে বিরল। ইয়োয়োরোপে মোটেই বিরল নয়। ছাত্র, ছাত্রী, মেয়ে কেরানী, ছোকরা এসিসটেন্টের ভিতর এ-জাতীয় প্রেম আকছারই হয়। এ-জাতীয় প্রণয়ের ফলে যদি কোনো কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় তবে কোনো কোনো স্থলে সে যুবকের বিরুদ্ধে খেসারতির মোকদ্দমা আনতে পারে। আমি যতদূর জানি, বিয়ে করতে বাধ্য করাতে পারে না—তবে রাশাতে বোধহয় সন্তানটি অন্তত পিতার নামটা আইনত পায়, অর্থাৎ জারজ রূপে ঘৃণার পাত্র হয় না। ইয়োয়োরোপে যদি যুবা প্রমাণ করতে পারে যে, মেয়েটার একাধিক প্রণয়ী ছিল তবে তাকে বা অন্য কাউকে কোনো খেসারতি দিতে হয় না। এক বলশেভিক আমাকে বলেন, এক্ষেত্রে রাশায় সব ক’জনকে খেসারতি ভাগাভাগি করে দিতে হয়।

তবে ইয়োয়োরোপের মেয়েরা যুগ যুগ ধরে প্রেমের মারফতে বিয়ে করেছে বলে অনেক কিছু জানে, এবং আর পাঁচজন বিচক্ষণ বান্ধবীদের কাছ থেকে উপদেশও পায়।

এদেশের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র নেই। তবে আমার সব সময়ই মনে হয়েছে আমাদের মেয়েরা বড় অসহায়।

*

*

*

সিরিয়স প্রবন্ধ লিখব বলে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমি প্রণয়, বিবাহ, লাভ ফর লাভস্ সেক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে ফরাসীদের দু-একটি মতামত লিখতে যাচ্ছিলুম মাত্র। এ বাবদে ফরাসীদের অধিকারই যে সব চেয়ে বেশি, সেখা বিশ্বজন মনে নিয়েছে। লোকে বলে অবোধ অবৈধ প্রেম নাকি ঐ দেশেই সব চেয়ে বেশি। আমি কিছু বলতে পারাজ, তবে একটা কথা জানি। ডিভোর্স বা লয়চ্ছেদ ফরাসীরা নেকুনজরে দেখে না। পারিবারিক শান্তি ও শিশুদেহ

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা বড়ই সচেতন। স্বামী-স্ত্রী দুজনাই কিঞ্চিৎ অসংযমী হলে ফরাসী সমাজ সয়ে নেয়, কিন্তু তারা একে অন্তর্ভুক্ত করে চাইলে সমাজ অসঙ্কট হয়।

ইয়োৰোপের উন্নত দেশগুলো যে-স্থলে গিয়ে পৌঁচেছে আমরাও একদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছব, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না (অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, আমি ইয়োৰোপের প্রেম তথা বিবাহ-পদ্ধতির নিন্দা করছি। বস্তুত বাইরের অল্প সভ্যতা অল্প ঐতিহ্যের মানুষ হয়ে আমার পক্ষে ইয়োৰোপীয় সভ্যতা বিচার করতে যাওয়াটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। যারা আমার চেয়ে বহু উর্ধ্বে-উঠে প্রকৃত সত্য দেখতে পান তাঁরাই বোধহয় অনাসক্তভাবে আপন দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার ধরেন)। এদেশের ঐতিহ্য তাকে প্রেম বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে অল্প প্যাটার্ন বানাতে শেখাবে—এই আমার বিশ্বাস।

*

*

*

যে ফরাসী যুবতী কয়েকটি তরুণীকে হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়ে সদুপদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর কথাগুলো শুনে আমি আমোদ অহুভব করছিলুম। তরুণীদের ভাবভঙ্গি-কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা যুবতীটিকে প্রেমের ভূবনে রীতিমত 'সাকসেসফুল' বা বিজয়িনী বলে মনে করছিলেন। তিনি খাচ্ছিলেন কন্ডাক ও চেসার, অতি ধীরে মন্থরে। অর্থাৎ সামান্য কয়েক ফোটা কন্ডাক পান করে সঙ্গে সঙ্গে অল্প গেলাস থেকে এক ঢোক জল। এই জল কন্ডাককে chase করে নিয়ে যায় বলে একে বলে 'চেসার'। যুবতীটি যে পান বাবদে শুধু সমজদার তাই নয়, আমার মনে হল তিনি এ বাবদে পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্বও বজায় রাখেন।

লম্বা হোল্ডারে সিগারেট ধরিয়ে, উর্ধ্বপানে ধূঁয়োর একসারি চক্কর চালান করে বললেন, 'লেয়েঁ ব্লুমের কেতাবখানা মন দিয়ে পড়ো। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক খাটি কথা বলেছেন।' ব্লুম একদা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁর বইয়ে বলেন, প্রেম, যৌনজীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীর বিবাহ সাধারণত তাদের জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য সুখশান্তি দিতে পারে না। উচিত, উভয় পক্ষেরই এ-সব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর বিয়ে করা। বলা বাহুল্য, এ বই প্রকাশিত হলে ইংলণ্ডের অনেকেই এটাকে 'শকিং' 'গর্হিত' বলে নিন্দা করেছিলেন।

স্মন্দরীটি ব্লুমের মূল বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করে বললেন, 'দেখো, আমি নিজে বিশ্বাস করি, নারী-পুরুষ দুই যুগ্মদান শক্তি, একে অন্তরের শক্তি—'

একটি তরুণী কক্ষের ঢোক গিলতে গিয়ে মারাত্মক বিষম খেয়ে বললে, 'আপনি

এ কি কথা বলছেন! কবি দুর্গা এখনো আপনার কথা ভুলতে পারেন নি—আপনি তাঁকে বিদায় দেওয়ার পরও। এখনো তাঁর মুখে ঐ এক মন্ত্র : আপনার মত প্রাণ-মন, সর্বহৃদয়, সর্বশ্ব দিয়ে এরকম আত্মহারা হয়ে কেউ কখনো ভালো-বাসতে পারে নি।’

যুবতী স্মিত হাসভরা চোখে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বেচারী আত্রে! তোমার এখনো অনেক-কিছু শেখবার বাকি আছে। আমি আর্টিস্ট। আমি যা-ই করি নে কেন, সেটাকে পরিপূর্ণতার চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে করি। যখনই ভালোবেসেছি, ‘আত্মহারা’ হয়েই ভালোবেসেছি। কিন্তু, ভার্টিং, ইহুদিও কি তার ব্যবসা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে না? তাই বলে মে কি তার মুনাকার কথা ভুলে যায়? যে ব্যবসাকে সে আপন প্রিয়্যার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাকে সে অকাতরে বিসর্জন দেয় না, যদি দেখে সেটা দেউলে হয়ে যাওয়ার উপক্রম?

তাই বলছিলুম, পুরুষ রমণীর শত্রু। যে কোনো পুরুষ আমাকে ‘আত্মহারা’ হয়ে ভালোবাসলেও একদিন সে আমাকে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে—আমি যে-রকম ম’সিয়ো দুর্গাকে দিয়েছিলুম। অবশ্য আমি শ্চাডিস্ট নই, তাই তাকে ড্রপ করার সময় যতদূর সম্ভব মোলায়েমভাবে সেটা সম্পাদন করি—তত্পরি বলা তো যায় না, কখন কাকে আবার প্রয়োজন হয়!’

আরেকটি তরুণী বললে, ‘কিন্তু দান্তে—?’

মাদাম বললেন, ‘ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি—যদিও ওঁর কাব্য আমার প্রেমপত্রে কাজে লেগেছে। ঐ ধরনের মানুষ আমি দেখি নি। তবে এইটুকু বলতে পারি, যারা কারো বিরহে বা মৃত্যুতে দীর্ঘদিন ধরে আপস-আপসি করে সেটা শুধু তাদের আত্মস্তরিতা। নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না যে, এই-বারে তার অস্ত্র ব্যবসা ফাঁদা উচিত। মনস্তত্ত্বে ওদের বলা হয় ম্যাজোজিকিস্ট—নিজকে নিজে কষ্ট দিয়ে স্থখ পায়। ঐ যে-রকম অনেক সর্বত্যাগী অনাহারে থেকে স্থখ পান! তোমার আমার স্বাস্থ্য আছে, ক্ষুধা আছে, আমরা নর্মেল। খাওয়া যখন রয়েছে তখন উপোস করবো কোন্‌ হুখে?’

‘তবে কি একনিষ্ঠ প্রেম বলে কিছুই নেই?’

‘কী উৎপাত! কে বললে নেই? নিশ্চয়ই আছে। যখন যাকে ভালো-বাসবে তখন তার প্রতি একনিষ্ঠ হবে, আত্মের ভাবায় আত্মহারা হবে। একাধিক জনের সঙ্গেও অক্লেশে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। ঐ তো আমার এক বন্ধু ছিলেন লিয়োঁতে। সেখানে মাঝে মাঝে উইক-এণ্ড করতে যেতুম। চমৎকার কথাবার্তা

বলতে জানেন। বাড়িটিও সুন্দর। প্যারিসে প্রতি বৃহস্পতিবারে আমার স্ক্যাটে আসতেন আরেক বন্ধু। উনি বিবাহিত। অল্প সময় সুযোগ পেতেন না। তা ছাড়া চাকরির উন্নতির জন্ত অফিসের এক বৃদ্ধ কর্তার সঙ্গে তাঁর মোটরে মাঝে মাঝে বেরুতে হত। তিনি আবার ভয়ানক ভীতু। যদি কেউ দেখে ফেলে! তাই রাত্রে মোটরে করে শহর থেকে দূরে যেতে হয় তাঁর সঙ্গে। এদের প্রত্যেককে যদি একনিষ্ঠভাবে না ভালোবাসি তবে—ঐ যে বললুম পুরুষ মাত্রই শত্রু—সে শত্রু ধরে ফেলবে না আমার ভারসেটাইলিটি—বহুমুখী প্রতিভা? শুনেছি, এবং বিশ্বস্তস্বত্রেই, যে রসরাজ কবি, যোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, শাসনকর্তা দাচুন্দজিয়ো একসঙ্গে একগুণা সুন্দরীর সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের উচ্চাঙ্গ সাধনা করেছেন, তিনি একই সময়ে চারজনকে যে চার সিরীজ প্রেমপত্র লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি অতিশয় অরিজিনাল মাধুর্যময় কবিত্বপূর্ণ—কোনো সিরীজের সঙ্গে কোনো সিরীজের সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকটি বস্ত্রভা আপন সিরীজ পেয়ে ধরা হয়েছেন।’

তারপর আরেক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘স্বাজান্, তুমি এ লাইন ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। পল্ আর মাসে’ল তোমাকে একই সময়ে ভালোবাসতো; আর তুমি মাত্র দুটোকে সামলাতে পারলে না? হায়! প্যারিস কোথায় এসে পৌঁচছে? আর ডার্লিং স্বাজান্, তুমি নাকি জানতেও না, পল্ আর মাসে’ল উভয়েরই তখন আরেক প্রস্তু প্রিয়া ছিল!’

স্বাজান্ তাজ্জব্ব যেনে বললো, ‘তাই নাকি? ম’ দিয়ে!’

নানেং বললে ‘ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল? দ্বিধা করে সিধা রাখো?’

মাদাম বললেন, ‘ও! তা কেন? মেনাজ্ আ ত্রোয়া (menage a trois = management by three) যদিও এখন ফ্রান্সে একটু আউট অব ডেট—তবু তিনজনে মিলেমিশে থাকাকাটা তো ট্রায়েল পেতে পারে, কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, শান্তিভঙ্গ যেন না হয়, নো স্কাণ্ডাল, প্রীজ! আর ডুয়েল, খুন, আত্মহত্যা এগুলো তো বর্বরতার চরম—ভুল বললুম, বর্বরদের ভিতর এসব অপ্রিয় ঘটনা প্রায় কখনোই ঘটে না। এগুলো ঘটলে মনের অশান্তি খানিকটে হয় বটে, কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক বদনাম ছড়ায় ভবিষ্যতের বিয়ের বাজারে। অবশ্য এমন কোনো বদনাম নেই যেটা আস্তে আস্তে মুছে ফেলা যায় না। এবং কোনো কোনো স্থলে একাধিক পুরুষ আকৃষ্ট হয় ‘ফাম্ ফাতাল্’ (fatal woman), ‘বিপজ্জনক রমণী’র প্রতি।’

ইনি তাঁদেরই একজন কি-না সেটা জানবার কোতূহল আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে তার কণ্ঠ্য শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে গুটিতিনেক তরুণী একসঙ্গে ওয়েটারকে ডাকলে। যুবতী রাজ-রাজেশ্বরীর মত ঝাঁ হাতখানা দিয়ে যেন বাতাসের একাংশ ছুঁটুকরো করে অসম্মতি জানানেন, বললেন, ‘সুইচ অফ্‌ ইউ, কিন্তু জানো তো আমার সোনার খনিতে এখন ডবল শিফ্টে কাজ চলছে। দ্বিতীয় শিফ্টায় আমি অবশ্য অনেকখানি সাহায্য করি। এমনিতেই আমি এক গাদা টাকার কুমিরকে চিনতুম, এখন আমার ‘মারী’ (স্বামী) প্রতি রাতেই দু-একটি নয়া নয়া বাঘ-ভাল্লুক শিকার করছেন আমাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে।—তোমরা বরঞ্চ শ্যামপেন খাও।’

তরুণীদের একাধিক জন আনমনা হয়ে ভাবলে তাদের জীবনে এ সূদিন আসবে কবে?

হঠাৎ যেন বিজয়িনীর একটি গভীর তত্ত্বকথা মনে পড়লো। গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘কিন্তু, যাদুয়া, একটি কথা মনের ভিতর ভালো করে গেঁথে নিয়ে। রুম এটা বলেন নি। সর্বপ্রেমের চরম গতি যখন পতিলাভ তখন সে-পথে নামবার আগে একটি মোক্ষম তত্ত্ব ভুললে চলবে না। রুম বলেছেন, প্রথম ইদিক-উদিক প্রেম এবং ফ্যাকটস অফ্‌ লাইফ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর, ইংরিজিতে পুরুষের বেলা যাকে বলা হয় ‘বুনো ভুট্টা বপন’—সেইটে হয়ে গেলে পর বিয়ে করবে। তা হলে একের অন্তরে প্রতি সহিষ্ণুতা হবে অনেক বেশি, একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে অনেক বেশি—দাম্পত্য জীবন তাই হবে দীর্ঘকালব্যাপী ও মধুর। রুমের উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ এ-বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। আমি তো নিশ্চয়ই করবো না, কারণ তিনি অতিশয় নীতি-বাগীশ—’

কোরাস উঠলো তাবৎ তরুণী কণ্ঠে, ‘কি বললেন, মাদাম?’

কণামাত্র বিচলিত না হয়ে মহিলাটি ধীরে স্বস্থে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, ‘কট্টর নীতিবাগীশ, ধর্মভীরু, আচারনিষ্ঠ এবং ছিন্নভিন্ন উদ্দেশ্যহীন ফরাসীসমাজকে নৈতিক দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যগ্র। তিনি ইহুদি, এবং অনেকেই যে রকম তাঁর ইহুদি-ভ্রাতা ক্রয়েটকে ভুল বোঝে, এঁর বেলাও তাই হয়েছে। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং জানি তিনি নীতি, মরালিটিতে অতিশয় আস্থাবান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাচীন নীতি পরিবর্তন করে—বরং বলবো সেটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী ও কল্যাণময়ী করে সম্পূর্ণতর করে তোলবার জন্য নবীন নীতির প্রয়োজন। তিনি সেইটে প্রবর্তন করতে চান। কিন্তু এই নবীন নীতি প্রবর্তন

করতে পারি শুধু আমরা ফরাসীরাই। ঘেরকম আমরাই সর্বপ্রথম ফরাসীবিজ্ঞোহ করে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রবর্তন করি। ইয়োরোপের অগ্ন্যন্ত দেশ, এমন কি জার্মনিরও লাগবে এ নীতি গ্রহণ করতে অন্তত একশ বছর। তারা তো এখনো গণতন্ত্রটাই রপ্ত করতে পারেনি। আর যেসব দেশ ধর্ম উপাদান করেছে—যেমন প্যালেস্টাইন, আরবদেশ, ইণ্ডিয়া, এরা এ নীতি কখনো গ্রহণ করতে পারবে না, আর যদি করে তবে তাদের সর্বনাশ হবে।’

আমি মনে মনে সম্পূর্ণ মায় দিলুম। এবং যোগ দিলুম, হয়তো চীন পারবে।

‘কিন্তু একটা প্র্যাকটিকাল উপদেশ আমি দিই। বিয়ের পূর্বের সর্ব অভিজ্ঞতা যেন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে হয়। তার প্রথম কারণ তারা প্রবীণতর, পকতর। তাদের কাছে শুধু প্রণয় নয়, জীবনের মূল্যবান আরো অনেক-কিছু শেখা যায়। কিন্তু খবরদার, আহাম্মকের মত কক্থনো তাকে বলবে না, তোমার বউকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করো। এক্সপেরিমেন্টের ইদুরকে আকাট মূর্থও বিয়ে করে না।

আরেকটা কারণ বললে তোমাদের তরুণ-হৃদয়ে হয়তো একটু বাজবে।

ঐ বিবাহিতদেরই হু’পয়সা রেস্তু থাকে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে আর সেফ হাওয়া খেয়ে খেয়ে জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় হয় না। সেটা হয় জনসমাজে। ক্লাব, “রেস্তোরাঁ”, অপ্‌রা, জুয়োর কাসিনো, রেস, রিভিয়েরা-সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ, এগুলো না করলে, না চষলে কোনো এলেমই হয় না, যেটা তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী ও দাম্পত্য-জীবনে কাজে লাগবে।

আরেকটা সুবিধে, বলা তো যায় না, তিনি যদি মাত্রা সামলাতে না পেরে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বসেন, তুমি তখন অতিশয় ব্রীড়া সহকারে বলতে পারবে, “আমি চাই নে যে আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স করে আপনি একটি পরিবার নষ্ট করুন।”

এবং শেষ সুবিধে, যেদিন তুমি কেটে পড়তে চাইবে, সেদিন স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে, “আমারও তো সংসার পাততে হবে, আমারও তো সমাজের প্রটেকশন দরকার”, তারপর ব্লাশ করে বলবে, “আমিও তো, আমিও তো মা হতে চাই”।’

কি বলবো পাঠক, সে যা অনবদ্য অভিনয় করলেন সেই বিবাহিতা যুবতীটি—আহা, যেন বোল বছরের তরুণীটি, ভাজা মাছটি উন্টে খেতে জানেন না। ধন্য নটরানী প্যারিস, ধন্য তোমার অভিনয়, ধন্য তোমার নব মরালিটি! সাথে কি

লোকে বার বার বলে, ‘সী প্যারিস এ্যাও ডাই’। প্যারিস দেখার পর পৃথিবীতে দেখবার মত আর তো কিছু থাকে না।

তবে আমার অহুয়োধ, অগ্রাগ্র বহু বস্তু নির্মাণ করার সময় ফ্রান্সে আইনত যেমন ছাপ মারতে হয়, ‘নট্ ফর এক্সপোর্ট’—‘বিদেশে চালান নিষিদ্ধ’, এই নব মরালিটির উপরও যেন তেমনি ছাপটি সযত্নে মারা হয়।

তবে আমি এটি আমদানি করলুম কেন? বুঝিয়ে বলি। বিদ্বদ্ধা যুবতীটি যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিলেন আমি তার সহস্রাংশের একাংশও বলি নি। আমি শুধু সেটুকুই বলেছি, যেটুকু আপনার জানা থাকলে যদি কখনো প্যারিসের ঐ নব মরালিটিটি এদেশে চোরাবাজার দিয়ে বা স্মাগলড্ হয়ে চলে আসে তবে যেন তৎক্ষণাৎ সেটি চিনতে পারেন।

চার্লি চ্যাপলিন এই কর্মটি করেছিলেন। অনেকেই তার ‘মঁসিয়ো ভেরুত্’ ছবি দেখেছেন। চ্যাপলিনের পূর্বেও তার সময়ে ইয়োরোপের কোনো কোনো দার্শনিক সাড়স্বর প্রচার করেন, জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার জ্ঞান মানুষ যেন সর্বাত্ম প্রয়োগ করে সর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে ‘অর ও কঁবা’—দরকার হলে খতম করে দেয়। সেই হাস্যাস্পদ দর্শনের বেকুব চরম পরিণতি প্রমাণ করার জ্ঞান চ্যাপলিন দেখান কি-ভাবে একজন লোক একটার পর একটা ধনী প্রাপ্তবয়স্ক রমণীকে বিয়ে করে তাকে স্বকৌশলে খুন করে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে। কিন্তু খুনের কৌশলটি ছবিতে দেখান নি।

আমিও বিদ্বদ্ধা প্যারিসিনীর আসল অন্তর্ভূত রহস্য সযত্নে গোপন রেখেছি।

মত্তপন্থা ওরকে মধ্যপন্থা

মত্তপান ভালো না মন্দ সে নিয়ে ইয়োরোপে কখনো কোনো আলোচনা হয় না—যেমন তাস খেলা ভালো না মন্দ সে-নিয়েও কোনো তর্কাতর্কি হয় না। কিন্তু এ-কথা সবাই স্বীকার করেন যে মাত্রাধিক মত্তপান গর্হিত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক—যে রকম তাস খেলাতে মাত্রাধিক বাজী রেখে, অর্থাৎ সেটাকে নিছক জুয়ো খেলায় পরিণত করে সর্বস্ব খুঁয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই অমুচিত।

এ ছুটো ব্যসন যে আমি একসঙ্গে উত্থাপন করলুম সেটা কিছু এলোপাতাড়ি নয়। কুরান শরীফে এ-ছুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ ছুটির উৎপত্তি-স্থল স্বয়ং শয়তান। তৎসঙ্গেও ইদানীং পূর্ব পাকিস্তানের একখানি দৈনিকে আলোচনা হচ্ছে, মাত্রা মেনে, অতিশয় সাবধানে কিংবা স্বাস্থ্যলাভের

জগৎ সামান্য মত্তপান করা শাস্ত্রসম্মত কিনা ? এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট আলোচনার জগৎ যতখানি মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞান থাকা উচিত আমার সেটি নেই। এবং শাস্ত্র ছাড়া লোকাচার, দেশাচার নামক প্রতিষ্ঠান আছে। উভয় বাঙলার এই দুটি আচারে মত্তপান নিষিদ্ধ। বরঞ্চ পশ্চিম বাঙলার কোনো কোনো জায়গায় তাড়ির প্রচলন আছে—পূর্ব বাঙলায় সেটাও নেই, অন্তত আমার চোখে পড়ে নি।

মোদা কথা এই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত সমাজে মত্তপান নিয়ে যে আলোচনা হয় সেটা নীতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে, এ্যাজ এ প্রিন্সিপল। অর্থাৎ হিন্দুর কাছে গোমাংস খেমন আত্যন্তিক ভাবে বর্জনীয়—অতি সামান্য অংশ খাওয়াও মহাপাপ—মুসলমানের কাছে শূকর মাংসও সেইরূপ। তাই এদেশে মত্তপান ঠিক সেই রকমই বর্জন করতে হবে কি না সেই প্রশ্নটা মাঝে মাঝে ওঠে।

ইতিমধ্যে ঔষধের মাধ্যমে অনেকেই সেটা প্রতিদিন পান করছেন—জানা-অজানায়। বেশীর ভাগ টনিকেই পনেরো, সতেরো পার্সেন্ট এলকহল থাকে। একটি তরুণ এলকহলের তত্ত্ব না জেনে আমাকে এক বোতল টনিক দিয়ে বললে, ‘অত্যুৎকৃষ্ট টনিক, শ্রুত ! খাওয়ার সঙ্গেই মাথাটা চিম চিম করে, শরীরে বেশ ফুঁতির উদয় হয়।’ আমি মনে মনে বললুম, ‘বটে ! ফুঁতিটা টনিকে ওষুধ থেকে না ঐ ১৭ পার্সেন্ট মদ থেকে সেটা তো জানানো না বৎস ! অর্থাৎ পুচ্ছটি উন্মোচন করে—ইত্যাদি।’ কারণ টনিক বজ্জিত ১৭ পার্সেন্ট এলকহল সমন্বিত যে-কোনো মত্ত পান করলেই মাথাটা চিম চিম করে শরীরে বেশ ফুঁতির উদয় হয়।’

ভলতেয়ারের একটি ‘আপ্তবাক্য’ এত বেশী সুস্বাদ, এত বেশীবার মনে পড়ে যে সেটা আবার বললে পাঠক যেন বিরক্ত না হন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যখন অতি সামান্য কিছুটা ইউরোপে পৌঁচেছে তখন এক শ্রেণীর কুসংস্কারবাদী বলতে আরম্ভ করলো, ভারতবাসীরা মস্তের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ঐ সময় এদেরই একজন ভলতেয়ারকে শুধায়, ‘মস্তোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মেরে ফেলা যায় কিনা ?’ ভলতেয়ার একটু বাঁকা হেসে বললেন, ‘নিশ্চয়ই। তবে খাতে কোন গোলমাল না হয় তার জগৎ আগের থেকে পালটাকে বেশ করে সঁকো খাইয়ে দিয়ো।’

এই হচ্ছে আসল তত্ত্ব কথা—সঁকোটাই সত্য ; মত্তটা থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

ঠিক তেমনি ঐ যে টনিকের কথা একটু আগে বললুম, তার ঐ ১৭ পার্সেন্টটাই সত্য ; বাকি যে সব ওষুধ-বিষুধ আছে সেগুলো থাকলে ভাল—

ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি ছেলে বাড়িতে নিজের চেষ্টায় পরিশ্রম করে যেটুকু শেখে সেইটেই সেকো, সেইটেই ১৭ পার্সেন্ট এলকহল। তারই জ্বরে ছেলে পরীক্ষা পাস করে—আমরা মাস্টাররা ক্লাসে যা পড়াই সেটা মস্তোচ্চারণের মত ; থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

এই যে দেশটা চলছে সেটা জনসাধারণের শুভ বা অশুভ বুদ্ধি দ্বারা—সরকার যেটা আছে, সেটা মস্তোচ্চারণের মত। এবং আজকাল তো আকছারই সেই মস্তোচ্চারণও ভুলে ভুলে ভর্তি। থাক আর না। বুদ্ধ বয়সে জেলে গিয়ে শহীদ হতে চাই নে।

ইয়োরোপীয়রা টনিকের অবাস্তুর মস্তোচ্চারণ অর্থাৎ ওয়ুধটা বাদ দিয়ে শুধু এলকহলটাই খায়, তবে ১৭ পার্সেন্টের মত কড়া করে নয়। কেউ খায় স্টাউট, কেউ খায় পোর্ট।

প্রাচ্যে ইহুদি, ক্যাথলিক ও পার্সীদের ধর্মামুষ্ঠানেও কিঞ্চিৎ মত্তের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের সকলেই অত্যধিক মত্তপানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করে থাকেন।

গল্পচ্ছলে প্রচলিত আছে :

দ্বিপ্রহর রাত্রে এক ধার্মিক যুবক
নিদ্রা যায় ; ঐ তার একমাত্র শখ।
একমাত্র স্থখ তার ঐ নিদ্রা বটে,
—পিতা তার বৃদ্ধ অতি, কখন কি ঘটে।
ভগিনীটি বড় হল, বিয়ে দেওয়া চাই
দিবারাত্রি খাটে, আহা, গোনে কড়ি পাই।
যৌবনেই লোলচর্ম হল অস্থি-সার
নিদ্রাতেই ভোলে তাই নির্দয় সংসার ॥

আপনারা তো আর ‘কেচ্ছা সাহিত্য’ পড়েন না। হায়, আপনারা জ্ঞানেন না, আপনারা কি নিধি হারালেন ! ‘বিভাস্বন্দর’ পড়ে যখন আনন্দ পান, তখন কেচ্ছা সাহিত্যে নিশ্চয়ই পাবেন।

আমার নিজের বিশ্বাস কেচ্ছা সাহিত্যের অমুপ্রেরণাতেই বিভাস্বন্দরের সৃষ্টি। তা সে যাক।

এবারে কেচ্ছাটাই শুনুন :

এই কেচ্ছা শোনে যেবা এই কেচ্ছা পড়ে
 উত্তম চাউল পাবে রেশনে না ল'ড়ে ।
 বারো আনা দরে পাবে কিলোর ইলিশ
 সরিষার তেল পাবে না সয়ে গর্দিশ ।
 দেড়টি টাকায় কিলো শোনো পুণ্যবান
 খুশীতে ভরপুর হবে জমীন আসমান ॥

এ সংসারে যে মেলা পাপ মেলা হুঃখ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু এগুলো আসে কোথা থেকে ? সেমিতি—অর্থাৎ ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলিম গুরুরা বলেন শয়তান মানুষকে কুপথে নিয়ে গিয়ে পাপ হুঃখের সৃষ্টি করে । পক্ষান্তরে ভারতীয় তিনটি ধর্মেরই বিশ্বাস পূর্বজন্মের অর্জিত পাপপুণ্যের দরুন এ জন্মেও স্বঃখহুঃখ দেখা দেয়—কাজেই হিন্দুধর্মে শয়তানের প্রয়োজন নেই । একদা কিন্তু এই হিন্দু ধর্মেরও শয়তান জাতীয় একটি অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়ে উপযুক্ত প্র্যাকটিসের অভাবে লোপ পায় ।

নল দময়ন্তীর উপাখ্যান যদিও মহাভারতে স্থান পেয়েছে তবু আমার বিশ্বাস মূল গল্পটি বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল । গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়ুস চোঙা বা নলের ভিতর করে আগুন চুরি করেন ; নলরাজও ইন্দ্র প্রজ্বলনে হুঃচতুর ছিলেন । স্বয়ং দেবতার প্রমিথিয়ুসের শক্রতা করেন । নলের শত্রুতা করে স্বয়ং দেবতার দময়ন্তীর স্বয়ংবয়ে উপস্থিত হন—নলকে তাঁর বলভা থেকে বঞ্চিত করার জন্তে ।

এই নলের শরীরে পাপ কলিরূপে প্রবেশ করেন । এই কলিই আর্ষধর্মে শয়তানের অপজিট নাষার । মনে করুন সেই শয়তান বা কলি ঐ নিদ্রিত যুবকটির সামনে দিল দেখা :

হঠাৎ দেখিল মর্দ সম্মুখে শয়তান
 নিদ্রা তার সঙ্গে সঙ্গে হৈল খানখান ।
 শয়তানের হাতে হেরে ভীষণ তরবার
 আকাশ-পাতাল জুড়ে ফলাটা বিস্তার ।
 ত্রিনয়ন, কণ্ঠে তার নৃমুণ্ডের মালা
 জিহ্বা তার রক্তময় যেন অগ্নি ঢালা ।

ইটি আসলে কথকতা । অতএব তাবৎ বক্তব্য ছন্দে দিলে রসভঙ্গ হয় ।

যুবক বেতস পত্রের গ্রায় কস্ত্রমান ।

শয়তান হুকার দিয়ে বললে, 'আজ থেকে স্বর্গ-মর্ত্য আমার পরিপূর্ণ দখলে এসেছে । তোকে আমি এই তরবারি দিয়ে দুই টুকরো করবো । তার পূর্বে

আমার শুব গেয়ে নে।’

যুবা কাঁদতে কাঁদতে বললে, ‘আমার মরতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি মরে গেলে আমার বৃদ্ধ পিতার জন্তে কে অন্ন আহরণ করবে? আমাকে তুমি নিষ্কৃতি দাও।’

শয়তান ক্ষণতরে চিন্তা করে বললে, ‘তোমাকে ছাড়তে পারি এক শর্তে। তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করো। তাহলে তোমার সমস্যাও সমাধান হয়।’ শয়তান অট্টহাস্য করে উঠলো।

পুত্র আর্ত ক্রন্দন করে বললে, ‘অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!

পিতা মোরে জন্ম দিল বাল্যোতে আরাম

কেমনে হইব আমি নেমকহারাম!’

‘নেমকহারাম’ শুনে শয়তানের ক্রোধ চরমে পৌঁছেছে। কারণ সে একদা আল্লার সঙ্গে নেমকহারামী করেছিল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে—‘হিত’ অবশ্য শয়তানের ধারণা অহুযায়ী যেটা হিত—বললে, ‘তা হলে তুমি তোমার ভগিনীকে ধর্ষণ করো।’

যুবা এবারে আর কোনো উত্তর দিল না। সে মৃত্যুর জগ্ন প্রস্তুত হল।

কিন্তু শয়তানের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হবে কেন? সে চায় যুবাকে দিয়ে পাপ করাতে। তাই অগ্ন ট্যাকটিক অবলম্বন করে বললে, ‘তোমাকে শেষ মুক্তির উপায় দিচ্ছি। এই নাও, এক পাত্র মত্ত পান করো।’

যুবা ভাবে :

মত্ত পান মহা পাপ সর্ব শাস্ত্রে কয়

এ পাপ করিলে গতি নরকে নিশ্চয়।

যাইব নরকে আমি নাহি কোনো ডর

শয়তানের শর্ত হীন, পাপিষ্ঠ, বর্বর।

অনিচ্ছায় সে করলে মত্ত পান। তারপর কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত।

মত্তপান করে পরিপূর্ণ মত্তাবস্থায় পাপপুণ্যজ্ঞানহীন যুবা শয়তানের ঐ ‘হীন পাপিষ্ঠ বর্বর’ কর্ম দুটি করে ফেলল।

কাহিনীটি সর্বত্র বলা চলে না। কিন্তু যে মহাজন এটির কল্পনা করেন তিনি স্পষ্টত কাউকে ছেড়ে কথা বলতে চান নি, কোনো পাপ স্পেয়ার করতে চান নি। পৈশাচিক বীভৎস রস সৃষ্টি করে সর্ব মানবের হৃৎকন্দরে ভগবানের ভয় প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন।

এ তো গেল এক পক্ষ। অন্য পক্ষ কি বলেন, তার অহুসন্ধান আমি বহুকাল ধরে করে আসছি। কারণ আরব তথা অন্যান্য প্রাচ্যভূমিতে এ তথ্য সর্ববাদি-সম্মত যে, হেন কাহিনী এ পৃথিবীতে নেই যার বিপরীত গাথাও নির্মিত হয় নি। সেটিও পেয়েছি।

কিছুকাল পূর্বে টুরিজম-প্রসার সংস্থার আমি সদস্য হয়ে যাই—আমার একমাত্র ‘গুণ’ যে, কোন দেশই আমাকে দীর্ঘকাল সহ করতে পারে না বলে আমি সে-দেশ থেকে সংক্ষেপে বিতাড়িত হই, ফলে আমার বহু দেশবাস, বহু দেশদর্শন হয়। এসব দেশের দেওয়ানি আদালতে দেউলৈদের যে লিস্ট টাঙানো থাকে তার প্রত্যেকটিতে আমার নাম পাবেন। যদি কোনোটিতে না পান তবে বুঝে নেবেন সে দেশে আমি নাম ভাড়িয়েছিলুম। বস্তুত আমি কোনো দেশের, কি স্বদেশের কি বিদেশের, কারো কাছে অশ্বলী থেকে মরতে চাই নে।

সেই টুরিজম সংস্থার এক মিটিংএ জর্নৈক সজ্জন সভারস্তেই বলেন, ‘ভদ্র-মহোদয় ও মহিলাগণ, কর্মসূচী আরম্ভ করার পূর্বেই আমার একটি বক্তব্য নিবেদন করি।

প্রবাদ আছে, মূর্গী-ঘরে যদি স্থাল ঢুকতে দাও, তবে সকালবেলার মম্লেটটির আশা ত্যাগ করেই ক’রো। তাই যদি দেশ থেকে মত্তপান একদম কোঁটিয়ে বের করে দাও, তবে ইয়োরোপীয় টুরিস্টের আশা ক’রো না; সে মম্লেটটি আমাদের প্লেট থেকে অন্তর্ধান করবে। অতএব, আপনারা এবং আপনাদের সরকার স্থির করুন, আপনারা টুরিজম চান, না দেশকে মত্তহীন করতে চান। আমার কাছে ছই-ই বরাবর।’

ভারী স্পষ্ট বক্তা। ওদিকে মুরুব্বীদের অনেকেই গাঙ্গীটুপি পরিহিত। এটাও চান ওটাও চান, কিন্তু কি করে উলঙ্গ ভাষায় বলেন, মদটা না হয় থাক। ওঁদের মতলব, এমন এক অভিনব কোঁশল বের করা, যার প্রসাদে আঙা না ভেঙেও মম্লেট বানানো যায়! অতএব এসব ক্ষেত্রে যা উইদাউট ফেল্ করা হয় তাই সাব্যস্ত হল। পোস্টপোন করো।

মিটিঙের শেষে আমাদের জগ্ন লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। আমি শক্তিত হয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলুম। সরকারী পয়সায় লাঞ্চকে আমি লাঞ্ছনা নাম দিয়েছিলুম। ওদের ডিনারকে অনেকে সাপার বলতেন। আমি বলতুম suffer : সংক্ষেপে ছপুরে লাঞ্ছনা, রাতে suffer.

আমার অবস্থা দেখে সেই স্পষ্টভাষী বক্তা আমাকে সন্তর্পণে গাধা-বোটের মত টেনে টেনে করিডরে বের করে দে ছুট—ভদ্রতা বাঁচিয়ে। সেই হোটেলের

তার কামরা ছিল। সেখানে বসে আমার হাতে মেহু এগিয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট আহাৰাদি এল। তার পূৰ্বে জিন এল, বিয়ার এল। তিনি খেলেন সামান্ধই।

বললেন, 'যত সব আদিখ্যেতা। কোনো জিনিসে একটা ক্লিয়ার পলিসি নেই। বিশ্বহৃদ্য লোক মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিক, এটা কেউই চায় না। ফ্রান্সের মত এলকহলিজম একটা সমস্তাৰুপে দেখা দিক, সেটাও কেউ চায় না। অথচ ইংরেজ—তথা তাবৎ ইয়োরোপীয়রা—বিজনেস পাকাপাকি করে দুপুর বেলা 'বারে' দাঁড়িয়ে।'

আমাকে বললেন, 'তুনেছি আপনি সাহিত্যিক। একটা ঐ মতীফের (ধরনের) গল্প শুনবেন?'

আমি বললুম 'আলবৎ, একশ বার।'

'হরপার্বতী সাইকল জানেন?' অৰ্থাৎ তাঁদের নিয়ে জনসাধারণের গল্প? তারা যে একে অস্ত্রের সঙ্গে বাজী ধরেন?

এটা তারই একটা।

হরপার্বতী শূন্যমার্গে উড়ে যাচ্ছেন। আকাশ থেকে দেখতে পেলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পুণ্যার্থী গঙ্গাস্নান করছে। পার্বতী তাই দেখে মুহু হাস্ত করলেন।

শিব বললেন, 'কি হল?'

পার্বতী খিলখিল করে হেসে বললেন, 'এবারে তোমার নরকের পথ বন্ধ হল। বিষ্ণু বহুকাল ধরে যমের ঐ পশ্চিমের বাড়িটা চাইছিলেন সেটা পেয়ে যাবেন। বেচারা যম! জানো, যমের সহোদর উকিল ডাক্তারদের পসার কমে গেলে তাদের কি অবস্থা হয়?'

'পসার কমবে কেন?' শিব শিবনেত্র হয়ে শুধোলেন।

কোঁতুকে হাসিলা উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া হর পানে। বললেন, 'কে আর যাবে নরকে? দেখছ না, তামাম দুনিয়ার লোক হৃদমুদ হয়ে গঙ্গাস্নান করছে। সবাই হবে নিম্পাপ। নরকে যাবে কে? তোমাকে বলি নি পই পই করে ঐ গঙ্গাটাকে তাড়াও।' আমার হোস্টটি গল্প ধামিয়ে শুধালেন, 'জানেন বোধহয়, গঙ্গা হলেন পার্বতীর সতীন!'

'গঙ্গা তরঙ্গিনী, শিবের শিরোমণি।'

হোস্ট বললেন, 'শিব এই গঙ্গাস্নানের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন,—কিন্তু তার পূৰ্বেই

'হর প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী,

বৎসরের ফলাফল থাক্ পশুপতি।

যমের রাজত্ব যাবে এইটুকু জানি
অমৃত-রেশন-শপও স্বর্গ নেবে মানি ।
ভেজাল না হয় শুধু এই লাগে ভয়
স্বর্গের হাউসিং লাগি চিন্তা মহাশয় ।’

থুড়ি ! আর কথকতা নয় । আমার হোস্ট এ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি ।

শিব কঙ্কেটা রথের স্টারগার্ড-এ (আকাশে মাড্-এর পরিবর্তে আকছারই নক্ষত্র চূর্ণ উড়ে এসে রথটা ধূলিময় কবে বলে ওটা স্টারগার্ড) কঙ্কেটা ঠুকে ঠুকে সাফ করতে করতে বললেন, ‘কিছু ভয় নাই, ডার্লিং । যারা স্নান করছে তারা এর পুণ্যফলে বিশ্বাস করে না ।’

পার্বতী তাজ্জব মেনে বললেন, ‘সে কী ! তাবৎ পুরাণে যে পষ্ট লেখা রয়েছে । এখন তো ছাপাও হচ্ছে, বেতারেও প্রচার হয়, যে-পণ্ডিত নেহরু—’

শিব তখনো ইণ্ডিয়ার উপরে । ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের কথা ভেবে তাড়াতাড়ি বললেন, ‘আমার কথা বিশ্বাস করো আমি প্রমাণ করতে পারি ।’

যথারীতি হু’জনাতে বাজী ধরা হল—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ভিতর শিব প্রমাণ করবেন, গঙ্গাস্নান যারা করে তারা মা-গঙ্গার কল্যাণে নিষ্পাপ হল বলে বিশ্বাস করে না ।

অতি প্রত্যাষে বাজীর চুক্তিমত পার্বতী রাজরাজেশ্বরীর মহিমাময় সজ্জা পরে কিন্তু অংশিয় বিষণ্ণ বদনে বসলেন গঙ্গাতীরে । আর তাঁর কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন শিবঠাকুর—তাঁর সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ !

গঙ্গাস্নান সেরে উঠে এ দৃশ্য দেখে প্রথম ব্রাহ্মণ অবাক । কৌতূহল দমন না করতে পেরে দরদী কণ্ঠে শুধালো, ‘মা, এ কি ব্যাপার !’

নিখুঁত ক্ষুদ্র দুটি নাসারন্ধ্র দিয়ে উষ্ণতম দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্বতী বললেন, ‘বাবা, আমার কপাল । দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমার স্বামীর অবস্থা । তবে ভগবানের দয়ায় এক গণৎকারের সঙ্গে দেখা । সে তাঁর হাত দেখে বলেছে, কোন নিষ্পাপ পুরুষ তাঁকে স্পর্শ করা মাত্রই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন ।’

ব্রাহ্মণ কাঁচুমাচু হয়ে ‘হ্যাঁ মা, তা মা’, বলে বাৎ মাছটির মত মোচড় মেরে হাওয়া ।

পার্বতী তো বজ্রাহত । লোকটা এইমাত্র গঙ্গাস্নান করে নিষ্পাপ হয়ে মা গঙ্গার কোল থেকে বেরিয়ে এল । তার মুখেও দয়ামায়ার চিহ্ন । তবে কি—তবে কি গঙ্গাস্নানে তার বিশ্বাস— ! শিব যুহু হাস্য করলেন ।

কিছুক্ষণ পরেই আরেক স্নান-সমাপ্ত দ্বিজ । কথোপকথন পূর্ববৎ । বাৎ

মাছের মোচড়টিও তখন। পার্বতী দিশেহারা। ভোলানাথ আশ্রদেশ বিস্তীর্ণ করলেন।

চললো যেন প্রাশেসন। পার্বতীর গলা থেকে একই রেকর্ড বেজে চললো। ফল একই। ধূর্জটি গঙা দুই হাই তুলে পদ্মনাভ স্বরণে এনে ঘুমিয়ে পড়লেন। দেবসমাজে এই হলো ঘুমের বড়ি সনোরিল।

করে করে বেলা দ্বিপ্রহর। ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট, কোলাহল থেমে গেছে, জনপদবাট পায়হীন। গঙ্গাতীরও ভূতনাথের শ্মশানসম নিজ্জন।

অপরাহ্ন। পার্বতীর ক্লান্তি এসে গেছে। বললেন, ‘নন্দীকে ডাকো, বাড়ি যাই। আমি হার মানলুম।’

শিব বললেন, ‘সন্ধ্যা অবধি থাকার কথা। তাই হবে।’

এ তো কলকাতা নয় যে বাবুরা হাওয়া খেতে সঙ্কেবেলা গঙ্গাতীরে আসবেন। কাগ-কোকিলও সেখানে আর নেই।

এমন সময় ক্ষীণ কনে দেখার মিলোয় মিলোয় আলোতে দূর থেকে দেখা গেল এক ইয়ার-গোছ নটবর। ডান হাত দিয়ে তুড়ি দিতে দিতে গান গাইছে, ‘লে লে শাকী, ভর দে পেয়ালা।’ বাঁ বগলে হাফ-পাট। বদনটি তার প্রফুল্ল। আপন মনে গান গাইতে গাইতে এদিক পানেই আসছে।

আসন্ন সন্ধ্যায় নিজ্জন গঙ্গাতীরে অপরূপ সুন্দরী দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। আপন মনে ‘মাইরি’ বলতে না বলতে হঠাৎ তার চোখ গেল সিঁথির সিঁদুরের দিকে। মাতাল যে কখন আচম্বিতে অকারণ পুলকে নেচে ওঠে, আর কখন যে সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়—সেটা পাকা ভুড়ির ভুড়িও আগভাগে বলতে পারে না। এবং মাতালের পুলক এবং কুঠা দুইই তখন পৌঁছয় চরমে, হাফাহাফি সঙ্কিস্থলের বেনের পথই যদি সে নেবে তবে তো সে নর্মাল! বোতলে পয়সা বরবাদ করবে কেন?

মাতালের কোতুহল হল। তহুপরি সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবুদ্ধিও জাগ্রত হল। মেয়েটাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। এই ভরসঙ্কেবেলায়—

কুঠায় যেন আপন পাঞ্জাবির ভিতর মায় পা দুখানা, সর্বশরীর লুকিয়ে নিয়ে বললে, ‘মা, এই অবেলায়, আপনি, এখানে, জানেন না, কি বলবো, কিন্তু কেন?’

পার্বতী মাতাল দেখে প্রথমটায় সঙ্কুচিত হয়ে ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। মাতাল কিন্তু মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ঠায় দাঁড়িয়ে। কী আর করেন জগন্মাতা পার্বতী? আর বলাও তো যায় না, মাতাল! কখন রঙ বদলায়।

থেমে থেমে বললেন তাঁর হৃদয় কাহিনী হৃদয়তর নির্ধারকরূপে।

সঙ্গে সঙ্গে মাতালের মুখে উৎসাহ আর আনন্দের ছাতি। হাসিও চাপতে পারে না।

কোন গতিকে বললে, ‘হায় রে হায়, এই সামান্য বিষয় নিয়ে মা, তোমার দুর্ভাবনা! তুমি এক লহমা বসো তো মা শান্ত হয়ে।’

তারপর বললে, ‘চতুর্দিকে কিন্তু চোর-চোঁটার পাল। হেঁ হেঁ—মা, কিছু মনে করো না, ঐ যে রইল বোতলটা তার উপর আধখানা চোখ রেখো।’

বিড়বিড় করে আপন মনে বললে, ‘এই মাঘের শীতের ভরসঙ্কেবেলা চানটা না ধরিয়ে ছাড়লে না। মহামূল্যবান নেশাটাও মেরে যাবে দড়কছা। তা আর কি করা যায়!’

ঝপ্ করে গঙ্গায় এক ডুব মেরে উপরে উঠে খপ্ করে ধরলে শিবের চ্যাঙখানা।

বজ্রিশ নয় যেন চৌষট্টিখানা দাঁত বের করে বললে, ‘হল মা-জননী? এই সামান্য জিনিসটের জন্তে তুমি এতখানি ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলে? ছিঃ মা, তোমার বিশ্বাস বড় কম!’

মাঝ গাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘ঐটে কি তোমাদের নৌকো? কে যেন ডাকছে? আমি তা হলে আসি। আমার আবার বেতো শরীর। পেন্নাম হই মা, বাবাজী সেবে তো উঠলো—এবারে একটু—ইয়ে মানে সাবধানে—।’

লাঞ্চ শেষ হয়ে এসেছে। সোফায় বসে সিগার ধরিয়ে হোস্ট বললেন, ‘দেশ বোর্ন-ড্রাই হোক কিংবা উচ্ছলে যাক—আমার কিচ্ছুটি বলার নেই। কিন্তু হু’ একটা মাতাল না থাকলে ডেয়ারিং কাজ করবে কে?’

আমারও নিজের কিচ্ছুটি বলার নেই। আমি হু’পক্ষেরই বক্তব্য নিবেদন করলুম মাত্র।

আমি পক্ষ নেবই বা কেন? এক পক্ষ বলছেন আমাকে ড্রাই করে ছাড়বেন, অন্য পক্ষ বলছেন, আমাকে ভিজিয়ে দেবেন। হু’পক্ষেই দারুণ লড়াই।

দুটো কুকুর যদি এক টুকরো হাড়ি নিয়ে লড়াই করে, হাড়িটা তো তখন কোনো পক্ষে যোগ দিয়ে লড়াই করে না!

শ্রীচরণেশ্বর

কতকগুলো খেলা প্রায় সব দেশের ছেলেমেয়েরাই খেলে। যেমন মনে করো, কানামাছি কিংবা লুকোচুরি। আবার মনে করো সঁতার কাটা ;—সাহারার মরুভূমিতে, কিংবা মনে করো খুব বড় শহরে, যেখানে নদী পুকুর নেই, সেখানে যে সঁতার কাটাটা খুব চালু হতে পারে না, সেটা অন্যায়সেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। জল আছে অথচ সঁতার কাটাটা লোকে খুব পছন্দ করে না, তাও হয়। শীতকালে ইয়োরোপের সব নদী-পুকুর জমে বরফ হয়ে যায় না, তবু সেই পাথর-ফাটা শীতে কেউ পারতপক্ষে জলে নামতে চায় না—সঁতারের তো কথাই ওঠে না।

খেলাধূলো তাই নির্ভর করে অনেকটা দেশের আবহাওয়ার উপর। কিছু না কিছু জল প্রায় সব দেশেই আছে, তাই কাগজ বা পাতার ভেলা সবাই জলে ভাসায়। কিন্তু যে দেশে ঝামাঝ-ঝম্‌ বৃষ্টি নেমে আজিনা ভরে গিয়ে চতুর্দিকে জল ঠে-ঠে করে না, সে দেশের ছেলে-মেয়েরা আর দাওয়ায় বসে আজিনার পুকুরে কাগজের ভেলা ভাসাবে কি করে? অথচ ভেলা-ভাসানোর মত আনন্দ কম খেলাতেই আছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার কথা ভেবে গান রচেন :

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে

পিছন পানে চাইনে ফিরে।

আর ছেলেমেয়েদের জন্ত ‘শিশু ভোলানাথ’র এ-কবিতাটি তোমরা নিশ্চয় জানো :

দেখছ'না কি নীল মেঘে আজ

আকাশ অঙ্ককার ?

সাত-সমুদ্র তেরো-নদী

আজকে হব পার।

নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,

নাইকো হরিশ খোঁড়া—

তাই ভাবি যে কাকে আমি

করব আমার ঘোড়া।

কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই

বাবার খাতা থেকে,

নৌকো দে-না বানিয়ে—অমনি

দিস, মা, ছবি এঁকে ।

রাগ করবেন বাবা বুঝি

দিল্লী থেকে ফিরে ?

ততক্ষণ যে চলে যাব

সাত-সমুদ্র-তীরে ।

ভারী চমৎকার কবিতা ! কিন্তু বাকীটা আর বললুম না । যাদের পড়া নেই, তারা যেন ‘শিশু ভোলানাথ’খানা খোলে, এই হচ্ছে আমার মতলব ।

তা সে কথা যাক । বলছিলুম কি, আবহাওয়ার উপর খেলাধুলো অনেকটা নির্ভর করে । আমাদের দেশ জলে ভর্তি, বিশেষ করে পূর্ব বাঙ্গলা, তাই আমাদের খেলাধুলো জমে ওঠে জলের ভিতরে বাইরে । তেমন শীতের দেশে বরফ পড়ে বিস্তর, আর তাই নিয়ে ছেলেদের খেলাধুলোর অন্ত থাকে না । ‘ধুলো’ বলা অবশিষ্ট ভুল হলো, কারণ বরফে যখন মাঠ-ঘাট, হাট-বাট সব কিছু ছেয়ে যায়, তখন তামাম দেশে এক রস্তু ধুলোর সন্ধান আর পাওয়া যায় না ।

কাবুলে যখন ছিলুম, তখন জানলা দিয়ে দেখতুম, ছেলেমেয়েরা সকাল থেকে পেঁজা বরফের গুঁড়ো হাতে নিয়ে টেলা পাکیয়ে একে ওকে ছুঁড়ে মারছে, সে টিল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চট করে সরে যাবার চেষ্টা করছে । যদি তাগমাকি লেগে গেল তবে তুমি ওস্তাদ ছেলে, হাতের নিশান ভালো, হয়তো একদিন ভালো বোলার হতে পারবে । আর না লাগলেও তা নিয়ে ভাবনা করা চলবে না, কারণ ততক্ষণে হয়ত তোমার কানে এসে ধাঁই করে লেগেছে আর কারো ছুঁড়ে মারা গোলা । কানের ভিতর থানিকটা বরফের গুঁড়ো ঢুক গিয়ে কানের ভিতরকার গরমে গলতে আরম্ভ করেছে । ভারী অস্বস্তি বোধ হয় তখন—মনে হয়—যেন কেউ হুড়হুড়ি দিচ্ছে । তখন খেলা বন্ধ করে কান সাফ করার জন্ত দাঁড়াতে হয় । আর ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যখানে ও একম ধারা দাঁড়ানো মানেই আর পাঁচজনের তাগ হওয়া । মাথা নীচু করে যতক্ষণ তুমি কান সাফ করছো, ততক্ষণে এ-দিক, ও-দিক, চতুর্দিক থেকে গোটা দশেক গোলাও খেয়ে ফেলেছ ।

তা বয়েই গেল । বরফের গোলা যত জোরেই গায়ে এসে লাগুক না কেন, তাতে করে চোট লাগে না । গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গোলা চুরমার হয়ে যায় । কিছুটা বরফের গুঁড়ো অবশিষ্ট জামা-কাপড়ে লেগে থাকে । তা সেটা হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেই হয়—না হলে গরম জামা কাপড়ের ওম লেগে থানিকক্ষণ বাদে বরফ গলে গিয়ে কাপড় ভিজিয়ে দেবে ।

বরফ জমলেই এ খেলা জমে উঠতো। আর আমি কাজকর্ম ধামাচাপা দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসতুম।

এ খেলায় সত্যিকার গুস্তাদ ছিল একটি সাত-আট বছরের ছেলে। খেলার মধ্যখানে সে এমনি চর্কিবাজির মত ঘুরত যে তার গায়ে গোলা ছোঁড়ে কার সাধি। আর আমাদের দেশের পাকা লেঠেলের মত সে একাই জন আষ্টেককে অনায়াসে কাবু করে ফেলত। ভারী মিষ্টি চেহারা, পাকা আপেলের মত টুকটুকে দু'টি গাল, নীল চোখ, আর সেই ছ'চোখে যেন ছনিয়ার মত দুইমি বাশা বেঁধে বসে আছে। নাম ইউসুফ, পাশের বাড়িতে থাকে, আর তার বাপ আমাদের কলেজেরকেরানী। আমাকে পথে পথে সেলাম করে কিন্তু সসম্মত সেলামের সময়ও চোখের দিকে তাকালে মনে হত ছেলেটা কোনো এক নতুন দুইমির তালে আছে। যদি জিজ্ঞেস করতুম, 'কি রকম আছিস?' তাহ'লে এক গাল হেসে কি একটা বলত, যার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম কোনো একটা দুইমির স্বেযোগ পলে সে আমাকেও ছাড়বে না।

সে-ই একদিন বাড়ি বয়ে এসে সোৎসাহে খবর দিয়ে গেল, আমি তাদের ইস্কুলে বদলি হয়ে এসেছি। তার চোখে মুখে হাসি আর খুশী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমি তার চোখে যেটি লক্ষ্য করলুম সেটি হচ্ছে "এইবার আসুন শ্র, আপনাতে আমাতে এক হাত হয়ে যাবে।" আমি যে খুব ভয় পেলুম তা নয়, কারণ ছেলেবেলায় আমিও কম দুই ছিলাম না।

ওদের ইস্কুল বড় অদ্ভুত। পাঁচ-ছ' বছরের ছেলেদের ক্লাস ওয়ান থেকে আই-এ ক্লাসের ছেলেরা একই বাড়িতে পড়ে। তাই সেটাকে পাঠশালা বলতে পারো, হাইস্কুল বলতে পারো, আর কলেজ বললেও বাধবে না। আমি বদলি হলুম কলেজ বিভাগে—ফাস্ট' আর সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবার জন্ত। এ ছ' ক্লাস পড়িয়ে আমার হাতে মেলা সময় পড়ে থাকত বলে একদিন প্রিন্সিপাল অছরোধ করলেন, আমি যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদেরও ইংরিজি পড়াই তবে বড় উপকার হয়। আমি থানিকটে ভেবে নিয়ে বললুম, তার চেয়ে আমাকে বরঞ্চ ক্লাস ওয়ানে পড়াতে দিন। আসছে বছর ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও প্রোমোশন দেবেন—অর্থাৎ আমি টু'তে পড়াব, তার পরের বছর থ্রী'তে। এই করে করে যাদের কলেজে টেনে নিয়ে আসতে পারব তাদের ইংরিজি জ্ঞান থেকে বৃদ্ধিতে পারবো আমি ভালো পড়াতে পারি কি না। প্রিন্সিপাল তো কিছুতেই মানেন না; বলেন, 'সে কি কথা! আপনি পড়াবেন

ক্লাস ওয়ানে !’ আমার প্রস্তাবটার তত্ত্ব বুঝতে তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগল। কাবুলী প্রিন্সিপালের বুদ্ধি—থাক, গুরুজনদের নিন্দে করতে নেই।

ওদিকে ক্লাস ওয়ানে হৈ হৈ রৈ রৈ। কলেজ বিভাগের অধ্যাপক আসছেন ক্লাস ওয়ানে পড়াতে !

আমার তখন আদপেই মনে ছিল না ইউসুফ ক্লাস ওয়ানে পড়ে। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকতেই দেখি, সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাইকে কি যেন বোঝাচ্ছে। অমুমান করলুম, প্রতিবেশী হিসেবে সে আমার সম্বন্ধে যেটুকু জানে সেটুকু সকলকে সগর্বে সদস্তে জানিয়ে দিচ্ছে। আমার চাকর আবদুর রহমানের সঙ্গে ইউসুফের আলাপ পরিচয় ছিল। আর আবদুর রহমান ভাবতো তার মনিবের মাথায় একটুখানি ছিট আছে। আবদুর রহমান যদি সেই স্মৃতিবরটি ইউসুফকে দিয়ে থাকে, আর সে যদি ক্লাসের সবাইকে সেই কথাটি জানিয়ে দেয়, তবেই হয়েছে !

ক্লাসে মাষ্টার ঢুকলেই কাবুলের ছেলেরা মিলিটারি কায়দায় সেলুট দেয়— আফগানিস্তান মিলিটারি দেশ। আমি ক্লাসে ঢুকতেই ইউসুফ তড়াক করে স্পারি গাছের মত খাড়া হয়ে মিলিটারি সেলুটের জুকুম হাঁকল। তার পর খুশীতে ডগমগ হয়ে আপন সীটে গিয়ে বসল।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই ইউসুফ উঠে দাঁড়ালো। ‘বাইরে যেতে পারি, স্তর ?’ আমি বললুম, ‘যা, কিন্তু দেখ, আমি বাইরে যাওয়া-যাওয়ি জিনিসটা মোটেই পছন্দ করি নে। যাবি আর আসবি।’ ‘নিশ্চয় স্তর।’ বলে আরেকটা মিলিটারি সেলুট হুঁকে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট যেতে না যেতে ইউসুফ ফিরে এল। তাই তো, ছেলেটা তা হলে অতটা হুটু নয়। কিন্তু আরো তিন মিনিট যেতে না যেতে আমার ভুল ভাঙ্গলো। ইউসুফের পাশের ছেলেটা পড়ার মাঝখানে হঠাৎ চোঁচিয়ে বলল, ‘স্তর, আমার পকেট ভিজে গিয়েছে,—এই ইউসুফটা আমার পকেটে বরফের ঢেলা রেখেছিল।’ ইউসুফ আরো চোঁচিয়ে বলল, ‘না স্তর, আমি রাখি নি।’ ছেলেটা আরো চোঁচিয়ে বলল, ‘আলবাৎ তুই রেখেছিস।’

ইউসুফ বলল, ‘তোর ডান পকেট ভেজা, আমি তো বাঁ দিকে বসে আছি।’ ছেলেটা বলল, ‘তুই না হলে বরফ আনল কে ? তুই তো এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়েছিলি।’

হট্টগোলের ভিতর আমি যে তাবৎ তর্কাতর্কি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম তা নয় কিন্তু কথা কাটাকাটিটা মোটের উপর এই রকম ধারায়ই চলেছিল। বিশেষ করে শেষের যুক্তিটা আমার মনের উপর বেশ জোর দাগ কাটল। ইউসুফ না

হলে বরফের টেলা আনল কে ? আর বরফ তো আগের থেকে ঘরে এনে জমিয়ে রাখা যায় না—গলে যায় ।

রাগের ভান করে কড়া হুকুম দিলুম, 'ইউসুফ, তুই বেকির উপর দাঁড়া ।'

ইউসুফ বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে তড়াক করে পলটনি কায়দায় বুট দিয়ে খটাস করে শব্দ করে বেকির উপর দাঁড়িয়ে ফের সেলুট দিল । পূর্বেরই বলেছি আফগানিস্তান মিলিটারি দেশ—ছোট ছেলেরা পর্যন্ত পলটনি জুতা পরে আর হুকুম তামিল করার সময় পলটনি সেলুট ঠোকে ।

ভাবলুম, ইউসুফ আমাদের দেশের ছেলের মত 'বসি, স্তর ?' বলে অশ্রু নয় করবে । আদপেই না । চাঁদপানা মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল । শেষটায় আমিই হার মানলুম । বললুম, 'বস্ । আর ও রকম করিস নে ।' ইউসুফ আরেকবার সেলুট জানিয়ে বসে পড়ল ।

বাড়ি ফেরার সময় বুঝতে পারলুম, সব দেশের খেলাধুলা যে রকম আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে, ছুটুমিটাও ঠিক সে রকম অনেকটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে । আমাদের দেশের ছেলেরা বরফের গুঁড়ো পাবে কোথায় যে তাই নিয়ে ছুটুমি করবে ?

তারপর দু' তিন দিন ইউসুফ ঠাণ্ডা । ভাবলুম প্রথম দিনের সাজাতে হয়তো ইউসুফের আক্কেল হয়ে গিয়েছে । আর জ্বালাতন করবে না ।

আমাদের দেশ গরম, তাই ঘরে ঘরে পাথার ব্যবস্থা থাকে । কাবুল ঠাণ্ডা, তাই সেখানে ক্লাসে ক্লাসে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা । একদিন ক্লাসে ঢুকে দেখি ঘরভর্তি ধুঁয়া, আর চিমানির আগুন নিভে গিয়েছে ।

ছেলেরা কাশছে আর ইউসুফ পাতলুনের দুই পকেটে হাত পুরে অত্যন্ত বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে । দেশে টানা পাথার দড়ি ছিঁড়ে গেলে যে রকম চাপরাসীর সন্ধানে ছেলে পাঠানো হয় আমি তেমনি বললাম, 'চাপরাসীকে ডাকো ।' ইউসুফকে পাঠানো আমার মতলব ছিল না । কিন্তু সে চট করে 'এক্সনি ডাকছি স্তর' বলে ছট করে বেরিয়ে গেল । থামাবার ফুরসৎ পেলুম না ।

মিনিট তিনেক পরে এলেন খুদ্দ প্রিন্সিপাল । মুখে কেমন ঘেন একটু বিরক্তি । বললেন, 'আপনি নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?' আমি তো অবাক !

'সে কি কথা ! আমি আপনাকে ডেকে পাঠাবো কেন ? আমার দরকার হলে আমি নিজেই তো আপনার কাছে যেতে পারি । আমি তো ডেকে পাঠিয়েছি চাপরাসীকে, আগুন নিভে গিয়েছে বলে ।' প্রিন্সিপালের মুখ থেকে

বিরক্তির ভাব কেটে গিয়ে দেখা গেল রাগ। ইউসুফের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে তুই আমাকে ডাকলি কেন?'

ইউসুফ তার ড্যাভড্যাভে চোখ হরিণের মত করণ করে বলল, 'আমি তো সুনলুম, প্রিন্সিপাল সায়েবকে ডেকে নিয়ে আয়। তা কি জানি ওঁর ফার্সী আমি ঠিক বুঝতে পারি নি হয়তো।' প্রিন্সিপাল ইউসুফকে দুই ধমক দিয়ে চলে গেলেন।

কি ঘড়েল ছেলে রে বাবা! আমি বিদেশী বলে যে খুব ভালো ফার্সী বলতে পারি নে তার পুরো স্বেযোগ নিয়ে সে আমাকে এক দফা বোকা বানিয়ে দিল।

ততক্ষণে চাপরাসী এসে আগুন জালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই আগুন জ্বলতে চায় না। ঘর আরো ধুঁয়োয় ভরে গিয়েছে। ছেলেরা কাশতে আরম্ভ করেছে, কারো কারো চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, আমার তো প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। চাপরাসী ততক্ষণে হার মেনে চলে গিয়েছে বুড়ো চাপরাসীর সম্মানে—সে যদি কিছু করতে পারে। ইউসুফ বলল, 'শ্র, জানলাগুলো খুলে দিই?' আমি বললুম, 'দাঁও।' দম বন্ধ হয়ে তো আর মারা যেতে পারি নে।

এক মিনিটের হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকে আমাদের হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগিয়ে দিল। পড়াবো কি, আর পড়বেই বা কে? আমাদের দেশে যে রকম ভয়ঙ্কর পরমের দিনে ক্লাসের পড়ার দিকে মন যায় না, কাবুলে তেমনি দারুণ শীতের মাঝখানে পড়াশোনা করা অসম্ভব। হাতের আঙ্গুল জমে গিয়েছে, কলম ধরতে পারছি নে, বইয়ের পাতা ওন্টানো যায় না। ছেলেরা ততক্ষণে আবার আপন আপন দস্তানা পরে নিয়েছে—আর দস্তানা-পর্য হাতে লেখা, পাতা ওন্টানো, এসব কাজ আদপেই করা যায় না।

ততক্ষণে বুড়ো চাপরাসী এসেও হার মেনেছে। কিন্তু লোকটা বিচক্ষণ। খানিকক্ষণ চেষ্টা দেওয়ার পর বলল, 'ধুঁয়ো উপরের দিকে না উঠে ঘর ভরে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে ধুঁয়ো বেরোবার চোঙা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে।'।

তদারক করে দেখা গেল বুড়ো ঠিক কথাই বলেছে। চোঙার ভিতরে, উপরের দিকে হাত চালানোতে বেরিয়ে এল একটা ক্যানাস্তার টিন, ছেঁড়া কঙ্কল দিয়ে জড়ানো। বোঝা গেল, বেশ যত্নের সঙ্গে, বুদ্ধি খরচ করে চোঙাটি বন্ধ করা হয়েছে, যাতে করে ধুঁয়ো উপরের দিকে না গিয়ে সমস্ত ক্লাস ভরে দেয়।

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'চোঙা বন্ধ করল কে?'

সমস্ত ক্লাস এক গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই ইউসুফ । আর কে করতে যাবে ?'

ইউসুফের দুশমন গোলাম রহুল বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকি তখন ইউসুফ ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না । নিশ্চয়ই ও করেছে ।'

ইউসুফ বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন গোলাম রহুল ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না । নিশ্চয়ই ও করেছে ।'

গোলাম রহুল চটে গিয়ে বলল, 'মিথোবাদী !'

ইউসুফ মুক্করীর স্বরে বলল, 'এই, স্তরের সামনে গালমন্দ করিস নে ।'

কি জ্যাঠা ছেলে রে বাবা ! বললুম, 'তুই এদিকে আয় ।'

কুইক মার্চে সামনে এসে সেলুট দিল । আমি বললুম, 'তোকে ভালো রকমের সাজা দেওয়া উচিত । আজকে সমস্ত ক্লাসের পড়া নষ্ট করেছিস । ঢোক গিয়ে টেবিলের তলায় । চূপ করে সেখানে বসে থাকবি, আর কথাটি কয়েছিস কি তোর গলা কেটে ফেলব ।'

সুড় সুড় করে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল ।

কাবুলের ক্লাসে মাস্টার মশায়দের টেবিল বিলিতি কায়দায় বানানো হয় । অর্থাৎ তার তিন দিক ঢাকা । শুধু মাস্টার যে দিকে বসেন সেদিকটা খোলা । মনে করো খুব বড় একটা প্যাকিং কেসের ডালাটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিল বানাও আর খোলা দিকটায় পা ঢুকিয়ে দিয়ে বাজটা দিয়ে টেবিলের কাজ চালাও । আমি ঠিক তেমনি ভাবে ব'সে, আর ইউসুফ চূপ করে ভিতরে । নড়নচড়ন নট কিছুর ।

মনে হল ইউসুফের তা নিয়ে কোন খেদ নেই ; কারণ পঞ্চাশ মিনিটের পিরিয়ডের প্রায় আধঘণ্টা সে ধুঁয়ো, প্রিন্সিপাল, আর চাপরাসী দিয়ে বরবাদ করে দেবার বিমলানন্দ আপন মনে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে ।

আমি ছেলেদের পড়াভূম মুখে মুখে । চেষ্টায়ে বলতুম I go, সমস্ত ক্লাস আমার পরে বলত I go, আমি বলতুম We go, ক্লাস বলত We go, এ রকম ধারা you go, you go, কিন্তু Rahim goes, Karim goes, তারপর হুকার দিয়ে বলতুম Rahim and Karim go-o-o-o ।

ওদিকে ইউসুফ চূপচাপ । জিজ্ঞেস করলুম—'তুই বলছিস না কেন রে ?' বাজের অথবা টেবিলের, যাই বলো—ভিতর থেকে ইউসুফের গলা শোনা গেল, 'ও তো আমি জানি ।' আমি বললুম, 'বলে যা ।' সে সমস্ত কনজুগেশনটা ভুল না করে গড় গড় করে আবৃত্তি করে গেল । হুঁ ! ছেলেটা শয়তান বটে, কিন্তু পড়াশোনায় ভালো ।

ঘটা পড়লো। বললুম, 'ইউহুফ বেরিয়ে আয়।' হুডুং করে বেরিয়ে এল। বললুম, 'বল আর ককুথোনো করবি নে।' কি যেন একটা বিড় বিড় করে বলল, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ততক্ষণে ক্লাস ডিসমিস করে দিয়েছি বলে সে একটা ছোটাসে ছোট। সেলুট সেরে ডবল মার্চ করে বেরিয়ে গিয়েছে। তখন বুঝতে পারলুম, হুটুমি করবে না এ প্রতিজ্ঞা করতে সে নারাজ, তাই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েছে।

রেজিস্টার, বই, খড়ি, ডাস্টার গুছিয়ে নিয়ে যেই দাঁড়াব বলে টেবিলের তলা থেকে পা টেনে আনতে গিয়েছি অমনি হু'পা-ই আটকা পড়ে গেল। কি ব্যাপার! ঘাড় নিচু করে দেখি, আমার হু'জুতোর দুই ফিতে একসঙ্গে বাঁধা।

কি করে হল? এ তো বড় তাজ্জব! অবশি, বুঝতে সময় লাগল না। আমার অভ্যাস পা হু'খানি একজোড় করে বসার। ইউহুফ তারই সুবিধে নিয়ে অতি আন্তে আন্তে ফিতের গিঁঠ খুলে হু'ফিতে অর্থাৎ দুই জুতো একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছে! আর সে এমনি মোলায়েম কায়দায় যে, আমি কিছুই টের পাই নি!

আমি হার মানলুম।

বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে দেখি, বাড়ির দেউড়ির সামনে ইউহুফ আমার চাকর আব্দুর রহমানকে হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে, আর বিরাট-বপু আব্দুর রহমান সর্বাঙ্গ ছলিয়ে হেসে কুটিকুটি। আমাকে দেখেই ইউহুফ চটপট চম্পট।

পরদিন কলেজ যাবার সময় আব্দুর রহমান জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'এক রকম বোতামওলা বুট ফিতেওলা জুতোর চেয়ে ভাল।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বস্ বস্, আর জ্যাঠামো করতে হবে না।'

পুচ্ছ (প্র) দর্শন

কুকুর মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে—এ-তথ্য কিছু নূতন নয়। কিন্তু কুকুরের কাটা লেজের অবশিষ্ট চার আঙুল পরিমাণ একটা ছ' ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ানকে বাঁচিয়েছে—এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যে-ব্যক্তি এ ঘটনাটির বর্ণনা আমাকে দেন, তিনি অনেকের কাছেই সুপরিচিত এবং তাঁরা সকলেই সানন্দে শপথ করতে প্রস্তুত হবেন যে, শ্রীযুত বিনায়ক রাও শিবরাম মসোজীকে কেউ কখনো মিথ্যা-ভাষণ করতে শোনেন নি।

আমার শুধু স্কোভ যে, বিনায়ক রাও যখন আমাকে প্রাণ্ডুক্ত ঘটনার সঙ্গে

বিজ্জড়িত তাঁর হিমালয় ভ্রমণ বর্জন করে যান, তখন আমার হৃদয় কল্পনাদৃষ্টি দিকচক্রবালে এতটুকু আভাস দেখতে পায় নি যে, আমার মত নগণ্যজনও একদিন বাঙলা সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবে; নইলে সেদিন আমি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে বিনায়ক রাওয়ের ভ্রমণকাহিনীটি সবিস্তার লিখে রাখতুম। কারণ, আমাদের পরিচিত জন নিত্য নিত্য মানসসরোবর দর্শনে যায় না; তাও পিঠে মাত্র একটি ছাভারশাক নিয়ে। পরবর্তী যুগে আমাদের এক মারাঠা দম্পতি বলেন যে, মানসরোবরে (না মানস সরোবরে তাই আমি জানি নে) যাবার পথে ডাকাতের ভয় আছে বলে তাঁরা সঙ্গে সেপাইশাস্ত্রী নিয়ে যান।

বিনায়ক রাও শ্রীযুত নন্দলালের শিষ্য এবং শিক্ষাশেষে তিনি গুরু নন্দলালের সহকর্মীরূপে কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। নন্দলাল যেরকম দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন, বিনায়ক রাও তেমনি ভারতীয় দৃষ্টিবিন্দু থেকে ভারতীয় বাতাবরণে, ভারতীয় বেশভূষায় মাদম্মা মা-মেরির একাধিক ছবি এঁকে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। ইয়োরোপীয় চিত্রকরদের মাদম্মা দেখে দেখে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম যে, মা-মেরি প্যালেস্টাইন-বালা এবং প্যালেস্টাইন প্রাচ্যভূমি। বিনায়ক রাওয়ের একখানি উৎকৃষ্ট মাদম্মা কিছুদিন পূর্বেও এলগিন রোডের একটি গির্জার শোভাবর্ধন করতো।

তিনি যে চিত্রকর ছিলেন, তার উল্লেখ করছি আমি অল্প কারণে। আর্টিস্ট মাত্রেরই অন্ততম প্রধান গুণ যে, তাঁরা কোনো বস্তু প্রাণী বা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো (ক্যারেকটারিস্টিক) লক্ষ্য করেন এবং ঠিক সেইগুলো মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে প্রকাশ করতেই আমাদের কাছে রূপায়িত বিষয়বস্তু প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনার সময় বিনায়ক রাও দৃশ্যের পর দৃশ্য মাত্র কয়েকটি ক্যারেকটারিস্টিক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হিমালয়ের গিরি-পর্বত-ভূষার-ঝঙ্কা চট্টি-কাফেলা সব যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেতুম। সেটা এখানে এখন আমার পক্ষে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব কারণ আমি কোনো অর্থেই আর্টিস্ট নই।

বিনায়ক রাওয়ের গভীর বন্ধুত্ব ছিল এক জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে—নাম খুব সম্ভব ছিল—এতকাল পরে আমার সঠিক মনে নেই—হাসেগাওয়া। পাঁচ ফুটের বেশী দৈর্ঘ্য হয় কি না হয়, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি পেশী ছিল যেন ইম্পাতের স্প্রিং দিয়ে তৈরি। প্রায় কিছু না খেয়েই কাটাতে পারতেন দিনের পর দিন এবং বীরভূমের ১১০ ডিগ্রীতেও তাঁর মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন দেখা যেত না। বিনায়ক রাওয়ের সঙ্গে তাঁর আরেকটা বিষয়ে ছিল ছব্বছ মিল, ছুঁনাই

অত্যন্ত স্বল্পভাবী। হাসেগাওয়াই প্রস্তাব করেন মানসসরোবরে যাওয়ার।

আমার আজ মনে নেই, কোন্ এক সীমান্তে গিয়ে ঐ পুণ্যসরোবরে যাবার জ্ঞান পারমিট নিতে হয়। বিনায়ক রাও আমাকে বললেন, ‘সব সরকারই বিদেশীদের ভরায়, ভাবে ওরা গুপ্তচর, কি মতলব নিয়ে এসেছে, কে জানে। ওসব জায়গায় তো যায় মাত্র দু’ধরনের লোক। তীর্থযাত্রী, আর যেটুকু সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারবারী লোক—এরা যায় কারাভান বা কাঞ্চেলার দল বানিয়ে। আমি খুঁটান, হাসেগাওয়া বোর্ড; মানসসরোবর আমাদের কারোরই তীর্থ হতে পারে না। তবু ফর্মে লিখে দিলুম তীর্থযাত্রী, নইলে পারমিট অসম্ভব। হাসেগাওয়া বললেন, “আমরা গা-ঢাকা দিয়ে রইব, যতদিন না পারমিট পাই, পাছে আমাদের স্বরূপ না ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে তোমাকে মাউন্টেনীয়ারিং বা পাহাড় চড়ার আর্টে তালিম দেব।” বিনায়ক রাও বললেন, ‘আমি তো মনে মনে হাসলুম। হাসেগাওয়ার তুলনায় আমি তো রীতিমত পাসলওয়ান। আমি পাহাড় চড়ি চড় চড় করে—ও আবার আমায় শেখাবে কি? কিন্তু ভুল ভাঙল প্রথম দিনই। পাশেই ছিল একটা ছোটখাটো পাহাড়। সেইটে দিয়েই হল আমার প্যাকটিস শুরু। হাসেগাওয়া আমাকে পই পই করে বাব বার বললেন, “কনে-বউটির মত চলি চলি পা পা করে ওঠো, নইলে আগেরে পস্তাবে।” আমি মনে মনে বললুম, দুস্তোর তোর পা পা। চড় চড় করে উঠতে লাগলুম চড়াই বেয়ে—বাঘের শব্দ পেলে বাদর ঘে-ধরনে সৌন্দর্যবনে স্তম্ভরী গাছ চড়ে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মশাই, ঘণ্টাটাই পরে দেখি অবস্থা সঙ্গীন। আর যে এক কদমও পা চলে না। ভিরমি যাবার উপক্রম। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আমি বসে পড়লুম একটা পাথরের উপর। ঘণ্টাটাক পরে হাসেগাওয়া আমাকে পাস করলেন, আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুছ হেসে। তিনি চুড়ায় উঠলেন। আমি বসে বসে দেখলুম। নোমে এলেন। বিশ্বাস করবেন না, সৈয়দসাহেব, আমার আত্মাভিमानে লাগল জোর চোট।’

আমি বললুম, ‘দাক্ষিণাত্যের তীর্থ আল্লামলাইয়ের রমন মহর্ষির নাম শুনেছি নিশ্চয়ই। তিনি অরুণাচলম পাহাড়ের উপর কাটান চল্লিশ না পঞ্চাশ বছর কিংবা ততোধিক। পাহাডটা কিছু মারাত্মক উঁচু নয় কিন্তু ঝড়ে-বাদলায়, গরমে-ঠাণ্ডায়, কখনো বা অত্যন্ত অস্বস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁকে দিনে অন্তত একবার করে ওঠানামা করতে হত। এক পুণ্যশীলা গ্রামের মেয়ে তাঁর জগ্ন প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতো পাহাড়ের তলায়, যেখানে আজকের দিনের আশ্রম। তিনিও আমাদের ঐ চলি চলি পা পা-র উপদেশ দিয়েছেন, খুব ভালো

ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে। তারপর বলো।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'পরদিন আরেকটা পাহাড়ে চেষ্টা দিলুম। সব জেনে-
শুনেও আমার কিন্তু ঐ কনে-চাল কিছুতেই রপ্ত হচ্ছিল না। আর হাসেগাওয়া
প্রতিদিন আমার দিকে তাকিয়ে য়ুহু হেসে পাস্ করতেন ও জিততেন লজ্জাকর
মাজিন রেখে।

'আমরা দিনের পর দিন গ্রহর গুনছি—পারমিট আর আসে না, ওদিকে
আমরা জনমানবহীন পাহাড়গুলো চড়ছি আর ভাবছি, আত্মগোপন করেছি
উত্তমরূপেই। কিন্তু ইতিমধ্যে সীজন যে বেশ এগিয়ে গিয়েছে। আর বেশী দেরি
হলে তো বরফ পড়তে আরম্ভ করবে।

'শেষটায় এক বড়কর্তার কাছে ডাক পড়ল। তাঁর প্রাসাদে উঠে দেখি, ইয়া
আল্লা। তার সেই উঁচু টিলার স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া জোরদার টেলিস্কোপ।
আমরা যখন অস্ট্রিচ পাখীর মত বালুতে মাথা গুঁজে আত্মগোপনের আত্মপ্রসাদ
অনুভব করছি, ইনি তখন প্রতিদিন নিৰ্ঝঙ্কটে আমাদের প্রতিটি পাহাড় ওঠা
পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কোঁতুহলী হয়ে আমাদের সম্বন্ধে সর্বসংবাদ সংগ্রহ
করেছেন। বেশ রসিয়ে রসিয়ে আত্মোপাস্ত বললেন। আমাদের মুখ শুকিয়ে
গেল—ইন্তেক যে-জাপানী বদন অনুভূতি প্রকাশে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ও অনিচ্ছুক
সেটিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হল।

'কিন্তু বুখাই আতঙ্ক; আমরা খামোখাই ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছিলুম।
আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বড়কর্তা সর্বসংবাদ শুনে আমাদের অভিযানাকাজ্জা
প্রসন্নতর দৃষ্টিতে আশীর্বাদ করেছেন। কারণ, আমরা ধর্ম বা অর্থ কোনোটাই
সঞ্চয় করতে যাচ্ছি না—আমরা আসলে তীর্থযাত্রী নই, আর ব্যবসায়ী তো
নই-ই। তবে তখনো জানতুম না, আরেকটু হলেই অনিচ্ছায়, অন্তত আমার,
মোস্‌লাভটা হয়ে যেত।'

আমি বললুম, 'ধর্ম, অর্থ, মোস্‌ তিনটির তো জমা-খরচ হল, আর কাম?'

মোস্‌জী বললেন, 'রাম, রাম।' ওর মত প্যুরিতান আমি কোনো মঠ,
কোনো মনাস্টেরিতে দেখি নি।

তারপর বিনায়ক রাও আমার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি এঁকে
যেতে লাগলেন। কত না বনস্পতি, অজানা-অচেনা বিহঙ্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয়,
আন্দোলিত উপত্যকার উপর ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী দোহুলামান ফুলের বন্যা,
পার্বত্য-নদী, জলপ্রপাত, অত্রংলহী পর্বত, পাতাললম্পর্শী অন্ধকূপ, সংকটময় গিরি-
সংকট, পাহাশালা, চট্ট, পার্বত্য ভ্রমণদের জিহ্বানিঃস্রবণপূর্বক তৎসঙ্গে ঘন ঘন

বৃদ্ধজুষ্ঠয় আন্দোলন দ্বারা অভিবাদন, দুর্গন্ধময় স্নেহজাতীয় পদার্থসহ চা-পানের নিমন্ত্রণসহ অতিথি সংকার। আরো এত সব বিজ্ঞাতীয় বস্তু ও কল্পনাতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, সেগুলোর নির্ঘণ্ট মাত্র দিতে হলে প্রচুর অবকাশ ও প্রচুরতর পরিশ্রমের প্রয়োজন। যেতি বা এবমিনেবল স্নোম্যান সন্মুখে যে-সব কাহিনী বর্ণন করেছিলেন শুধু সেগুলো শিকের হাঁড়িতে সন্মুখে তুলে রেখেছি : অস্বদেশীয় সম্পাদক ও প্রকাশকদের শেষশয্যায় সেগুলো তাঁদের রসিয়ে রসিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের শেষ যাত্রাটি বিভীষিকাময় করে দেবার জন্তে !

বিনায়ক রাও বললেন, 'ক্রমে ক্রমে আমরা লক্ষ্য করলুম, পাহাড় থেকে নেমে আসছে সবাই, উপরের দিকে যাচ্ছে না কেউই। চট্টির পর চট্টি দেখি হয় জনমানবহীন—দরজা-খা-খা করছে কিংবা তালাবন্ধ—সমস্ত শীতকালভর এখানে তো আর কেউ আসবে না।

'আমরা চড়াইয়ের দিকে শেষ কাফেলাও মিস্ করেছি।

'কিন্তু হাসেগাওয়ার ঐ একটি মহৎ সদ্গুণ যে, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন না হওয়ার পূর্বে তিনি ঐ নিয়ে মাথা ঘামান না।

'আমরা যতই উপরের দিকে উঠছি, ততই রাস্তা এবং চট্টি জনবিরল হতে লাগলো। শেষটায় আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার পরও কাউকে নেমে আসতে দেখি না—ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। তখন দেখি এক পরিত্যক্ত চট্টির সামনে একজন সাধু বসে আছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়। মোক্ষম শীত পড়েছে কিন্তু সাধুজী কোঁপিনিসার। সর্বান্তে ভয়ও মাথেন নি কিংবা অস্ত্র কোনো ব্যবস্থারও প্রয়োজন-বোধ করেন নি। অথচ দেহটির দিকে তাকালে মনে হয়, এইমাত্র প্রচুর তেল ডলাইমলাই করে স্নান সেরে উঠেছেন—গা বেয়ে যেন তখনো তেল ঝরছে। আমাদের সঙ্গে চাপাতি ও শুকনো তরকারি ছিল। সাধুজীকে তার থেকে হিন্দে দিলুম। তিনি কোনো প্রকারের বাক্যালাপ না করে খেলেন। আমরাও কোনো প্রশ্ন শুধালুম না। পরের দিন ভোরবেলা দেখি, তিনি তখনো সেখানে ঠায় বসে। আমরা তাঁকে প্রণাম করে রাস্তায় নামবার সময় মনে হল এই যেন সর্বপ্রথম তাঁর চোখে ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল—সে পরিবর্তনে যেন আমাদের প্রতি আশীর্বাদ রয়েছে। রাস্তায় নামার পর হাসেগাওয়া বললো, 'আমরা দুশ্চিন্তা গেছে। আমাদের যখন উনি চড়াইয়ের পথে যেতে বারণ করলেন না, তখন মনে হচ্ছে, আমাদের যাত্রা সফল হবে।

'হিমালয়ের অস্ত্রতম এই রহস্যের সমাধান এখনো হয় নি। এইসব একাধিক

সন্ন্যাসী সমস্ত শীতকালটা এসব জায়গায় কাটান কি করে? পাঁচ-সাত হাত বরফ এখানে তো জমেই—সেখানে না আগুন, না কোনো প্রকারের খাত। এক চট্টাওলা আমাকে পরে বলেছিল, বরফের তলায় নাকি একরকমের লতা গজায়। তারই রস নাকি এদের খাত, বস্ত্র, আগুন—সব।

‘আর হাসেগাওয়া তুলে যাচ্ছে, একটার পর একটা ছবি। এই গিরি অভিযানে বেরুবার তার অন্ত্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—যত পারে, যত রকমের হয়, ফোটোগ্রাফ তোলা। দাঁড়ান, আপনাকে বইখানা দেখাই।’

বিনায়ক রাও নিয়ে এলেন চাউস এক ফোটোগ্রাফের বই। মলাটের উপরকার ছবি দেখেই আমার বুকে বাকি রইল না যে, এই বই জাপানী। জার্মানরাও বোধহয় এরকম প্রিন্ট করতে পারে না। কে বলবে এগুলো রক থেকে তৈরি! মনে হয় কণ্টাক্ট প্রিন্ট!

বিনায়ক রাও বললেন, ‘জাপানে ফিরে গিয়ে হাসেগাওয়া তাঁর তোলা ছবির একটি প্রদর্শনী দেখান। সে-দেশের রসিক-বেরসিক সর্বসম্মতিক্রমে এই সফরান ফোটোগ্রাফির প্রথম বিশেষ পুরস্কার পায়।’

ছবি বোঝাবার জন্য এ-বইয়ে টেক্সট অত্যন্ত। আমার বড় বাসনা ছিল বইখানা যেন ভারতের বাজারেও জাপানীরা ছাড়ে। কিন্তু ঠিক তখনই মার্কিন হিরোশিমার উপর এটম বোমা ফেলেছে। পরবর্তীকালে আমি আবার কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গেলুম।

এ-বইখানা আনাতে কিন্তু আমার অসুবিধা সৃষ্ট হল। বিনায়ক রাও বই আনার পর আর বর্ণনা দেন না। শুধু বলেন, ‘এর পর আমরা এখানে এলুম’ বলে দেখান একটা ফোটো, ফের দেখান আরেকটা অনবদ্য ছবি। কিন্তু এখন আমি সেসব ছবির সাহায্য বিনা তাঁদের যাত্রাপথের গান্ধীর্থ, মাধুর্য, বিশ্বাস, সঙ্কট, চিত্র-বর্ণন করি কি প্রকারে! পাঠক, তুমি নিরাশ হলে, আমি নিরুপায়।

বিনায়ক রাও, হাসেগাওয়া তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য যে, ওঁরা দুজনা পথিমধ্যে একটি কাফেলা পেয়ে গেলেন—এবং অবিশ্বাস্য, সেটা যাচ্ছে উপরের দিকে। এদের ভিতর আছে তীর্থযাত্রী ও অল্পবিস্তৃত ব্যবসায়ী। এই শেষ কাফেলা। নানা কারণে এদের বড় বেলাই দেরি হয়ে গিয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের মনে শঙ্কা, বরফ-নামার পূর্বে এঁরা পাহাড় থেকে নামতে পারবেন কিনা। তীর্থযাত্রীদের মনে কিন্তু কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা নেই। এ-ধরনের তীর্থদর্শনে যারা বেরয়, তারা ঘরবাড়ির মোহ, প্রাণের মায়ী সবকিছু জ্বালালি দিয়েই সমুখপানে পা ফেলে। পথিমধ্যে মৃত্যু, মানসে মৃত্যু, গৃহ-প্রত্যাভর্তন না

করা পর্যন্ত যেখানেই মৃত্যু হোক না কেন, তাঁরা আশ্রয় পাবেন ধূর্জটির নিবিড় জটীর মাঝখানে—যে-জটা হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে চিরজাজ্জল্যমান।

আর কাফেলার ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করলে মনে হয়, কি বিচিত্র দ্বন্দ্বময় পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপ এদের জীবনে। যে-প্রাণরক্ষার জন্তু এরা দুটি মুঠি অন্ন উপার্জন করতে এসেছে এখানে, সেই প্রাণ তারা বিস্ব করছে প্রতি দিন, প্রতি বৎসর! হুবহু সার্কাসের স্টাণ্ট খেলাড়িদের মত—প্রাণধারণের জন্তু যারা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে প্রতি সন্ধ্যায়!

তা সে যাক। এ-লেখাটি এখন সংক্ষিপ্ত করি। কারণ, হিমালয়ের বর্ণনাই যখন দিতে পারছি নে, তখন হিমালয় নিয়ে কাহিনী বলা শিবহীন দক্ষষ্ণু এবং যত্বপি হিন্দু পুরাণের সঙ্গে পরিচয় আমার ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এটুকু জানি, সে প্রলয়-কাণ্ড ঘটেছিল এই হিমালয়েই—দক্ষালয়ে।

আমি অরসিক। হঠাৎ শুধালুম, ‘বিনায়ক রাও! তোমরা খেতে কি?’

‘শেষের দিকে পথে যেতে যেতে—‘পথ’ বললুম বটে কিন্তু আমি আপনারা পথ বলতে যেটা বোঝেন, সেটাকে অপমান করতে চাই নে—আমার শ্বেনদৃষ্টি থাকতো কিসের উপর জানেন? শকুনি, শকুনি—আমি তখন সাক্ষাৎ শকুনি। শকুনি যেমন নির্মল নীলাকাশে ওড়ার সময়ও তাকিয়ে থাকে নিচে ভাগাড়ের দিকে, আমিও তাকিয়ে থাকতুম নিচের দিকে। কোথাও যদি ভারবাহী যাক পশুর এক চাবড়া গোবর পেয়ে যাই। সে-ঘুঁটেতে আগুন ধরিয়ে ধূঁয়ের ভিতর নাড়াচাড়া করি, চেপে ধরি, দু হাত দিয়ে চড়চাপড় মেরে তৈরি করা এবড়ো-খেবড়ো রুটি—গুজরাতীতে যাকে বলে রোটলা, কাবুলী নানের চেয়েও তিন ডবল পুরু। কিন্তু সেই ডাঁশা রুটিই মনে হত সাক্ষাৎ অমৃত—ওলড্ টেস্টামেন্টের বিধিদত্ত মাস্না, যার স্বাদ আজো ইহুদিকুল ভুলতে পারে নি।’

বিনায়ক রাও বললেন, ‘পঙ্কুও ঈশ্বরপ্রসাদাৎ গিরি লঙ্ঘন করে—এটা মানসে পৌঁছে জন্মের মত উপলব্ধি করলুম। হাসেগাওয়ার দর্শনই ঠিক—পঙ্কু বাধ্য হয়েছে এগোয় অতি ধীরে-মহুৱে, তাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় মানসসর্বোবরে। পঙ্কুর কাছে যা বিধিদত্ত, স্তম্ভ মাহুৱকে সেটা শিখতে হয় পরিশ্রম করে।’^১

১ চেকোশ্লোভাকিয়ার পাহাড়-পর্বত হিমালয়ের তুলনায় নগণ্য। সেখানে পাহাড় চড়তে গিয়ে শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে অভিজ্ঞতা হয় সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

বিনায়ক রাও ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যোত্তরে স্নান করেছিলুম। আমার জীবনের মহামূল্যবান অভিজ্ঞতার ভিতর এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'সর্বাক্ষ জুড়িয়ে গেল—না? পুণ্যান্নান তো বটে।'

বিনায়ক রাও শিউরে উঠলেন, 'বাপরে বাপ! জলে দিয়েছি বাঁপ আর সঙ্গে সঙ্গে মেরেছি পারের দিকে লাফ। সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার। দ্বিপ্রহরের সেই উগ্র রোদ্দে আমি ঘণ্টাটুকু ছুটোছুটি করেছিলুম শরীরটাকে গরম করার জন্তে। ছুটেছি পাগলের মত দু-হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পা-দুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে আছাড় মেরে মেরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে থামতে বাধ্য হয়েছি। ফাঁসির লাশের মত জড় বেরিয়ে গিয়েছে হাঁপাতে হাঁপাতে। ফের ছুটতে হয়েছে গা গরম করার জন্ত। গা আর কিছুতেই গরম হয় না। সে কী যন্ত্রণাভোগ!'

আমি বললুম, 'তুনেছি, গত যুদ্ধে যেসব এয়ার পাইলট শীতকালে ইংলিশ-চ্যানেলের জলে পড়েছে, তাদের কেউই কুড়ি মিনিটের বেশী বাঁচে নি।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'লোকে বলে, অগ্নিপরীক্ষা! আমি বলি শীতের পরীক্ষা।'

'হ্যাঁ, আফ্রিকাবাসীরাও বলে—Heat hurts, cold kills.'

বিনায়ক রাও বললেন, 'হাসেগাওয়া প্রাণভরে ছবি তুললেন। তারপর প্রত্যাবর্তন। অগ্র পথ দিয়ে।'

মিরেক (একজন পাহাড়-বন-বিভাগের চৌকিদারকে) শুধোলে, 'আচ্ছা, আপনি এত আস্তে চলছেন কেন?'

প্রশ্ন শুনে চৌকিদার হোঃ হোঃ করে খুব খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর বললেন—'শুধুন। বহু বছর, চল্লিশেরও উপর, বনের পথে, পাহাড়ে রাস্তায় নানান গতিতে হেঁটেছি। কখনও জোরে কখনও ধীরে। আপনাদের মত আগে হাঁটতুম, আরো জোরে হাঁটতুম। লাকিয়ে বাঁকিয়ে পাহাড়ে উঠে তার পর হাঁপাতুম। হাত-পা ছড়িয়ে ঘালের উপর শুয়ে জিরিয়ে নিতুম, তারপর আবার চলতুম। কাজের তাগিদে কখনো সারাদিন হাঁটতে হয়েছে, কখনও সারারাত। কিন্তু এই যে এখনকার আমার চলার গতি দেখছেন, এ হচ্ছে বহুদিনের বহু সাধনার পর আবিষ্কৃত। এ গতিতে চললে কখনও ক্লান্তি আসবে না শরীরে। বত দূর-দূরান্তরে বনান্তরে যান না কেন, যাত্রার শুরুতে যেমন শরীর তাজা তমনিই থাকবে। চরণিক, প্রথম (বেঙ্গল) সংস্করণ, পৃ ১১৩।১৪।

‘চলেছি তো চলেছি, তারপর এল আমাদের কঠিনতম সংকট। আমাদের একটা গিরিসংকট পেরুতে হবে। এবং এটা পৃথিবীর অন্ততম সর্বোচ্চ গিরি-সংকট। সমুদ্রতট থেকে বারো হাজার ফুট উচুতে না বাইশ হাজার আমার মনে নেই। এবং একটুখানি যাওয়ার পরই আরম্ভ হয় চড়াইয়ের পর চড়াই। ক্যারাতানের এক ব্যবসায়ী আমাকে বলেছিল, যেসব তীর্থযাত্রী মারা যায়, তাদের অধিকাংশই মরে এইখানে।

‘ক্রমেই বাতাসের অক্সিজেন কমে আসছিল। অতিকষ্টে আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। এমন সময় চোখে পড়ল একটা লোক অকাতরে ঘুমুচ্ছে ‘পথের’ এক-পাশে। কাছে এসে বুঝলুম, মৃতদেহ! এবং সম্পূর্ণ অবিকৃত মৃতদেহ। এ-বছরে মরেছে, না গেল বছরে বুঝতে পারলুম না। কারণ, আমি শুনেছিলুম, উপরে-নিচে বরফ থাকে বলে মড়া পচে না।

‘এর পর আরো কয়েকটা। আমি মাত্র একবার একজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম, আহা! সে কী শান্ত, প্রশান্ত, নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি। মায়ের কোলে ঘুমিয়ে-পড়া শিশুর মুখেও আমি এরকম আনন্দভরা আত্মসমর্পণের ছবি দেখি নি।

‘ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি গেল অতদিকে। দেখি, আমাদের দলের একজন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। কারো সেদিকে জ্রঞ্জেপ পর্যন্ত নেই। আমি জানতুম, এবং হাসেগাওয়াও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে বলবান যুবা পুত্রও হাত বাড়িয়ে মাতাকে পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে না। কারো শরীরে একবিন্দু উদ্ভূত শক্তি নেই যে, সে সেটা অস্ত্রের উপকারে লাগাবে। সামান্য দুটি কথা বলে যে সাহস দেবে সে শক্তিও তখন মাহুষের থাকে না। আমার মনে হল, হালকা একটি পালক দিয়েও যদি কেউ আমাকে ঠোনা দেয় আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবো।

‘আমি খুব ভালো করেই জানতুম, কাফেলা কারো জ্ঞাত অপেক্ষা করে না; করলে সমস্ত কাফেলা মরবে। আমাদের যে করেই হোক সন্ধ্যা নাগাদ সামনের আশ্রয়স্থলে পৌঁছতে হবে।

‘এমনিতেই আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল শব্দগতি। আমি সেটাও কমিয়ে দিলুম ঐ বৃদ্ধকে সঙ্গ দিতে। হাসেগাওয়া বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে রহস্যভরা নয়নে সে তাকাল। আমি ইঙ্গিতে জানালুম, সে যেন তার গতি লক্ষ্য না করে।’

এখানে আমি সামান্য একটি তথ্যের উল্লেখ না করলে কর্তব্যবিচ্যুতি হবে।

বিনায়ক রাওয়ের মত পরদুঃখকাতর মানুষ আমি এ-জীবনে কমই দেখেছি, এবং একেবারেই দেখি নি পরোপকার গোপন রাখতে তাঁর মত কৃতসঙ্কল্প জন। প্রভু যীশুর আদেশ 'তোমার বাঁ হাত যেন না জানতে পারে তোমার ডান হাত কি দান করলো' এরকম অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমি কোনো খুঁটান অখুঁটান কাউকে দেখি নি। কাফেলার বৃদ্ধের প্রাতি তাঁর দরদ গোপন রাখতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই তাই করতেন—এ সত্য আমি কুরান স্পর্শ করে বলতে রাজী আছি। কিন্তু এটা গোপন রাখলে তাঁর মূল বক্তব্য একেবারেই বিকলাঙ্গ হয়ে যেত বলে তিনি যতটা নিতান্তই না বললে নয়, সেইটুকুই বলেছিলেন।

বিনায়ক রাও সোদনের স্বরণে একটুখানি হাস ফেলে বললেন,—“বৃদ্ধকে আমি বলবো কি—স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন কাফেলা থেকে সে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এই যে আমি তার তুলনায় শক্তিশালী, আমারই থেকে থেকে মনে সন্দেহ হচ্ছিল, আমিই কি পৌঁছতে পারবো গন্তব্যস্থলে? তখন হৃদয়ঙ্গম করলুম, এখানে এ-সঙ্কট থেকে নিষ্কাত পাবার জ্ঞাত শারীরিক বলের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন মানসিক বলের। এবং এ বৃদ্ধের সেটা যেন আর নেই। তীর্থদর্শন হয়ে যাওয়ার পর ফেরার মুখে অনেকেই সেটা হারিয়ে ফেলে—কারণ তখন তো সামনের দিকে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, আর কোনো চরম কাম্য বস্তু নেই। ফিরে তো যেতে হবে আবার সেই সংসারে, তার দিনযাপনের প্রাণ-ধারণের স্থানির ভিতর।

‘আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজে যেন সম্ভরণে অক্ষম, আরেক সম্ভরণে অক্ষম জনকে সাহায্য করার নিখল প্রচেষ্টা করছি। তবু বললুম, “আরেকটুখানি পরেই উৎরাই। চলুন।” এই সামান্য কটি শব্দ বলতে গিয়েই যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এল।

‘বুড়ো আমার দিকে তার ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ কি যেন দেখতে পেল। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বললে, “বাবু, তোমার বোতল থেকে একটু শরাব।”

বিনায়ক রাও বললেন, ‘আমি জীবনে কখনো শরাব স্পর্শ করি নি; আমার বৃকের পকেটে ছিল চ্যাপ্টা বোতলে জল।

‘কোনো গতিকে বললুম, “জল।” বুড়ো বিশ্বাস করে না। কাতর নয়নে তাকায়।

‘আন্তে অতি আন্তে বুড়ো এগোচ্ছে ঐ শরাবের আশায়।

‘এইভাবে খানিকক্ষণ চললো। হঠাৎ বৃষ্টি বৃড়ো লক্ষ্য করেছে কাক্কেলা একেবারেই অন্তর্ধান করেছে। কাঁপতে কাঁপতে বৃড়ো বলল, “জিরোবো।” আমি শুদ্ধকণ্ঠে যতখানি পারি চৈচিয়ে বললুম, “না, না।” আমি জানি, এ জিরোনোর অর্থ কি। এই বসে পড়ার অর্থ, সে আর উঠে দাঁড়াবে না। তার মনে হবে এই তো পরমা শান্তি—আরাম, আরাম। আর শেষ নিশ্বাস ঢলে পড়বে।

‘বৃড়ো তার শেষ ক’টি কথা বললে যার অর্থ, এক ঢোক শরাব পেলে সে হয়তো সঙ্কট পেরুতে পারবে। আমার দিকে হাত বাড়ালো। আমি আর কী করি? দিলুম বোতল। সে টলতে টলতে বসে পড়ল। এ কী সর্বনাশ! তারপর বোতল মুখে দিয়ে যখন দেখল সত্যি জল, তখন আমার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

‘এই শরাবের আশাতেই সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে কোনো গতিকে এসেছে। এবারে শেষ আশা বিলীন হতে সে ঢলে পড়লো।

* * *

‘চলেছি তো চলেছি। কতক্ষণ চলার পর উৎরাই আরম্ভ হয়েছিল, কখন যে উপত্যকায় নেমেছি সেগুলো আমার চৈতন্যসত্তা যেন গ্রহণ করে নি।

‘সন্ধ্যতে এলুম হঠাৎ বরফপাতের সঙ্গে সঙ্গে। অতি হাল্কা চাদরের মত কি যেন নেমে এল। তবু সম্মুখপানে খানিকটা দেখা যায়। ঈষৎ দ্রুততর গতিতে চলতে আরম্ভ করলুম। কয়েক মিনিট পরেই বরফপাত থেমে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আতঙ্কে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, একটুখানি বেশী আগেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসেছি।

‘সামনে উপত্যকা, এবং এইমাত্র যে বরফপাত হয়ে গেল তারই “কল্যাণে” মুছে গেছে কাফেলার পদচিহ্ন। এবং সঙ্কটটাকে যেন তার বীভৎসতম রূপ দেবার জন্য সামনে, ধীরে ধীরে, নেমে আসছে কুয়াশার জাল—দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছে।

‘তারই ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করলুম, আরেকটু সামনে একটা পাথরের টিলা। সেখানে পৌঁছে আমাকে যেতে হবে হয় বাঁয়ে নয় ডাইনে। কিন্তু মনস্থির করি কি প্রকারে? বরফের উপর যে কোনো চিহ্নই নেই। তবু আমার মনে যেটুকু দিক্-বিদিক জ্ঞান ছিল সেটা পরিকার বললে, যেতে হবে বাঁ দিকে।

‘এমন সময় হঠাৎ কুয়াশার ভিতর যেন একটু ছিদ্র হল, এবং তার ভিতর দিয়ে এক মুহূর্তের তরে, যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, দেখি একটা কুকুরের ইঞ্চি-তিনেক লেজ, বাঁ করে ডান দিকে মোড় নিল, কুকুরটাকে কিন্তু দেখতে

পেলুম না—’

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘কুকুর ! কোথাকার কুকুর ? কুকুরের কথা তো এতক্ষণ কিছু বলাো নি !’

‘ও । সত্যি ভুলে গিয়েছিলুম । ঐ কুকুরটা থাকতো একটা চট্টিতে । আমার সে চট্টিতে, ঝুটির জন্ত আটকা পড়ে, দিন তিনেক ছিলুম । ঐ সময় আমি ওটাকে সামান্য এটা সেটা খেতে দিয়েছি । সে-চটি ছাড়ার খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি আমার পিছু নিয়েছেন । বিস্তর হাই-হুই করে পাখর ছুঁড়েও তাকে চট্টিতে ফেরত পাঠাতে পারলুম না ।’

আমি বললুম, ‘এই তো সেই জায়গা যেখানে যুধিষ্ঠিরের সারমেয় তাঁকে ত্যাগ করতে চায় নি ।’

মলোজী বললেন, ‘এসব কেন, কোনো কুকুরেরই লেজ কাটা উচিত নয় ; তবু কে যেন বেচারীর বাচ্চা বয়সে তার লেজ কেটে দিয়েছিল । আমি দেখতে পেলুম সেই টুকরোটুকু, ষেটুকু অবশিষ্ট ছিল । এবং সেটা মোড় নিল ডানদিকে ।

‘আমার অভিজ্ঞতা, আমার পর্যবেক্ষণ, আমার বিচারশক্তি সব—সব—আমাকে চিৎকার করে বলছিল, “বা দিকে বা দিকে মোড় নাও” আর অতি স্পষ্ট যদিও অতিশয় ক্ষণভরে আমি দেখলুম, কুকুরটার লেজ মোড় নিল ডান দিকে ।

‘আমি নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে কুকুরটার লেজকেই বিশ্বাস করলুম বেশী ।

‘কুকুরটাকে কিন্তু তখনকার মত আর দেখতে পেলুম না ।

‘ঘন্টাটাক পরে চট্টিতে পৌঁছলুম । হাসেগাওয়া বললেন, আমি বুড়োর জন্ত অপেক্ষা করার পর থেকেই কুকুরটা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিল । শেষটায় সে অদৃশ্য হয়ে যায় ।’

আমি শুধালুম, ‘আর বা দিকে মোড় নিলে কি হত ?’ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই বুঝলুম আমি একটা ইডিয়ট ।

বিনায়ক হেসে বললেন, ‘তাহলে আপনি আপনার বন্ধু বিনায়ককে আর—’

আমি বললুম, ‘ষাট ষাট’ ।^২

২ বিনায়ক রাও আমাকে তাঁর মানস-গমন কাহিনী বহু বৎসর পূর্বে বলেছিলেন । এখন কেতাবপত্র খেঁটে লুপহোলগুলো যে পূর্ণ করা যেত না তা নয়, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হল এই খাপছাড়া খাপছাড়া অসম্পূর্ণ পাঠটাই সত্যের নিকটতর থাকবে ।

মটরাজনের একলব্যত্ব

বধী নামার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার উপর দিয়ে পূর্ববৈয়া বায়ু বইতে আরম্ভ করে না। সে হাওয়া আসে তার দিন আঠেক পরে। কিন্তু তখনই সাড়া পড়ে যায় বন্দরে বন্দরে মাঝি-মহল্লায়। হালের বলদ পালের গরু বিক্রি করে তারা তখন কেনে নৌকোর পাল। পুরনো পালে জোড়াতালি দিয়ে যেখানে চলে যাওয়ার আশা, সেখানে চলে কাঁথার ছুঁচ আর মোটা সূতো। তার পর আসবে ঝোড়ো বেগে পূব হাওয়া। দেখ্ তো না দেখ্, নারায়ণগঞ্জী নৌকো পৌঁছে যায় রাজশাহী। বিশ্বাস করবেন না, শ্রোতের উজ্জানে, তর তর করে।

আমিও বসে আছি হাল ধরে, পাল তুলে—হাওয়া এই এল বলে। নোঙ্গর নিই নি। এই শেষ যাত্রায় যেতে হয় এক ঝটকায়। কোথাও থামবার ছকুম নেই।

নাতি ডাবাটি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দাদু, তামুক খাও।'

হাওয়ার আশায় বসে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ-আবেশে ভরে যায়।

নাতি বললে, 'দাদু, সারাজীবন ধরে পদ্মার উজ্জান-ভাটা করলে। কত লোকের সঙ্গেই না তোমার দোস্তী হল। বাড়িতে থেকে থেত-খামার করে দোকানপাট চালালে তো অতশত লোকের সঙ্গে তোমার ভাবসাব হত না—আর বিদেশীই বা কিছু কম। কই কই মুন্স্কের বং-বেবংয়ের চিড়িয়া। আমারে কও, তাদের কথা।'

শ্রীযুত গান্ধুলীর পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটু আগেই ফুটনোটে উল্লেখ করেছি। মোরাভিয়ার পাহাড় তেমন কিছু উঁচু নয়, কিন্তু বরফের ঝড়ে কিংবা নিছক ক্লাস্তিবশতঃ পর্যটকের মরণবরণ একই পদ্ধতিতে হয়। গান্ধুলিমশাই লিখছেন :

'সেবারে দুটি স্নোভাক ছেলে প্রাড্‌য়েটের চূড়ায় এসে হাজির হল। তখন খুব বরফ পড়ছে। (সেখানকার) কাফিখানায় এক চুল জায়গা নেই—যত রাজ্যের লী-চালক সেখানে এসে জমেছে। এই দুই স্নোভাক ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু পেয়ালা গরম দুধ খেয়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞেস করায় তারা জবাব দিলে—চেভের্নে সেডলো।

বরফ পড়লেও দিনটা মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। কিন্তু ছেলে দুটি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই হঠাৎ কুয়াসা এসে চারিদিক ছেয়ে ফেললো। তারপর এই কুয়াসা কাটল না, ছেলে দুটিও ফিরে এল না। এদিকে অন্ধকার নেমে এল

আমি পদ্মা নদীর মাঝি নই। কিন্তু আমার জীবনধারা বয়ে গেছে পদ্মার চেয়েও দেশদেশান্তরে। কত না অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতি, কত না বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এখন পাল তুলে ওপারে যাবার মুখে ভাবছি, এঁদের কারো কারো সঙ্গে আপনাদেরও পরিচয় করিয়ে দি। কারণ এঁদের সম্বন্ধে অল্প কেউ যে মাথা ঘামাবে সে আশা আমার কম—প্রচলিতার্থে এঁরা দেশের

আর তারই সঙ্গে ঘন তুষারপাত শুরু হয়ে গেল।

কাফিখানার মালিক উদ্বিগ্ন হয়ে বিদেশী ছেলে দুটিকে খোঁজবার জন্তে কয়েকজনকে পাঠালেন। তারা শী নিয়ে কোমরে টর্চ বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু রাত্রে অন্ধকারে ঐ ঘন তুষারপাতের মধ্যে যাবে কোথায়? যাবেই বা কি করে? বিশেষ কিছু লাভ হল না। তারা ফিরে এল। কিন্তু ছেলে দুটি আর ফিরল না।

পরদিন সকালবেলা বরফের উপর রোদ পড়ে যখন চারিদিক ঝলমল করে উঠল, তখন দেখা গেল রাত ভোর এত বরফ পড়েছে যে ছেলে দুটি যদি কোথাও মরেও পড়ে গিয়ে থাকে তাদের দেহ খুঁজে বার করবার কোনো উপায় নেই। আশপাশের যত কুটির যত গ্রাম আছে সব জায়গা থেকে যখন খবর এল যে ছেলে দুটি কোথাও পৌঁছয় নি তখন বোঝা গেল এই অঞ্চলের বরফের মধ্যে তাদের সমাধি হয়েছে।

সারা শীতকাল ছেলে দুটি তাদের অজানা সমাধির মধ্যে রইল শুয়ে। তারপর যখন প্রথম বসন্তের হাওয়ায় বরফ গলতে আরম্ভ করল তখন তাদের অবিকৃত দেহ আবিষ্কার হয় এই জঙ্গলের মধ্যে। আশেপাশে অনেকগুলো আধপোড়া দেশলাই-এর কাঠি ছড়ানো।

বরফের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়ার এই হচ্ছে বিপদ। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মত হলে যে ক্লান্তি আসে সে বড় ভয়ানক ক্লান্তি। দু-চারটে দেশলাই জ্বলে কি তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? দেহ মন চোখ সমস্ত ঘূমে জড়িয়ে আসে। হঠাৎ শীতের অহুভূতি আর থাকে না। মনে হয় বরফেরই কবল জড়িয়ে শুয়ে পড়ি। তখন মনে হয় জেগে থাকার চেষ্টা করার মধ্যেই যত অস্বস্তি যত কষ্ট! ঘুমিয়ে পড়াই হচ্ছে আরাম! তারপর একবার সেই ঘূমের কোলে কেউ টলে পড়লে, সে ঘুম আর ভাঙে না। বরফের মধ্যে মৃত্যুকে ঠিক জীবনের অবলান বলা যায় না—এ ঘেন এক গভীর স্বপ্নি।’

কুতুবমিনার নন। অথচ আমার বিশ্বাস এঁরা যদি সত্যিই এম্বিশাস্ হতেন তবে আজ আমার মত অখ্যাত জনের কাঁধে এঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার ভার পড়তো না, আর পড়লেও সেটা আমি গ্রহণ করতুম না। কারণ এঁদের আমি ভালোবেসেছিলুম এঁরা লাওৎসের চেলা বলে। তাঁরই উপদেশ মত এঁরা জীবনের মধ্য-পথ অবলম্বন করেছিলেন। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে, আপন প্রতিভা যতদূর সম্ভব চাপা রেখে গোপনে গোপনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন। বাধা পড়লে লড়াই দিতেন মোক্ষম, কিন্তু সর্বক্ষণ এঁদের চরিত্রে একটা বৈরাগ্য ভাব থাকতো বলে মনে মনে বলতেন, ‘হলে হল, না হলে নেই।’

কিন্তু আমাকে একটু সাবধানে, নাম পরিচয় ঢেকে চেপে লিখতে হবে। পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি এঁরা জীবন-সভাস্থলে প্রধান অতিথির আসনে বসে ফুলের মালা পরতে চান নি, তাই পাঠক সহজেই বুঝে যাবেন, কারো লেখাতেও তাঁরা হামলেট, রঘুপতি হতে চান না—আমার নাত্তিপরিচিত লেখাতেও না।

মনে করুন তার নাম নটরাজন। তার পিতা ছিলেন পদস্থ সরকারী কর্মচারী, আশা করেছিলেন ছেলেও তাঁর মত চারটে পাস দিয়ে একদিন তাঁরই মত বড় চাকরি করবে। অত্যাশা আশা করেন নি, কারণ নটরাজন ক্লাসের পয়লা নম্বরী না হলেও প্রোমোশন পেত অক্লেশে, আর একটা বিষয়ে ইন্সুলের ভিতরে বাইরে সবাইকে ছাড়িয়ে যেত অবহেলে। ছবি আঁকাতে। তার অঞ্চলে এখনও দেওয়ালে রঙিন ছবি আঁকার (ম্যুরাল) রেওয়াজ আছে। তারই ওস্তাদ পটুয়ারী স্বীকার করতেন, নটরাজনের চতুর্দশ পুরুষে যদিও কেউ কখনো ছবি আঁকেন নি—তাঁরা খানদানী, পটুয়া হতে যাবেন কোন্‌ দুঃখে—এ ছেলে যেন জন্মেছে তুলি হাতে নিয়ে। শুধু তাই না—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এদেশে যখন হরেক রকম রঙের অভাব চরমে পৌঁচেছে তখন নটরাজন দেশের কাদামাটি কাঁকর পাথর ফুলপাতা থেকে বানাতে আরম্ভ করলো নানা রকমের রঙ। এটা ঠিক আর্টিস্টের কাজ নয়—এর খানিকটে কেমিস্ট্রি বাকিটা ক্রাক্‌টম্যান্‌শিপ। পটুয়ারী নটরাজনকে প্রায় কোলে তুলে নিলেন। তখন তার বয়েস বারো-তেরো।

রবিবর্মী তার অঞ্চলেরই লোক। ওঁর ছবি কিন্তু নটরাজনকে বিশেষ বিচলিত করে নি। হঠাৎ একদিন সে দেখতে পেল নন্দলালের একখানা ছবি। জঘন্ঠ রিপ্ৰজাক্‌শন্—রেজিস্ট্রেশন এতই টালমাটাল যে মনে হয় প্রিন্টার তিনটি বোতল

টেনে তিনটে রঙ নিয়ে নেচেছে।

নটরাজন কিন্তু প্রথম ধাক্কাই স্তম্ভিত। দ্বিতীয় দর্শনে রোমাঞ্চিত। মধ্য রজনী অবধি সে ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

নটরাজন ছিল অসাধারণ পিতৃভক্ত। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা কি আশা পোষণ করেন সে তা জানতো। কি করে তাঁকে বলে যে সে তার গুরুর সন্ধান পেয়ে গিয়েছে; সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর পদপ্রান্তে তাকে যেতেই হবে। তত্পরি কোথায় মালাবার আর কোথায় শাস্তিনিকেতন!

পিতাই লক্ষ্য করলেন তার বিষন্ন ভাব। পিতাপুত্র সখ্য ছিল—দ্রুত নয়। সব শুনে বললেন, ‘বাধা পথে যে চলে না তার কপালে দুঃখ অনেক। কিন্তু আপন পথ খুঁজে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ আরো বেশী। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।’

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম যুগ। যারা ‘গোলামী-তালিম’ চায় না, তারা যাবে কোথায়? বিশ্বকবি কবিগুরু যেন বিধির আদেশে ঠিক ঐ শুভলগ্নেই শাস্তিনিকেতনে তাদের জন্ম নীড় নির্মাণ করেছিলেন—যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্। দূর সিদ্ধি, মালাবার, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, আসাম থেকে ছেলেমেয়ে আসতে লাগলো—দলে দলে নয়, একটি দুটি করে।

যারা এল তাদের মধ্যে দু-চারটি ছিল লেখাপড়ায় বিত্তোশাগর, বাপ-মাতা-খাদ্যাদানো বিশ্ববকাটে। বিশ্বভারতীই তো বিশ্ববকাটেদের উপযুক্ত স্থান, ঐ ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস! আসলে এরা ছিল কোনো কোঁশলে ইস্কুল থেকে নাম কাটাবার তালে। অসহযোগের সহযোগিতায় তারা সে কর্মটি করলো নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে।

বলা বাহুল্য আমি ছিলুম এই দলের।

হিন্দী-উর্দুতে বলে ‘পাঁচো উলিয়া ঘীমে’ আর গর্দন ডেগমে’—অর্থাৎ ‘পাঁচ আঙুল ঘিয়ে আর গর্দনটাও হাঁড়ায় ঢুকিয়ে ভোজন।’ আমরা যে ভূমানন্দ—ভূমা, বিশ্বপ্রেম, অমৃতের পুত্র এসব কথা তখন ছিল আমাদের ভালভাত—আমাদের মধুরতম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি, এখানে এসে দেখি সে-অমৃত উপচে পড়ছে। সে যুগে বিশ্বভারতীর প্রথম নীতি ছিল, আমি অক্ষরে অক্ষরে তুলে দিচ্ছি: ‘The system of examination will have no place in Visvabharati, nor will there be any conferring of degrees.’ !!

বন্ধি চাটুঘ্যের কল্পনাশক্তি বড়ই দুর্বল। তিনি রচাছিলেন,

‘ছাত্রজীবন ছিল সুখের জীবন

যদি না থাকিত এগজামিনেশন।’

বিশ্বভারতী বন্ধিমের সে স্বপ্ন মূর্তমান করেছিল।

এবং ধর্মতঃ স্রাস্রাতঃ প্রাণুক্রনৌতির পিঠ পিঠ আসে : যেখানে পরীক্ষা নেই সেখানে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া না-হওয়া ছাত্রের ইচ্ছাধীন। অতএব রেজিস্ট্রি নেই, রোল-কল্ নেই !

আমাদের অভাব ছিল মাত্র একটি—উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যা-ই হোক—চায়ের দোকান। তাই ছিল ঘরে ঘরে স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম।

সত্যকুটিরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে শুনি ভিতরে স্টোভের শব্দ। কেশবগরের মণি গাঙ্গুলী চা বানাচ্ছে। সামনে, গৌরপ্রাঙ্গণ পেরিয়ে, লাইব্রেরির বারান্দায় ঈশং প্রাণচাঞ্চল্য আরম্ভ হয়েছে। বৈতালিকের মূলগায়ন শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার (পরবর্তী যুগে খ্যাতিপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ) ও দোহারদের ফুল রায় গান বাছাই করছেন। পূজনীয় বিধু-ক্ষিত-হরি একটু পরেই আসবেন।

তখনকার দিনে প্রথা ছিল, যারা গত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই প্রথম আশ্রমে এসেছে তারা ভোরের বৈতালিকে উপস্থিত হত। আমাদের দলটা ‘গুডি গুডি’দের তুলনায় ছিল সংখ্যালঘু। অবশ্য আমরা দম্ভভরে গুরুদেবকেই উদ্ধৃত করে বলতুম, ‘The rose which is single need not envy the thorns which are many. কিন্তু তকে তকে থাকতুম, দল বাড়াবার জন্ত।

হঠাৎ চোখ পড়লো নয়। মালের দিকে। দূর থেকে মনে হল চেহারাটা ভালোই—ভালোমাহুষ। জানলা দিয়ে ভিতরের গাঙ্গুলীকে বললুম, ‘এসেছে রে’। গাঙ্গুলী এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে গান ধরলে,

‘শুনে তোমার মুখের বাণী

আসবে ছুটে বনের প্রাণী—’

অর্থাৎ বিশ্বভারতীর ডাক শুনে বনের প্রাণীরা এসে জুটেছে।

ইনিই হলেন আমাদের নটরাজন।

ছপুরবেলা খাওয়ার পর তাকে গিয়ে শুধালুম, ‘টেনিস খেলতে জানো?’ বড়ই গাঁইয়া—মাস ছয় পূর্বে আম্মো ছিলুম, এবং বললে পেত্যয় যাবেন না, এখনো আছি—হকচকিয়ে ‘ইয়েস ইয়েস, নো নো, ইয়েস ইয়েস’ বললে। ‘র‍্যাকেট নেই? কুছ পরোয়া ভী নেই, আমারটা দোব’খন।’ এরপর জাব হবে

না কেন ?

তবে লাভ হল না। কলাভবনের ছাত্র। আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কম। তবে দেখলুম, বাউতুলে স্বভাব ধরে। তখন তখন স্কেচ বই নিয়ে খোয়াইডাডার ভিতর ডুব মারে। সাঁওতাল গ্রাম থেকে ডিম কিনে এনে গোপনে বে সেদ্ধ করে খাওয়া যায়—আশ্রম তখনো নিরামিবাশী—সেটা ওকে শিখিয়ে দিলুম। সে তো নিত্য নিত্য খোয়াই পেরিয়ে সাঁওতাল গায়ে যায়—তার পক্ষে ডিম যোগাড় করা সহজ।

কিন্তু ঐ গোবেচারাপারা ছোড়াটা পেটে যে কত এলেম ধরে সেটা অন্তত আমার কাছে ধরা পড়লো অল্পদিনের ভিতর। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে অনেকক্ষণ অবধি এদিক থেকে, ওদিক থেকে, এগিয়ে পিছিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তুললো ছুটি ফোটো। পরে প্রিন্ট দেখে আমার চক্ষুস্থির। এ যে, বাবা, প্রফেশনালেরও বাড়া! এবং আজ আমি হুহুরের দেবতা বিশ্বকর্মাণে সাক্ষী মেনে বলছি, পরবর্তী যুগে কি বার্লিন কি লণ্ডন কেউই টেকনিকালি আমার এমন পারফেক্ট ছবি তুলতে পারে নি—এবং স্বরণ রাখবেন, নটরাজনের না ছিল কৃত্রিম আলো বা স্টুডিও।

এরপর যা দেখলুম সে আরো অবিশ্বাস্য। নটরাজনের অগ্রতম গুরু প্রথম মেয়ের বিয়ে। কোথায় গয়না গড়ানো যাবে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। স্বল্পভাবী নটরাজন অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ শোনার পর বললে, ‘আমাকে মাল-মশলা দিন। আমি করে দিচ্ছি।’ সবাই অবাক; ‘তুমি শিখলে কোথায়?’ বললে ‘শিখি নি, দেখেছি কি করে বানাতে হয়।’ নন্দলাল চিরকালই এ্যাড-ভেঞ্চার-একস্পেরিমেন্টের কলহাস। দিলেন হুকুম, ‘ঝুলে পড়।’

বিশ্বকর্মাণে জানেন শ্রাকরার যন্ত্রপাতি কোথেকে সে যোগাড় করলো, কি কৌশলে কাজ সমাধা করলো। গয়না দেখে কে কি বলেছিলেন সেটা না বলে শুধু সবিনয় নিবেদন করি, হিন্দু বিয়েতে বরপক্ষ আকছারই সহিষ্ণুতায় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসেন না—তারা পর্যন্ত পঞ্চমুখে গয়নার প্রশংসা করেছিলেন।

নটরাজনের অগ্রাগ্র গুণ উপস্থিত আর উল্লেখ করছি না। তার পরবর্তী ঘটনা বোঝার জন্য একটি গুণকীর্তন করি। এতেক বর্ণপরিচয় স্পর্শ না করে শুধু কান দিয়ে সে শিখেছিল অদ্ভুত সড়গড় চলতি বাঙলা। আমাকে শুধু গোড়ার দিকে একদিন শুধিয়েছিল, ‘বাঙলার কি কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণ নেই? উচ্চারণে উচ্চারণে যে আসমান জমীন ফারাক? কোনটা শিখি?’

শান্তিনিকেতনে তখন ছিল নিরঙ্কুশ ‘বাঙাল’ রাজত্ব। ‘গাচটা বাদরের’

বদলে ‘পাস্টা বাদর’ হামেশাই ঝোপঝাড় থেকে ‘বেয়িয়ে পড়ার’ বদলে ‘বেড়িয়ে পরতো’, অবিড়াম ঝড় ঝড় বাড়ি-ধাড়ার মাঝখানে। আমি নটরাজনকে বললুম, ‘আর যা করু করু, দোহাই আল্লার, আমার উচ্চারণ নকল করিসু নি। আমি বাঙালন্ত বাঙাল—খাজা বাঙাল। আর করিস নি গুরুদেবের। তাঁর ভাষা, তাঁর উচ্চারণ তাঁর মুখেই শোভা পায়। করবি তো করু তোর গুরু নন্দলালের উচ্চারণ। বাঙলায় এম. এ. পাশ ধুরন্ধররাও ওরকম সরল চলতি বাঙলা বলতে পারে না।’

তার পর ঝাড়া বিশটি বছর আমাদের দুজনাতে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, চিঠি-পত্রও না। এই বিশ বৎসরের ভিতর বাঙলা দেশে থাকলে পৌষ মেলায় কখনো-সখনো শান্তিনিকেতন গিয়েছি। ওর সাক্ষাৎ পাই নি। সত্যি বলতে কি, ওর কথা শ্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। শুধু কেউ কখনো অচলিত গান

জগপতি হে

সংশয় তিমির মাঝে

না হেরি গতি হে—

গাইলে মনে পড়তো নটরাজন ওর সুরটা বড় দরদভরা করুণ সুরে বাঁশীতে বাজাতে।

১৯৪৭ সাল। স্বরাজ যখন পাকা ফলটির মত পড়ি পড়ি করছে ঐ সময়ে আমি একদিন বাঙ্গালোরের এক রেস্টোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি। দেখি, তিনটি প্রাণী ঢুকে এককোণে আসন নিল। একজন চীনা কিংবা জাপানী ছোট্টখাটো এক মুঠো মেয়ে, দ্বিতীয়া স্বর্ভোলা তরুণী—খুব সম্ভবত তামিল—এবং সঙ্গে এক কে ? নটরাজন ! চেহারা রক্তির বদলায় নি। শুধু কপালটি আরো চওড়া হয়েছে, চুলে বোধ হয় অতি সামান্য একটু পাক ধরেছে। আমার চেহারা বদলে গেছে আগা-পাশ-তলা কিন্তু আর্টিস্ট নটরাজনকে ফাঁকি দিতে হলে প্রাস্টিক সার্জারি করাতে হয়, এবং চোখ দুটো ‘আই-ব্যাঙ্কে’ জমা দিতে হয়। নটরাজন আমাকে দেখা মাত্র উঠে এসে আমাকে তার টেবিলে নিয়ে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তামিলটি লেডি ডাক্তার, বিধবা, প্র্যাকটিস করেন, এবং জাপানীটি তাঁর স্ত্রী। শুধালাম, ‘তুমি আবার জাপান গিয়েছিলে না কি ?’ সেই মুখচোরা নটরাজন মুখ-চোরাই রয়ে গেছে। বললে ‘অনেক বছর কাটিয়েছি।’

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হল না। শুধু বললে, শহরের তিন মাইল দূরে

ফাঁকা জায়গায় সেরামিকের ছোটখাটো কারখানা করেছে, বাড়িও। আমাকে শনিবার দিন উইক-এণ্ড করতে সেখানে নিয়ে যাবে। আমার ঠিকানাটা টুকে নিল।

এস্থলে বলে রাখা কর্তব্য বিবেচনা করি, আমি কুমোরের হাঁড়িকুড়ি থেকে আরম্ভ করে সেরামিক, পর্সেলিন, গ্লেকজড পটারি, ফাইন্স এসবের কিছুই জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে স্টোনওয়ার পাথরের জিনিস নয়—সেটা আমরা যাকে তামচিনি বলি, মেয়েরা যে সব বোয়ামে আচার-টাচার রাখেন। এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন হল এই কারণে যে সেই সন্ধ্যায় এক বন্ধুকে নটরাজনের কথা তুলতে তিনি বললেন, ‘সেরামিক বাবদে ও যা জানে না, সেটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। বিগেস্ট একস্পার্ট ইন দি ফিল্ড। এখানকার সরকারী সেরামিক ফ্যাক্টরির বড় কর্তা।’

শনির সন্ধ্যায় নটরাজন আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বউ একটি-মাত্র কথা না বলে যা যত্ন-আত্তি করলে সেটা দেখে বুঝলুম কেন চীন-জাপানে প্রবাদ প্রচলিত আছে ‘চীনা খাও আর জাপানী জ্বী—স্বর্গ-স্বথ : চীনা জ্বী আর জাপানী খাও—নরক ভোগ।’ জাপানী জ্বীজাতির মত কর্মঠ, শাস্ত, সেবাপরায়ণ রমণী নাকি ইহসংসারে নেই।

আহারাদির পর নটরাজনের জ্বী বললেন, ‘দুই বন্ধুতে কথাবার্তা বলুন।’

নানা কথা হওয়ার পর আমি বললুম, ‘জাপানের কথা কও।’

নটরাজন সে রাত্রে কিছুটা বলেছিল, পরে আরো সবিস্তার।

বললে, ‘শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আমার ধারণা হল যে আর্টসের চেয়ে ক্রাফ্টসেই আমার হাত খোলে বেশী।’

আমি বললুম, ‘সে আর বলতে! সেই যে, গয়না বানিয়েছিলে!’

বললে, ‘সে কথা আর তুলো না। হাত ছিল তখন বড় কাঁচা। তা সে যাক। নানা ক্রাফ্টস শিখলুম অনেক জায়গায়। শেষটায় চোখ পড়লো পর্সেলিনের দিকে। সামান্য কিছুটা শেখার পরই বুঝলুম, এ একটা মারাত্মক ব্যাপার, একটা নতুন জগৎ, এর সাধনায় আস্ত একটা জীবন কেটে যায়। মেলা কেতাবপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করলুম যে, যদিও চীন এই কর্মে একদা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, ড্রেসডেনও একদা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল, এখন কিন্তু জাপান এর রাজা।

ঘটি-বাটি বিক্রি করে চলে গেলুম জাপান।

টোকিয়ো পৌঁছানোর কয়েকদিন পরেই দেখি আমার ল্যাণ্ডলেডি চীনামাটি

নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার কাছ থেকে খবর পেলুম, পর্সেলিন অর্থাৎ চীনা-মাটির বাসনকোসন, কাপ-সসার বানানো এদেশে কুটিরশিল্পও বটে। সে কি করে হয়! যে মাটি দিয়ে পর্সেলিন তৈরী হয় তার থেকে বালু আর অগ্ন্যান্ত খাদ সরাবার জন্তু ব্যাপক বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয় অনেকখানি জায়গা নিয়ে—আমি এখানে, বাঙালোরে এসে করেছি, কিন্তু ঠিক ওৎরাচ্ছে না, এখানকার মাটি ভালো নয়—থরচাও বিস্তর। ল্যাণ্ডলেডি বললে, বাজারে রেডিমেড কাদা বিক্রি হয়। আমি ল্যাণ্ডলেডিকে বললুম, সে না হয় হল, কিন্তু পোড়াবে (fire করবে) যে, তার জন্তে কিল্ন ফারনেস (পাঁজা) পাবে কোথায়?’

আমি বাধা দিয়ে নটরাজনকে বললুম, ‘আমাদের কুমোররা—’

বললে, ‘হায়, হায়! ঐ টেম্পারেচারে মাটির হাঁড়িকুড়ি হয়। গ্রেজড্ পটারির—এ দেশের সব বস্তুই তাই—জন্তু আরো টেম্পারেচার তুলতে হয়, আর কমসে কম দু হাজার ফারেনহাইট না হলে—’

আমি বললুম, ‘থাক, থাক। ওসব আমি বুঝবো না।’

বললে, ‘হ্যাঁ সেই ভালো। তার পর খবর নিয়ে গাজেমুড়ো অবধি ওকিবহাল হয়ে গেলুম। নিজের চাই শুধু একটা পটারস ছইল—কুমোরের চাক। বাজার থেকে রেডি-মেড কাদা এনে তাতে চড়িয়ে বানাবে যা খুশী। সেগুলো ভেজা থাকতে থাকতেই তার উপর আঁকবে ছবি—নিজস্ব আপন অল্পপ্রেরণায়, এবং একই ছবি দুসরা সেটে আবার নকল করবে না, যে রকম খাস পেণ্টাররা একই ছবি দু’দুবার আঁকেন না। ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে সেগুলো ঠেলায় করে নিয়ে যাবে কিল্নওয়ার কাছে। বহু লোকের কাছ থেকে এক রাশ জমা হলে তবে সে ফায়ার করবে, নইলে খর্চায় পোষায় না। তবে মোটামুটি বলে দেয় কবে এলে তোমার মাল তৈরী পাবে। মাল খালাসীর সময় দেবে তার মজুরী। তার পর তুমি তোমার মাল পর্সেলিনের দোকানে দিয়ে আসতে পারো—তার বিক্রি করে তাদের কমিশন নেবে—কিংবা তুমি ঠেলা ভাড়া করে তার উপর মাল সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াতে পারো।’

আমি বললুম, ‘ব্যবস্থাটা উত্তম বলতে হবে। তার পর?’

‘জিনিসটা যে এত সরল সহজ করে এনেছে জাপানীরা সেটা আমি জানতুম না। সেইদিনই সব-কিছু ষোগাড় করে লেগে গেলুম কাজে। টেকনিকেল ছটো একটা সামান্য জিনিস ল্যাণ্ডলেডির করার ধরন থেকে অনায়াসে শিখে নিলুম। আর এ ব্যাপারে তো এই আমার পয়লা হাতেখড়ি নয়। আর কাপ, পটে আঁকার মত ছবির বিষয়বস্তু নিয়েও আমার কোনো হুঁতাবনা ছিল না।

মাল যখন সমুচা তৈরী হল, তখন কিছুটা দিলুম দোকানে, আর ঠেলা নিয়ে ফেরি করতে কার না শখ যায় ?

ভারতীয় বলে সর্বত্রই পেলুম অকুপণ সৌজ্ঞ্য ও সাহায্য। তুমি জানো কিনা জানি নে, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক ভবঘুরে জাপানী না জানি কি করে ভাসতে ভাসতে পৌঁছয় তোমাদের ঢাকা শহরে। ভাবতেই কি রকম মজা লাগে—হুনিয়ার সব জায়গা ছেড়ে ঢাকা। তবে ঐ চিরসবুজের দেশ—আমারও দেখা আছে—তাকে এমনি মুগ্ধ করলো যে, সে সেখানে একটা সাবানের কারখানা খুললো এবং শেষটায় একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়েও করলো। বাপ মাকে দেখাবার জন্ত একবার নিয়ে গেল তার বউকে জাপানে। ‘বুদ্ধের দেশের মেয়ে জাপানে এসেছে’ খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। সেই অজ পাড়াগাঁ রাতারাতি হয়ে গেল জাপানের তীর্থভূমি। হাজার হাজার নরনারী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে কন্ঠার দর্শনাভিলাষে। ভাবো, মেয়েটার অবস্থা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে বসতে হল পদ্মাসনে, আর নতনয় জাপানীদের লাইন তাকে প্রণাম করে পাণ্ডুঅর্ধ দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলো।’

আমি বললুম, ‘মহিলাটি ঢাকায় ফিরে তাঁর জাপান-অভিজ্ঞতা বাঙলায় লেখেন, বড় সবিনয় ভাষায়। আমি পড়েছি। সে তো এলাহি ব্যাপার হয়েছিল।’

‘হবে না ? আমার আমলে আমাদের রাসবিহারীবাবু ছিলেন জাপানীদের সাক্ষাৎ দেবতা। ভারতবর্ষ থেকে জাপানে যে কেউ আসুক না কেন—এমন কি ইংরেজও—তার কাগজপত্র যেত ওঁর কাছে। তিনি ‘না’ বললে পত্রপাঠ আগন্তকের জাপান ত্যাগ ছিল অনিবার্য। আর গুরুদেবের কাছ থেকে কেউ চিঠি নিয়ে এলে রাসবিহারীবাবু তাকে সমাজের সর্বোচ্চদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মদিনে তাঁর বাড়ি থেকে প্রসাদ বিতরণ হত—কিউ দাঁড়াতো মাইল দুয়েক লম্বা। সিঁড়া না আমাদের দেশের কি একটা খাবার—জাপানীদের কাছে রোমান্টিক এবং হোলি।

আমি অবশ্য পারতপক্ষে মাতৃভূমির পরিচয় দিতুম না।

তবু বিক্রি হতে লাগলো প্রচুর। তার কারণ সরল। পাত্রে গায়ে অজানা ডিজাইন, নবীন ছবি—তা সে ভালো হোক আর মন্দই হোক—সজ্জলেরই চিন্তা-চাঞ্চল্য এনে দেয়। তারই ফলে আমি পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলুম। ফেরি-টেরি আর করি নে—নিতাস্ত হু’মাসে ছ’মাসে এক আধ দিন—রোমান্সের জন্ত। করে করে দু বছর কেটে গেল।

একদিন ঐ ঠেলা গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আমি জিরোচ্ছি, এমন সময় এক থুরথুরে অতিবৃদ্ধ জাপানী খানদানী সামুরাই—অন্তত আমার তাই মনে হল—থমকে দাঁড়ালেন ঠেলার সামনে। কিন্তু ঐর মুখে দেখি তীব্র বিরক্তি। পুরু পরকলার ভিতর দিয়ে ক্ষণে তাকান আমার দিকে, ক্ষণে ঠেলার মালের দিকে। জাপানীরা অসহ্য রকমের অসম্ভব ভদ্র; অসম্ভবষ্ট কিছুতেই প্রকাশ করতে চায় না। ঐর কিন্তু ধৈর্যের বাধ যেন টুটে গেল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ‘এসব কি? এসব কি করেছ? যাও, যাও, ওস্তাদ ওসিমার’ কাছে। তোমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।’ তার পর আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললেন, ‘এ রকম সুরেলা গলা নিয়ে কি বিশ্রী বেসুরা গান!’

আমি বাড়িতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। সত্যিই তো, আমি এ দু বছরে নূতন শিখেছি কি? কাদা কি করে তৈরী করতে হয় কিল্ন কি করে জালাতে হয়—অন্য সব বাদ দিচ্ছি—কিছুই তো শিখি নি। দেশে ফিরলে ওগুলো আমায় করে দেবে কে? আর বাসনকোসনের শেপে, ছবিতে নিশ্চয়ই মারাত্মক ত্রুটি আছে, নইলে রাস্তার বুড়ো গুরুকম খাণ্ডা হল কেন?

চিন্তা করতে করতে মনে পড়লো শান্তিনিকেতন মন্দিরে গুরুদেবের একটা সারুমনের কথা। সোনার পাত্রে সত্য লুকানো রয়েছে—সবাই পাত্র দেখে মুগ্ধ, ভিতরে হাত দিয়ে খোঁজে না, সত্য কোথায়। আমার হয়েছে তাই। এখানে কাঁচা পয়সা কামিয়ে আমি অবহেলা করেছি সেরামিকের নিগূঢ় তত্ত্ব।

কিন্তু আর না।

ওস্তাদ ওসিমা সম্বন্ধে খবর নিয়ে কিন্তু বিশেষ ভরসা পেলুম না। তিনি বাস করেন এক অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে, এবং গত দশ বছর ধরে কোনো শাগরেদ নিতে রাজী হন নি। তবে সবাই একবাক্যে বললেন, গুরুকম গুণী এখন তো কেউ নেইই; সেরামিকের ইতিহাসেও কমই জন্মেছেন।

যা হয় হবে কুল-কপালে। সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে, একফালি বিছানা আর একটি স্টুটকেন নিয়ে পৌঁছলুম সেই গাঁয়ে, খুঁজে বের করলুম ওস্তাদের বাড়ি।

জাপানী ভাষা কিন্তু আমি বাড়লার মত স্বক্কু কান দিয়ে শিখি নি। প্রথম দিন থেকে রীতিমত ব্যাকরণ অভিধান নিয়ে—তোমরা যে রকম আশ্রমে শাস্ত্রী

১ বর্তমান লেখক ওস্তাদের নাম ভুলে যাওয়াতে অন্ত্যন্ত কাল্পনিক নামের সঙ্গে ওসিমার আশ্রয় নিল।

মশায়ের কাছে সংস্কৃত—’

আমি বললুম, ‘থাক্, থাক্।’

‘ওস্তাদের ঘরে ঢুকে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করে অতিশয় বিনয়, ততোধিক বশতা প্রকাশ করে তাঁর শিষ্য হওয়ার ভিক্ষা চাইলুম।

যেন বোমা ফাটলো ; ‘বেরিয়ে যাও এফ্‌নি, বেরোও এখান থেকে।’

আমি ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম সত্যি, কিন্তু এরকম পদাঘাত প্রত্যাশা করি নি।

আরম্ভ করলুম কাকুতিমিনতি, সূদূর ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি, আমি হতো দেব ইত্যাদি। আর শুধু মাটিতে মাথা ঠেকাই।

অনেকক্ষণ পর তিনি অতিশয় শাস্ত সংঘত কণ্ঠে বললেন, “আমি কি করি না করি সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করি নে। তবু তোমাকে বলছি—বিদেশী বলে। আমার কাছে লোক এসে ছুঁচার মাস তালিম নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রটায় তারা আমার শিষ্য। কিছুই তারা শেখে নি—আর আমার নাম ভাঙিয়ে খায়। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোনো শিষ্য নেব না”।’

আমি বললুম, ‘নটরাজন, বরোদার ওস্তাদ গাওয়াইয়া ফইয়াজ খানও হুবহু ঠিক একই কারণে তাঁর জীবনের শেষের দিকে আর কোনো চেলা নিতেন না।’

নটরাজন বললে, ‘ওঁদের দোষ দিই নে, কিন্তু আমার দিকটাও তো দেখতে হবে। আমি আমার ওস্তাদকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ওরকম কোনো কুমতলব নিয়ে আসি নি। তিনি অটল অচল, নির্বাক।

কি আর করি! বারান্দায় গিয়ে বসে রইলুম বিছানাটার উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে—আমি না-ছোড়-বান্দা, জীবনমরণ আমার পণ।

ঘণ্টাখানেক পর ওস্তাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেলেন—আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি এক লম্ফে ঘরের ভিতর ঢুকে তাঁর চাকরকে খুঁজে বের করে বললুম, “দাদা, এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি আমার সাহায্য করো।” সে আগেই গুরুর সঙ্গে আমার বাক্যলাপ শুনেছিল। তাকে বথশিশের লোভও দেখালুম। তার অহুমতি নিয়ে ওস্তাদের সব ক’খানা ঘরে লাগালুম ঝাঁট, ঝাড়াই-পোছাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে। গামলার জল পাণ্টালুম, রঙতুলি গুছিয়ে রাখলুম, জামা-কিমোনো ভাঁজ করলুম, বিছানা দুরুস্ত করলুম। তারপর ফের বারান্দায়, বিছানার উপর। ওস্তাদ ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে দরজার সামনে এক লহমার তর্রে একটু থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু নির্বাক। এবার চাকরকে চাকের ঝুঁক দিলেন।

আমি আড়াল থেকে লক্ষ্য করলুম। ঘণ্টাখানেক পরে খেয়ে শুতে গেলেন। আমি গায়ের যে একটি মাত্র খাবারের দোকান ছিল সেখানে শুটকি-ভাত খেয়ে এলুম। ওস্তাদ ঘুম থেকে উঠে চায়ের জন্ম হাঁক দিতেই আমি রান্নাঘর থেকে চায়ের সরঞ্জাম এনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চা তৈরী করে কাপ এগিয়ে দিলুম। তিনি তখন আমার দিকে পিছন ফিরিয়ে ভেজা পাত্রে ছবি আঁকছিলেন। পেয়াল হাতে নিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভ্রুকুটি-কুটিল নয়নে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু নির্বাক। এরপর আমি রঙ গুলে দিতে লাগলুম। যাই বলো, যাই কও—আমিও আর্টিস্ট। কখন কোন্ রঙের দরকার হবে আগের থেকেই বুঝতে পারি। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় না। তিনি নির্বাক।

সে রাত্রে আমি বারান্দাতেই ঘুমিয়েছিলুম। কিন্তু ঐ এক রাত্রিই।

ভোর থেকেই লেগে গেলুম চাকরের কাজে। তার পরের দিন। ফের পরের দিন। চাকরটা এখন আর তাঁর ঘরেই ঢোকে না। তিনি নির্বাক।

আমি দু বেলা হোটেলে গিয়ে শুটকি-ভাত খাই, আর রাত্রে চাকরের পাশে শুই।

বিশ্বাস করবে না, এই করে করে প্রায় একমাস গেল। তিনি নির্বাক।

মাসখানেক পরে একরাত্রে আমি আমার ইচ্ছা আর কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। যা দেখেছি সেইটে কাজে লাগাবার অদম্য কামনা আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে। অতি চুপিসাড়ে ওস্তাদের পটার্স রুমের পাশে বসে একটা জাম-বাটি তৈরি করতে লাগলুম তন্ময় হয়ে। হঠাৎ পিঠের উপর একটা বিরশি সিকার কিল আর হুকার।

“কোনু গর্দভ তোমাকে শিখিয়েছে গুরুকম ধারা বাটি ধরতে? কোনু মর্কট তোমাকে শিখিয়েছে গুরুকম আঙুল চালাতে? প্রত্যেকটি জিনিস ভুল। যেন ইচ্ছে করে যেখানে যে ভুলটি করার সেটা মেহনত করে করে শিখেছ। হটো ইহাসে!”

গুরু প্রথম নিজে করলেন। কী বলবো ভাই, তাঁর দশটি আঙুল যেন দশটি নর্তকী। প্রত্যেকটির ফাংশন যেন ভিন্ন ভিন্ন, নাচে আপন আপন নাচ। তারপর আমাকে বসিয়ে আমার হাতে হাত ধরে গুরু করলেন গোড়ার থেকে। আর শুধু বলেন, “হা আমার অদৃষ্ট, এসব গলদ মেরামত করতে করতেই তো লেগে যাবে পাঁচটি বছর!”

এই আমার প্রথম পাঠ। ভোর অবধি চলেছিল।

সকালবেলা চা খেতে খেতে শান্ত কর্তে বললেন, “ভুল প্র্যাকটিস বে কী

মারাত্মক হতে পারে তার কল্পনাও তোমার নেই। তোমার ঘর কাঁট দেওয়া, রঙ গোলা থেকে আমি অহুমান করেছিলুম তোমার হাত আছে, কিন্তু অসম্ভব খারাপ রেওয়াজ করে করে তার যে সর্বনাশ করে বসে আছো সেটা জানলে প্রথম দিনই পুলিশ ডেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিতুম। এখন দেখি, কি করা যায়। এও আমার এক নতুন শিক্ষা! তোমাকে নেব দুই শর্তে। প্রথম, আমি অহুয়তি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার কাজ জনসাধারণকে দেখাতে পারবে না। দ্বিতীয়, আমি অহুয়তি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি শিক্ষা ক্ষান্ত দিয়ে পালাতে পারবে না।”

আমি বুদ্ধের নামে শপথ করলুম।

তারপর, ভাই, আরম্ভ হল আমার পিঠের উপর র‍্যাঁদা চালানো। একই কাজ একশ’ বার করিয়েও তিনি তৃপ্ত হন না—আর মোস্ট এলমেণ্টারি টাস্ক। সঙ্গীতের উপমা দিয়ে বলতে পারি, এ যেন স্ত্রেফ ‘সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। সা রে গা মা পা ধা নি—’

আমি বললুম, ‘বোমা পড়ে জাপানী!’

নটরাজন অবাক হয়ে বললে, ‘সে আবার কি?’ আমি বললুম, ‘সিলেটে গত যুদ্ধে প্রথম জাপানী বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কবি রচেন,

সা রে গা মা পা ধা নি

বোমা পড়ে জাপানী

বোমার মধ্যে কালো সাপ

বিটিশে কয় বাপ রে বাপ!’

নটরাজন বললে, ‘আমার অবস্থা তখন ব্রিটিশের চেয়েও খারাপ। তারা তো পালিয়ে বেঁচেছিল, আমার যে পালাবারও উপায় নেই। তবে গুরু এখন বাধ্যয়। চা খেতে খেতে, বেড়াতে যেতে যেতে ফাইয়ঁস-পর্সেলিনের গুহৃতম তত্ত্ব বোঝাতেন, কিন্তু রেওয়াজের বেলা সেই প্রাণবাতী সা রে গা মা।

পাক্কা দেড়টি বছর পরে পেলুম দ্বিতীয় পাঠ!

ইতিমধ্যে দেখি, এ-দেশের ব্যাপারটাই আলাদা! অনেক দিন একটানা পাত্র গড়ে তার উপর ছবি এঁকে যখন এক ডাঁই তৈরী হল তখন গুরু কিল্‌নে সেগুলো ঢুকিয়ে করলেন ‘ফায়ারিং’। ইতিমধ্যে পটারির সমঝদারদের কাছে নিমন্ত্রণ গেছে, অমুক দিন অমুকটার সময় তাঁর পটারির প্রদর্শনী। টাউস টাউস মোটর চড়ে, গ্রাম্যপথ সচকিত করে এলেন লক্ষপতিয়া। তাঁরা চা খেলেন। সার্ড করলুম। সবাই ভাবলেন আমি বিদেশী চাকর। একজন একটু কোঁতুল

দেখিয়েছিলেন, গুরু সেটা অঙ্করেই বিনাশ করলেন। তার পর ঠুঁদের সামনেই কিল্‌ন থেকে পটারি বের করা হল। পাঁচ শ থেকে আরম্ভ করে, এক এক সেট হু'হাজার তিন হাজার টাকায় সব—সব বিক্রি হয়ে গেল। দেশে, বিলেতে মাহুষ যে রকম ছবি, মূর্তি কিনে নিয়ে আপন কলেক্‌শন বানায়।

তার পর আন্তে আন্তে অহুমতি পেলুম পাত্রেয় গায়ে ছবি আঁকবার। পুরো এক বছর ধরে পাত্র গড়ি, ছবি আঁকি কিন্তু কিল্‌নে ঢোকবার অহুমতি পাই নে। ভেঙে ফেলতে হয় সব। সে কী গব্বয়জ্ঞা!

এমন সময় এল গুরুর আরেকটা প্রদর্শনী। আমি গোপনে গুরুর ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটা কাপ এক কোণে রেখে দিলুম। ডিজাইন দিয়েছিলুম পার্শিয়ান। আমাদের দেশে তো সেবামিকের ঐতিহ্য নেই, আর পার্শিয়ান ডিজাইন জাপানে প্রায় অজানা।

চায়ের পর কিল্‌ন খোলার সময় প্রায় একই সময়ে সকলের দৃষ্টি পড়ে গেল আমার কাপটার উপর। আমি আশা করেছিলুম ওটা আমি গোপনে সরিয়ে নিতে পারবো। আমি তখন ছোঁ মেরে সেটা সরিয়ে করলুম পলায়ন। ঠুঁদের ভিতর তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আমার কাপ নিয়ে নীলাম। গুরু বলবার ঘরে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে কাপটি রাখলুম। তখন তাঁরা বুঝলেন, এটা কার কাজ। গুরু শ্মিত হাস্তে ঠুঁদের সবকিছু বয়ান করে বললেন, “শিগগিরই ওর আপন প্রদর্শনী হবে। আপনারা কে কি চান অর্ডার দিয়ে যান।”

ওয়া চলে গেলে আমি সব বুঝিয়ে গুরুর কাছে মাফ চাইলুম। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, “হু-চার মাসের ভিতর এমনিতেই হ’ত। তোমাকে কিছু বলি নি।”

আমি কাজে লেগে গেলুম। গুরু আপন কাজ বন্ধ করে দিয়ে পই পই করে তদারকি করলেন আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বা অঙ্গুলিচালনা।

নিমন্ত্রণ-পত্র বেরুলো তাঁর নামে। আমার প্রথম প্রদর্শনী। গুরু বললেন, “তোমার একটা ফটো ছেপে দাও চিঠিতে।”

নটরাজন বললে, “দাঁড়াও, সে চিঠির একটা কপি বোধহয় বউয়ের কাছে আছে।” তাঁকে স্মরণ করা হলে তিনি নিয়ে এলেন একটা এ্যালবাম। তাতে মেলা প্রেস-কাটিংস। নটরাজনের প্রদর্শনীর রিভিউ। নিমন্ত্রণপত্রে তাক্‌জ্ব হয়ে দেখি ফটোতে নটরাজনের মাথায় খাল পাঠান পাগড়ি! আমি বললুম, ‘এ কি?’ বললে, ‘তাই, জাপানীরা ঐ পাগড়িটাই চেনে। ওঠা হলেই ইন্ডিয়ান!’

আমি শুধালুম, 'তারপর !'

'প্রদর্শনী হল। গুরু মন্দিরটার মত প্যাখম তুলে ঘোরাঘুরি করলেন। বেবাক্ মাল বিক্রি হয়ে গেল। কাঁড়া কাঁড়া টাকা পেলুম। কাগজে কাগজে রিভিউ বেরলো।'

নটরাজনের স্ত্রী বললেন, 'তিনি জাপানের অন্ততম সেরা আর্টিস্ট বলে স্বীকৃত হলেন।'

নটরাজন বললে, 'সে সব পরে হবে। আমার মস্তকে কিন্তু সাতদিন পরে সাক্ষাৎ বজ্রাঘাত। চাঁদের আলোতে ঝরনাতলায় চুকচুক করে সাকে খেতে খেতে গুরু বললেন, "এইবারে বৎস, তোমার ছুটি। টোকিওতে গিয়ে আপন পসরা মেলা।"

আমি আর্তকণ্ঠে বললুম, "গুরুদেব, আমার যে কিছুই শেখা হয় নি।"

গুরু বললেন, "বৎস, শেখার তো শেষ নেই। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে তালিম নেবার একটা শেষ থাকে। তোমাদের ইস্কুল-কলেজেও তো শেষ উপাধি দিয়ে বিদায় দেয়। তখন কি আর গুরু শোনে তোমার মিনতি যে, তোমার কিছুই শেখা হয় নি ? আমি যে সব ছন্দ পুরুষায়ক্রমে পেয়েছি তার প্রত্যেকটি তোমাকে শিখিয়েছি। এবারে আরম্ভ করো সাধনা।"

আমার সব অমুনয়-বিনয় ব্যর্থ হল। বললেন, "মাঝে মাঝে এসো ; তোমার কাজ দেখে আলোচনা করবো। নির্দেশ দেবো না, আলোচনা করবো।"

আমি পরের দিন আমার সঞ্চয়ের সব অর্থ গুরুর পদপ্রান্তে রাখলুম— গুরুদক্ষিণা। তিনি একটি কড়িও স্পর্শ করলেন না। অনেক চেষ্টা দিলুম। আবার তিনি নির্বাক ! সেই প্রথম দিনের মত।'

বেশ খানিকক্ষণ কি যেন একটা ভেবে নিয়ে নটরাজন বললে, 'এর সঙ্গে কিন্তু একটা সাইড-ড্রামাও আছে।'

'সেটা কি ?'

মুচকি হেসে বললে, 'তার কন্ডার—'

মিসেস উঠে বললেন, 'আমি চললুম।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া।

নটরাজন বললে, 'তার কন্ডার পাণিগ্রহণের অহুমতি চাইলুম।'

আমি বললুম, 'সে কি ! এর তো কিছু বলো নি !'

'বললুম তো, সে অস্ত্র নাট্য। আরেক দিন বলবো।'

'গুরু কি বললেন ?'

‘হু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বললেন “আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না যে আমার গুণী মেয়ে কোনো আনাড়ির হাতে পড়ে, যে সেরামিকের রস জানে না। তোমরা দুজনতে আমার ঘরানা বাঁচিয়ে রাখবে, সমৃদ্ধ করবে।” আমার স্ত্রী সত্যি ভালো কাজ করতে পারে।’

*

*

*

পরের দিন শুধালুম, ‘দেশে ফিরে কি করলে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ‘আমি জানতুম এদেশে অলঙ্ঘ্য বাধাবিধি। কাদা-কিলনের কথা বাদ দাও, আমার হ্যাণ্ডপেণ্টেড অরিজিনাল জিনিস পাঁচশ’ হাজার টাকা দিয়ে কিনবে কে? এদেশে তো এসব কেউ জানে না,—ভাববে আমি পাগল, একটা টি-সেটের জন্য পাঁচশ’ টাকা চাইছি। এদেশে জাপানী ক্রকারি আসে মেশিনে তৈরী মাস্-প্রোডাকশন্। আমার তো প্রতি মাসে অন্তত সাতশ, হাজার টাকা চাই। জাপানে প্রতি মাসে পাঁচ-সাত হাজারও কামিয়েছি।’

আমি বললুম, ‘এ কী ট্রাজেডি! যা শিখলে তার সাধনা করতে পেলে না?’

হেসে বললে, ‘আমি কি পয়লা না শেষ? বিদেশ থেকে উত্তম সায়াস শিখে এসে কত পণ্ডিত উপযুক্ত স্বল্পপাতির অভাবে এদেশে শুকিয়ে মরে! আর ষারা ছবি আঁকে? তাদেরই বা ক’জনের অল্প জোটে? তাই একটা চাকরি নিয়েছি—দেখি, অবসর সময়ে যদি কিছু—’

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম, ‘তোমার চাকরিটা তো ভালো। তোমাদের সেরামিক ফ্যাক্টরি গুনেছি, ভারতের সর্বোত্তম। সবচেয়ে বেশী টেম্পারেচর তুলতে পারে তোমাদের কিলনে।’

অটহাস্ত করে নটরাজন বললে, ‘ইন্সুলেটর! ইন্সুলেটর! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি! টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথায় সাদা মুতুটা দেখেছ? আমার বানাই সেই মাল। অষ্টপ্রহর তাই বানিয়েও বাজারের খাঁই মেটাতে পারি নে। কোম্পানির ওতেই লাভ, ওতেই মুনাফা। আর দয়া করে ভুলো না, হরেক রকম ইন্সুলেটর সেরামিক পর্যায়েই পড়ে! হা-হা হা-হা, যেমন দেয়ালে যে বঙ লাগায় সেও পেণ্টার, অবন ঠাকুরও পেণ্টার!’

ইন্সুলেটর হে, ইন্সুলেটর !!

বুড়ো-বুড়ী

‘চিঠি নাকি, বাবাজী আজান ?’

‘বিলক্ষণ, মসিয়ো...প্যারিস থেকে এসেছে।’

চিঠিখানি যে খুদ প্যারিস থেকে এসেছে তাই নিয়ে সাদা-দিল্ বাবাজী আজানের চিন্তে রীতিমত দেমাক।...কিন্তু আমার না। কে যেন আমায় বলে দিচ্ছিল, এই যে জঁয়া জাক্ রুসো সরগীর প্যারসিনী বলা নেই কওয়া নেই, সাত সকালে হঠাৎ আমার টেবিলের উপর এসে অবতীর্ণ হলেন, ইনি আমার পুরো দিনটারই সর্বনাশ করবেন। ঠিক। তুল করি নি : বিশেষ না হয় দেখুন :

‘আমার একটু উপকার করতে হবে, দোস্ত। তোকে এক দিনের তরে তোর ময়দা-কল বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে এইগুইয়ের যেতে হবে...এইগুইয়ের বড় গণ্ডগ্রাম, তোর গুথান থেকে পাঁচ ছ কোশ—কিছু না, বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে যাবি। পৌঁছে অনাথাত্রয়ের খোঁজ নিবি। আশ্রমের ঠিক পরের বাড়িটা একটু নিচু, জানলা-খড়খড়ি ছাই-রঙা, বাড়ির পিছনভাগে একটুখানি বাগান। কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়বি,—দরজা হামেহাল খোলা থাকে—আর ঘরে ঢুকেই আচ্ছা জোরসে চৈচিয়ে বলবি, “সজ্জনদের পেনাম জানাই ! আমি মরিসের বন্ধু...” তখন দেখতে পাবি এক মুঠো সাইজের ছোট্ট একজোড়া বুড়ো-বুড়ী, ওঃ ! সে কী বুড়ো ! বুড়ো, তার চেয়েও বুড়ো, আত্মিকালের বুড়ো-বুড়ী তাঁদের বিরাট আরাম কেন্দ্রার গর্ভ থেকে তোর দিকে হাত তুলে ধরবেন, আর তুই তখন তাঁদের আমার হয়ে আলিঙ্গন করবি, চুমো খাবি, তোর সর্ব হৃদয় দিয়ে, যেন গুঁরা তোরই। তার পর সবাই মিলে গাল-গল্প আরম্ভ হবে ; গুঁরা হৃদু আমার সম্বন্ধেই কথা কইবেন, আর কিছুটি না, হৃদু আমার কথা ; হাজার হাজার আবোল-তাবোল বকে যাবেন, তুই কিন্তু হাসবি নি...হাসবি নি কিন্তু, বুঝেছিস ?...এঁরা আমার ঠাকুন্দা, ঠাকুমা, গুঁদের আগাপাস্তলা প্রাণ একমাত্র আমি—এবং আমাকে দশ বছর হল দেখেন নি...দশ বছর—দীর্ঘকাল ! কিন্তু করি কি বল ! আমি—প্যারিস আমাকে জাবড়ে ধরে আছে ; গুঁদের ? গুঁদের আটকে রেখেছে বুড়ো বয়স... এঁদের যা বয়স, আমাকে দেখবার জ্ঞান রওয়ানা হলে পশ্চিমধ্যে চালানী মালের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন...কিন্তু আমার কপাল ভালো, তুই তো ভাই, হোথায় আছিস, বেরাদর আমার, ময়দাকলের মালিক’—তোকে আদর-প্যার করে

১ আসলে দোদে নিজঁনে বাস করার জ্ঞান একটি অতিবৃদ্ধ পরিত্যক্ত মিল ভাড়া করেছিলেন, প্রায় বিনামূল্যে।

বেচারী বুড়ো-বুড়ীরা আনন্দ পাবে, যেন আমারই এ্যাটুথানিকে চুমো-চামা খাচ্ছে...আমি অনেক বার আমাদের কথা ওঁদের বলেছি, এবং আমাদের গভীর বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও, যেটি কি না....’

জাহান্নামে যাক বন্ধুত্ব! ঠিক আজকের সকালটাতেই আবহাওয়াটি হয়েছে চমৎকার, কিন্তু বাউণ্ডলের মত যত্র-তত্র চর্কিবাজি খাওয়ার মত আদপেই নয়। একে তো বইছে জোর হাওয়া, তদুপরি রৌদ্রটিও চড়চড়ে কড়া—প্রভাস অঞ্চলের খাঁটি দিন যাকে বলে। আমি ঠিক করে বসেছিলুম, হুটি পাহাড়ের টিপির মধ্যখানে শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেব ছবছ একটি গিরগিটির মত, স্থূললোক পান করতে করতে আর পাইন গাছের মর্মর গান শুনতে শুনতে—এমন সময় এল ঐ লক্ষ্মীছাড়া চিঠিটা...কিন্তু করা যায় কি কণ্ড? মিল্টা বন্ধ করলুম অভিসম্পাত দিতে দিতে, চাবিটা রেখে দিলুম বেরালটার আসা-যাওয়ার ছোট্ট গর্তটার ভিতর। লাঠিটা, পাইপটি—বাস, নাবলুম রাস্তায়।

বেলা প্রায় দু’টোর সময় পৌঁছলুম এইগুইয়েরে। গাটা খাঁ খাঁ করছে, সবাই খেত-খামারে। ধুলোয় ঢাকা এলুম গাছে ঝিল্লি ঝিঁঝিঁ করছে যেন নিজের খোলামাঠের মধ্যখানে। অবিজ্ঞি সরকারী বাড়িটার সামনের চত্বরে একটা গাধা রোদ পোয়াচ্ছিল বটে, আর গিজের সামনের কোয়ারার একপাল পায়রাও ছিল, কিন্তু অনাখাশ্রমটি দেখিয়ে দেবার মত কেউই ছিল না। কিন্তু কপাল ভালো, হঠাৎ আমার সামনে যেন পরীর মত আত্মপ্রকাশ করলে এক বুড়ী। ঘরের সামনের এক কোণে উপু হয়ে বসে চরকা কাটছিল। শুধালুম তাকে। আর পরীটিরও ছিল দৈবীশক্তি। কড়ে আঙ্গুলটি তুলে দেখাতে না-দেখাতে তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে যেন মন্ত্রবলে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে উঠলো অনাখা-শ্রমটি!...বিরাট, ভারিক্কি, কালো কুঠিবাড়ি। বেশ দেমাকের সঙ্গে তার দেউড়ির উপরের পাশটে লাল রঙের প্রাচীন দিনের ক্রুশ—চতুর্দিকে আবার দু’হস্তর লাতিনও দেখিয়ে দিচ্ছে! ঐ বাড়িটার পাশেই দেখতে পেলুম আরেকটি ছোট্ট বাড়ি। ছাইরঙের খড়খড়ি, পিছনে ছোট্ট বাগানটি...তদুগেই চিনে গেলুম, কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়লুম।

আমার বাকী জীবন ধরে আমি সেই দীর্ঘ করিডরটি দেখব; মন্দ-মধুর ঠাণ্ডা, শাস্ত-প্রশান্ত, দেয়ালগুলো গোলাপী রঙের, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে দেখি বাগানটি যেন স্বচ্ছ রৌদ্রালোকে অল্প অল্প কাঁপছে, আর শানিগুলোর উপর ফুলপাতার জড়ানো বেহালার ছবি আঁকা। আমার মনে হল আমি সেদেই যুগের প্রাচীন সম্রাট দরবারখানায় পৌঁছে গিয়েছি।...করিডরের শেষপ্রান্তে, ডানদিকে, আধ-

ভেজানো দরজার ভিতর দিয়ে আসছে দেয়াল-ঘড়ির টিক্-টাক্ শব্দ, আর একটি শিশু—ইজুলের বাচ্চার গলার শব্দে—প্রতি শব্দে থেমে থেমে পড়ছে : ত—খন... সেণ্ট...ইরেনে^২...চিংকা...র...করে...বললেন...আমি...প্রভুর...ঘেন...গম... শব্দ...আমাকে...ময়দা...হতে...হয়ে...ঐ...সব...পদ্মদের...দাঁতের...পিষণে...। আমি ধীরে ধীরে য়ুহ পদে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকালুম।

শান্ত, অর্ধ দিবালোকে, ছোট্ট একটি কামরার ভিতর, গভীর একটা আরাম-কেদারার ভিতর ঘুমুচ্ছেন এক অতি বৃদ্ধ। গোলাপী ছোট্ট দুটি গাল, আজুলের ডগা অবধি সর্ব শরীরের চামড়া কৌচকানো, মুখ খোলা, হাত দুটি দু'জাম্বর উপর পাতা। তাঁর পায়ের কাছে নীল পোশাক পরা ছোট্ট একটি মেয়ে—মাথায় নানদের মত টুপি, অনাথাশ্রমের মেয়েদের পোশাক পরা—সাম্বী ইরেনের জীবনী পড়ছে—বইখানা আকারে তার চাইতেও বড়। এই অলৌকিক পুরাণ পাঠ যেন সমস্ত বাড়িটার উপর ক্রিয়া চালিয়েছে। বৃদ্ধ ঘুমুচ্ছেন তাঁর আরাম-কেদারায়, মাছিগুলো ছাতে, ক্যানারি পাখিগুলো এই হোথায় জানলার উপরে তাদের খাঁচায়। প্রকাণ্ড দেয়াল-ঘড়িটা নাক ডাকাচ্ছে—টিক্, টাক্, টিক্, টাক্। সমস্ত ঘরটাতে কেউই জেগে নেই—সুন্দুমাঙ্গ খড়খড়ির ভিতর যে এককালি সাদা, সোজা আলো এসে পড়েছে তার ভিতর ভর্তি জীবন্ত রশ্মি-কণা—তার নাচছে তাদের পরমাণু নৃত্যের চক্রাকারের ওয়াল্ট্‌স্...এই ঘরজোড়া তন্দ্রালসের মাঝখানে সেই মেয়েটি গভীর কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছে : সঙ্কে...সঙ্কে...ছুটো...সিংহ...লাফ...দিয়ে...পড়ল...তাঁর...উপর... এবং...তাকে...উদর...সাং...করে...ফেলল...ঠিক ঐ মুহূর্তেই আমি ঘরে ঢুকলুম। স্বয়ং সেণ্ট ইরেনের সিংহ ছুটোও ঐ সময়ে সে-ঘরে ঢুকলে এতখানি বিহ্বলতার স্তম্ভন সৃষ্টি করতে পারতো না। সে-ঘেন রীতিমত নাটকীয় আচমকা আবির্ভাব! বাচ্চাটা ডুকরে উঠলো, বিরাট কেতাবখানা পড়ে গেল, ক্যানারি পাখিগুলো জেগে উঠলো, দেয়াল-ঘড়িটা ঢং ঢং করে উঠলো, বুড়ো প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন—একেবারে হকচকিয়ে গেছেন—আর আমিও কেমন ঘেন বোকা বনে গিয়ে চৌকাঠে থমকে গিয়ে বেশ একটু জোর গলায় বলে উঠলুম :

‘সুপ্রভাত, সজ্জনগণ! আমি মরিসের বন্ধু!’

২ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধন্তবাদ দিচ্ছি।

আহা ! আপনারা যদি তখন তাঁকে দেখতে পেতেন—যদি দেখতে পেতেন, বেচারী বুড়াকে দেখতে পেতেন ! দুই বাছ প্রসারিত করে আমাকে আলিঙ্গন করতে, আমার হাত দুখানা ধরে ঝাঁকুনি দিতে এগিয়ে এলেন, আর স্বরময় উত্তেজিত হয়ে ছোটোছুটি লাগিয়ে শুধু বলেন,

‘হে দয়াময়, হে দয়াময় !’...

তাঁর মুখের সব কৌচকানো চামড়া হাসিতে ভরে উঠেছে। আর তোতলাচ্ছেন,

‘আ মসিয়ো,...আ মসিয়ো...’

তার পর কামরার শেষ প্রান্তে ডাক দিতে দিতে গেলেন :

‘মামেং !’

একটা দরজা খুলে গেল। করিডরে যেন একটা ইহুরের পায়ের শব্দ শোনা গেল...ঐ যে মামেং ! ঐ এক ফোঁটা বুড়ী—কী যে স্নন্দর দেখাচ্ছিল—মাথায় গিঁট বাঁধানো বনেট, পরনে কারমেলিট নান্দের ফিকে বাদামী রঙের পোশাক, হাতে নক্শা-কাটা রুমাল—আমাকে সেই প্রাচীন দিনের কায়দায় অভিনন্দন জানানোর জন্তে...ওঁদের দেখলেই কিন্তু বুকেটা দরদে ভরে আসে, দুজন্যরই চেহারা একই রকমের ! বুড়োর মাথার চুল বদলে দিয়ে বুড়ীর বনেট তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে তাঁকেও মামেং নাম দেওয়া যেত !...শুধু সত্যিকার মামেংকে নিশ্চয়ই তাঁর জীবনে চোঁথের জল ফেলতে হয়েছে অনেক বেশী, আর তাঁর সর্বাঙ্গের চামড়া কুঁকড়ে গিয়েছে আরো বেশী। বুড়োর মত ওঁরও সঙ্গে অনাথাশ্রমের একটি ছোট্ট মেয়ে, পরনে অগ্র মেয়েটার মতই পোশাক, বুড়ীর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে, কক্থনো তাঁর সঙ্গে ছাড়ে না—অনাথাশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত দুটি বাচ্চা মেয়ে এই দুই বুড়ো-বুড়ীকে যেন আশ্রয় দিয়ে রক্ষণ করছে—এর চেয়ে হৃদয়স্পর্শী যেন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না।

ধরে ঢুকতে ঢুকতে বুড়ী আমাকে গভীর সম্মান-অভিবাদন জানাতে আরম্ভ করছিলেন, কিন্তু বুড়ো একটি শব্দ দিয়েই তাঁর সম্মান-অভিবাদন কেটে হু’-টুকরো করে ফেললেন :

‘এ তো মরিসের বন্ধু...’

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী কাঁপতে লাগলেন, কেঁদে ফেললেন, রুমালখানা হারিয়ে ফেললেন, মুখ রাঙা হয়ে গেল, টকটকে লাল, বুড়োর চেয়েও বেশী লাল...হার্য, বুড়ো-বুড়ী ! এঁদের সর্ব শিরায় আছে মাত্র একটি ফোঁটা রক্ত, আর সামান্ততম অহুত্বের পরশ লাগলেই সেই ফোঁটাটি মুখে এসে পৌঁছে যায়।

‘শিগ্গির, শিগ্গির—চেয়ার নিয়ে এস’...বুড়ী তাঁর বাচ্চাটিকে বললেন।

‘জানলাটা খুলে দাও’—বুড়ী তাঁর বাচ্চাটিকে হুকুম দিলেন।

তার পর ছ’জনাতে আমার ছ’ বাছ ধরে খুট খুট করে হেঁটে নিয়ে চললেন জানলার কাছে। সেটা পুরো খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে করে ওরা আমাকে আরো ভালো করে দেখতে পান। আমরা এগিয়ে গেলুম আরাম-কেন্দারার কাছে। আমি বললুম তাঁদের দুজনার মাঝখানে চেয়ারে। মেয়ে দুটি আমাদের পিছনে। তার পর আরম্ভ হল সওয়াল :

‘কি রকম আছে সে? কি করে সে? এখানে আসে না কেন? স্থখে আছে তো?’

এটা, ওটা, সেটা—কত শত কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আর আমি? তাঁরা আমার বন্ধুবাবদে যে সব প্রশ্ন শুধোচ্ছিলেন সেগুলোর উত্তর আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যমত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তো দিলুমই—যেগুলো জানা ছিল; আর যেগুলো জানা ছিল না সেগুলো নির্লজ্জভাবে বানিয়ে বানিয়ে। আর বিশেষভাবে অবশ্যই কিছুতেই স্বীকার করলুম না যে তার ঘরের জানলাগুলো ঠিকমত বন্ধ হয় কি না সেটা যে আমি লক্ষ্য করি নি, কিংবা তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের!

‘তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের?...নীল রঙের ঠাকুমা, হাকা নীল—আসমানী রঙের—ফুলের মালার ছবি আঁকা।...’

‘—তাই না?’ বুড়ী একবারে গদগদ। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘সোনার চাঁদ ছেলেটি!’

বুড়ী সোৎসাহে যোগ দিলেন, ‘সোনার চাঁদ ছেলে।’

আর আমি যতক্ষণ কথা বলছিলুম, তাঁরা একে অল্পের দিকে তাকিয়ে ক্ষণে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন, ক্ষণে সামান্য শ্মিতহাস্য করছিলেন, ক্ষণে চোখে চোখে তাঁর মারছিলেন, ক্ষণে একে অল্পকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন—কিংবা বুড়ী আমার একটু কাছে এসে আমায় বলেন,

‘আরেকটু জোরে কণ্ঠ...ভালো করে শুনতে পায় না ও।’

আর উনিও, ‘আরেকটু চেষ্টা, লক্ষ্যটি!...উনি সব কথা ভালো করে শুনতে পান না...’

আমি তখন গলাটা একটু চড়াই; দুজনাই তখন একটুখানি শ্মিতহাস্যে আমাকে ধন্যবাদ জানান। আর তাঁদের লেই হাঙ্গা কিকে শ্মিতহাস্যভরা দৃষ্টি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁরা যেন আমার চোখের নিভৃতভম গভীরে খুঁজে

দেখবার চেষ্টা করেন তাঁদের মরিসের ছবি ; আর আমার হৃদয়ও যেন আমার বন্ধুর ছবি তাঁদের চোখে দেখে একেবারে গলে যায়—আবছা-আবছা, ঘোমটা-ঢাকা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেন অনেক দূরের থেকে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে মুহু মুহু হাসছে ।

*

*

*

হঠাৎ বুড়ো তাঁর আরাম-কেদারার গভীর থেকে হকচকিয়ে উঠলেন :

‘আমার কি মনে পড়লো, মামেং...সে বোধহয় এখনো ছপূরের খাবার খায় নি !’

আর মামেং আর্ত হয়ে শূণ্যে তুলে দিয়েছেন হাত দুখানা :

‘এখনো খায় নি !...হে দয়াময়, হে ভগবান !’

আমি ভাবলুম, এখনও বৃষ্টি মরিসের কথাই হচ্ছে ; তাই তাঁদের বললুম যে, তাঁদের যাহু মরিস ছপূর হতে না হতেই খানার টেবিলে বসে যায়—তার চেয়ে দেরি সে কস্মিনকালেও করে না । কিন্তু না, এবারে উঠেছে আমার কথা । আর আমি যখন স্বীকার করলুম যে আমি তখনো থাই নি, তখন যে ধন্দুমার আরম্ভ হল সেটা সত্যি দেখবার মত ।

‘শিগ্গির শিগ্গির নিয়ে এসো । ছুরি কাঁটা সব—ও বাচ্চারা ! টেবিলটা ঘরের মধ্যখানে নিয়ে এস । রবারের টেবিলক্লথ, ফুলের নক্সাদার বাসন-প্লেটগুলো ! আর অত হাসাহাসি না করলেও আমাদের চলবে, বুঝলে ! আর জলদি, জলদি, প্রীজ !’

আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, তারা জলদি জলদিই করেছিল ! তিনখানা পেলেট ভাঙতে যতখানি সময় লাগার কথা তার পূর্বেই টেবিল, খাবার-দাবার, সব তৈরী ।

‘শামান্স একটু ভালো-মন্দ নাশতা বই আর কিছু নয়’—আমাকে টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে মামেং বললেন । ‘শুধু তোমাকে একলা-একলিই খেতে হবে । আমরা ? আমরা সকাল বেলাই খেয়ে নিয়েছি ।’

বেচারী বুড়ো-বুড়ী ! যে কোনো সময়েই ওঁদের শুধোও না কেন, ওঁদের সব সময়েই ঐ এক উত্তর, তাঁরা সকাল সকালই খেয়ে নিয়েছেন ।

মামেংয়ের দেওয়া নাশতা—দুধ, খেজুর আর একখানা আন্ত ‘পাই’ ; ঐ দিয়ে কিন্তু মামেং আর তার ক্যানারি পাখীগুলোর নিদেন আটদিনের খাওয়া-দাওয়া চলে যায়...তাই ভাবো দিকি নি, আমি একাই তাবৎ মালের শেষ কথাটুকু খেয়ে ফেললুম !...আর টেবিলের চতুর্দিকে সে কী ‘কেলেঙ্কারি’ ! জুড়ে দুই

নীলাধরী একে অন্তর্ভুক্ত করে কল্লুইয়ের গুঁতো মেয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করছিল, আর খাঁচার ভিতরে ক্যানারিগুলোর ভাব, যেন মনে মনে বলছে, 'দেখেছ! এ কেমন ভয়ঙ্কর! গোটা পাইটাই খেয়ে ফেললে!'

কথাটা সত্যি। আমি প্রায় সমস্তটাই বেথেয়ালে খেয়ে ফেলেছি—কারণ আমি তখন ঐ শান্ত শীতল ঘরটার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছি সেখানে কেমন যেন প্রাচীন দিনের সৌরভ ভাসছিল...বিশেষ করে দুটি ছোট্ট খাট থেকে আমি আমার চোখ কিছুতেই ফেরাতে পারছিলুম না। প্রায় যেন ছোট্ট দুটি শিশুদের দোলনা। আমি কল্পনা করতে লাগলুম—সকালে, অতি ভোরে বুড়ো-বুড়ী ঝালর-লাগানো পর্দাঘেরা খাটের গভীরে শুয়ে। ভোর তিনটে বাজলো। ঐটেই সব বুড়ো-বুড়ীর জেগে ওঠার সময়।

—ঘুমুচ্ছে, মামেং ?

—না গো।

—কি বলা, মরিস ছেলেটি বড় লক্ষ্মী—না ?

—সে আর বলতে, বড় লক্ষ্মী ছেলে !

আর স্বল্পমাত্রা একটির পাশে আরেকটি, বুড়ো-বুড়ীর ছোট্ট দুটি খাট দেখে আমি ওদের দুজনার মধ্যে পুরোপুরি একটি কথাবার্তা কল্পনা করে নিলুম...

ইতিমধ্যে ঘরের অন্তপ্রান্তে, আলমারির সামনে একটা ভীষণ নাটকের অভিনয় চলছিল। ব্যাপারটা হয়েছে কি, ঐ আলমারির সখচেয়ে উপরের থাকে রয়েছে এক বোয়াম লিক্যোর-ব্রাণ্ডিতে মজানো চেরি। এটা দশ বৎসর ধরে মরিসের জন্তু অপেক্ষা করছে। এখন সেটাকে নামাতে হবে যাতে করে আমি এটার উন্মোচন-পর্ব সমাধা করতে পারি। মামেত্তের সর্ব অল্পনয় উপেক্ষা করে বুড়ো স্বয়ং লেগে গেছেন সেটাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায়। ভয়ে আড়ষ্ট বউ—আর উনি একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচা করছেন সেটাকে পাড়তে... পাঠক, যেখানে আছো সেখান থেকেই ছবিটি দেখতে পাবে : বুড়ো কাঁপছেন, ঝুলে পড়ে লম্বা হবার চেঁচা করছেন, ক্ষুদ্রে নীলাধরী মেয়ে দুটি চেয়ারটাকে জাবড়ে ধরে আছে। পিছনে মামেং হাঁপাচ্ছেন—হাত দুটি হৃদিকে মেলে ধরেছেন, আর এ সব-কিছুর উপর ভাসছে যুহু হৃগন্ধি নেবুর সৌরভ খোলা। আলমারির ভিতর থেকে, থাকে থাকে সাজানো কাপড়ের ডাঁই থেকে।

অবশেষে, অশেষ মেহশতের পর, সেই স্বপ্রসিক্ত বোয়ামটি আলমারি থেকে বের করা হল, আর তার সঙ্গে টোলে টোলে ভর্তি একটি রূপোর 'মগ'-পাত্র। গেলাস—মরিস যখন ছোট্ট ছিল সেই আমলের। গেলাসটি চেঁচি দিয়ে আমার

জন্ম কানায় কানায় ভর্তি করা হল; মরিস এই চেঁরি খেতে কতই না ভালোবাসতো! চেঁরি আর ত্রাণ্ডি ভরতে ভরতে বুড়ো খুশ-খানা-সমঝদারের মত আমার কানে কানে বললেন :

—‘বুঝলে হে, তোমার কপাল ভালোই বলতে হবে, হ্যাঁ, তোমার কথাই কইছি, এখন যা থাকে...আমার গিন্নীই এটি তৈরী করেছেন...খাসা জিনিস থাকে এখন।’

হায়রে কপাল! ওঁর গিন্নী এটি তৈরী করেছেন সত্যি, কিন্তু চিনি দিতে গেছেন বেবাক ভুলে! তা আর কি করা যায় বলো! বুড়ো বয়সে কি আর মাহুকের সবকিছু মনে থাকে! বেচারী মামেং আমার, সত্যি বলতে কি তোমার চেঁরিগুলো অখাণ্ডের একশেষ; হলে কি হয়, আমি চোখের পাতাটি পর্যন্ত না নাড়িয়ে তলানি অবধি সাফ করে দিলুম।

*

*

*

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়ালুম ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। ওঁরা অবশি সত্যি খুশী হতেন যদি আমি আরো কিছুক্ষণ থাকতুম, যাতে করে ওঁরা লক্ষ্মী ছেলে মরিস সম্বন্ধে আরো কথা বলতে পারেন, কিন্তু বেলা তখন চলে পড়েছে, মিলটাও দূরে—বিদায় নিতেই হয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

—‘মামেং, আমার কোটটা!...আমি ওকে চত্বর অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।’

সত্যি বলতে কি, মামেং মনে মনে দ্বিধা বোধ করছিলেন, বেশ একটু শীত পড়েছে, এ সময় আমাকে চত্বর অবধি পৌঁছে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না; কিন্তু সেটা মুখের ভাবে প্রকাশ করলেন না। শুধু শুনতে পেলুম, ঝিঝকের বোতামগুলো, সোনালি নস্ত্রি রঙের চমৎকার ফ্রক্-কোটটি পরিয়ে দিতে দিতে লক্ষ্মী ঠাকুরমাটি কর্তাকে নিচু গলায় শুখালেন,

‘তোমার ফিরতে দেরি হবে না তো?—কেমন?’

বুড়ো একটু জুঁজুমির মুচকি হাসি হেসে বললেন,

‘—হেঁ, হেঁ!...কি জানি...হয় তো বা...’^৩

৩ ঘোঁবনে যে ফুঁতিফাঁতি করতে গিয়ে আর পাঁচজনের মত মাঝে-মাঝে দেয়িতে বাড়িতে ফিরতেন, মামেং বকাঝকা করতেন, এটাতে ঠাট্টা করে তারই ইঙ্গিত।

একে অন্তের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ওঁদের হাসতে দেখে বাচ্চা ছুটি হাসলে, আর খাঁচার কোণে বসে ক্যানারি ছটোও তাদের আপন চঙে হাসলে... নিতান্ত তোমাকেই বলছি, পাঠক, আমার মনে সন্দেহ হয়, ঐ চেরি-ব্রাণ্ডির গন্ধে ওরা সবাই বোধহয় একটুখানি বে-এক্কেয়ার হয়ে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরদা আর আমি যখন রাস্তায় নামলুম তখন অন্ধকার হব-হব। একটু দূরের থেকে পিছনে পিছনে নীলপোশাকী ছোট্ট মেয়েটি আসছিল ওঁকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্তু—বুড়ো ওঁকে দেখতেও পান নি। তিনি সগর্বে আমার বাহু ধরে চলছিলেন যেন কতই না শক্তসমর্থ মন্দা জোয়ান। মামেং ভরপুর হাসিমুখে দোরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে খুশীতে মাথা নাড়ছিলেন যেন ভাবখানা এই ‘ঘা-ই বলো, ঘা-ই কণ্ড,—আমার বুড়া এখনও তো দিব্য চলাফেরা করতে পারে।’^৪

কোষ্ঠী-বিচার

আমি তো রেগে টং।

মুসলমান বাড়িতে সচরাচর গণংকার আসে না, যদিও শুনেছি ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমান, হিটলারের মত কট্টর বিজ্ঞান-বিশ্বাসীরা নাকি রাশিকুণ্ডলী মাঝে-মাঝে দেখে নিতেন। আমাদের বাড়িতে গণংকার এসেছিল। তা আশ্চর্য। মেয়েরা জটলা পাকিয়েছিল। তা পাকাক। কাউকে রাজরাণী, কাউকে রাজেশ্বরী, কাউকে ডাক্তার হওয়ার আশা দিয়ে গিয়েছে—তা দিক, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি রাগে টং হলাম যখন শুনলুম, পাশের বাড়ির আট বছরের মেয়ে মাধুরীলতা, আমার বোনের ক্লাসফ্রেন্ড, সেও নাকি এসেছিল এবং গণংকার বলেছে, তার কপালে বাল-বৈধব্য আছে।

বাল-বৈধব্য তার কপালে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে—আমি জানব কি করে, আর গণংকারই বা জানবে কি করে? আর যদিও ধরেও নিই গণংকার জানতোই, তবে সে বরাহমিহির সেটা বলতে গেল কেন মেয়েটাকে—ঐ আট বছরের ফুলের মত মেয়েটিকে?

এই দৈববাণীর ফল আরম্ভ হল পরের দিন থেকেই।

মাধুরী শুরু করল ছুনিয়ার ফুলে ব্রত-উপবাস, পূজা-পারণা। ইতু, বেঁচু

হেন দেবতা নেই যে সে খুঁজে খুঁজে বের করে বাড়িতে তার পুজো লাগায় নি । তার বাড়িতে ছিলেন আমাদের দেশে সব চাইতে নামকরা নিষ্ঠাবতী ঠাকুরমা— তিনি পূর্বস্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, মাধুরীর পুজোপাটের ঠেলায় ।

এসবের অর্থ অতি সরল । অতিশয় প্রাঞ্জল । মাধুরী ত্রিলোকবাসী সর্বদেব, সর্বমানব, এমন কি সর্ব ভূতপ্রোতকেও প্রসন্ন রাখতে চায়, যাতে করে তাঁরা তাকে বাল-বৈধব্যের হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখেন ।

কিন্তু মাধুরীর মুখের হাসি শুকিয়ে গিয়েছিল—আমার রাগ সেইখানটাতে । তার সর্বচেষ্টা, সর্ব অস্তিত্বে মাত্র একটি চিন্তা ; তাকে আমৃত্যু বাল্য-বৈধব্য বয়ে বেড়াতে হবে । এবং সে নাকি হবে শতায়ু ! তার বাপ ঠাকুরদা তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে তখন শুধু তার ভাগর চোখ দুটি মেলে তাকাতো, কোন কথা বলত না ; স্পষ্ট বোঝা যেত আর সাস্থনাবাগী, স্তোকবাক্য, তত্ত্বকথা তার মনের উপর কোন দাগ কাটছে না ।

মাধুরী তেমন কিছু অসাধারণ সুন্দরী ছিল না । তবে ইঁা, তার চোখ দুটির মত চোখ আমি আর কোথাও দেখি নি । সেই চোখ দুটিতে তার আট বছর বয়সে যে মধুর হাসি আমি দেখতে পেয়েছিলুম সেটি আর কখনো দেখি নি । তার রঙ ছিল শ্রাম । কিন্তু মাধুরীে ভরা । তাই সব সময়ই মনে হত, এ মেয়ের নাম মাধুরী সার্থক । সে সুন্দর নয়, মধুর । মধু তো আর গোলাপ ফুলের মত দেখতে সুন্দর হয় না ।

ষোল বছর বয়সে মাধুরীর বিয়ে হল । কুলীন ঘরের মেয়ে । সে-দিক দিয়ে অন্ততঃ সবাই লুফে নেবে । ছেলেটি বিলেত-ফের্তা ইঞ্জিনীয়ার । মাদ্রাজে কর্ম করে । মাধুরীকে দেখে ওদের বাড়ির সকলেরই পছন্দ হয়েছে । আমি তখন বিদেশে ।

আমার বোন মাধুরীকে বড় ভালবাসতো । তাই আমাকে লেখা তার চিঠি ভর্তি থাকত মাধুরীর কথায় । পুজোপাট তার নাকি বিয়ের পর আরো অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে । মাদ্রাজে গিয়ে পেয়েছে আরেক নতুন সেট দেবদেবী । ওঁয়ারা তো ছিলেনই, ওঁয়ারাও এসে জুটলেন । ইঁা, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, শুকুরবারে শুকুরবারে মসজিদে শির্গা পাঠাতেও মাধুরীর কামাই যেত না ।

বোন লিখেছিল, মাধুরীর স্বামীটি নাকি পয়লা নম্বরের বৈজ্ঞানিক, দেবদ্বিজে আদৌ ভক্তি নেই । মাধুরীর পালপার্বণের ঘটা দেখে সে নাকি রক্ত-রস করত, সেই পালপার্বণের আদিখ্যেতার—তার ভাষায়—কারণ শুনে নাকি হাসাহাসি করেছিল তার চেয়েও বেশী । তবে ছেলেটি খানদানী ঘরের ভদ্রছেলে ছিল বলে

এসব কথা তুলে মাধুরীর মনে কষ্ট দিতে চাইত না।

কিন্তু মোক্ষা কথা—বোন লিখেছিল—মাধুরী স্বামী, মাধুরী স্বামী-সোহাগিনী।
যাক্। চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হলুম।

তার ছ' মাস পরে বজ্রাঘাত।

মাত্রাজে যুদ্ধের সময়, একসম্প্রদায় না বোম্বাণ্ডারের ফলে মাধুরীর স্বামী
আপিসের চেয়ারের উপরই প্রাণত্যাগ করে।

সেদিন আপিস যাবার সময় সে নাকি মাধুরীকে বলে গিয়েছিল, 'তোমরা
বাঙালীরা বড্ড ঢিলে। সময়ের কোন জ্ঞান নেই। আমি বাড়ি ফিরবো সাড়ে
পাঁচটায়। তোমাকে যেন তৈরী পাই। দশ মিনিটের ভিতরে যেন বেরতে
পারি। সিনেমা তোমার জন্তু অপেক্ষা করবে না।'

মাধুরী পাঁচটা থেকে তৈরী হয়ে বসে ছিল। কে জানে, কোন্‌ শাড়ীখানা
পরেছিল? সেই হলদে রঙেরটা? যেটা আমি তাকে প্রজেক্ট করেছিলুম—ওর
রঙের সঙ্গে সুন্দর মানাতো বলে? থাক্ ওসব। মোহনীর গল্প শোনাতে আমি
আসি নি। সমস্ত ব্যাপারটাই এমনি ট্রাজিক যে তার উপর অলঙ্কার চাপাতে
ইচ্ছে করে না।

ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো—করে করে রাত এগারোটা হল। মাধুরী
তার স্বামীকে এই প্রথম অনপনুচ্চুয়েল হতে দেখল—এবং এই শেষ।

আর পাঁচজন বাঙালীই প্রথম দুর্ঘটনার খবর পান। তাঁরা রাত এগারোটার
এসে মাধুরীকে খবরটা দেন। সঙ্গে এসেছিলেন মাধুরীর এক বান্ধবী—ধর্ম্যে তাঁর
বিশ্বাস অবিচল ছিল বলে মাধুরীর সঙ্গে সখ্য হয়। তিনি খবরটা ভাঙেন। কি
ভাষায়, সোজাসুজি না আশকথা-পাশকথা পাড়ার পর, জানি নে। তবে শুনেছি,
মাধুরী একসঙ্গে এতজন লোককে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে আসতে দেখেই
কেঁদে উঠেছিল।

মাধুরী কলকাতায় ফিরে এল।

এখানেই শেষ? গণ্যকারের কথাই ফলল? তাও নয়।

মাত্রাজ ছাড়ার পূর্বে মাধুরী তার সখীকে তার কোষাকোষী আর সব
পুজোপাটার জিনিসপত্র তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে। মাধুরী
বলে নি—কিন্তু সখী বললেন, 'ও বলতে চেয়েছিল, এত করেও যখন দেবতাদের
মন পেলুম না, তখন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমার আর কি হবে? আমার
তো অল্প আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।'

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

কলকাতায় ফিরে মাধুরী চাকরি নেয়। বস্তিতে করপারেশনের ইন্সুলে। সেখানে তার বসন্ত হয়। তার বোনঝি—ভাস্কর—বললে, ‘ওয়ান বিগ্ ব্লাব—করবার কিছু নাই।’

সে শতাব্দী হয়ে বাল-বৈধব্যের যন্ত্রণা উপভোগ করে নি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সে গত হয়। পরোপকারে প্রাণ দেয়। সে জিন্নবাসিনী, অমর্ত্যলোকে অনন্ত স্বামী-সোহাগিনী।

একটি অনমিত নাম : বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

‘স্বর্গীয়’ লিখতে গিয়েই কলম থেমে গেল; এমন কি ক্ষণজন্মা, পুরুষসিংহ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ‘পরলোক’ গমন করেছেন,—এটা লিখতেও বাধো-বাধো ঠেকছে, কারণ বনবিহারী স্বর্গ, পরলোক, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না।

বনবিহারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা প্রায় অসম্ভব, কারণ চাকরিজীবনে তাঁকে বাধ্য হয়ে আজ পাকশী, কাল মৈমনসিং, পরশু বগুড়া করতে হয়েছে—এবং অসময়ে বেকসুর বদলি হলেও তিনি হয়তো প্রতিবাদ জানাতেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো মেহেরবাণী চাইতেন না। বনবিহারী এ জীবনে কারো কাছ থেকে কোনো ‘ফেবার’ চান নি, এবং ভগবানের কাছ থেকে অতি অবশ্য, নিশ্চয়ই না। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম কোথায় যান জানি নে, কিন্তু তার পরই চলে যান দেয়াতুনে। সেখানে বেশ কয়েক বৎসর একটানা হোটেলে বাস করার পর হঠাৎ চলে যান—বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আন্দামান। স্বৈচ্ছায় এবং অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে। বলা বাহুল্য, সেখানে রোমান্সের সন্ধানে যান নি। কাব্যে, সাহিত্যে তিনি কতখানি রোমাণ্টিসিজম বরদাস্ত করতেন বলা কঠিন, কিন্তু সংসার-জীবনে তিনি রোমাণ্টিসিজমের পিছনে দেখতে পেতেন, make belief, সত্য থেকে আত্মগোপন, এস্কেপিজম এবং ভগামি এবং এর সব কটাকেই তিনি অত্যন্ত ভ্রুকুটিকুটিল নয়নে তিরস্কার জানাতেন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি আবার ভারতে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন আমাকে বড় পীড়া দিত। তাই তাঁকে অহুরোধ জানালুম, তিনি যেন দয়া করে আমার সঙ্গে বসবাস করেন। উত্তম হক মধ্যম হক, আমি মোগলাই, বিলিতি কিছু কিছু বাঁধতে পারি; সে সময়ে আমার বাসস্থানটি ছিল প্রশস্ত ও নির্জনে—খাশানের কাছে অবস্থিত। আমার নিজস্ব বই তো ছিলই, তদুপরি তাঁর পরিচিত একটি লাইব্রেরি কাছেই ছিল। অবশ্য সর্বপ্রধান প্রলোভন ছিলেন

তঁার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। তঁার বাগাও নিকটে। এই ভাইটিকে বনবিহারী আপন হাতে মাহুস করেন এবং সে ঘেন ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, উপাসনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকে সেজন্য কোনো ব্যবস্থার ক্রটি করেন নি। বিনোদবিহারীর ডাক নাম 'নস্ত'। বনবিহারী তাঁকে ডাকতেন 'নাস্তিক' বা 'নাস্তে'। আমার বাড়িতে এসে বাস করলে তিনি যে তঁার নাস্তিকে অক্লেশে দু'বেলা দেখতে পাবেন সেইটেতে বিশেষ জোর দিয়ে আমি আমার চিঠিতে নিবেদন জানিয়েছিলুম। বিনোদবিহারী প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তঁার চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন; তাই তঁার পক্ষে অগ্রজ সন্নিধানে যাওয়া কঠিন ছিল।

আমি কণি আশা নিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলুম, কারণ আমি তঁার কৃতবিশ্বাস, বিস্তাশালী, পিতৃভক্ত পুত্রকে উত্তমরূপেই চিনি। তঁার শত কাতর অহুরোধ সত্ত্বেও তিনি পুত্রের গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে রাজী হন নি। আমার আশা ছিল, আমি তঁার কেউ নই, তিনি জানতেন যে আমি ধর্ম, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একটা আস্ত জড়ভরত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবিচল ভক্তি করি, এবং দাসের মত সেবা করবো; বিশ্বসংসার নিয়ে তঁার যত রকমের সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রোপ আমি সহাস্ত বদনে শুনেছি এবং শুনবো এবং তর্কযুদ্ধ করার মত লোকের অভাব হলে আমাকে দিয়েও কিছুটা কাজ চলবে—তিনি জানতেন, আমার জীবন কেটেছে 'তুলনাত্মক ধর্ম' চর্চায়।

তিনি এলেন না সত্য, কিন্তু আমাকে একটি অতিশয় প্রীতিপূর্ণ (তিনি সেটিমেণ্টের আতিশয্য এতই অপছন্দ করতেন যে, সেফ্‌সাইডে থাকার জন্য সেটা বাক্যে, পত্রে সর্বত্র বর্জন করতেন) পত্র লিখে জানানলেন, 'তোমার নিমন্ত্রণ মনে রইল, সময় হলেই আসবো।'

আমার ক্ষোভ-শোকের অন্ত নেই যে তঁার সময় আর হল না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দি, আমি কে যে তিনি আমার সেবা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করতেন।

শেখার্দীন পর্যন্ত, এত সব ঘোরাঘুরির মাঝখানেও সর্বত্র তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন তঁার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী। বনবিহারীর অধিকাংশ লেখাই ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছত না। প্রকাশিত হলে ফাইলে রাখতেন না, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলতেন না, 'অমুক কাগজে আমার লেখা বেরিয়েছে, পড়ে দেখো।' তঁার পরিপক্ব যৌবনে কিন্তু তিনি আমাদের মত বালকদের প্রতি সদয় ছিলেন। সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ বহু লেখা তিনি সোৎসাহে আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন।

এখনো যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শ্রীযুত বঙ্কবিহারী প্রামাণিক নিবন্ধ লিখতে পারবেন। কোন্ লেখা কোন্ উপলক্ষে লেখা হয়েছিল, কোন্ ব্যঙ্গচিত্র আঁকবার সময় কাকে তিনি মনে মনে সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, কিভাবে সমাজের কোন্ গুণ্ডা পাপাচার তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, এর বেশীর ভাগই একমাত্র তাঁরই জানার কথা। এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের এত বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক ঐ বিষয়ে কখনো কিছু লেখেন নি এটা কেমন জানি বিশ্বাস করতে অস্বীকার হয়। আমি নিজে জানি, ছাত্রদের দুই ধরনের ব্যাণ্ডেজ শিখিয়ে তাদের নাম বলে, দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে খাটাই করার পর একটা তৃতীয় ব্যাণ্ডেজ হয়তো শেখালেন। কোনো বুদ্ধিমান ছেলে হয়তো লক্ষ্য করলো এটার নাম তিনি বলেন নি ; শুধোলে পর বলতেন, 'ওঃ ছাটু ওয়ান ? ওটা ব্যাণ্ডেজ আ লা বনবিহারী' (তিনি নিজের চেষ্টায় হৃদয় ফরাসী শিখেছিলেন ও উচ্চারণটিও তাঁর চমৎকার ছিল। আমি ফরাসী শিখতে আরম্ভ করেছি জেনে তিনি আমাকে মপাসাঁ পড়ে শুনিয়েছিলেন ; নতুবা নিতান্ত বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত বনবিহারী আপন বৃহৎ ক্ষুদ্র সর্বকৃতিত্বই লুকিয়ে রাখতেন)।

বনবিহারী সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু লেখা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রায় অসম্ভব শুধুমাত্র তাঁর প্রকাশিত লেখা ও ব্যঙ্গচিত্র যোগাড় করা। বেনামে ছদ্মনামে তো লিখেছেনই, তদুপরি নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন প্রকারের মোহ ছিল না বলে সেগুলোকে তাদের গ্রাফা সম্মান দেবার জন্য তিনি কোনো চেষ্টা তো করতেনই না, উন্টে নিতান্ত অজানা অচেনা কাগজে প্রায়ই বাছাই বাছাই লেখা ছাপিয়ে দিতেন। এবং আমার জানতে সত্যই ইচ্ছে করে, তিনি তাঁর লেখার জন্তে কখনো কোনো দক্ষিণা পেয়েছেন কিনা।

উপস্থিত আমি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ নিবেদন করছি ; যদি কোনো দিন তাঁর প্রকাশিত রচনা ও ছবির দশমাংশের এক অংশও যোগাড় করতে পারি তবে তাঁর জীবন-দর্শন সম্বন্ধেও কিছু পেশ করার ভরসা রাখি। অথবা হয়তো তখন দেখব, তাঁর জীবন-দর্শন ছিল যে, মাহুষের পক্ষে কোনো প্রকারের শাস্ত্র জীবনদর্শনে পৌঁছনো সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ শাস্ত্র বলে কোনো বস্তু, ধারণা বা আদর্শ এ-সংসারে আদপেই নেই।

'ভ্যানিটি অব্ ভ্যানিটিজ—অল ইজ ভ্যানিটি' বাইবেলের এই আশুবাণী তাঁর মুখ দিয়ে বলাতে আমার বাধা, কারণ নাটকীয় ভঙ্গিতে কোনো জিনিসই প্রকাশ করাতে তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি। কারণ এসব ভঙ্গি, স্টাইল, পোজ থেকে উদ্ভূত হয় ধর্মগুরু দল—এবং বনবিহারীর ক্ষুদ্র ধারণা ছিল যে তাঁদের সম্বন্ধে

আমরা যত কম সুনতে পাই ততই ভালো। বলার মত বিশেষ কিছু তো নেই—
হয়তো বলতেন বনবিহারী—তাহলে বলতে গিয়ে অত ধানাইপানাই কেন ?

বৃষের মত স্বচ্ছ, আজাহুলখিত বাহু—এসব শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ দিয়ে বিচার
করলে বনবিহারী নিশ্চয়ই সুপুরুষের পর্যায়ে পড়তেন না ; তৎসত্ত্বেও বলি,
বনবিহারীর মত অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বান্ সুপুরুষ আমি দেশ-বিদেশে অতি
অল্পই দেখেছি। বাঙালী ফর্সা রঙ পছন্দ করে, কিন্তু বনবিহারীর গৌরবর্ণ আমি
অল্প কোনো বাঙালীর চর্মে দেখি নি। বলা বাহুল্য যে সে বর্ণ ইংরেজের ধবলকুষ্ঠ
স্বৈত নয়। গৌর হয়েছে সে বর্ণে ছিল কৃষ্ণের স্মৃতি। তপ্তকাক্ষন তো সে
নয়ই, ‘টান্দের অমিয়াসনে চন্দন বাটিয়া’ও সে বর্ণ মাজা হয় নি। নদীয়ার
গোঁসাঁইকে আমি দেখি নি, কিন্তু তাঁকে কল্লনায় দেখতে গেলে তাঁর অঙ্গে আমি
বনবিহারীর বর্ণ চাপাই। তাঁর চুল ছিল কটা। আমি একদিন তাঁকে
বলেছিলুম, ‘ঋগ্বেদে না কোথায় যেন অগ্নির দাড়িকে রক্তবর্ণ বলা হয়েছে ;
আপনি দাড়ি রাখলে সেটা ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ ধারণ করবে।’ আমার সভ্যই
মনে হ’ত, কেমন যেন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় কি যেন এক এ্যাটাভিজমের
ফলে তিন হাজার বৎসর পর আর্থ ঋষি গোঁড়দ্বিজের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন।
বনবিহারী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তর্কজাল বিস্তার করে পর্যায়ক্রমে, অপ্রমত্ত চিন্তে যে-
সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন তার অর্থ : যারা বলে বাঙালীর গায়ে কিঞ্চিৎ
আর্থরক্ত আছে এটা তাদের ভ্রম—যারা বলে বাঙালী পরিপূর্ণ আর্থ—তাদের
ভ্রমের চেয়েও মারাত্মক দুঃস্থবুদ্ধিজাত ভ্রম।

ঐ সময়ে আমি রেনার খুঁট-জীবনী পড়ি অধ্যাপক হিড্জিভাই মরিসের
কাছে।^১ প্রথম অধ্যায়েই তিনি লিখেছেন ‘যে লোক মাহুঘে মাহুঘে পার্থক্য
ঘোচাবার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা দিয়েছেন (অর্থাৎ খুঁট) তাঁর ধমনীতে কোন্
জাতের রক্ত প্রবাহিত সে অনুসন্ধান করতে যাওয়া অসুচিত।’ বনবিহারী সমস্ত
জীবন ধরে বিস্তার অক্লান্ত জিহাদ লড়েছেন, কিন্তু বর্ণ বৈষম্য চোখে পড়লেই তিনি
নিকাশিত করতেন তাঁর শানিততম তরবারি। এস্থলে বলে রাখা ভালো,
বনবিহারী তাঁর জিহাদ চালাতেন হৃদয়হীন যুদ্ধাঙ্গের মত। তাই সত্যের
অপলাপ না করে অনায়াসে বলতে পারি, তাঁর মত মিলিটেট নাস্তিক এ-দেশে
তো কখনই জন্মায় নি, বিদেশেও নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয়। ‘পীসফুল কো-এগ্জিক্সটেনস্’

১ ইনি পার্সী দস্তুর (বাজক) সম্প্রদায়ের লোক ; খ্রীষ্ট প্রবর্তনাথ বিনী
এঁর লক্ষ্যে লিখেছেন। ‘ববৌজনাথ ও নাস্তিকনিকৈতন’ পৃ. ১২৫।

নীতিটি তিনি আদর্শেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন হাসপাতালের ভিতরে বাইরে সর্বত্রই, এবং টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ভিউটির সার্জন। তাঁর বক্তব্য, 'তোমার পায়ে হয়েছে গ্যাঙ্রীন, সেটা আমি কেটে ফেলে দেব। গ্যাঙ্রীনের সঙ্গে আবার পীসফুল কো-এগজিষ্টেন্সেন্স কি?' কিন্তু পাঠক ভুলে কণতরেও ভাববেন না, বনবিহারী অসহিষ্ণু ছিলেন। এর চেয়ে বৃহত্তর, হীনতর মিথ্যা ভাষণ কিছুই হতে পারে না। 'তুমি আন্তিক। তোমার মস্তিষ্ক থেকে আমি সেই অংশ ছুঁই দিয়ে কেটে ফেলব। কিন্তু তোমার প্রতি আমি অসহিষ্ণু হব কেন? বস্তুত চিকিৎসক বলে আমার সহিষ্ণুতা অনেক বেশী। তোমার পরিচিত কারো সিফিলিস হলে তুমি শুধু সিফিলিস না, সেই লোকটিকেও বর্জন করো। আমি সিফিলিস দূরীভূত করি, কিন্তু সে হতভাগ্যকে তো দূর দূর করে দূরীভূত করার চিন্তা আমার স্বপ্নেও ঠাই দিই না। প্রেগ এলে তুমি এ শহরের নাগরিকদের বিষয় বিবেচনা করে তাদের বর্জন করো; আমি তা করি নে।' এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে শপথ করতে রাজী আছি এটা তাঁর বাগানফালন নয়। কাব্যে আমরা বাক্ ও অর্থের সমন্বয় অমূল্যমান করি, জীবনে করি বাক্ ও কর্মের। এ দুটির সমন্বয় বনবিহারীতে প্রকৃতিগত ছিল। বলতে বাচ্ছিলুম 'বিধিদত্ত', কিন্তু তাঁর আত্মাকে ক্ষুদ্র করতে চাই নে। আবার ভুল করলুম, তিনি আত্মাতে বিশ্বাস করতেন না, কাজেই হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধার মতই তাঁর আত্মাকে নিপীড়িত করার সম্ভাবনা।

বনবিহারী তাঁর বাল্যবয়সের অধিকাংশটা কাটান তাঁর মাতামহের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি কিন্তু সেটা বের করা কঠিন হবে না। এই মাতামহটি ছিলেন গত শতাব্দীর ধনুর্ধর, অপরাধিত দার্শনিক এবং নৈয়ায়িক। যে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে ছিলেন সে যুগের চুড়ামণি, তিনি ছিলেন তাঁর নিত্যশ্রাব্যী সখা। যে দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহে বঙ্কিমাদি মনোবিগণ আসতেন তত্ত্বালোচনার জন্তু সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ গিয়েছেন দিনের পর দিন এই নৈয়ায়িকের অপরিহার্য পথের ক্ষুদ্রতর গৃহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই আপন-ভোলা সাদা দিলের মানুষ যে তর্কে বিরক্তির সঞ্চার হলে তাঁর কণ্ঠ তপ্ততর ও উচ্চতর হতে আরম্ভ করত—বনবিহারীর মাতামহ এ তথ্য জানতেন বলে সেটা আদৌ গায়ে না মেখে পূর্বের চেয়ে ক্রীণতর কণ্ঠে মোক্ষমতর যুক্তি পেশ করতেন। খাওয়ার বেলা গড়িয়ে যায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ সে সন্ধ্যা বেহুঁশ। শেষটায় বেলা প্রায় তিনটায় উত্তেজিত হয়ে আসন ত্যাগ করে বলতেন, 'ঝকঝক, ঝকঝক, এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করা; আমি চললুম এবং এই

আমার শেষ আসা।’ বনবিহারীর মাতামহ ক্রীণকণ্ঠে বলতেন, ‘গিন্নী পুঁই-চচ্চড়ি রেঁধেছিল।’ অট্টহাস্য করে দ্বিজেন্দ্রনাথ টেনে টেনে বলতেন, ‘সেটা আগে বললেই হ’ত, আগে কইলেই হ’ত।’ তারপর বারান্দায় প্রতীক্ষমাণ তাঁর ‘গার্জেন’কে বলতেন (মহর্ষিদেব এই আপন-ভোলা যুবরাজের জন্য একটি তদারকদার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন), ‘যাও, বাড়ি থেকে দাঁত নিয়ে এসোগে।’ শুধু খাবার সময়ই তিনি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতেন। আমার ভাবতে বড় কৌতুক বোধ হয় যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতম দৌহিত্র বাড়ির কোর্মা-কালিয়া ছেড়ে অনাড়ম্বর নৈয়ায়িকের অপরিচরিত বারান্দায় পিঁড়িতে বসে পুঁই-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে উচ্চকণ্ঠে পাড়া সচকিত করে তার অরূপণ প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন।

পরদিন ‘নাউ-চিঙড়ি’! ‘নাউ’—লাউ না!

এ ধরনের একাধিক বিচিত্র বিষয় আমি ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি প্রাপ্ত বিনোদবিহারী মহাশয়ের কাছ থেকে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ প্রবন্ধরাজিতে মাত্র দু’জন দার্শনিক পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে সপ্রশংস চিত্তে উল্লেখ করেছেন যারা দার্শনিক ও তত্ত্ববিদের গুরুভার কর্তব্য আপন আপন স্বক্ষে অনায়াসে তুলে নিতে পারেন; এঁদের একজন ‘পুঁই-চচ্চড়ি’-রসিক দার্শনিক—বনবিহারীর মাতামহ। এবং তাঁর সম্বন্ধে বলি, সে যুগে পিরিলি ঠাকুররা অগ্রাগ্রা ব্রাহ্মণদের কাছে অপাণ্ডিত্য ছিলেন।

বিশ্বস্তস্বত্রে অবগত আছি, বনবিহারী বাল্য বয়সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবস্থায়ও স্তূর্ধোদয় থেকে প্রারম্ভ পূজা-অর্চনা শেষ করতে করতে কোনো কোনো দিন ক্লাসের সময় পেরিয়ে যেত। এটাতে আমার সামান্য বিস্ময় লাগে, কারণ আমি যে কয়টি প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িককে চিনি তাঁদের সকলেই পূজা-অর্চনা সম্বন্ধে ঈর্ষ উদাসীন ছিলেন। আমার আপন গুরু পথে যেতে যেতে বারোয়ারি সরস্বতী প্রতিমা দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেছিলেন, ‘ন দেবায়, ন ধর্মায়।’ অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রে (অবশ্য তিনি স্মৃতি জ্ঞানতেন অত্যন্তই এবং সেজন্ত তাঁর কণামাত্র ক্ষোভও ছিল না) এ রকম পূজোর কোনো ব্যবস্থা নেই বৌদ্ধ ধর্মে (‘ন ধর্মায়’-এর ধর্ম এখানে ‘ধর্ম শরণং গচ্ছামি’ থেকে নেওয়া) তো থাকার কথাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সরস্বতীর যে ‘কুথ্যতি’ (হয়তো অমূলক) আছে সেটা তাঁর স্মরণে আসতো। তা সে যাক। কারণ আমার ধর্মের স্মৃতিদের ও খৃষ্টান মিস্টিকদের ভিতরও ক্রিয়াকর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ অনাসক্তি লুক্কায়িত রয়েছে।

অকস্মাৎ একদিন বনবিহারী নাস্তিকরূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন ও শুধু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম (রিচুয়েল) নয়, শঙ্করাচার্যের নিষ্ঠুর ব্রহ্ম থেকে হাঁচি টিক্‌টিকির বিরুদ্ধে ভীত কর্কশ কণ্ঠে মারমুখো জিহাদ ঘোষণা করলেন। খৃষ্টান মিশনারী পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা, উদ্দীপনা এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখলে বিশ্বাসের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করতো। এই যে সামান্য আমি, আমার বয়েস তখন কত হবে? ষোলগোছ,—আমাকে পর্যন্ত প্রথম দর্শনের পাঁচ মিনিটের ভিতর, কলার অভাবে কুর্ভার গলার মুরী ধরে শুধোলেন, ‘তুমি ঈশ্বর মানো?’

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম, ‘আজ্ঞে আমার বিশ্বাস দৃঢ় নয়, অবিশ্বাসও দৃঢ় নয়।’ আমি তখন জানতুম না, এই উত্তরই চার দশক পরে কলকাতার ‘মডার্ন মহিলাদের ভিতর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বিশ্বাস দৃঢ়ই হক, আর শিথিলই হক, সেইটে কিসের উপর স্থাপিত আমাকে বুঝিয়ে বলো।’

কী যুক্তি দেব আমি? যেটাই পেশ করি, সেটাই বুঝে যাওয়ার মত ফিরে আসে ফের আমারই গলায়। ইতিমধ্যে আমার জন্ম উত্তম মমলেট, ষোলের শরবৎ এসেছে—দুপুর অবধি তর্ক চালালে অবশ্যই পুঁই-চচ্‌ড়ি আসতো!

আমি রণেভঙ্গ দিতে চাইলেও তিনি ছাড়েন না। আমি যে ধর্মের ‘অধর্ম’ পথে চলেছি সেইটে তিনি সপ্রমাণ করতে চান, সর্বদৃষ্টিকোণ থেকে, সর্বদৃষ্টিবিন্দু থেকে। এবং আমার সব চেয়ে বিশ্বাস বোধ হল যে, আমি যে ক’জন ইয়োহান্নাসীয় নাস্তিক দার্শনিকের নাম জানতুম—অবশ্য অত্যন্ত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাবে—তাঁদের কাছ থেকে বনবিহারী ঈশ্বরত্ব, ধর্মত্ব যুক্তি আহরণ করলেন না। বিস্তর তর্কজাল বিস্তৃত করার পর, মাঝে মাঝে তিনি সেগুলো সাম্‌ আপ্‌ করতেন, এ-দেশী পরিভাষায় সুত্ররূপে প্রকাশ করতেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে! এই প্রথম আমার গোচরে এল যে, আর্থাবর্তের মত ধর্মাবর্তের দেশেও অসংখ্য নাস্তিক প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বহুযুগ পূর্বেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিয়েছেন।

সেদিন আমি বড়ই উপকৃত হয়েছিলুম। ঈশ্বরবিশ্বাসে যে-সব বাতিল যুক্তি আছে সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে আমি ঈশ্বর সন্ধানে সত্য যুক্তি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করলুম। কিন্তু আমার কথা থাক।

পাঠক, আপনি মোটেই ভাববেন না, বনবিহারীর প্রধান সংগ্রাম ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তাঁর সংগ্রাম ছিল জড়তা, কুসংস্কার, ধর্মের নামে পাপাচার, সামাজিক অনাচার, তথাকথিত অপরাধীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা, রাজক সন্ত্রাসের শোষণ, চিন্তা না করে বাঁধা পথে চলার বদ অভ্যাস, মহরমের

তাজিয়ার সামনে কুমড়া-গড়াগড়ি, ঘোন সম্পর্কের উপর তথাকথিত শালীনতার পর্দা টেনে আড়ালে আড়ালে কুমারী ও বিধবার সর্বনাশ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের অকারণ দত্ত, অব্রাহ্মণের অহেতুক দাস্ত্রমনোবৃত্তি, তথাকথিত সত্যরক্ষার্থে সত্য গোপন, স্বার্থাঘেষণে বিদেশীর পদলেহন ও অজ্ঞানুক্রমণ কিন্তু যেখানে সে মহৎ সেটাকে প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়ে বজ্রন, বৎসরের পর বৎসর, প্রতি বৎসর রুগ্মা অর্থমুতা স্ত্রীকে গর্ভদান করে তার কাতর রোদন অমুনয়-বিনয় পদদলিত করে তাকে অবশ্রম্ভাবী অকাল-মৃত্যুর দিকে বিতাড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে, ধর্মসভায় সচ্চরিত্র সজ্জন খ্যাতি অজ্ঞান (বলা বাহুল্য চিকিৎসক হিসাবে ঠিক এই ট্র্যাজেডি তাঁর সামনে এসেছে বহু, বহুবার), গণিকালয় থেকে একাধিকবার বিবিধ মারাত্মক ব্যাধি আহরণ করে নিরপরাধ অর্ধাঙ্গিনীর শিরায় শিরায় সেই বিষ সংক্রামণ, একবার একটি মাত্র ভুল করার জন্ত অমৃতপ্তা রমণীকে ব্ল্যাকমেল করে তাকে পুনঃ পুনঃ ব্যভিচার করাতে বাধ্যকরণ—

হে ভগবান ! এ যে অফুরন্ত ফর্দ ! কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বনবিহারীর সিকি পরিমাণ প্রকাশিত—অপ্রকাশিতের হিসেব নিচ্ছি নে এবং অধিকাংশ লেখাই যে তিনি ছিঁড়ে ফেলতেন সেও বাদ দিচ্ছি—গল্প পণ্ড ব্যঙ্গচিত্র সংগ্রহ করে কেউ যদি তাঁর জিহাদের লক্ষ্য বিষয়গুলো সংকলন করেন তবে এ-স্থলে আমার প্রদত্ত নির্ঘণ্টের চেয়ে বহুগুণে বৃহত্তর ও কঠোরতর হবে ।

কৌ নিদারুণ ব্যঙ্গ, বিতুষণ ও ঘৃণার সঙ্গে তিনি অন্তায় আচরণ, ভণ্ড কাপুরুষতাকে আক্রমণ করতেন সে তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রই জানেন । ভাষার শাণিত তরবারি তাঁর হাতে বিদ্বাৎবহি বিচ্ছুরণ করতো এবং এই মরমিয়া মোলায়েম আ মরি বাঙলা ভাষাও যে কতখানি বহির্গতা সে তত্ত্ব উদঘাটিত হ'ত বনবিহারীর অদম্য, নিঃশঙ্ক আঘাতের পর আঘাত থেকে । প্রত্যেক শব্দ প্রত্যেকটি বর্ণ বিপুল যুক্তির উপর দণ্ডায়মান । শাস্ত্র ভাঙতে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তখন শাস্ত্রের দোহাইয়ের তো কথাই ওঠে না, তিনি বিজ্ঞানের দোহাইও দিতেন না । কোনো কিছুই অপ্রাস্ত নয়, কোনো সত্যই শাস্ত্রত নয় ; অতএব প্রত্যেকটি সমস্তা নূতন করে ঘাচাই করে দেখতে হবে, এবং এই সাধনা চলবে আমৃত্যু ।

ঈশ্বর-বিশ্বাসকে যে তিনি গোড়াতেই আক্রমণ করেছিলেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি এই বিশ্বাস by itself, per se অন্তান্ত সংস্কারের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক বলে মনে করতেন । তাঁর ধারণা জয়েছিল—এক সেটা বিস্তর অহুসঙ্কাম ও গবেষণা করার পর, যে—এই বাংলা দেশে যত প্রকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক

অজ্ঞায় অবিচার হচ্ছে, যা কিছু নারীর ন্যায় অধিকার ও পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে,—আর ধর্মের নামে অনাচার শোষণের তো কথাই নেই—এ সব-কিছু হচ্ছে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে । ২

যে-সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বনবিহারী লড়াই দিতেন তাদের বিরুদ্ধে কি অস্ত্র বাঙালী লড়ে নি ? নিশ্চয়ই লড়েছে । বর্ণবৈষম্য, আহারে-বিহারে স্ব স্ব সঙ্গীর্ণ গত্তী নির্মাণ, ধর্মের নামে অধর্মচর্চা—শাস্তাধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে তাদের কুসংস্কারে নিমজ্জিত রাখা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাকে হুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা, ধর্মত্যাগীকে পুনরায় স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া ইত্যাকার বহু বহু সংস্কার আচার দূর করার জন্য চৈতন্য সংগ্রাম দেন ও সর্বজনীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন । রামমোহন, বিজ্ঞানাগর, বিবেকানন্দ এঁরা এবং আরো অনেকে মুক্ততা, কুসংস্কার ও একাধিক পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন । এঁদের তুলনায় বনবিহারীকে চেনে কে ?

কারণ বনবিহারী অস্ত্র পন্থা অবলম্বন করেছিলেন ।

প্রাগুক্ত সকলেই দেশ-দশকে পাপচিন্তা-পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের অর্থাৎ ধর্মের শরণ নিয়েছেন । বনবিহারী মানবিকতার শরণ নেন । প্রচলিত ধর্মও তাঁর শত্রু । একমাত্র ধর্মের moral, ethical যেটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধোপে টেকে সেইটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে ।

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানাগরকে একথানা চিঠিতে যা লেখেন তার নির্ধাস ছিল এই, শাস্ত্র মেনে হিন্দু তার সামাজিক জীবন যাপন করে না । সে মানে লোকাচার, দেশাচার । বিজ্ঞানাগর যদি সর্বশাস্ত্র দিয়েও হ্যর্থহীন নিরঙ্কুশ সপ্রমাণ করেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রসিদ্ধ তবু হিন্দু সে-মীমাংসা গ্রাহ্য না করে আপন লোকাচার দেশাচার আগেরই মত মেনে নিয়ে বিধবার বিয়ে দেবে না । “অতএব বিজ্ঞানাগরের উচিত যুক্তি জ্ঞায় ও মানবিকতার (এই ধরনেরই কিছু, আমার সঠিক মনে নেই, তবে মোক্ষা, reasonএর উপর নির্ভর করা, শাস্ত্রের উপর না করে) উপর নির্ভর করা ।

২ তাই তাঁর নিজস্ব মৌলিক করমূল্য বা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন ছিল :—

ভগবান আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন । (এই স্বতঃসিদ্ধটি আন্তিকরা স্বীকার করেন ও বনবিহারী এটা উপস্থিত তর্কস্থলে মেনে নিচ্ছেন)
সেই বুদ্ধি বলছে, “ভগবান নেই” ।

∴ ভগবান বলছেন, “ভগবান নেই” ।

বিভাগসাগর উত্তরে কি লিখেছিলেন, আদৌ উত্তর দিয়েছিলেন কি না সেটা বহু অল্পসন্ধান করেও আমি খুঁজে পাই নি।^৩ কিন্তু তিনি যে বঙ্কিমের উপদেশ গ্রহণ করেন নি, সে কথা কারো অবিদিত নেই। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, শাস্ত্রের সাহায্যে হয়তো বা কিছু কার্যোদ্ধার হবে, যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছুই হবে না। বিভাগসাগর আপন দেশবাসীকে বিলক্ষণ চিনতেন।

অতএব প্রাপ্ত রামমোহনাদি সকলেই লুথার জাতীয় সমাজ ও ধর্মসংস্কারক। যে বাইবেল পোপ মানেন, খৃষ্টান মাত্রই মানে—সেই বাইবেল দিয়েই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন যে প্রত্যেক মানুষেরই বিধিভুক্ত অধিকার আছে—আপন বুদ্ধি অমুযায়ী বাইবেল থেকে বাণী গ্রহণ করে আপন জীবন চালনা করার; ‘চিরন্তন, অজান্ত’ কোনো পোপকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তলস্তয়, গান্ধী এই সম্প্রদায়ের।

ভলতেয়ার এ পথ স্বীকার করেন নি। তিনি নির্ভর করেছিলেন যুক্তি (রীজন), শুভবুদ্ধি (মোটিমুটি কমন সেন্স), মানবতা ও ইতিহাসের শিক্ষার উপর। তাঁর কমনসেন্স ও ইতিহাসের উপর বরাত মানার একটা উদাহরণ দি। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা ধর্মোদ্ধ হয়ে যে প্রথম খৃষ্টান মিশনারী সিন টমাসকে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল বা পশ্চাৎকাবিত হলে পর তিনি গুহাগহ্বরে বিলীন হয়ে যান, সেই কিংবদন্তী অস্বীকার করে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে ভলতেয়ার বলছেন, যে হিন্দুর পরধর্মে সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমরা বহুকাল ধরে বহু পর্ঘটকের কাছ থেকে শুনে আসছি, সেইটে হঠাৎ অবিশ্বাস করতে কাণ্ডজ্ঞানে (কমন সেন্সে) বাধে। এ দেশের বনবিহারী ভলতেয়ার—কিন্তু তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য নন।

তবে জনসাধারণ বনবিহারীকে চেনে না কেন? তার সর্বপ্রধান কারণ, বনবিহারী নিজেকে কখনো সংস্কারক, যুগান্তকারী মহাপুরুষরূপে দেখেন নি। হয়তো তিনি ভাবতেন, উচ্চাসনে দগুয়মান হয়ে অনলবর্ষী ভাষণের সাহায্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে, কিংবা ভাবালুতার বজ্রায় দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী সূদৃঢ় পরিবর্তন আনা যায় না। কিংবা হয়তো স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক বিনয়বশতঃ (সামান্য পরিচয়ের ন’সিকে লোক ভাবতো, তাঁর মত দস্তী গবী ত্রিসংসারে বিবল—বিশেষতঃ লোকটা যখন স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁর যুগযুগাধিকৃত স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে সরাতে চায়।) তিনি পেভেট্টেলে আরোহণ করতে

৩ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধর্মবাদ দ্বিচ্ছিন্ন।

চাইতেন না, কিংবা হয়তো তিনি নৈরাশ্রবাদী ছিলেন। তা সে যা-হোক, আমরা যে তাঁর মত কিংবা তাঁর চেয়েও শক্তিশালী লোকের জ্ঞান এখনো প্রাপ্ত হই নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কেন ?

বনবিহারী তো এমন কিছু নূতন কথা বলেন নি যা ভারতে কেউ কখনো বলে নি। স্থির হয়ে একটু ভাবলেই ধরা পড়বে ভারতবর্ষের চিন্তা-জগৎ (ধর্ম-শাস্ত্র-নীতি-আচার-ঐতিহ্য-কলা-জ্ঞানবিজ্ঞান) কি দিয়ে গড়া।

১। সনাতন হিন্দুধর্ম ২। বৌদ্ধধর্ম ৩। জৈনধর্ম ৪। দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্য ৫। চার্বাক প্রভৃতি লোকায়ত মতবাদ।

প্রথমটি বাদ দিলে বাকি চারটি চিন্তাধারাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বার বার সাবধান-বাণী প্রচারিত হয়েছে, তোমার স্বথ-শান্তি, তোমার পরমাগতি সম্পূর্ণ তোমারই হাতে ; দৃশ্য এবং অদৃশ্য কোনো লোকেই এমন কোনো অলৌকিক শক্তি নেই যে তোমাকে কোনো প্রকারে কণামাত্র সাহায্য করতে পারে। এই চিন্তাধারা আদৌ অর্বাচীন নয়। বৈদিক যুগে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে যখন যাগযজ্ঞহোমপশুবলি সর্বত্র স্বীকৃত, ঋষিকবিগণ যখন তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিষ্ময়ে অপৌরুষেয় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি আরেকটি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ, আরেক সত্যাত্মবোধী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন—ধন্য হোক সে প্রশ্ন, ধন্য হোক তার জন্ম-লগ্ন—‘তাহলে কোন্ দেবতাকে আমি স্বীকার করবো ?’ এই প্রশ্ন থেকেই আরম্ভ হল, চরম সত্যের—আলটিমেট রিয়েলিটির—অন্বেষণ। এই প্রশ্নের দুটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী আরণ্যক-উপনিষদের যুগে—বেদান্তের মূল সূত্র সব-কিছুই ব্রহ্ম, এই তিন ভুবন আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয় সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর জন্ম নেয় ঐ সময়েই, হয়তো তার পূর্বেই, এবং সবল কণ্ঠে ধ্বনিত হয় লোকায়ত মতবাদে এবং তারও পরে তীর্থঙ্করদের কণ্ঠে, বুদ্ধদেবের কণ্ঠে—দেবদেবীতে পরিপূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করে মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্ররূপে স্বীকার করা। এরই চরম বিকৃতরূপ—চার্বাকের মতবাদ, যে মতবাদ নৈতিক দায়িত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।

বৌদ্ধধর্ম এ-দেশ থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সে মতবাদ সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তর্কযুদ্ধে পরাজিত কোনো এক সাংখ্যতীর্থ বোধ হয় বৌদ্ধবৈরাগী শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেছিলেন, বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে যে এতখানি সন্ধি করেছে যে, সে মতবাদ আত্মসাৎ করতে তার বাধে নি, তাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলবো, না তবে কি বলবো ?

আর নিরীশ্বর জৈনরা তো, এখনো ভারতবর্ষে বাস করেন।

নিরীশ্বর সাংখ্যের চর্চা করেন এখনো বহু পণ্ডিত : ধর্মের মতে ঈশ্বর প্রমাণভাবে অসিদ্ধ।

নৈয়ায়িকরা কোন্ পন্থায় ?

এবং এদেশের সহজিয়ারা সৃষ্টিকেন্দ্র করেছেন মাহুশকে : ‘সবার উপরে মাহুশ সত্য, তাহার উপরে নাই।’

পূর্বেই বলেছি, বনবিহারী ভলতেয়ারের শিষ্য নন। তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য এ-কথা তাঁর সামনে বললে তিনি নিশ্চয়ই ছেড়ে আসতেন। অবশ্যই বলতেন, ভলতেয়ার যদি দেখেন যে তাঁর মতবাদ আমার মতবাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তবে তিনি গর্ব অহুভব করতে পারেন ; আমার তাতে কি ? আবার তাঁকে যদি বলা হ’ত, তিনি ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য দর্শন প্রচার করছেন তবে তিনি নিশ্চয়ই আরো মারমুখো হতেন। নিশ্চয়ই বলতেন, ‘চুলোয় যাক্ (“জাহান্নমে” যাক্”, নিশ্চয়ই বলতেন না, কারণ যে জায়গা নেই, সেখানে কোনো মতবাদকে পাঠিয়ে বনবিহারী অবশ্যই সঙ্কট হতেন না !) তোমার সাংখ্য জৈন মতবাদ ; পিছন পানে তাকাও কেন ? নিজের বুদ্ধি, নিজের যুক্তি, নিজের রেশনালিটির উপর নির্ভর করতে পারো না ? কপিল-জ্ঞানের ঠাকনা ছাড়া বুদ্ধি দাঁড়ানো যায় না ? তুমি আছ, আমি আছি—বাস্। আমরা বের করে নেব ন্যায় আচরণ কি ? আর রাগ কোরো না, আমি আমারটা বহুপূর্বেই একাই বের করে নিয়েছি।’

ডন্ কুইকসটের সঙ্গে বনবিহারীর মাত্র একটা বিষয়ে পার্থক্য। বিস্তর মধ্যযুগীয় রোমান্টিক কাহিনী পড়ে পড়ে ডনের মাথা গরম হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন তিনি সে যুগের শিভালরাস্ নাইটদের একজন।^৫ ব্যস্, আর যাবে

৪ জাহান্নম এসেছে হীক্স গেহানেস থেকে ;

বলা উচিত দুটো শব্দই কগ্নেট। এই গেহানেস প্যালেস্টাইনের ভ্যালি অব ডেথ্—ভৌগোলিক উপত্যকা।

৫ এ যুগের ভাইসচ্যান্সেলর হাস্‌লান স্‌ত্ৰাওয়ার্‌র্দী যখন লাটসাহেবকে বীণা-কল্যাণীর হাত থেকে বাঁচান তখন তাঁকে রাতারাতি (অর্থাৎ এক night নাইটে-ই) নাইট (knight) করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর ব্রাতুষ্পুত্র (?) শহীদ স্‌ত্ৰাওয়ার্‌র্দী একটি অতুলনীয় কবিতায় বলেন, ‘মধ্যযুগে ড্র্যাগনের (রাক্ষস) হাত থেকে কুমারী উদ্ধার করে বীরপুরুষ নাইট হতেন। এ যুগে কুমারীর হাত থেকে ড্র্যাগনকে রক্ষা করে মাহুশ নাইট হয়।’

কোথায়। দ্বিধাশূন্য-জ্ঞানশূন্য হয়ে একাকী, সম্পূর্ণ একা তিনি খোলা তলওয়ার হাতে আক্রমণ করলেন জলযন্ত্রকে (উইণ্ড মিলকে)।

তারও বহু পরে যিনি এ-যুগের সর্বশেষ নাইট বলে নিজেকে প্রচার করেন তিনি ফীল্ড মার্শাল হেরমান্ গোয়িঙ—হ্যার্নবেগ মোকদ্দমায়। তাঁর কৃতিত্ব : জার্মানিতে তিনিই সর্বপ্রথম কনসানট্রেশন ক্যাম্প স্থাপনা করেন (অবশ্য তার বহু পূর্বে ইংরেজ করেছিল বোয়ার-যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায়) এবং আইষমানের ইহুদি-হননে তাঁর সম্মতি ছিল। নিহত ইহুদিদের ভিতর লক্ষাধিক কুমারী কন্যাও ছিল।

বনবিহারী কপিল-জীন-চাবাক পড়ে পড়ে ডনের মত মাথা গরম করেন নি। ধীরস্থির মনে চিন্তা করে, মীমাংসায় পৌঁছে তিনি আক্রমণ করলেন বঙ্গদেশের জগদল জাদ্যকে। এখনো তাঁর মাথা কতখানি ঠাণ্ডা সেটা বোঝা যায় এর থেকে যে, তখনো তাঁর ঠোঁটে হাশ্ব-ব্যঙ্গ-রস—তাঁর নব-প্রকাশিত নাস্তিক্য প্রচারকামী পত্রিকা 'বেপরোয়া'র (বাঙলা দেশে এ ধরনের কাগজ বোধ হয় এই প্রথম আর এই শেষ) প্রথম সংখ্যায় প্রথম 'war song'-এ তিনি বললেন,

‘টলবো না কো অতুস্বার আর বিসর্গের

ঐ ছব্বায়ে

কিংবা দেখে টিকির খাড়া সঙ্গীন !’

সে পত্রিকায় কি না থাকতো ? ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য, চিত্র—এসবক পদপিপিরি মাছুলি, হাচি-টিকটিকি। এর পূর্বে তিনি 'ভারতবর্ষে' ব্যঙ্গচিত্রসহ বঙ্গজীবনবৈচিত্র্য তাবলো পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন : তার একটি ছিল কেরানী—লোলচর্ম অস্থিসার জীর্ণবেশ 'ক্লক-কেশ কেরানীর ছবির নিচে ছিল,

‘চাকরি গেল, চাকরি গেল, চাকরি রাখা

বিষম দায়

ঐ গো, বুঝি ন’টা বাজে, ঐ গো বুঝি

চাকরি যায় !

বিজলি-বাতির ফাহুল হেন ঠুনকো

মোদের চাকরি ভাই !

ফট করে সে ফাটে, কিন্তু ফাটার শব্দে

চমকে যাই !’

সর্বশেষে কেরানী যেন বৈষ্ণব, কবিরাজ, ডাক্তার, মহামান্য শ্রীযুত

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কেই বাদ্য করে বলছে (উইথ এ টুইস্টেড আইরিশ স্মাইল)—

‘ভরা পেটে ছুটতে মানা ? চিবিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যকর ?

চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো সে তারপর ।’

রবীন্দ্রসৃষ্টির সঙ্গে আমি ঈষৎ পরিচিত । রবীন্দ্ররসিকদের রচনা আমি পড়েছি । অধুনা ‘রবীন্দ্রায়ণ’ও (অত্যাৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংকলন, তত্‌পরি অভুলনীয় সম্পাদন) অধ্যয়ন করেছি । তারপরও বলবো, মুক্তকণ্ঠে বলবো, বনবিহারীর মত রবীন্দ্রসৃষ্টির চৌকশ সমঝদার আমি দ্বিতীয়টি দেখি নি । তাই আজ পর্বস্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছে, তার মধ্যে বনবিহারীর সমালোচনাই সর্বোৎকৃষ্ট । পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের অন্য সমালোচকদের প্রতি তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা । বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলতেন, ‘রসসৃষ্টির পথে যত সব অবাস্তুর বস্তু নিয়ে বর্বরশ্রু শক্তিকয় ! রবীন্দ্রনাথ নাকি নগ্ন ঘোঁনের অশ্লীল ছবি আঁকেন—তা তিনি আঁকেন নি । আর যদি আঁকেনই বা, তাতেই বা কি ? এ সব তো সম্পূর্ণ অবাস্তুর—রসসৃষ্টি হলেই হল ! রবীন্দ্রনাথের রূপক নাকি অস্পষ্ট ! তা হলে চশমা নাও—ওঁকে দোষ দিচ্ছে কেন ?’

তার পর বুঝিয়ে বলতেন, ‘দে আর অল বার্কিং আপ দি বং ট্রী’—অর্থাৎ বেরালটা উঠেছে একটা গাছে, আর কুকুরগুলো যেউ যেউ করছে অন্য গাছের গোড়ায় ।

সত্যেন দত্তকে আজকের দিনে লোক আর স্মরণে আনেন না ; অথচ তিনি যখন সবে আসরে নেমেছেন, সেই সময় থেকেই বনবিহারী তাঁর প্রশংসা গেয়েছেন । সেই সত্যেন দত্তই যখন এই শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে মাঝে মাঝে অহুপ্রাস ও ছন্দের ম্যাজিকের (জাগ্‌লারি) ‘কেরদানি’ দেখাতেন, তখন বনবিহারী অতিষ্ঠ হয়ে ‘বেপরোয়া’তে অপ্রিয় সমালোচনা করেন । আমরা তখন তাঁকে বলি, ‘এগুলো নিছক একস্পেরিমেন্ট জাতীয় জিনিস ; আপনি অত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন ?’ আরেক টিপ নশ্রু নিয়ে—এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র বদঅভ্যাস, আর ঐ করে করে করেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বরের সর্বনাশ—বললেন, ‘তা হলে ছাপানো কেন ? যে প্রচেষ্টা রসের পর্ষায়ে ওঠে নি সেটা প্রকাশ করে বিড়ম্বিত হওয়ার কি প্রয়োজন ?’

বিজ্ঞেজ্ঞনাথের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাগুরী দিনেজ্ঞনাথও বলতেন,

শতং বদ

মা লিখো

শতং লিখো

মা ছাপো।

*

*

*

আরো বহু স্মৃতি বার বার মনে উদয় হচ্ছে। একদা দুরারোগ্য রোগের অসহ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ তিনি আমাকে দেখিয়ে দেন। রিটারার করার বহু পরে তিনি একবার কলকাতায় এসে কি করে খবর পান আমি অমুহু। বিশ বছর ধরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। তিনি খবর পাঠালেন। সব শুনে বললেন, 'এ রোগ সারে না—তবু তুমি পরেশ চক্রবর্তীর কাছে যাও। আমি বহু ছেলে পড়িয়েছি—সব ব্লাকো। ঐ একটি ছেলের আক্কেলবুদ্ধি ছিল। বিলেত থেকে ও নিয়ে এসেছে এ টু জেড বিস্তার ডিগ্রী।' আমি তাঁর কাছে গেলে সে ভাস্কর বলেন, 'গুরু এই প্রথম আমাকে একটি রোগী পাঠালেন। কি বলেছেন উনি? এ রোগ সারে না? না, সারে।' তিনি আমাকে সম্পূর্ণ স্বস্থ করে দিয়েছিলেন। এক্সপেরিমেন্ট করে করে নয়। প্রথম ওষুধ দিয়েই। কিন্তু সে আরেক কাহিনী। এবং সবচেয়ে সস্তাপের কথা, এই কৃতবিদ্য চিকিৎসক অল্প বয়সে গত হন।

*

*

*

৫ই জুলাই বনবিহারী পঞ্চভূতে লীন হন।

সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ 'বনফুল' তাঁর সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকার ১৫ই আশ্বিন সংখ্যায় অতি অল্প কয়েকটি কথা বলেছেন, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, এবং তার প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি পিটছে। আমি এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে যা প্রকাশ করতে সক্ষম হই নি, তিনি অল্প কথাতেই সেটি মূর্তমান করেছেন।

"বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর (বনবিহারীর) দান চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক সামাজিক কোনও অশ্রায়ে সঙ্গ কখনও তিনি রক্ষা করেন নি। অনবদ্য তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে সে-সবের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ তিনি করে গেছেন। সেকালের ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, বেপরোয়া প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় তাঁর কীতি এখনও মণি-মুক্তার মতো ঝলমল করছে। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অনমনীয় দুর্বীর প্রকৃতির লোক। কখনও কারো অশ্রায় সহ্য করতে পারেন নি। স্মৃত্যং কারও সঙ্গ তিনি মানিয়ে চলতে পারেন নি, কারো সঙ্গ তাঁর বনে নি। এজ্ঞে শেষ জীবনে প্রায় একা একা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়েছে তাঁকে। অতিশয় বিচক্ষণ

চিকিৎসক ছিলেন। সিভিল সার্জ'ন হয়ে বগুড়া থেকে রিটার্নার করেন।... পৃথিবীতে নিখুঁত মানুষ নেই, নিখুঁত মানুষের সন্ধানেই তাঁর সারা জীবন কেটেছে। কিন্তু কোথাও সে মানুষ পান নি। নিঃসঙ্গ জীবনই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর একটি ভাই তাঁকে ছাড়েন নি। বঙ্কুবিহারীই শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। শেষে তিনি নিজের ঠিকানাও কাউকে জানাতেন না। গত ৫ই জুলাই তিনি মারা গেছেন।”

বনফুলই তো চেনে বনবিহারীকে। আর এই ‘বনবিহারী’ নাম সার্থক দিয়েছিলেন তাঁর গুরুজন! জনসমাজে বাস করেও তিনি যেন সারাজীবন ‘বনেই’ ‘বিহার’ করলেন।

আমার আর মাত্র দুটি কথা বলার আছে।

বনবিহারী যে হিন্দু-সমাজ ও বাঙালীর কঠোর সমালোচনা করে গিয়েছেন তার কারণ এই নয় যে, তিনি এই দুটিকেই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বলে মনে করতেন। তিনি নিজেকে প্রফেট বা রিকর্মার বলে মনে করতেন না। কাজেই বিশ্বভুবনের তাবৎ জাতি দূর করার ভার আপন স্বত্বে তিনি তুলে নেন নি। এমন কি তাঁর হাতের আলোটিও তিনি উচু করে তুলে ধরেন নি। সে-আলো তাই পড়েছিল মাত্র তাঁর আশপাশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্যের উপর। তারই মলিনতাটুকু তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন মাত্র। তবুও আমার মনে হয়েছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘জ্যাঠামশাই’ ও রবীন্দ্রের ‘জ্যা ক্রিস্তফ’-এর সমন্বয়—কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ‘জ্যা ক্রিস্তফ’ বনবিহারীর অগ্ন্যতম প্রিয় পুস্তক (ডাক্তার হয়েও—সিরিয়াস ডাক্তাররা সাহিত্যচর্চার সময় পান কম—তিনি সম্পূর্ণ নিজের সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন সেটা বোঝাবার চেষ্টা করবো না)।

আজ তিনি জীবিত নেই, তাই বলবার সাহস পাচ্ছি, তিনি বাঙালীকে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় একথা বললে তিনি বোধ হয় আর আমার মুখ দর্শন করতেন না। বাঙালী বলতে তিনি হিন্দু—বিশেষ করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু—মুসলমান, ইলিয়ট রোড অঞ্চলের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সকলকেই বুঝতেন।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটি নিবেদন করি। এ কথাটি তাঁর জীবিতাবস্থায় বললে তিনি হুনিশ্চিত রামদা নিয়ে আমার পশ্চাক্ষেপে ধাবমান হতেন।

ইংরিজিতে বলে—“মিষ্ট অব্ হিউমেন কাইওনেস্।”

অনিচ্ছায় বলছি, কিন্তু এতলে বলার প্রয়োজন, আমি বিস্তর দেশ-বিদেশ

দেখেছি। বহু সমাজসেবী, হাসপাতাল চালক মিশনারি, রেডক্রসের একনিষ্ঠ সেবক কর্মী সর্বভাগী মহাজন, স্ত্রীলিঙ্গাদের বিভীষিকাময় রক্তাক্ত রণাঙ্গন-প্রত্যাগত সাজ্জনকে আমি চিনি। বনবিহারীর হৃদয়ের অতিশয় গোপন কোণে যে ভুবন-জোড়া স্নেহমমতার ভাণ্ডার ছিল—সে রকম তো আর কোথাও দেখলুম না। সেই স্নেহমমতাই তাঁর আপন স্বত্বশাস্তি হরণ করেছিল। সেই বেদনাবোধই তাঁকে উত্তেজিত করতো খড়্গ ধারণ করে অস্ত্রায়, অসত্য, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

এই স্নেহমমতা তিনি এমনই সঙ্কোপনে রেখেছিলেন যে, অধিকাংশ লোকই তাঁর কঠোর ভাষা, তীব্র কণ্ঠ, নির্মম বাঙ্গ শুনে বিভ্রান্ত হয়েছেন। বনবিহারীর সেজ্ঞ কণামাত্র ক্ষোভ ছিল না। তাঁর সহানুভূতি তিনি রাখতেন আরো গোপন করে।

আমরা বোধ হয় অত্যন্ত সহিষ্ণু। কিংবা যথেষ্ট ইতিহাস পড়ি নি। নইলে সোক্রাতেস খৃষ্টের জন্ম একদা যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বনবিহারীর জন্ম সেটা করা হ'ল না কেন?

কিন্তু এই অল্পভূতিগত অভিজ্ঞতা গড়ে প্রকাশ করা যায় না।

বনবিহারীর প্রয়াণ উপলক্ষ্যে 'বনফুল' যে সনেটটি লিখেছেন সেটি উদ্ধৃত করি :—

'বনবিহারী মুখোপাধ্যায়'

পাষাণে আঘাত হানি, অসি তীক্ষ্ণধার
চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'ল? কঙ্কর কটক
জয়ী হ'ল বিক্ষত করিয়া বার বার
বলিষ্ঠ পথিক-পদ? ধূর্ত ও বঞ্চক
সাধুরে লাস্তিত করি' বিজয়-কেতন
আশ্ফালন করিল আকাশে? অঙ্ককার
গ্রাসিল কি রবি? না—না—নতি-নিবেদন
করি' পদে উচ্চকণ্ঠে কহি বারংবার
নহে ব্যর্থ, পরাজিত, হে বহি-কমল
তমোহরী, হে প্রদীপ্ত মশাল-বর্তিকা,
অগ্নি তব অনিবার্য, চির-সমুজ্জল,
অনবচ্ছিন্ন অপকল্প উদ্ভব-মুখী শিখা।

মহাপ্রস্থানের পথে বিগত অর্জুন
অজ্ঞাগারে যেথে গেছে শরপূর্ণ তুণ ।

অদৃষ্টের রাজরস

আওরেকজেব মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাবৎ ভারতবর্ষে লেগে গেল ধুমুয়ার ।
বাদশাহ হবেন কে ?

এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি যে, আর্য এবং একাধিক আর্যের জাতির মধ্যে প্রথা—রাজার মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনা বাধায় সিংহাসনে বসেন । কিন্তু তুর্কমানিস্তানের মোগলদের ভিতর এরকম কোনো ঐতিহ্য ছিল না । তাদের ছিল ‘জোর যার মুল্লুক তার’ । আরবদের ভিতর গোড়ার দিকে এই একই প্রবাদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট (খলীফা) নিযুক্ত হতেন, তবে ‘জোরের’ বদলে সেখানে ছিল চরিত্রের, শৌর্যবীর্যের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব । তাই বলা হ’ত, ‘সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন খলীফা,—হন-না তিনি হাবশী (নিগ্রো) ।’ এবং সেটাও ঠিক করা হ’ত গণভোট দিয়ে ।

তাই মোগল রাজা মারা যাওয়া মাত্রই, কিংবা তিনি অথর্ব অসমর্থ হয়ে পড়লেই লেগে যেত রাজপুত্রদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ । কোনো কোনো সময় রাজার নাতিরাও এবং অন্ত বাজে লোকও এই লড়াইয়ের লটারিতে নেবে যেতেন । অবশ্য রাজরক্ত না থাকলে তাঁর সন্তাট হবার সম্ভাবনা থাকতো না । পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ফররুখসিয়াদের রাজত্বের শেষের দিক থেকে মুহম্মদ শাহ বাদশা রঙীলার সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত সিদ্ধ দেশের সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব দিল্লীতে সিংহাসনের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন । রাজার পর রাজাকে তাঁদের হাতে পুতুলের মত নাচতে হয়েছে । কিন্তু খ্যাতি, শক্তি, অর্থবলের মধ্যাহ্নগগনে থাকাকালীনও তাঁদের কারো তখৎ-ই-তাউসে বসবার ছঃসাহস হয় নি । সৈয়দ পয়গম্বরের বংশধর,—তিনি সম্মান পাবেন মসজিদে, মস্তবে, মাদ্রাসায়—রাজসভায় কবিরূপে, ঐতিহাসিকরূপে—সমাজে গুরুরূপে, কিন্তু মোগল রাজবংশের রক্ত তাঁদের ধমনীতে ছিল না বলে দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান তাঁদের বাদশাহ-সালারূপে কিছুতেই এঁদের স্বীকার করতো না । ঠিক ঐ একই কারণে মারাঠা ও ইংরেজ দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চায় নি । সিপাহ বিদ্রোহ চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত ইংরেজ স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের অধীশ্বরী বলে ঘোষণা করবার সাহস পায় নি । এবং সেটাও করেছিল অতিশয় সতয়ে ।

রাজা বা সার্বভৌম আমীরের মৃত্যুর পর যুবরাজদের ভিতর ভ্রাতৃত্বের মারফতে কে সবচেয়ে শক্তিশালী সেটা বের করা তুর্কমানিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশে প্রবল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভারতের (এবং অনেক সময় কাবুল কান্দাহার গজনির উপরও দিল্লীর আধিপত্য থাকতো) মত বিরাট দেশে এ প্রকারের যুদ্ধ বিকট অরাজকতা ও দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করতো। লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় তো হ'তই,—অনেক সময় একই ভূখণ্ডের উপর ক্রমাগত অভিযান ও পার্টা অভিযান হওয়ার ফলে সেখানে চাষবাস হ'ত না, ফলে পরের বৎসর হুঁতু হ'ত। সাধারণজনের বাড়িঘরদোর তো নষ্ট হ'তই, কলাসৃষ্টির উন্নয়ন উত্তম নিদর্শনও লোপ পেত। এইসব যুদ্ধবিগ্রহের ফলেই ইওরোপের তুলনায় এদেশে বেঁচে আছে অতি ভিন্ন রাজপ্রাসাদ। কোনো কোনো স্থলে পলায়মান সৈন্য পথপ্রান্তের প্রতিটি ইদারাতে বিষ ফেলে যেত। ফলে বৎসরের পর বৎসর ধরে পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীর একমাত্র জলের সন্ধান অব্যাবহার্য হয়ে থাকতো।

এই দলাদলি মারামারি থেকে, কি দিল্লী-আগ্রার মত বৃহৎ নগর, কি সুদূর স্ববের (প্রভিন্স) ছোট শহর, আমীর-ওমরাহ, সিপাহসালার, ফৌজদার প্রায় কেউ নিষ্কৃতি পেতেন না। কারণ এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আহ্বান, আদেশ, অমুনয়-ভরা চিঠি পেতেন প্রত্যেক যুযুধান রাজপুত্রের কাছ থেকে—‘আমাকে অর্থবল সৈন্যবল সহ এসে সাহায্য করো।’ তখন প্রত্যেক আমীরের সামনে জীবনমরণ সমস্তা দাঁড়াতো—আখেরে জিতবে কোন্ ধোড়াটা, ব্যাক্ করি কোন্টাকে? অতিশয় বিচক্ষণ কূটনৈতিকরাও রং হস্ ব্যাক্ করে আপন, এবং কোনো কোনো স্থলে সপরিবার, প্রাণ দিয়ে ভুলের খেসারতী দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ থাকবার উপায় ছিল না। মোগল রাজপুত্র মাত্রই ইংরিজি প্রবাদটাতে বিশ্বাস করতেন, ‘ওয়ান হু ইজ নট উইন্ মৌ ইজ্ এগেনস্ট্ মি’, যে আমার সঙ্গে নয়, সে আমার বিপক্ষে।

নির্ঝঞ্ঝাটে প্রতিষ্ঠিত বাদশাদের তো কথাই নেই, অতিশয় টলটলায়মান সিংহাসনে বসে জু'দিনের রাজাও সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন সেপাই-শাক্তী, ফাঁসভের দল—তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের উভয় চক্ষু অন্ধ করে দেবার জন্ত—যেন তারা চিরতরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সিংহাসন লাভের জন্ত যুদ্ধ ঘোষণা না করতে পারে। শাস্তিকামী, ধর্মচরণে আজীবন নিযুক্ত, সিংহাসন আরোহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক জনেরও নিষ্কৃতি ছিল না। নিষ্কৃতি ছিল একমাত্র পন্থায়—আত্মীয়-স্বজন দশ-দেশ ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। তবে সেটাও

করতে হ'ত আগেভাগে পরিপূর্ণ শান্তির সময়। একবার ধুকুমার লেগে যাওয়া মাত্রই তামাম দেশে এসে যেত এমনই অশান্তি, লুটতরাজ যে তখন আর বন্ধরে গিয়ে জাহাজ ধরার উপায় থাকতো না। এমন কি পরিপূর্ণ শান্তির সময়ও আগেভাগে শেষ রক্ষা বাবদে কসম খাওয়া যেত না—মজাতে নির্বাসিত বাইরাম খান নাকি পথমধ্যে গুজরাতে আকবরের গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন।

ইংরেজ ফার্সীতে লিখিত ইতিহাসরাজির সব কটাকেই গুণায় আণ্ডা মিলিয়ে নিন্দাবাদ করে বলেছে, এ-সবেতে আছে শুধু লড়াই আর লড়াই। বিবেচনা করি, গুণুলোতে যদি গুণায় গুণায় শান্তিকামী পীর-দরবেশ ঘুরে বেড়াতেন, কিংবা তার চেয়েও ভালো হ'ত যদি রাজা-প্রজায় সবাই মিলে চাঁদনি চৌকে হাঙ্গেলুইয়া হর্ষরব তুলে ইংরেজের আগমনী গান ধরতেন, তাহলে বোধ হয় খেত সমালোচকরা সন্তুষ্ট হতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মোগলরা ঘে-ঐতিহ্য সঙ্গে এনেছিল সেটা তার বিকৃততমরূপে দেখা দিল তাদের পতনের সময়। ফলে স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হল তার সমাধান যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিকরা সেসব যুদ্ধের বর্ণনা না দিয়ে দি নেশন অব শপ্লিফটারসের জন্তু সেই সংকর্মের টেকনিক বয়ান করলে সত্যের অপলাপ হ'ত।

কিন্তু এসব ইতিহাস শুধু যুদ্ধে যুদ্ধে ভর্তি ছিল একথা বললে আরেকটা খুব বড় সত্য গোপন করা হয়। এদের প্রচুর সাহিত্যিক মূল্যও যে ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার পূর্বেই একটি সত্য স্বীকার করে নিই। বিদেশাগত কিছু লোক ভিন্ন এদেশের কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। এবং মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে শত ভেঙ্কিবাঙ্কি দেখাতে পারলেও সেখানে সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বও অনস্বীকার্য যে, সাহিত্য যে উপাদানে নিমিত হয় তার অভাব ভারতবর্ষে রচিত ফার্সী ইতিহাসে কখনো ঘটে নি। তুলনা দিয়ে বলা যায়, রামায়ণের কাহিনী যত কাঁচা ভাষাতেই রচা হোক না কেন তার চিত্তাকর্ষণী শক্তি কিছু না কিছু থাকবেই।

তাই ফার্সী ভাষায় রচনাকারী ঐতিহাসিকরা হামেশাই কোনো বাদশার রাজত্বকালের তাবৎ লড়াই, বাদশার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্তু আমীরদের প্রতিশ্রুতি, কূটনৈতিক চতুরঙ্গ কৌড়ার মারপ্যাচ ইত্যাদি বর্ণনা করার পর পঞ্চমুখ হতেন বাদশার বিবাহের সালসার বর্ণনা দিতে; সেই উপলক্ষে সম্মিলিত কবিকুলের বর্ণনা দিতে, এবং সর্বশেষে বাদশার ব্যক্তিগত গুণাগুণের উল্লেখ করতেন। সব সময় যে তাঁরা নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে সমর্থ হতেন তা নয়, কিন্তু

বাদশা সজ্জন হলে তাঁর গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতে কোনো অহুবিধাই উপস্থিত হ'ত না।

যেমন গুজরাতের এক বাদশা ছিলেন অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, পুণ্যশীল। তাঁর জীবিতাবস্থায়ই গুণমুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর নাম দেন 'অল্-হালীম'—'পুণ্যশীল'। মিরাত-ই-সিকন্দরী গুজরাতের প্রখ্যাত ইতিহাস। তার লেখক অল্-হালীমের সময়কালীন যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা দেবার পর পরমানন্দে হজুর বাদশার সর্বপ্রকারের পুণ্যশীল খামখেয়ালির বর্ণন-পর্বে প্রবেশ করেছেন। কে বলবে তখন আমাদের এই ঐতিহাসিক শুধু যুদ্ধবিগ্রহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েই উল্লাস বোধ করেন। বস্তুত এই অহুচ্ছেদে প্রবেশ করার পর মনে হয় তাঁর যেন আর কোনো তাড়া নেই, মাথুরে পৌঁছনে র পর কৌতুনিয়ার খে অবস্থা হয়। এ ইতিহাস তাঁকে যে একদিন শেষ করে 'তামাম্ শুদ্' লিখতে হবে সে ভাবনা তাঁর চৈতন্য থেকে যেন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

হজুর অল্-হালীমকে এক বিদেশাগত পাচক এক নূতন ধরনের পোলাও খাওয়ালে পর হজুর পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে বললেন, 'উজীর। আমার প্রজারা কি কখনো-সখনো এরকমের পোলাও খায়?' উজীর স্মিতহাস্ত করে বললেন, 'হজুর, তা কখনো হয়।' হজুর বললেন, 'একা একা খেয়ে আমি কেমন যেন সুখ পাচ্ছি নে।' হকুম দিলেন, মহল্লা মহল্লায় বিরাট বিরাট পাত্রে করে যেন সব্বই এরকমের পোলাও তৈরী করে তাবৎ আহমদাবাদবাসীদের খাওয়ানো হয়। আমাদের ঐতিহাসিকটি যেন ঈষৎ আমোদ উপভোগ করে ইঙ্গিত করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হজুরের এসব 'খামখেয়ালীর অপব্যয়' দেখে ভারী বিরক্ত হতেন।

তা সে যা-ই হোক তাবৎ আহমদাবাদবাসী সেদিন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে দিনভর ফিস্টি খেলে। যে সাবরমতীর পারে বসে বহু যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষণ' রচেন ছিলেন সেই সাবরমতীর পারে সেদিন আর কেউ ক্ষুধিত রইল না।

ঠিক ঐ রকমই দিল্লীর শেষ মোগলদের কোন্ এক বাদশার বিয়ের শোভাযাত্রায় উঁচু হাতীর পিঠ থেকে রূপো দিয়ে বানানো ফুল রাস্তার দু' পাশের দর্শকদের উপর মুঠো মুঠো ছড়ানো হয়। ঐতিহাসিক খাফী খান—কিংবা খুশ্-হাল্-চন্দ বা অন্য কেউ হতে পারেন, আমার মনে নেই—যখন তাঁর ইতিহাস লিখছেন তখন দিল্লীর বড় দুঃখের দিন। সেই জাঁকজমক শান-শওকতের স্বরণে যেন উক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, 'এ অধমও সেই দর্শকদের মধ্যে ছিল। সেও তার কুর্ভার দামন্ (অগ্রভাগ, অঞ্চল) দু' হাত দিয়ে প্রসারিত করে

উদ্গ্রীব আকাজ্জক প্রতীক্ষা করলো। এ অধমের কী শোভাগ্য, কী ধূশ-কিম্ব! আমরা তিনটে ছোট ছোট ফুল পেয়ে গেলুম। জয় হোক দিল্লীশ্বরের! জগদীশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন!’

এ যুগের ইতিহাস বিবাদময়, কিন্তু ঘটনাবলি বলে একাধিক ফার্সীজ হিন্দুও তার স্মদীর্ঘ বিবরণ লিখে গিয়েছেন। তার একটি ঘটনার বর্ণনা দেবার জন্য বক্ষ্যমাণ লেখেন। কিন্তু তৎপূর্বে এক লহমার তরে আহমদাবাদ ফিরে যাই।

মিরাৎ-ই-সিকন্দরী ইতিহাস বলে, অল্-হালীম্ আহমদাবাদের দুর্গান্ত শীতে লক্ষ্য করলেন, গৃহহীনদের দুরবস্থা। আদেশ দিলেন যে, প্রতি চৌরাস্তায় যেন সজ্জার পর কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালানো হয়। বহু গৃহহীন এমন কি গৃহস্থও সেই আগুন ঘিরে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে গাল-গল্প, গান-বাজনা করে রাত কাটাতো। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অল্-হালীম্ বৃহৎ আবাস নির্মাণ করে দিলেন—ভিথিরি-গরীবের বসবাসের জন্য। ঐতিহাসিকরা বলতে পারবেন, এ ধরনের ‘পুয়ের হোম’ পৃথিবীর এই সর্বপ্রথম কি না।

শীতে যাতে তারা কষ্ট না পায় তার জন্য লেপের ব্যবস্থাও হল। মিরাৎ-ই-সিকন্দরীর লেখক বলছেন, ‘কিন্তু এসব লক্ষ্যীছাড়া ভ্যাগাবণ্ডদের কেউ কেউ আপন আপন লেপ বিক্রী করে দিয়ে মদ খেত। খবরটা কি করে জানি হজুরের কানে গিয়ে পৌঁছল।’ আমার মনে সন্দেহ হয়, হয়তো বা আমাদের সেই সিনিক প্রধানমন্ত্রী উজ্জীর-ই-আজম্ সাহেবই মজা চেখে চেখে বাক্য নয়নে তাকিয়ে হজুরের অপব্যয়ের চরম পরিণামটি হজুরেরই খেদমতে পেশ করেন!

তিনি নিজে করে থাকলে সেটা বুমেরাঙের মত তাঁরই কাছে ফিরে আসে। হজুর বললেন, ‘এটা কি করে ঠেকানো যায়, বলো তো উজ্জীর।’ উজ্জীর অগ্ৰ-দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ভাবখানা করলেন, স্বাধীন সম্রাট আসমুদ রাজস্থানব্যাপী গুর্জরভূমির মহামাত্র সম্রাটের অতিমাত্র প্রধানমন্ত্রী ‘নেপক্যাতা’ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না! হজুর কিন্তু উজ্জীরের অতশত স্মৃষ্কভূতির পশ্চাক্কাবন করেন না। বললেন, ‘রাতটা ভেবে দেখো।’ উজ্জীর-ই-আলা যে ভাবে কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন তাতে মনে হল না যে, তিনি ত্রিধামা-ধামিনী অনিত্রায় যাপন করবেন।

পরদিন ফজরের নমাজের পরই, অর্থাৎ ব্রাহ্ম-মুহুর্তেই প্রধানমন্ত্রীর তলব পড়লো। হজুর সহাস্ত আস্তে তাঁকে বললেন, ‘বুঝলে হে উজ্জীর সাহেব, আমিই কাল রাতে চিন্তা করে দাওয়াইটা বের করেছি। প্রত্যেককে আলাদা লেপ না দিয়ে চার-চারজনকে এক-একটা করে, বড় লেপ দাও। চারজনই তো আর

মদের গোলাম হবে না যে এক জোট হয়ে লেপ বিক্রী করে দেবে। যারা খায় না তারা ঠেকাবে।’

এ ধরনের চুটকিতে মিরাত-ই-সিকন্দরী ভর্তি। তাছাড়া দীর্ঘত্তর কাহিনীও এ কেতাবে আছে। এমন কি বিশাল বিরাট বীরপুরুষ মুহম্মদ বেগড়ার (এর গোপ নাকি এতই দীর্ঘ ছিল যে তিনি তার দুই প্রান্ত মাথা ঘুরিয়ে পিছনে এনে ঘাড়ের উপরে গিঠ বেঁধে রাখতেন!) যোন জীবনও তিনি নির্বিকারচিত্তে সালঙ্কার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রাদেশিক ইতিহাস বলে এ কেতাব তার গ্রাঘ্য মূল্য পায় নি।

শেষ মোগলদের ইতিহাসে একটি অতিশয় হতভাগ্যের জীবন ও একটি ঈষৎ হাশুরস-মিশ্রিত ঘটনা—এই দুটি আমার মনে আসে। পুজোর বাজারে অল্প পত্রিকায় একটা করুণ রস লিখে আমার রেশন খতম। দ্বিতীয়টাই শুনুন।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোগলসম্রাট মাজেরই মৃত্যু হলে রাজপুত্রদের ভিতর লাগত যুদ্ধ। আওরেঙ্গজেবের মৃত্যুর পরও তার ব্যতিক্রম হল না। লড়াই জিতে বাদশাহ হলেন শাহ আলম বাহাদুর শাহ। পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র জাহান্দার শাহ তখ্তে বসলেন। মোগল বংশের উপর আর কেউ এঁর মত কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেন নি। একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। একটি বাইজী—লালকুনওরুকে তিনি দিয়েছিলেন বেগমের সম্মান ও তাঁকে নিয়ে বেরোতেন দিল্লী প্রকাশ্য রাস্তায় মগপান করতে।^১ তখনকার দিনে আজকের পানগুলার দোকানের মত মদের দোকান থাকতো—অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চৌ করে এক পাত্র মগপান করে ফের অল্প দোকানে আরেক পাত্র—করে করে বাড়ি পৌছনো যেত। কিংবা রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়া যেত। হজুর বাদশাহ সালামৎ সেই বাইজী লালকুনওরের পাশে দাঁড়িয়ে এইসব অতি সাধারণ শ্রেণীর দোকান

১ এ যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হিটলারের প্রধান সেনাপতি রুমবের্ক যুদ্ধ বয়সে ভালো করে অনুসন্ধান না করে তাঁর টেনোকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ ইনি একদা একাধিক শহরে দেমি-ম’দেন ছিলেন। বিয়ের স্বাক্ষ্রে পৃথিবীর ঐ সর্বপ্রাচীন ব্যবসায়ের মেয়েরা তাদের পাড়ায় পাড়ায় বিয়েটা সেলেব্রেট করে—যেন তারা সমাজে কষ্ট পেয়ে গেল—এবং শুধু তাই না, যে-সব পুলিশ তাদের উপর চোটপাট করতো তাদের ফোন করে তাদের হেলথ ড্রিক করে। পরে হিমলায় দলীল-দস্তাবেজসহ হিটলারের কাছে কেলেকারিটা ফাঁস করলে পর তিনি রুমবের্ককে রিটার্ন করিতে আদেশ দেন।

ও তাদের খদ্দেরের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে করতে পাজের পর পাজ গলার ঢালতেন এবং লালকুনওয়ার তো কথাই নেই। তিনি একদা যে হাফ-গেরস্থ অঞ্চলে (ফরাসীতে ছবছ একেই বলে 'দেমি-মঁদ', এদের জ্বীলোক বাসিন্দা 'দেমি-মঁদেন') তাঁর বাবসা ঢালাতেন, সেখানকার লোকেররা এসে সেখানে জুটতো। বাদশা সালামৎ দরাজ দিলে ঢালাই পাইকিরি হিসাবে মত্ত বিতরণ করতেন। তখনকার দিনে দিল্লীর বাদশারা বয়েলের গাড়ি চড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন। তার ড্রাইভারও সেই সর্বজনীন গণতান্ত্রিক পানোৎসবে অপাংক্লেয় হয়ে রইত না। রাস্তায় ভিড় জমে যেত। আমীর-ওমরাহ হঠাৎ এসে পড়লে পাঙ্কি ঘুরিয়ে নিতেন; পদাতিক ভদ্রজন এই বেলেপানার মাঝখানে পড়ে বিব্রত না হওয়ার জন্য গুস্তা মেরে ভাইনে বায়ের কোনো দোকানে আশ্রয় নিতেন।

মুসলমান শাস্ত্রে মত্তপান নিষিদ্ধ। অবশ্য দেশবাসী জানতো যে রাজা বাদশারা এ আইনটি এড়িয়ে যান, কিন্তু তাঁরাও চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোলাখুলিভাবে সচরাচর মত্তপান করতেন না। এ যুগে রাজা ফারুক প্রায় জাহান্দার শাহ'র মত আচরণ করে কাইরোর জনসাধারণের আঁকল গুডুম করে দেন। রোজার মাসে—আবার বলছি উপবাসের মাসে তিনি তাঁর নিত্যপরিবর্তিত দেমি-মঁদেন নিয়ে প্রশস্ত দিবালোকে এক 'বার' থেকে আরেক 'বারে' ঘুরে বেড়াতেন—মাতা এবং প্রাসাদের অস্থায়ী মুরুব্বীদের সর্ব সত্বপদেশ তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দিয়ে। এঁরই পরিত্যক্তা এক দেমি-মঁদেন প্রেয়সী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই 'মহাপুরুষটি' গুরুভোজন বা অত্যধিক পানের ফলে গতাস্থ হবেন। বহুবার ভক্ষণ করে রাজ্যচ্যুত অবস্থায় ইনি অধুনা রোম শহর থেকে সাধনোচিত ধামে গেছেন—ঝিনুরের ভিতরকার বস্ত্র মাত্রাধিক খাওয়ার ফলে।

তা বা-ই হোক, জাহান্দার শাহ একদিন ইত্যাকার রোঁদ মারতে মারতে বেএক্লেয়ার হয়ে যান—না হওয়াটাই ছিল ব্যত্যয়—এবং আধামাতাল গাড়োয়ান ছজুর ও লালকুনওয়ারকে কোনো গতিকে গাড়িতে তুলে পাশাপাশি গুইয়ে দিয়ে লালকেল্লা পানে গাড়ি ঢালায়। বয়েল দুটো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের। পথ চিনে সোজা কেল্লার ভিতরে প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লালকুনওয়ার টলতে টলতে প্রাসাদে ঢুকলেন। বয়েল দুটো চললো—আপন মনে বয়েলখানার দিকে, কারণ গাড়োয়ান সম্পূর্ণ বেহুঁশ।

ঘণ্টাখানেক পরে পড়ল খোঁজ খোঁজ রব। বাদশা কোথায়, বাদশা কোথায়? এ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। থবরটা যদি রটে যায় তবে বাদশার ঘে-

কোনো ভাই, চাচা, ভাতিজা নিজে কে রাজা বলে অবশ্যই ঘোষণা করবেন এবং তাহলেই তো চিস্তির। বিরাট লালকেল্লা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু হজুর যেন মহাশূন্যে অন্তর্ধান করেছেন।

তখন এক হুবুন্ধিমানের মাধ্যমে আলৌকিক অনুপ্রেরণা এল। এক মাইল দূরের বয়েলখানাতে অনুসন্ধান করে দেখা গেল, হজুর অঘোর নিদ্রায়, গাড়োয়ানও তদ্বৎ।

বলা বাহুল্য, পথচারী মণ্ডপায়ী মহলে হজুর অতিশয় জনপ্রিয় হলেও আমীর-ওমরাহ—মায় প্রধানমন্ত্রী, যদিও তিনি জানতেন; জাহান্দারশাহ তথৎ-হীন হলে তাঁরও নবীন রাজার হাতে জীবন সংশয়—সকলেই তাঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

ওদিকে দুই প্রধান আমীর সিদ্ধ দেশের সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী ব্যাক করছেন অল্প ঘোড়া—জাহান্দারশাহের ভ্রাতা আজীম উশ-শান-এর পুত্র হৃদর্শন, সুপুরুষ—বলা হয় তৈমুরের বংশে এরকম বলবান সুপুরুষ আর জন্মানি নি—ফররুখ সিয়্যারকে। তাঁরা দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়েছেন সিংহাসন অধিকার করতে। যুদ্ধে জাহান্দার পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। সিংহাসন হারিয়ে তিনি যত না শোক প্রকাশ করেছিলেন তার চেয়ে বেশী মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন, বার বার বেদনাতুর, মিনতিভরা আত্মকণ্ঠে চিৎকার করে, ‘আমার লালকুনওয়ারকে আমার কাছে আসতে দাও, দয়া করে লালকুনওয়ারকে আসতে দাও।’ সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব তখনই তাঁদের স্বরূপ দেখাতে আরম্ভ করেছেন—অর্থাৎ তাঁরা গ্যাডস্টোনের মত কিংমেকারস্, তাঁরা রাজা ম্যাকফেচচার করেন—লালকুনওয়ার অল্পমতি পেলেন জাহান্দার-এর বন্দীজীবনের সাথী হওয়ার।

অধম শুধু পটভূমিটি নির্মাণ করছে; নইলে জাহান্দার শাহ বা ফররুখ সিয়্যার কেউই আমার লক্ষ্য প্রাণী নন। তবু ফররুখ সিয়্যার সম্বন্ধে ষৎসামান্ত বলতে হয়। ইনি বুদ্ধি ধরতেন কম, এবং যে কূটনীতিতে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেইটে প্রয়োগ করতে চাইতেন দুই ঘুরফুর পকসিদ্ধ, অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈয়দ ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে। তাঁদের একজন প্রধানমন্ত্রীর ও অল্পজন প্রধান দেনাপতির পদ গ্রহণ করে বাদশাহ সালামৎকে প্রায় উপেক্ষা করে রাজত্ব চালনা করতে লাগলেন। নানাপ্রকার মেহেরবানী বণ্টন করে দুই ভাই শক্তিশালী আমীর-ওমরাহ গোষ্ঠী নির্মাণ করলেন এবং প্রত্যক্ষত সন্দেহ হইল না যে সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে বাই বরুন না কেন, শাহী কোঁজ তাঁদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করবে না। বেচারী বাদশাহ্ ক্রমেই ক্ষমতা হারাতে লাগলেন এবং শেষটায় চেষ্টা দিলেন, যেসব ভাগ্যাশ্বেষী অ্যাডভেনচারাররা ইরান তুরান থেকে দিল্লী আসত তাদের নিয়ে একটা দল সৃষ্টি করতে।

একদা এঁদের মধ্যে যারা সত্যাকার কৃতবিদ্য কিংবা রণবিশারদ তাঁরা দিল্লী দরবারে ও জনসাধারণের ভিত্তর সম্মান পেতেন। কিন্তু পাঁচশত বৎসর মোগল রাজত্ব চলার পর দিল্লীর খাসবাসিন্দা মুসলমান ও হিন্দুগণ একটা জোরদার ‘স্বদেশী’ পার্টি তৈরী করে ফেলেছিলেন। সৈয়দ ভাইরা ছিলেন এ দলের নেতা। (ভূত্যাগক্রমে এ যুগের ঐতিহাসিকরা এই ‘স্বদেশী’ দলের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন নি; আর ইংরেজ ঐতিহাসিক অবশ্যই চাইতো না যে এরই অহুসরণে নিত্য নবাগত ইংরেজ ভাগ্যাশ্বেষীদের বিরুদ্ধে ভারতে একটা ‘স্বদেশী’ পার্টি গড়ে উঠুক)।

নিরুপায় হয়ে ফররুখ সিয়্যার তাঁর স্বস্তর ঘোষণার রাজা অজিত সিংকে দিল্লীতে আসবার জন্ত সর্নির্বন্ধ অহুরোধ জানিয়ে দূত পাঠালেন। কারণ তখন তিনি সত্যই বুঝে গিয়েছিলেন যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে আর বেশী দিন বরদাস্ত করবেন না। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে অজ্ঞ ক্রীড়নক তথৎ-ই-তাউসে বসাবেন।

অজিত সিং দিল্লী পৌঁছনো মাত্রই সৈয়দরা তাকে সংবর্ধনা করতে অগ্রসর হলেন—বাদশা সালামৎ তখন কার্ঘত লালকেল্লায় বন্দী। তাঁরা ঐ ‘স্বদেশী’ বিদেশীর জিগিরটি উচ্চকণ্ঠে গাইলেন। অজিত সিংও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, সৈয়দদের সঙ্গে মোকাবেলা করার মত শক্তি তাঁর নেই। ফররুখ সিয়্যারকে সিংহাসনচ্যুত করা বাবদে তিনি সম্পূর্ণ সম্মতি স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছিলেন কি না বলা কঠিন।

সৈয়দদ্বয় ফররুখ সিয়্যারকে ধরে আনবার জন্ত অন্তরে সৈন্ত পাঠালেন। হারেমের রমণীরা উচ্চৈঃস্বরে কন্দন করে উঠলেন। তুকী রমণীদের সাহস যথেষ্ট, নুরজাহান জাহানারা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে তাবৎ ভারত শাসন করেছেন, কিন্তু এঁদের ভিত্তর কেউ সে রকম ছিলেন না, কিংবা হয়তো দস্তী ফররুখ সিয়্যার এঁদের মস্তপায় কর্ণপাত করেন নি। অবশ্য তাঁকে সবলে টেনে আনতে দূতদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ তাঁর শরীরে ছিল অসাধারণ বল।

, সৈয়দদ্বয়ের সামনে তাঁকে আনা হলে তাঁদের একজন আপন কলম-দান খুলে, চোখে সুরমা (কাজল) লাগাবার শলাকা ঘাতকের হাতে দিলেন। ফররুখ সিয়্যারকে সবলে চিৎ করে ফেলে অন্ধ করা হল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ঐ নিষ্ঠুর কর্ম যে করেছিল সে তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে নি—সে ভেবেছিল,

বলা তো যায় না, হয়তো একদিন তিনি আবার রাজা না হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী হবেন, তখন সে যত্নদণ্ড তো এড়াবেই, হয়তো বা বখশিশও পেতে পারে। ফররুখ সিয়ারকে নহবৎখানায় বন্দী করে রাখা হল। লালকেল্লার আজকের দিনের প্রধান প্রবেশপথ ও দেওয়ান-ই-আম-এর মাঝখানে এটা পড়ে।

ওদিকে কিন্তু দিল্লীর অগ্নি এক মহল্লায় এক ভিন্ন কমেডি শুরু হয়েছে।

সৈয়দদ্বয় অনেক চিন্তা ততোধিক তর্কবিতর্ক আলোচনা করে স্থির করেছেন যে, ফররুখ সিয়ারের খুড়ো রফী-উশ্-শানের (ইনি আজীম-উশ্-শানের পরের ভ্রাতা—আওরঙ্গজেবের দৌহিত্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ মুহম্মদ ইব্রাহীমকে সিংহাসনে বসানো হবে। সেই মর্মে দূত পাঠানো হয়েছে রফী-উশ্-শানের হাভেলিতে। সেখানে ইব্রাহীম তাঁর ভাই ও অগ্ন্যাগ্নি আত্মীয়স্বজন সহ বাস করেন।

দূতের দল উপস্থিত হওয়া মাত্রই হাভেলিতে উচ্চৈঃস্বরে বামাকঠের ক্রন্দন রোদন চিংকার অভিসম্পাত আরম্ভ হল।

কারণটা সরল। কয়েকদিন ধরেই দিল্লী শহর শত রকমের গুজবে ম-ম করছে। ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হলে হতেও পারেন—যদিও অনেকেই প্রাণপণ আশা করছিলেন, অজিত সিং যাই করুন, আপন জামাতাকে সিংহাসন-চ্যুতি থেকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই, নইলে তাঁর নিধন অবধারিত ও দিল্লীবাসীদের কাছে যে ব্যক্তি পুত্রকে হত্যা করে তার চেয়েও ঘৃণ্য—যে তার মেয়েকে বিধবা হতে দেয়। • (কিছুদিন পর ফররুখ সিয়ার নিহত হওয়ার পর অজিত সিং রাস্তায় বেরোলেই তাঁর সশস্ত্র পাইক-বরকন্দাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাস্তার ছোড়ার তাঁর পাক্কীর দুই পাশে ছুটতে ছুটতে তারস্বরে ঐক্যতান ধরতো, ‘দামাদকুশ, দামাদকুশ’—জামাতৃহস্তা, জামাতৃহস্তা! পুত্রকে হত্যা করে কেউ এভাবে লালিত হয়েছেন বলে আমার স্মরণে আসছে না।)

ফররুখ সিয়ার সিংহাসন হারালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের যে কার প্রতি ‘নেক্-নজর’—অবশ্য যে-ই রাজা হোন তাঁকে হতে হবে ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে পুস্তলিকা মাত্র—পড়বে তার কিছু স্থিরতা ছিল না। দূতরা তাই যখন হাভেলির সামনে এসে স্নসংবাদ দিলে, তারা এসেছে সমারোহ সহকারে নবীন রাজা মুহম্মদ ইব্রাহীমকে তাঁর অভিষেকের জ্ঞা নিয়ে যেতে, তখন সবাই নিঃসন্দেহে ভাবলে এটা একটা আশ্চর্য্য। আসলে আর কেউ বাদশা হয়ে দূত পাঠিয়েছেন ইব্রাহীমকে ছলে বলে পকড় করে নিয়ে গিয়ে হয় হত্যা করতে, নিদেন অঙ্ক করে দিতে—যাতে করে পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্পূর্ণ নিমূল হয়; এ রেওয়াজ তো রাস্তার ভিথিরি পর্যন্ত জানে, জানবে না শুধু রাজবাড়ির হারেমের মহিলারা! তওবা! তওবা!!

বিরিট বাড়ি। বিস্তর কুটুরি, চিলেকোঠা। তত্পরি এসব কারবার তো দিল্লী শহরে হামে হাল লেগেই আছে। তাই দু-চারটে গুপ্তঘর, পালিয়ে যাবার স্বড়কও যে নেই, এ-কথাই বা বলবে কে? হারেম-মহিলারা তড়িঘড়ি ইব্রাহীম ও তার ছোট ভাই রফী উদ্-দৌলাকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেললেন তার সন্ধান পেতে—আদৌ যদি পাওয়া যায়—লাগবে সময়। ওদিকে দূতদের পই পই করে বলা হয়েছে, তারা যাবে আর আসবে, ছরবার মত দ্রুতবেগে, এবং পথমধ্যে যেন তিলাধিকাল বিলম্ব না করে। কারণটি অতিশয় স্বপ্রকাশ। দিল্লী শহরের দুষ্-পোষা শিশু পর্যন্ত জানে, একবার যদি খবর রটে যায় এবং সেটা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়—যে ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হয়ে গিয়েছেন এবং সে সিংহাসন তখনো শূন্য তা হলে আওরঙ্গজেব-বংশের যে কোন রাজপুত্র দুঃসাহসে ভর করে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে দেবে। সৈয়দ-ভায়ারা বিলক্ষণ জানতেন যে, যদিও আমীর-ওমরাহ সোওয়ার-সেপাই তাঁদের পক্ষে, তবু এ তথ্যটি ভুললে বিলকুল চলবে না যে, ফররুখ সিয়ার ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় সম্রাট। তারপর আরেকটা কথা। আওরঙ্গজেবের এক বংশধর যদি অগ্র বংশধরকে খেদিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করেন, তবে জনসাধারণ হয়তো কোনো পক্ষই নেবে না। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব তো কোনো রাজাদেশে, সিংহাসনে হকধারী কোনো রাজপুত্রের হুকুমে বাদশাহ ফররুখ সিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করেন নি! তাঁরা কে? আসলে সিদ্ধ প্রদেশের চুই ভাগ্য্যাঘেয়ী। একজন ফররুখ সিয়াদের প্রধানমন্ত্রী, অগ্রজন প্রধান সেনাপতি। অর্থাৎ তাঁর কর্মচারী এবং তাঁরই হুননেমক খেয়েছেন অন্তত ছ'টি বছর ধরে। তাই মনিবকে সিংহাসনচ্যুত করে এঁরা যে অপকর্মটি করলেন এটা নেমকহারামীর চূড়ান্ত! দিল্লীর জনসাধারণ উজবুক নয়। তারা যদি ক্ষেপে যায় তবে সৈন্ত-সামন্ত নিয়েও দিল্লীকে ঠাণ্ডা করা রীতিমত মুশকিল হবে।

অতএব সৈয়দদের সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রয়োজন, তড়িঘড়ি আওরঙ্গজেবের কোন সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফরমান নিয়ে আইনত এবং ঐতিহ্যগত পন্থায় দিল্লীর রাজভক্ত প্রজাগণকে মোকাবেলা করা।

কিন্তু দূতরা গুপ্তঘরের সন্ধান পাবে কি করে? বাচ্ছাটাকে কেড়ে নিতে চাইলে বেরালটা পর্যন্ত মারমুখো হয়ে ওঠে। এরা আবার তুর্কী রমণী—যুগ যুগ ধরে ইয়া তাগড়া তাগড়া মর্দকে কড়ে আঙ্গুলের চতুর্দিকে ঘুরিয়েছে।

অবশ্যই পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, ফররুখ সিয়াকে হারেমের ভিতর থেকে ধরে আনা গেল, আর এখন এই চ্যাংড়াটাকে কাবু করা যাচ্ছে না?

ব্যাপারটা সরল। ফররুখ সিয়াদের হারেমের তুর্কী রমণীরা যে বাদশার সঙ্গে

সঙ্গে সর্ব সম্মান হারিয়ে বসেছেন। এরা বাধা দিলে সেপাইরা তাদের উপর প্রয়োগ করবে পত্তবল। এরা জানে দুদিন বাড়েই এইসব নিশ্চয়, হতজ্যোতি, লুপ্তসম্মান স্বন্দরীদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে 'সোহাগপুরা'তে। আল্লা জানেন, কোন্ কাষ্ঠরসিক এই পরিত্যক্তা রমণীদের দীনদরিদ্র নির্লজ্জভাবে অবহেলিত শেষ আশ্রয়স্থলকে 'সোহাগপুরা' নাম দিয়েছিল। এরা সেখানে পাবেন সেক' গ্রাসাচ্ছাদন। তার বীভৎস বর্ণনা থেকে আমি পাঠককে নিকৃতি দিলুম।...কিন্তু যে ইব্রাহীম এখন রাজা হতে চললেন তাঁর মুকুব্বীদের তো ভিন্ন শিরঃপীড়া!

তাই নূতন রাজাকে আনতে গিয়ে দূতদের প্রাণ যায়-যায়। মরায়ী হয়ে তাঁর মা, মাসী, জ্যোঠি, খুড়ি এক কথায় তাবৎ রমণীরা আরম্ভ করেছেন দূতের গুষ্ঠীকে বেধড়ক ঠ্যাঙাতে। ছেঁড়া জুতো, খোঁচা খোঁচা খ্যাংরা-খররা, হেন বস্ত্র নেই যা দিয়ে তাঁরা ওদের পেটাতে কস্বর করছেন। বেচারীরা খাচ্ছে বেদরদ মার, হু'হাত দিয়ে যতখানি পারে সে মার ঠেকাবার চেষ্টা করছে। একখানা কাঠির বাঁটার সপাং করে মুখের উপর মার—সেটা কোন্ জঙ্গীলাটের কোন্ অস্ত্রের চেয়ে কম! বেচারীরা এঁদের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, ঠেলাটি পর্যন্ত দিতে পারে না। কালই তো এঁরা লালকেল্লার প্রাসাদে গিয়ে আবাস নেবেন। তখন বেচারীদের হালটা হবে কি? খুদ বাদশা সালামতের পিসিকে মেরেছিল ধাক্কা, খুড়িকে মেরেছিলে কহুই দিয়ে গুলতা—বেয়াদবী বেতমিজী তবে আর কাকে বলে! বন্দ'করো ব্যাটাদের পিঞ্জরা মে', ঝুলিয়ে রাখো বদমাইশদের লাহোরী দরওয়াজার উপর! সৈয়দ-ভায়ারা কি তখন আর তাদের স্মরণে আনবেন!

এই একতরফা জেনানা আক্রমণ, তথা গৃহনির্মিত সাতিশয় মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের দফে দফে বয়ান প্রত্যেক ঐতিহাসিক দিয়েছেন বড়ই প্রেমসে। এই মারপিটের বর্ণনাতে পৌঁছে এ যুগের ঐতিহাসিকরা ভাবেন, তাঁরা যেন বেহেশতে পৌঁছে গেছেন—নড়বার নামটি পর্যন্ত করেন না।

আর আর্ত চিৎকার উঠছে সম্মার্জনী-লাঙ্ঘিত হতভাগ্যদের—'দোহাই আল্লাব, কসম আল্লাব, পয়গম্বর সাক্ষী, আমরা কোনো কুমৎলব নিয়ে আসি নি। আমরা এসেছি হুজুরকে তাঁর শায়া তখতের উপর বসাতে।' কিন্তু অরণ্যে রোদন আর জনারণ্যে রোদনে ফারাক থাকলে জনসমাবেশকে 'অরণ্য' নাম দেওয়া হল কেন?

ওদিকে দুই 'কিং-মেকার্স' বা রাজা নির্মাণের রাজমিস্ত্রি মহা প্রতাপাশ্রিত শ্রীবৃত্ত সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী লালকেল্লার দিওয়ান-ই-আম-এক

ভিতর বসে আছেন যেন কাঠ-কয়লার আগুনে আঁধার উপর। দূতের পর দূত পাঠিয়ে যাচ্ছেন রফী-উল্-শানের হাভেলীতে, কিন্তু সে যেন সিংহের গুহাতে মাহুষ পাঠানো। কেউই আর ফিরে আসে না। যে যায়, সে-ই কাঁটা-পেটার দ'য়ে লীন হয়ে যায়, কিংবা রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে চিংকার করে 'অগুরুচন্দন-ঠারের ভাষায়' বোঝাতে চেষ্টা করে যে, প্রতিটি মুহূর্ত জীবন-মরণ সমস্তা সঙ্কটময় করে তুলছে। ভিতরে একপাল লোক ছুটেছে গুপ্তঘরের সন্ধানে, তাদের পিছনে ছুটেছে জেনানা-রেজিমেণ্ট পেটিকোট-পল্টন আসমান-ফাটানো চিল্লি-চিংকার করতে করতে। সর্বপ্রকারের সংগ্রামানভিজ্ঞ আপনাদের সেবক, এই দীন লেখক, তাঁদের হাতে যে সব মারপাশ আছে, তাঁদের রণকৌশল, বাহুনির্মাণাদির আর কী বর্ণনা দেবে? বাবুচিখানার খুস্তি সাঁড়ানী থেকে আরম্ভ করে সেই মোগল যুগে কত কি থাকতো তার বর্ণনা দেব নিরীহ বাঙালী, আমি! মাশাল্লা।

চতুর্দিকে, আকাশে-বাতাসে সেই অভূতপূর্ব উত্তেজনা, দ্রুতগতিতে ধাবমান বহুবিধ নরনারী, চিংকার আর্তরব, আল্লার শপথ, রসুলের নামোচ্চারণ, হজরৎ আলীর অলুকাপ্পার জন্তু করণ ফরিয়াদ, মহরমের দিনের ইমাম হাসন-হুসেনের ঝাণ্ডা নিয়ে কাড়াকাড়ি হেন, এমন সময়—

এমন সময় অতি ধীরে ধীরে একটি বালক—বালকই বটে, কারণ সে অজাতশূত্র অজাতগুপ্ত—ঐ যে হোথা মুদির দোকান দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই হাভেলির সামনে এসে একবার মাত্র সেই হলশুল কাণ্ডের দিকে একটা শাস্ত দৃষ্টি ফেলে বাড়িতে ঢুকলো। তার পরনে হুনময়লা সূতির পাজামা, তার উপর একটা অতি সাধারণ কুর্তা। মাথায় টুপিটি পর্যন্ত নেই, পায়ে চটি আছে কি না ঠিক ঠাহর হল না। সে কুর্তার সামনের দিকটার (পূর্বোল্লিখিত 'দামন' বা অঞ্চল) দুই খুঁট দুই হাত দিয়ে এগিয়ে ধরে তাতে সামলে রেখেছে পায়রাকে খাওয়ার দানা। স্পষ্ট বোঝা গেল, এইমাত্র পাড়ার মুদির দোকান থেকে সে বেসাতিটা কিনে এনেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তার বুকেতে বিলম্ব হল না যে, হট্টগোলের উৎপাতে পায়রাগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন তার খেয়াল গেল চতুর্দিকের ছোটোছোটো আর চেলাচেল্লির দিকে। সে কিন্তু নির্বিকার। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক ঘোরাক্ষেপ করতে লাগলো—বাড়িটা যেন চাঁদনি চৌক।

এবারে বাইরে শোনা গেল এক পদস্থ অস্বারোহীর কটুবাক্য আর তীব্র চিংকার—ইনি অস্ততপক্ষে ফৌজদারই হবেন। 'ওরে সব না-মর্দ, বেগুতুফ, বেকার নাকসার হল। এই এখুনি বেরিয়ে আয়, কাম খতম্ করে। নইলে হজরৎ আলীর ঝাণ্ডার কলম খেয়ে বলছি, তোদের কিয়ামতের শেষ-বিচারের

দিন এই লহমাতোই হাজির হবে। আল্লার গজব, আল্লার লানৎ তোদের উপর, তোদের বাল্-বাচ্চার উপর।’

এই ছঁশিয়ারী, এই দিব্যিদিলাশ যেন তিলিস্মাৎ-ভাহুমতীর কাজ করলো।

দূতদের দুজনার দৃষ্টি হঠাৎ গেল সেই দামনে-দানা-ভরা বালকটির দিকে। লাফ দিয়ে পড়লো সেই দুই নরদানব তার উপর। এক ঝটকায় তাকে কাঁধে ফেলে দে-ছুট দে-ছুট দেউড়ির দিকে, দেউড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে আল্লার মালুম কোন দিকে! কি যে ঘটলো কিছুই বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো বামাকুলের আর্তনাদ—‘ইয়াল্লা, এরা যে রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে গেল রে। ধরো, পাকড়ো ওদের। পাকড়ো, পাকড়ো, জানে নু পায়, যেতে না পায় যেন! ইয়া রহ্‌মান, ইয়া রহীম!’

কিন্তু কে ধরে তখন কাকে?

হারেমের মেয়েরা ভাবতেই পারেননি যে রফী-উশ্-শানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নাবালক বাচ্চা রফী-উদ্-দরজাৎকে ধরে এরা চম্পট দেবে। যতক্ষণ এরা জেনানা জঙ্গীলাট হয়ে সার্বভৌম মহম্মদ ইব্রাহীম আর মধ্যম রফী উদ্-দৌলাকে পঞ্চত্ব, কন্সেকন্স অঙ্কত্ব থেকে রক্ষা করছিলেন, ততক্ষণে, যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনো ভয়-ভীতি ছিল না, সেই সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে ‘দুশমন’ উধাও হয়ে গিয়েছে।

আজব সেই লড়াই তাজ্জবভাবে ফোরন্স থেমে গেল। দোস্ত দুশমন কোনো পক্ষের কেউ মারা গেল না, হার মানলো না, সন্ধি করলো না, ধরা দিল না— আচানক্ সবকুচ্ছ বিলকুল ঠাণ্ডা!

সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব দিওয়ান-ই-আম্ থেকে নহবৎখানা পর্যন্ত পাইচারির বদলে ছোটোছুটি আরম্ভ করেছেন। এঁরা বিস্তর লড়াই লড়েছেন, জীবন এঁদের বহুবীর বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারে তাঁরা যে রকম যেমে নেয়ে কাঁই হয়ে গেলেন এরকমটা আর কখনো হন নি। ক্রোধে, জিঘাংসায় তাঁরা শুধু একে অণ্ডকে বলছেন, যে-কটা না-মর্দকে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের জ্যাস্ত শরীর থেকে চামড়া তোলবার হুকুম দেবেন, নয় ফোঁটা ফোঁটা গরম তেল তাদের ব্রহ্মতালুতে ঢেলে ঢেলে নিধন করবেন।

এমন সময় সেই দুই পাহলোয়ান এসে উপস্থিত শাহজাদা রফী উদ্-দরজাৎকে সঙ্গে নিয়ে।

শাহজাদা হোক আর ককীরজাদাই হোক, সে কিন্তু পুঁটুলি পাকিয়ে ছু হাত দিয়ে-জোরে পাকড়ে আছে পায়রার দানা-ভর্তি তার কৌচড়। এসব বাদশা-

উজীরের ব্যাপার দিল্লী শহরে এখন আছে তো তখন নেই—কিন্তু পায়রার দানা কটি পায়রার দানা, শাহজাদা মিয়া রফীর কাছে এটা ভয়ঙ্কর সত্য।

ইতিমধ্যে সৈয়দ ভায়ারা হুকার দিয়ে উঠেছেন, ‘কম্বখৎ, না-দান—এ কাকে ধরে এনেছো তোমরা? বাদশা হবেন বড় ভাই, ধরে আনলে ছোটটাকে। তোমাদের জ্যাস্ত না পুঁতলে—’

সৈয়দদ্বয় তখন নাগরিক, ফৌজদার এমন কি তৈমুরের বংশধর, বাবুর-হুমায়ূনের পুত্র-পৌত্র বাদশাহ-সালামতদের ও জান-মালের মালিক। এ সব কথা দূত দুটি ভালো করেই জানে। কিন্তু আজকের ঝাঁটার মার তাদের করে দিয়েছে বেপরোয়া। চরম বিরক্তি আর তচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ‘যা পেয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হন। আর আমাদের মারুন আর কাটুন, যা খুশী করুন।’

দুই ভাই তাড়াতাড়িতে ব্যাপারটা জানতে পেরে বুঝলেন, এখন আবার নতুন করে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে বড় দুই ভাইয়ের একজনকে—তঁারা ইব্রাহীমের চেয়ে রফী উদ্-দৌলাকেই পছন্দ করেছিলেন বেশী—ধরে আনাতে সময় লেগে যাবে বিস্তর। আজকের ভাষায় ততক্ষণ টাইম-বম্ কেটে যাবে!

একে দিয়েই তা হলে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। গতাস্তর কি?

আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি? ইব্রাহীমই হোক আর রফী উদ্-দৌলাই হোক, যেই হোক, তাকে তো হতে হবে ওঁদের হাতেরই পুতুল। সে পুতুল তার মায়ের গর্ভ-ফ্যাক্টরি থেকে পয়লা চালানো বেরিয়েছে, না তেমনি কিস্তিতে তাতে কীই বা যায় আসে? ফরানী সম্রাটের চেয়েও সরল কণ্ঠে তখন তাঁরা বলতে পারতেন, ‘লে’ তা সে হু’—‘ভারতবর্ষ? সে তো আমরা হু’ভাই!’ বাদশা? যে কোনো গড্-ড্যাম আগুয়েজ্জিব-বংশের গর্তশ্রাব—!

নবীন রাজার অভিষেকের জন্ত দুই ভ্রাতা তাঁর হৃদিকে চলেছেন রাজার দুই বাহু ধরে। আল্লা জানেন, কার আদেশে তাঁর দুই বন্ধুমুঠি শিথিল করার ফলে এই এখন পায়রার দানা ঝরঝর করে দিওয়ান-ই-আমের পাথরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।

চতুর্দিকে সৈয়দদের মিজ ও পরামর্শদাতা আমীর-ওমরাহ তাঁদের মহামূল্যবান কিংখাবের পাগড়ী, শুভ্র মলমলের আঁকারাখা, তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে নীচের সাক্ষা জবির বোনা সদরীয়ার সোনালী আভা, কোমরে কান্দীরের সর্বশ্রেষ্ঠ শাল দিয়ে তৈরী কোমরবন্ধ, তার বাঁ দিকে গোঁজা জাঁতির মত জাম্বুর অঙ্গ, ডাইনে ঝুলছে দিমিশ্কেব তলোয়ার—থাপের উপর মুষ্টিতে বিচিত্র মণিমানিক্যের জড়োয়া কাজ, পরনে সাটিনের পাঞ্জামা, পায়ে জবির কাজ করা শুভ-তোলা

সিলিমশাহী। উফৌষে মুক্তোর সিরপেচ, বৃকে মোতির হার, হাতে হীরের আংটি।

এদের ভিতর দিয়ে চলেছেন বাদশাহজাদা। পরনে হুনময়লা পাজামা, গায় মামুলী কুর্তা। বাস্। পাঁচ লহমা পরে যিনি হবেন দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা! এ যে জগদীখরের কোঁতুকবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন।

সৈয়দদের একজন শাহজাদার মাথায় বসিয়ে দিলেন তাঁর আপন পাগড়ী—মস্তকাভরণহীন অভিষেক কল্লনাভীত। সেই বিরাট সাইজের পাগড়ী শাহজাদার কান দুটো গিলে ফেলল। অল্প ভ্রাতা তাঁর মুক্তোর সাতলখা হার পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। ময়লা কুর্তার উপর সে মালা দেখালো ঘোলা জলের উপর রাজহংস!

এবং রফী উদ্-দরজাৎ এই বেশেই বসলেন—যা-তা সিংহাসনের উপর নয়—আসল ময়ুর সিংহাসনের উপর। এও আরেক রঙ্গ। কারণ সচরাচর মোগল বাদশারা বসতেন আটপৌরে সিংহাসনের উপর। ফররুখ সিয়াবের অভিষেকের বাৎসরিক পরব না অল্প কোনো উপলক্ষে তোবাখানা থেকে আগের দিন ময়ুর-সিংহাসন আনানো হয়েছিল; সেটা তখনো তোবাখানায় ফেরত পাঠানো হয় নি বলে যেন কনট্রাস্টটা চরমে পৌঁছনোর জন্য পাজামা-কুর্তা পরে শ্রীযুত রফী বসলেন তারই উপর!

এর পরের ইতিহাস আরো চমকপ্রদ, আরো অচিস্তনীয়। কিন্তু তার ভিতর খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে যাবেন, কিন্তু এরকম কোঁতুকজনক বড়-কিছু একটা পাবেন না। আমি একেবারে কিছু পাই নি। শুধু খুন আর লড়াই। নৃশংস আর বীভৎস। আমি তাই বাকিটা সংক্ষেপেই বলি—নিতান্ত খারাপ ছোট গল্প পড়ার পরও শুধোন, 'তারপর কি হল?' তাঁদের জন্য।

সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব শব্দর শেষ রাখতে নেই বলে ফাঁসুড়ে পাঠিয়ে ফররুখ সিয়াবকে খুন করালেন। এক বছরের ভিতরই ধরা পড়লো রফী উদ্-দরজাতের মামা। সে বছর যেতে না যেতেই তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর বড় ভাই রফী উদ্-দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনিও ঐ বৎসরই মারা গেলেন। তারপর বাদশা হলেন মুহম্মদ শাহ বাদশাহ। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ ভ্রাতাদের দুর্দিন ঘনিয়ে এল। একজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন, অন্যজন বন্দী অবস্থায় বিষপ্রয়োগবশতঃ।

বস্তুত এ যুগের ইতিহাস পড়লে বার বার স্মরণে আসে :

রাজত্ব-বধূরে যে-ই করে আলিঙ্গন

তীক্ষ্ণধার অসি পরে সে দেয় চুষন।

এই গত শারদীয়া বেতার জগতে 'কোষ্ঠীবিচার' নামক একটি কথিকা এ-অর্থম নিবেদন করে। বিবরণটি ছিল সত্য ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত। তৎসম্বন্ধেও আমার এক দোস্ত সেটি পড়ে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হন। আমি সবিনয় বললুম, 'ব্রাদার, এটা বরহক্ জলজ্যান্ত ঘটেছিল; আমাকে দুঃখো কেন?' তিনি বললেন, 'তুমি সেটি রসস্বরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছ; সেক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যের কোনো অভ্যুহাত নেই।' একদম খাঁটি কথা। তাই এবারে কিন্তু যেটি নিবেদন করবো সেটি পড়ে তিনি প্রসন্ন হবেন, এমনত আশা করি, আর আপনারা পাঁচজন তো আছেনই। এই সুবাদে আরেকটি সামান্য বক্তব্য আমার আছে। হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী কাউকেই আমি বেদনা দিতে চাই নে। দিলে সেটা অজ্ঞানিত এবং তার জগ্রে এইবেলাই বে-কৈ ফিয়ৎ মাক্ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার বক্তব্য দৃষ্টবুদ্ধিজনিত ভ্রমাত্মক সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সেটি সংহরণ করতে আমি অক্ষম—এটা গুরুত্ব আদেশ।

এদানির কিছু লোক আবার আমার কাছ থেকে প্রাচীন দিনের শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে ভালোমন্দ শুনতে চান। আমি তাঁদের লুকায়িত বক্তব্যটিও বিলক্ষণ মালুম করতে পেরেছি; সেটি এই, 'যা বুড়োচ্ছ, দুদিন বাদেই ভীমরতি ধরবে এবং তখন হয়ে দাঁড়াবে একটি চৌকশ "লিটারারি বোর"; যতবধি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তোমার আপন কথা ধানাই-পানাই না করে আশ্রমের কথা কও, গুরুদের কথা কও ইত্যাদি।'।

তাই সই। দেশকাল ঠিক ঠিক রাখবো। পাত্র ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করবেন।

১৯২০।২১ সনে রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে কলেজ কোর্স খোলেন। ঐ সময় গান্ধীজী সরকারী ইন্স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের গোলামী-তালিম বর্জন করতে আহ্বান জানান। ফলে ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে যে সব মেধাবী ছিল, গান্ধীজীর বাণী গ্রহণ করলো তারা, জমায়েৎ হল শাস্তিনিকেতনে। আর এলেন কয়েকটি থাজা মাল, যারা বছরের পর বছর পোঁনঃপুনিক দশমিকের পাইকিরি হিসেবে বেধড়ক ফেল মেরে যাচ্ছিলেন। অবশ্য এদের একজন বলেছিল, 'এলন্ এ্যানসার বুক লিখেছিলুম, স্তর, যে এগজামিনার বললে "এনকোর"। তাইতে ফের একই পরীক্ষা দিতে হল।'। এঁদের মধ্যে আমার মত গুণাগ্রকৃতির দু-চারটি কাবেল সন্তান ছিলেন।

ইতিমধ্যে এলেন বিশ্বনাথ তিরুমল রাও অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে ।
এঁকে নিয়ে যখন দু'দলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তখন ধরা পড়লো ইনি বরের
পিসি, কনের মাসি । অর্থাৎ ইনি যেমন অনেকটা ইজ্ঞনাথের মত অন্ধকার স্বাস্থ্য
স্ট্রাডিস্ট ক্লাস-টীচারের মাথায় হঠাৎ কঞ্চল ফেলে তাকে কয়েক বা বসিয়ে বাড়ি
থেকে হাওয়া হয়ে এখানে চলে আসেন, ঠিক তেমনি কলাভবনে প্রবেশ করার
পর দেখা গেল, তিনি একই হাতে পাঁচটা তুলি নাচাতে পারেন—যাহুকরণ
যেমন পাঁচটা বল নাচায় । স্কেচে ওস্তাদ, ফিনিশে তালেবর ।

তত্পরি আরেকটি অতিশয় আশ্রমপ্রিয় সদৃশ তীর ছিল, যার প্রসাদাৎ
তিনি সর্বত্রই কলকে পেতেন । উচ্চতায় যতপি পাঁচ ফুট দুই, কিন্তু পেশীগুলো
যেন মানওয়ারি জাহাজের দড়া দিয়ে তৈরী, এবং ফুটবলে চৌকশ । বীরভূমের
কাঁকরময় গ্রাউণ্ডে ভজন খানেক আছাড় খেয়ে সর্বাস্থে রক্তলাহন আকার পরও
তিনি বুলেটবেগে ছুট লাগাতে কহুর করতেন না এবং হাসিমুখে । বিচক্ষণ জন
সে হাসিতে নষ্টামির গোপন চিহ্ন দেখতে পেত ।

আমাদের দোস্তি প্রথম দিন থেকেই । নাম যখন শুধালুম সেটা দ্রুতগতিতে
দায় সারার মত বলে নিয়ে জানালে, ‘ওটা তোলা নাম । আমার ডাকনাম
চিন্নি । তোমার ?’

‘নীতু ।’

পরবর্তী যুগে চিন্নি, ওরফে মিঃ রাও, স্বর্গত শ্রামাপ্রসাদের সঙ্গে দিল্লীতে কাজ
করে । তার ভুলে ভতি অনর্গল বাঙলা কথার তুবড়িবাঁজি রাশভারি
শ্রামাপ্রসাদের মুখেও কৌতুকহাস্য এনে দিত এবং বিশেষ করে ঐ কারণেই তিনি
চিন্নিকে মাত্রাধিক স্নেহ করতেন । চিন্নি উত্তম ইংরিজি বলতে পারত, কিন্তু তার
বক্তব্য, দিল্লীর মঞ্জপালয়ই হোক আর ভুবনভাঙার কুরকুরে চায়ের দোকানই
হোক, সে তার শান্তিনিকেতনে শেখা বাঙলা ছাড়বে কেন ? স্বয়ং গুরুদেবের
সঙ্গে সে বাঙলায় কথা কহিত নির্ভয়ে—চারটিখানি কথা নয়, এবং শ্রামাপ্রসাদ
এই তত্বটি আবিষ্কার করে, চিন্নির ভজন ভজন ভুল-ভতি বাঙলা সম্বন্ধে বলতেন,
‘রাও কিন্তু তার বাঙলা প্রতিদিন ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে ।’ অর্থাৎ ভুল বাড়ছে !

শ্রামাপ্রসাদ মন্নিং রিজাইন দিলে পর চিন্নিও তার জুতো থেকে দিল্লীর ধূলা
ঝেড়ে ফেলে মাত্রাজ চলে যায় । সেখান থেকে ইউনেস্কোর আহ্বানে তাইল্যান্ড,
কলম্বো, জিনীভা, ওয়াশিংটন, বাগদাদে কীর্তিভ্রমণ বিস্তার করে ।

সে যে দড়মালে তৈরী সেটা আশ্রমে তার আঠারো বছর বয়সেই ধরা পড়ে ।
সেখানে ইঙ্কলের ছেলেরা ছুবেলা উপাসনা করে ; প্রস্তাব হল আমাদেরও করত

হবে। চিল্লি উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল সে নাস্তিক। ফৈসালা কদার জন্তু আমাদের মীটিং বললো। প্রিন্সিপাল মেসেজ পাঠালেন, তিনি চান, আমরা যেন উপাসনা করি। চিল্লি বললে, 'ইস্কুলের ছেলেদের বাপ-মা উপাসনার কথা জেনেভেনেই বাচ্চাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের অধিকাংশই এসেছি তাঁদের অমতে (এ কথাটা খুবই খাঁটি; আমাদের গার্জেনদের অধিকাংশই ছিলেন সরকারী চাকুরে; তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে সায় দেন কি প্রকারে? আমার পিতাকে তো ইংরেজ রীতিমত ভয় দেখায়)। আমরা সাবালক; আমি নাস্তিক।' চিল্লি পার্লামেন্টেরেনও বটে—তার দোস্ত মসৌজীকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, 'তুমি তো ক্রীশ্চান; তোমার সর্ব প্রার্থনা পাঠাতে হয় প্রভু যীশুর মাধ্যমে। আশ্রমের উপাসনায় যোগ দেবে কি করে?' আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই তো মিয়া ভাই (মুসলমান)! পাঁচবেকং নেমাজ করিস' (করবো বলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছিলুম)। সভাপতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'গুর ঘাড়ে আরো দুটো চাপানো কি ধর্মসম্মত?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। রেভারেণ্ড এ্যানড্রুজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সভাকে রাজী করাতে। পাত্রীসাহেবের ষাবতীয় স্কিল, তত্পরি তাঁর সরল আন্তরিকতা, তিনি সবকিছু প্রয়োগ করে খুব সুন্দর বক্তৃতা দেন। কিন্তু ভোটে চিল্লিপন্থীরা কয়েকটি ভোটে জিতে গেল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হ'ল, গুরুদেব বা আদেশ দেবেন তাই হবে। এ্যানড্রুজ সাহেবকেই আমরা দূত করে পাঠালুম।

গুরুদেব মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করেন—'না'।

এই গেল চিল্লির পরিচয়।

ইতিমধ্যে আরেকটি ছেলে এল অঙ্ক থেকে। মাধব রাও। সেও চমৎকার ফুটবল খেলে।

*

*

*

রাজ রাজমহেন্দ্রবরাম নগর—অর্থাৎ রাজমন্ডীর শ্রীযুত জগন্নাথ রাও চিল্লির বন্ধু। তিনি চিল্লিদের বাড়ির ছেলের মত। শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ব্রাহ্মছাত্র অন্ধদেশের শ্রীযুত চালামায়া গুরুদেবের প্রচুর কবিতা গল্প উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনা অনবদ্য তেলুগুতে অতীবাদ করেন। জগন্নাথ রাও সেগুলো পড়ে আকণ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। চিল্লির আশ্রমাগমনের ফলে তাঁর আশ্রমদর্শনের সদিচ্ছা প্রবলতর হল। চিল্লিকে আকস্মিক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তাকে কোনো প্রকারের নোটিশ না দিয়ে শুধু চিল্লির পিতামাতাকে জানিয়ে এক শুভপ্রাতে রওনা দিলেন কলকাতা অভিমুখে।

কলকাতায় উঠলেন বড়বাজার অঞ্চলে এক অন্ধ মেসে। সেখানে শুধোলেন, শান্তিনিকেতন কি প্রকারে যেতে হয়? কেউ কিছু জানে না বলে টাইমটেবল যোগাড় করা হল—সেখানেও শান্তিনিকেতনের সন্ধান নেই। তখন একজন বললে, কাছেই তো পোয়েটের বাড়ি; সেখানে গেলেই জানা যাবে। শ্রীযুত জগন্নাথ রাও তাই করলেন। সেখানে দেখেন ‘বিশ্বভারতী পাবলিকেশন্স’ দফতর খোলা বটে, কিন্তু লোকজন কেউ নেই। শেষটায় একটি ছোকরা কেরানীকে আবিষ্কার করা হলে সে বললে, হাওড়া থেকে যেতে হয়, সে কখনো ওখানে যায় নি। ঝাঁরা যাওয়া-আসা করেন, তাঁরা সবাই গেছেন ঝাশানে। শান্তিনিকেতনের কে এক মিস্টার রাও সেই ভোরে হাসপাতালে মারা গেছেন।

জগন্নাথ রাও ত্রিভুবন অঙ্ককার দেখলেন। সম্মিতে ফিরে আর্ডকর্থে শুধোলেন, ‘কে?’ ছোকরাটি বললে, বড়ই দুঃখের বিষয়। মিস্টার রাও আশ্রমের হয়ে ফুটবল খেলতে যান শিউড়িতে। সেখানে খেলাতে জোর চোট লাগার ফলে তাঁর হানিয়া স্ট্রেন্জুলেটেড্ হয়ে যায়। এ্যান্ড্রুজু সাহেব এখানকার হাসপাতালকে জরুরী চিঠি লিখে লোকজন সহ তাঁকে পাঠান কাল রাজে। সবই করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

জগন্নাথ রাও টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। চিল্লি ওয়াল্টেয়ারে আরেকবার এই রকম খেলার মাঠে বেহুঁশ হয়।

রাস্তা থেকে আবার ফিরে গেলেন ছোকরাটির কাছে। শুধোলেন, ‘তার বাড়িতে তার পাঠানো হয়েছে?’ ছোকরাটি বললে সে জানে না।

জগন্নাথ রাও মেসে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। দেশবাসীর পরামর্শ করে তাঁর কথামত চিল্লির বাড়িতে তার পাঠালেন দুঃসংবাদটা জানিয়ে।

জগন্নাথ রাওয়ের কোনোই ইচ্ছা আর রইল না শান্তিনিকেতন যাবার, কিন্তু তিনি পরিবারের বন্ধু—এখন এত দূর কলকাতা অবধি এসে যদি সবিস্তার খবর নেবার জন্ত সেখানে না যান তবে সবাই দুঃখিত হবেন।

নিতান্ত কর্তব্যের পীড়নে জগন্নাথ রাও হাওড়া গিয়ে, বোলপুরের ট্রেন ধরলেন।

বিকেলের দিকে যখন আশ্রমে পৌঁছলেন তখন গেস্ট হাউসে হিতলাল (বর্তমান কালোর দোকানের কালোর পিতা) ভিন্ন কেউ ছিল না—হিতলাল ইংরিজি জানে না। জগন্নাথ বিছানাপত্র সেখানে রেখে বেরুলেন কলাভবনের সন্ধানে। চিল্লি তাঁকে কলাভবনের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখত।

সে কলাভবন বাড়ি আর নেই। তবে তার ভিতটা এখনো দেখতে পাওয়া

যায়, গুরুদেবের 'দেহলী' বাড়ির কাছে, বোলপুর যাবার রাস্তার পাশে।

কলাভবন সে সময়টায় নির্জন থাকে। নিচের তলায় কাউকে না পেয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ল্যাণ্ডিং পৌঁছে সেখান থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন,—

আমি যাচ্ছিলুম বোলপুর—নশি কিনতে; হঠাৎ শুনি, সেই অবেলায় কলাভবনে শোরগোল, স্পষ্ট চিনতে পেলুম আর্টিস্ট রমেন চক্রবর্তীর গম্ভীর গলা। কিন্তু আর্ট কণ্ঠে...তুমি যাও, শিগগীর যাও, জল নিয়ে এস। আমি ততক্ষণে দেখছি,—

তিন লম্ফে সেখানে পৌঁছে দেখি, চিল্লি 'দেহলী' বাড়ির দিকে কালবোশেখী বেগে ছুটেছে। আমি সেদিকে খেয়াল না করে সিঁড়ি বেয়ে মাঝখানে উঠে দেখি কে একজন লোক দু'পা ইয়া ফাঁক আর দু'হাত ওয়া লম্বা করে ধূলি-শয়নে চিং হয়ে পড়ে আছে। জোয়ারের সমুদ্র বেলাতটকে মড়া ফিরিয়ে দিলে সে ঘেরকম শুয়ে থাকে। চোঁট ছোটো তার কাঁপছে, আর বিড় বিড় করে বলছে, 'চিল্লি, চিল্লি!' চক্রবর্তী বললেন, সে আবার কি? তিনি বিখনাথ রাণ্ডয়ের ডাকনাম জানতেন না। আমি বুঝিয়ে বললুম। চক্রবর্তী বললেন, দেখো তো, সৈয়দ, ডাক্তার এসেছে কি না, বিকেলে তো মাঝে-মাঝে আসে। আমি বললুম, দেখি, মনে তো হচ্ছে ভিরমি কেটে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি, ওদের কেউই আর সেখানে নেই।

চিল্লি ভালো অভিনয় করতে জানে। রাত্রে তার ঘরে সে দেখালে জগন্নাথ রাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাকে দেখে—সে আর চক্রবর্তী তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন—থমকে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন। দু'হাত হৃদিকে ছোটো হাঁটুর সঙ্গে এক তালে মুগী ঝগীর মত কাঁপতে কাঁপতে ধপাস্। চিল্লি বললে, 'অবশ্য আমার মুখেও জগন্নাথ বিন্ময় দেখতে পেয়েই ভয় পেয়েছিল আরো বেশী। ভাগ্যিস রমেনবাবু সঙ্গে ছিলেন! আমাকে ঐ আবছায়া আলোতে একলা-একলি দেখতে পেলে তার কোনো সন্দেহ থাকতো না যে, আমার ভূত কলাভবনের মায়া কাটাতে না পেরে সন্ধ্যার নির্জনে সেখানে আবার এসেছে।'

হঠাৎ দেখি জগন্নাথ রাণ্ডয়ের মুখ একেবারে রক্তহীন, মাছের পেটের মত পাঁশুটে হয়ে গিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে যা বললেন তা শুনে রমেনবাবুর মত ঠাণ্ডা মাথা স্থিরবুদ্ধির লোক পর্যন্ত অচল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এতক্ষণে জগন্নাথের খেয়াল গেছে যে, তিনি চিল্লির বাপ-মাকে তার করে জানিয়ে বসে আছেন যে চিল্লি নেই।

আমি ভেঙে বললুম, 'আপনি তো আচ্ছা—নেতার মাইণ্ড!—রাও তো

‘আপনাদের দেশে প্রত্যেক সেকেণ্ড ইন্ডিয়ট।’

জগন্নাথ বার বার বলেন, ‘চিনি তো আমায় জানায় নি যে আরেকজন অজ্ঞবাসী এসেছে। তার উপর ফুটবল, তারপর পেটে—’

রমেনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ‘ওহে! এতক্ষণ তো খুব রগড় করলে! শোনো, ব্যাপারটা সিরিয়স! এ্যান্ড্রুজ সাহেবের কাছে যাও। আর কারো টেলিগ্রাম বাপ-মা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। গুরুদেব তো বালিনে!’

সাহেব মোটেই চটলেন না। নাস্তিক চিনির জন্ত খাটি খুঁটান ছ’পাতা লম্বা তার করলেন সব বুঝিয়ে। আর আমি চিনিরকে তাঁর সামনেই বললুম, এবার প্রার্থনা করোগে, বাড়িতে যেন ভালো-মন্দ কিছু একটা না হয়। দুই অক্ষ ভাইজ্যাগ্ বাগের ট্রেন ধরলেন।

চিনি ফোকটে ছুটি মেরে হুপ্তা তিনেক পরে ফিরল। আমরা শুধালুম, ‘কি, আপন ছেরান্দ সাঁপটাবার মত ঠিক সময়ে পৌঁচেছিলি তো? হুঁকোটা লে, খুলে ক’!’

চিনি বললে, ‘টেলিগ্রাম পৌঁচেছিল দেহিতে। ইতিমধ্যে দাদাকে আনানো হয়েছে মাদ্রাজ থেকে। বাড়িতে কান্নাকাটি সে আর কি বলতে—অবশ্য আমার শোনা কথা। যেদিন তার পৌঁছল সেদিন বামুন এসেছে শ্রাহের ব্যবস্থা করতে। আর ট্র্যাজেডিটা দেখ, বাড়িস্থ সবাই শোকে এমনি বিকল যে, কে একজন তারটা সহ্য করে নিয়ে একপাশে রেখে দিয়েছে, ঘণ্টা দুই কেউ খোলে নি, ভেবেছে, কি আর হবে, কণ্ডলেন্স-টেন্স। খুলেছিল শেষটায় আমার ছোট ভাই। সেও নাকি প্রায় ঐ জগন্নাথ রাণয়ের মত পাণ্ডাশ মেরে রাম ইন্ডিয়টের মত গা-গা ডাক ছেড়েছিল। বাকিরা ভাবলে, আবার কে মরলো? তারপর কেউ বিশ্বাস করে না তারটাকে, যদিও সবাই করতে চায়। এ্যান্ড্রুজ সাহেব এত বিখ্যাত লোক, তিনি আমাদের চিনিটার জন্ত ইত্যাদি...’

শেষটায় বিশ্বাস করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি না পৌঁছানো পর্বন্ত কারো কারো মনের ধোঁকা কাটে নি।

রাত্রে ছাতের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছি হুঁজনতে। আমি বললুম, ‘চিনি, ঘুমুলি?’

‘না।’

‘আর তোর মা?’

‘বিশ্বাস করবি নে, সেটা ভারি ইন্ট্রেস্টিং। জগন্নাথ রাণয়ের তার পৌছনোর পর থেকেই মায়ের মুখে শুধু এক বুলি, “কিছুতেই হতে পারে না। আমার ছেলে

নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এই তো বছরের পরলা দিনে আমি গণংকার ঠাকুরকে
কি বছরের মত এবারও সব ক'টা ছেলের কোণ্ঠী দেখিয়েছি। তিনি এবারও
বলেছেন, চিম্নির সামনে ফাঁড়াটি পর্যন্ত নেই”।’

চিম্নি বললে, ‘যখন পুরুতঠাকুর আঁকের ব্যবস্থা করতে এসেছে তখনো তার
মুখে ঐ এক বুলি, “কি হবে এসব ব্যবস্থা করে? গণংকার বলেছে, এ বছরে
চিম্নির জ্বর-জ্বালাটি পর্যন্ত নেই”।’

কে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে বোঝাবে চিম্নি নেই?

আর আঁকে যা টাকা খরচা হওয়ার কথা ছিল সেটা মা দিয়েছে গণংকারকে।